

সেদেদে

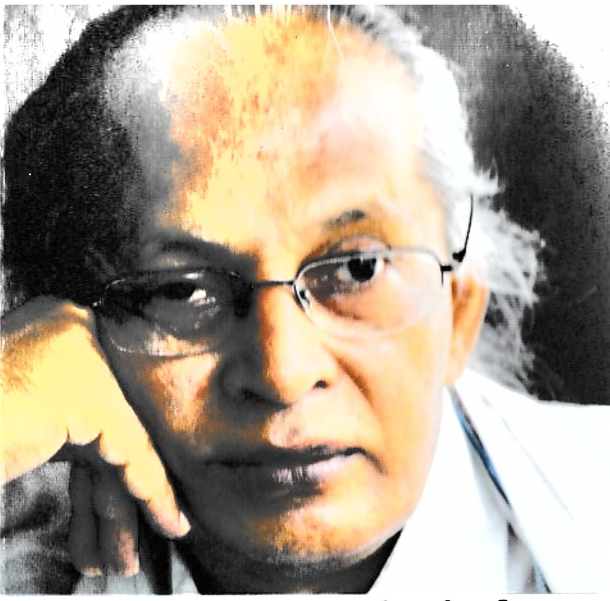
ফরহাদ মজহার

2046

‘ভাব’ এক অর্থে সাধারণত ‘দর্শন’ বলতে আমরা যা বুঝি তা-ই। কিন্তু বাংলার ‘ভাব’-কে আমরা পশ্চাত্য বা ভারতীয় ‘দর্শন’ থেকে দার্শনিক কারণেই পৃথক বলে বিচার করি। দর্শন অর্থ দেখা। দার্শনিক অর্থে এই দেখার অর্থ সত্য দর্শন করা, প্রমাণ করা বা দেখানো। দর্শনে সত্যের যে-ধারণা তার সঙ্গে দেখাদেখির, নিজেকে দেখা বা অন্যকে দেখানোর ব্যাপারটাকে অভিন্নই ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দাবি বাংলার ‘ভাব’ সত্যকে ঠিক এইভাবে দেখে না। সম্ভবত এর সঙ্গে বাংলার তন্ত্রের একটা সম্পর্ক আছে যেখানে দেহ শুধুমাত্র চোখ বা দৃষ্টি নয়, পঞ্চইন্দ্রিয়মাত্রাও নয় বরং ব্রহ্মাণ্ডের শরীরের সঙ্গে দেহ অভিন্ন। দেহ ছাড়া চিন্তা বলে আলাদা কিছু নাই। দেহ যদি ব্রহ্মাণ্ডই হয় তা হলে রক্তমাংসের মানুষরূপে চিন্তা যখন চিন্তা করে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজেই নিজেকে নিয়ে ভাবে—এই অনুমান আমরা বাংলার ভাবান্দোলনে প্রায়ই দেখতে পাই।

বাংলার ভাবান্দোলনকে শুধু ভাব, দর্শন বা জ্ঞানের জায়গা থেকে বিচার করলে চলবে না। তার রাজনীতি বা রাজনৈতিকতার বিচারও চাই। বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের এটাই প্রধান দিক। শুধু ‘ভাব’ হিশাবে বিচারের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বিপ্লবী রাজনীতি—অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যবস্থার খোলনলটে পালটে দেবার যে-রাজনীতি বাংলার ভাষায় ও ভাবে সেই বৈপ্লবিকতার আবাহন করবার তাগিদেই বাংলার ভাবান্দোলনে আমরা আগ্রহী হয়েছি।

বিশ্বব্যবস্থার বদল ঘটাবার জন্য যারা ভাবে ও তৎপরতায় সক্রিয় তাঁরাই বাংলার ভাবান্দোলনের সত্যিকারের ছাত্র—আশা করি অন্যরাও একই অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হবেন।



আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

ফরহাদ মজহার এখন কিংবদন্তি। জীবনযাপন থেকে শুরু করে কর্ম ও কাব্য, সঙ্গীত ও নাটক, সর্বোপরি চিন্তাভাবনা ও দর্শনচর্চায় তিনি অগ্রদূত। নীরবধ্যানে কর্মনিবিষ্টতার মধ্যে স্বদেশের মূলধারার কৃষি, শিল্প, প্রকৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে ভাবান্দোলনের সম্পর্ক নিরূপণে রচনা করেছেন একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। তার ভেতর দিয়ে তিনিই প্রথম বাংলার মানুষের ভাব বা দর্শনচর্চার ইতিহাসকে গ্রন্থিত করলেন।

জন্ম : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, নোয়াখালী।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : ঢাকা ও

নিউইয়র্কে—ঔষুধশাস্ত্র (ফার্মাসিস্ট) ও
অর্থনীতি।

নেশা: কৃষি, কাব্য, সঙ্গীত ও বাংলার
ভাবান্দোলন।

ভাবান্দোলন

ফরহাদ মজহার

মাওলা ব্রাদার্স ৯ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স



© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accessitel.net

প্রচ্ছদ
সাইম রানা

বর্ণবিন্যাস
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
২৪ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0028 0

BHABANDOLON (Philosophical Discourse) by Farhad Mazhar. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover designed by Sayeem Rana. Price : Taka Three Hundred Only. US \$ 9.95

ধরো চরণ ছেড়ো না দয়াল নিতাই কারও ফেলে যাবে না...
— ফকির লালন সাঁই

উৎসর্গ

উপমহাদেশের জাত-পাত-শ্রেণী-নারী-পুরুষভেদ বিরোধী
রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান পূর্বসূরি
দয়াল নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে

আমার ঋণ

‘ভাবান্দোলন’ আমার দাবি, সমবায়িক রচনা। অর্থাৎ আমার একার লেখা না। যখনই বাংলার ভাবচর্চার রূপ খুঁজতে শুরু করি তখন থেকেই যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠতা তাঁদের কথারই প্রতিধ্বনি আমি করেছি, আলবৎ আমার ভাষায়। কিম্বা তাঁদের চিন্তাচেতনাই লেখার প্রেরণা হয়েছে। মানি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায় ভাগ আমার, জবাবদিহিও আমাকেই করতে হবে। কিন্তু ‘ভাবান্দোলন’ যে অসংখ্য মানুষের কাছে ঋণী সেই কথা শুরুতে আমাকে বলতেই হচ্ছে।

বাংলা দর্শনচর্চার ভাবরূপের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা লেখালিখির চেহারা নেবার তাগিদ পেতে শুরু করে এককালে নদীয়ার অন্তর্গত এখন কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়ায় নবপ্রাণ আন্দোলনের আখড়াবাড়িটির যাত্রা আরম্ভের দিন থেকে। মলম শাহের যে-বাড়িটি ফকির লালন সাঁইজীর আখড়াবাড়ি ছিল এবং এখন যা লালন ফকিরের মাজার বলে পরিচিত — মতিজান-লালন ফকিরের স্মৃতিধন্য সেই স্থানটির দিকে মুখ করে আছে নবপ্রাণ। এখানে সাধুগুরুদের সঙ্গে আন্তরিক সঙ্গের সুযোগও আমার বাড়ে এবং নদীয়ার ভাবের যতোটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে সেই তলানির স্বাদ পেয়ে আমারও সাহস বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের সীমা ও সংকট সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠছিলাম। সেই সীমা ও সংকট মীমাংসার ক্ষেত্রে ছেঁউড়িয়া একটা অবলম্বন হতে পারে সেই ভরসাও আমি পেয়ে যাই। ফলে যে-কথাগুলো আমি এখানে বলার চেষ্টা করছি সেটা অনেকটাই নবপ্রাণের খুঁটির জোরে। নবপ্রাণ আমাকে বহু বয়াতি, কবি, ‘বাউল’, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শাক্ত ও বলাবাহুল্য লালনের ঘরের সাধু ও অনুরাগীদের সঙ্গে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য করেছে। এঁদের কাছে আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নাই। যারা বাংলার ভাবচর্চার ধারা সম্পর্কে খানিক অবহিত তাঁরা বুঝে যাবেন, যে-কথাগুলো লিখেছি, তা সম্ভব হয়েছে সাধুগুরুদের সঙ্গে দীর্ঘদিন সঙ্গ ও আলাপ-আলোচনার সাহস নেপথ্যে কাজ করেছে বলেই। ফলে গুরুর কৃপা ছাড়া যে-দিকগুলো নজরে আসা অসম্ভব ছিল। ভুলত্রুটি অবশ্যই দাসানুদাসের। এই প্রসঙ্গে নবপ্রাণের পরিচালক ফেরদৌস আখতার

লিলি ও লালন সঙ্গীত-শিক্ষক আবদুল কুদ্দুসের অবদানও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

সমবায়িকতার এই আনন্দ ছাড়াও বয়সে আমার ছোট কিন্তু তিনজন মানুষের ব্যক্তিগত পরিশ্রম ছাড়া ‘ভাবান্দোলন’ প্রকাশ অসম্ভব ছিল — এই কথাও আমাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতেই হয়। ঐদের ঋণ স্বীকার না করে এই বই প্রকাশ অনায়াস।

প্রথমে গৌতম দাসের কথা বলতে হয়। আশি ও নব্বই দশক থেকেই গৌতম আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিশেষত দর্শন বা ভাবগত ভাবে যেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা কখনো ব্যর্থ আবার কখনো সফল হয়েছি সেই টানা পড়েনের চিহ্নগুলো কমবেশি গৌতমের জানা। ‘ভাবান্দোলন’ নামে যে লেখাগুলো এখন গুছিয়েছি তাদের প্রথম প্রকাশরূপের ভালমন্দ নিয়ে গৌতম তর্কাতর্কি করেছে, অনেক কথা নতুন বলতে গিয়ে যে-সাহসের অভাব বোধ করেছে গৌতম সাহস জুগিয়েছে।

মুসতাইন জহির এই পাণ্ডুলিপি তৈরির শুরু থেকেই জড়িত। প্রতিটি লেখা অক্ষর ধরে ধরে মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা এবং আমাকে আবার পরিমার্জনা ও সংশোধন করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে মুসতাইন যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তার তুলনা নাই। ‘বান্ধা’ কথাটা আমি বলছি এই কারণে যে বিভিন্ন প্রশ্ন নতুন করে ভাবতে জহির আমাকে প্রণোদিত করেছে, এই ঋণ আমাকে অতএব স্বীকার করতেই হয়। বলা দরকার, পাক্ষিক চিন্তার ‘বৃহস্পতিবার’ পাঠ্যক্রমের প্রায় সকলেই — বিশেষত তারেক, রোমেল, ফয়সল, মিলন ও টুটুলসহ অনেকে নানান প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে ‘ভাবান্দোলন’ সম্পর্কে আমার চিন্তাকে আরো পরিচ্ছন্ন করতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া মোহাম্মদ আজম নানান বইপত্র দিয়ে ও আমার সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনায় শুরু থেকে বইটিকে গুছিয়ে আনতে তাঁর অজান্তেই অবদান রেখেছেন।

এরপর আছে সাইমন জাকারিয়া। সাইমন ছাড়া এই প্রকাশ ছিল রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রুফ দেখার কঠিন কাজের জন্য মোটেও নয়। বরং সাইমন আমার এই বইটি শেষ করবার ক্ষেত্রে নিত্যদিনের প্রেরণা হয়েছিল। আমার লেখবার ঘরে ঢুকবার আগেই দূর থেকে ওর ‘ফরহাদ ভাই, কদর...?’ শুনে আমার মধ্যে এমন এক বিচিত্র ভীতির সঞ্চার হোত যার আনন্দ আমি কখনই ব্যাখ্যা করতে পারব না। এই বইটি গ্রন্থাকারে বের করবার পেছনে এই আনন্দটুকু দারুন কাজ করেছে। কৃতিত্ব একান্তই সাইমন জাকারিয়ার। শুধু তাই নয়, সাইমন মনোযোগ দিয়ে কয়েকবারই লেখাগুলো পড়েছে এবং তার সমালোচনার মুখে আমাকে বহু ক্ষেত্রে পিছু হটতে হয়েছে। ওকে এখন ধন্যবাদ দেওয়া নিরর্থক। ঋণ স্বীকারও। বই প্রকাশের ষোল আনা দায় দায়িত্ব সাইমন নিজের কাঁধে নিয়ে বাংলার ‘ভাবান্দোলন’ সম্পর্কে তার নিজের নিষ্ঠা ও সংকল্পই প্রমাণ করেছে। ওর সঙ্গে কাজ করার আনন্দ অমর হোক। ওর অবদান অনস্বীকার্য।

ফরিদা আখতার ছাড়া আমি আদৌ লেখালিখি করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমি যে ভাব ও ধারায় বিশ্বাস করি সেই মোতাবেক তিনিও এই গ্রন্থের রচয়িতা।

অতএব তিনি ধন্যবাদের পাত্রী নন। আমাকে কাজ থেকে অবসর দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান ‘উবিনীগ’-এর কর্মীরা যেভাবে আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছেন তার তুলনা চলে না। তাঁদের ঋণ স্বীকার করি।

পাণ্ডুলিপি তৈরিতে কবি মজনু শাহ ও মোস্তাফিজ কারিগরের পরিশ্রম স্মরণ করছি।

মাওলা ব্রাদার্সের আহমেদ মাহমুদুল হকের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি আমার ওপর হাল ছাড়েন নি। তাঁকে ধন্যবাদ।

কৃতিত্ব যেন সকলেরই হয়, আর অপরাধটুকু পাঠক, যেন আমার ওপরেই বর্তায়।

২ মাঘ ১৪১৪। ১৫ জানুয়ারি ২০০৮। শ্যামলী।

ফ.ম.

একটা প্রতীকের খুবই চল আছে কবিদের দরবারে যে, কবি বুঝি গর্ভবতী মেয়ে। কবিতার বীজ যখন তাঁর মধ্যে অধরা ‘পুরুষ’ বপন করে তখন কবি চাইলেও কবিতার জন্ম দান করতে পারেন না। (যদিও অবস্থাবিশেষে গর্ভপাত ঘটে যেতে পারে)। কবিকে তখন প্রকৃতির মতোই পুরুষের দাস হতে হয়। বায়লজিকাল পুরুষের কথা এখানে বলছি না, বলছি সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ যেভাবে ‘পুরুষ’-কে অর্থ দান করে সেই দিক থেকে। কবিকে পরমার্থিক সেই পুরুষের দান গ্রহণ করে অপেক্ষা করতে হয় যেন কাব্যের প্রাকৃতিক নিয়মে কাব্যশিশু পরিণত জ্ঞানের রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এই বইটির ক্ষেত্রেও একই প্রকার কাব্যদুর্দশা ঘটেছে। বইটি প্রকাশ করবার তাগিদ ছিল দীর্ঘদিনের। আমি টালবাহানা করে গিয়েছি। এই দীর্ঘসূত্রতার দোষ এখন খানিক আমার ঘাড়ে আর বারো আনা প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের কেছা গেয়ে সেই অধরার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি যাকে ধরে জবাবদিহি আদায়ের ব্যবস্থা দার্শনিকরা এখনো করতে পেরেছেন বলে শুনি নি।

‘ভাবান্দোলন’ নামে এখানে যা জমা করেছি, লেখাগুলো নানান সময়ে লেখা। ফলে বিভিন্ন লেখায় একই কথা ফিরতিবার বলার দোষ ঘটেছে। তাই আগেভাগেই পাঠকের কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। পাঠকের বিরক্তির কথা ভেবে এখানে-ওখানে হাত লাগিয়েছি, কিন্তু পুরাপুরি সংশোধনে বিরত থেকেছি। প্রতিটি লেখার স্বাধীন প্রবাহ যদি ক্ষুণ্ণ হয় এই আশংকায় সংস্কার ততোটুকুই করেছি যতোটুকু আলোচ্য বিষয়ে আমার চিন্তা পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। আগে প্রকাশিত আলাদা আলাদা লেখায় ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে যে-চিন্তা হাজির করেছিলাম—এক মলাটের মধ্যে একসঙ্গে একই সূতায় বাঁধতে গিয়ে সঙ্গতি রাখার তাগিদ বোধ করেছি। ফলে মাঝে মধ্যে কাটাছেঁড়া করেছি। সত্য। যারা আমার লেখা মোটামুটি পড়েন এবং জানেন তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্র আরো সহজে ধরতে পারবেন বলে আমার ধারণা। ভাবান্দোলন সম্পর্কে এই বইটিই এখন আমার অবস্থান জ্ঞান করে বিচার করা যেতে পারে।

সাজাবার সময় এটাও খেয়াল রেখেছি যে শুধু দুই মলাটের মধ্যে অনেকগুলো লেখার সংকলন হিসাবে না দেখে সব লেখার মধ্যে বাংলায় ভাবচর্চার জরুরী প্রশ্নগুলো ধরবার ঝোঁকটা যেন পাঠক ধরতে পারেন। সবক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো পরিষ্কার করতে পেরেছি সেই দাবি করব না, সেটা আমার একার কাজও নয়। কিন্তু যে ঝোঁক বা ইঙ্গিতগুলো ধরার চেষ্টা করেছি, সেই দিকে আগামী দিনে আরো অন্বেষণ চালাবার সাধ আছে। আমার অনুমান বাংলায় দর্শনচর্চা বা আমার ভাষায় ‘ভাবচর্চা’-র অভিমুখটা ঐ সকল ঝোঁক বা ইঙ্গিত অনুসরণের মধ্য দিয়েই সাবালিকা হয়ে উঠবে। আগামী দিনে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কাজ করা দরকার সেই কাজগুলো শনাক্ত করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবেই লেখাগুলোকে বিচার করা ভাল। বইটিতে ‘ভাবান্দোলন’ নামটিতে সম্ভবত নতুন একটি বিষয়ের ঘোষণা আছে যাকে পাশ্চাত্য অর্থে ‘দর্শন’ বলতে আমি নারাজ। হয়তো বিষয়টির খানিক আবির্ভাবও ঘটেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে গুছিয়ে লেখালিখির বই এটি নয়। বরং ভাবান্দোলনের বিষয় কী হওয়া উচিত তারই কয়েকটির আগাম ইঙ্গিত করতে চেয়েছি। তবে ফাঁকফোকরে বিশেষ ও নির্বিশেষ চিন্তাসূত্র বা দর্শন—কিন্তু ভাবুকের প্রশ্ন, সংশয় ও মীমাংসার দুই একটি ইশারাও রয়েছে। পাঠক তাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেই খুশি হব। আমার আশা, এইসকল ইঙ্গিত ও ইশারা নিয়ে আগামীতে গদ্যের ফুরসত আমি পাব।

প্রশ্ন, সংশয় ও মীমাংসা মাত্রই কোন না কোন অনুমানের ওপর দাঁড়ায়। সেই অনুমান সম্পর্কে ভাবুক সবসময়ই জাগ্রত বা সজ্ঞান এই দাবি তুরীয় আত্মসচেতন দার্শনিকও সাধারণত করেন না। নতুন চিন্তা কখন কিভাবে ভাষায় ধরা দেয় সেটা কবি যেমন আগাম জানেন না, ভাবুকের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। এই কারণেই হয়তো এই কালে কাব্য আর ভাবুকতার ভেদরেখা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। তবে কাব্য বা শিল্পকলার সঙ্গে ভাবের কায়কারবারের ফারাক ওখানে যে ভাবুক নিজের অনুমান শুধু নয়, একইসঙ্গে আপন চিন্তার গতিপথ সম্পর্কে কমবেশি ইঁশিয়ার থাকতে পছন্দ করেন। সেটা আবার কবির কর্তব্য নয়, শিল্পীর সেই বাধ্যবাধকতা নাই। যখন এই লেখাগুলো লিখছিলাম তখন কখনো কখনো কবির দায় বোধ করেছি, কখনো ভাবুকের। অথচ উভয়ের পার্থক্য আমি বিশেষ মানিও না। তবে এই দোলাচল আবার মন্দ লাগে নি। তাই লেখার সময় যেখানে যেমন কথা ফুটেছে, তেমনি তাকে পাপড়ি মেলতে দিয়েছি।

ভাবচর্চা একটা কোদালি কাজের মতো। কাজটা যখন হয়ে যায় তখন ধরা পড়ে যিনি কাজটি করেছেন তাঁর মনে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে চিন্তায় কাজের নকশাটা আগে থাকতেই কিভাবে বিরাজ করছিল। আর ঠিক এখানেই ভাবুকের কাজের অপরিসীম গুরুত্ব। তিনি ঠিক বললেন নাকি বেঠিক বললেন সেটা গোণ। তিনি ‘সত্য’ বা ‘নিশ্চয় জ্ঞান’ কায়ম করেছেন কি করেন নি সেই তর্কের চেয়েও তাঁর কালের প্রশ্নগুলো তিনি তুলতে পেরেছেন কিনা সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে। একেকটা কালে বা একেকটা যুগে যে প্রশ্ন চিন্তাসূত্র, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, সংকল্প ইত্যাদি দানা বাঁধতে থাকে তারা

ভাবুকতার মধ্যে ধরা পড়তে থাকে। পাশ্চাত্য ‘দর্শন’ আর বাংলা ভাষায় ‘ভাব’—এই দুইয়ের পার্থক্য অন্বেষণ করতে করতে এতোদূর আসা! অলিগলিতে প্রবেশ। এটাই আমার প্রশ্ন। মাঝে মধ্যে হয়তো সদর রাস্তার ইঙ্গিত এসেছে কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে দর্শনচর্চা বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থে সেই (কু)কর্ম সচেতনভাবে পরিহার করেছি। তবে শেষ কথা বলি নি, যদি ‘শেষ কথা’ নামক চরম বা পরম কিছু আদৌ ভাবজগতে থেকে থাকে।

না। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে একটা মহা দ্বন্দ্ব আছে যা নিরসনের অযোগ্য এই ধরনের কোন অনুমান আমার মধ্যে কাজ করে নি। লালনের ঘরে বাস করি বলে আমি ‘মানুষ’ ভজনা করি। সাদা/কালো, প্রাচ্য/পাশ্চাত্যের ভেদ এই ঘরে খাটে না। দর্শনের বিপরীতে বাংলার ‘ভাব’ প্রতিষ্ঠা আমার লক্ষ্য নয়। আন্তর্জাতিক অর্থে ভাবুকতা যেখানে এসে ঠেকেছে, তার সমৃদ্ধি ও সংকটসহ—মানবেতিহাসের এখনকার বিপন্ন চিহ্নগুলো শনাক্ত করার বাসনা কাজ করেছে। ফলে আমার বিষয় একদিকে প্রাচ্য হোক বা পাশ্চাত্য আসুক—আসল মতলব চিন্তার শক্তি উপলব্ধি করা এবং একই সঙ্গে চিন্তা এখন কী চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছে সেই ভুলে যাওয়া চিহ্নগুলো আবার সাফসুতরো করে তোলা। একই সঙ্গে চিন্তায় যা এখনো ধরা পড়ে নি, কিম্বা চিন্তাকে চিন্তা করতে দেওয়া হয় নি, তাকে তুলে আনার চেষ্টা চালানো। চিন্তার এখনকার সংকটগুলো কোথায় তাকে বাংলা ভাষায় ধরা যায় কিনা, কিম্বা যদি ধরতে চাই তবে কিভাবে কোথায় ধরব সেই গোপন ও দৃশ্যমান জায়গাগুলো খুঁজতে নেমেছি। পাঠকের কাজে লাগবে কতোটুকু তাঁরাই বিচার করবেন। সাধ আর সাধের সঙ্গতি আদৌ ঘটেছে কিনা সেই বিচার আমার নয়। লেখালিখির মধ্যে পাঠক যদি একটা কাজের পরিশ্রম ধরতে পারেন তাহলেই দারুন খুশি হব। অইটুকুন আমার পাওনা।

যাঁরা পড়বেন তাঁদের সম্পর্কে আমার অনুমান সবসময় একরকম ছিল না। সাহিত্যওয়ালারা পড়বেন নাকি ভাবুকেরা? কিম্বা রাজনীতিক? কিম্বা বয়সের বিচারে তরুণ সম্প্রদায়? ফকির-ফ্যাকড়ার কথা আছে; বহু বিষয়েই তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়েছে, ভাববিচার ঘটেছে, তার ইঙ্গিত লেখাগুলোতে থাকলেও থাকতে পারে। জানি, কেউ পড়বেন কেউ পড়বেন না। তবে অনেকে পড়বেন না সেটা নির্ধারণ জানা কথা। বাংলা ভাষায় যদি আমরা দর্শন চর্চা করি তাহলে কীভাবে ও কোথা থেকে শুরু করা যায়, এবং পাঠকদের একটা বড় অংশ কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পাবে সেই নিকগুলো আমি ভেবেছি। এটা দ্রষ্টব্য যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে-ধারাকে ‘লোকায়ত’ ধারা বলে থাকে বাংলায় ভাবচর্চার ধারা ওটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ভাবচর্চার মধ্যেই দর্শনের মূল প্রশ্নগুলো বারবার তোলা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিল্পসাহিত্য লেখালিখি বাংলার ভাব বা দর্শনচর্চার মূল ধারা নয়। জ্ঞান বা প্রজ্ঞার গুরুতর প্রশ্ন বা জটিল দিকগুলো, আশ্চর্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নয়, আকৃষ্ট করেছে অতি সাধারণ মানুষগুলোকে। গভীরতা ও বিস্তার উভয় দিক থেকেই এই ধারা সমৃদ্ধ। ফলে ‘ভাবান্দোলন’ বইটি এমন একটি জগতের দিকে আহ্বান জানাতে

চাইছে যে জগত আমাদের আশেপাশেই বিরাজ করে অথচ ওর অন্তর মহলে প্রবেশের তীব্র কোন আকাঙ্ক্ষা আজ অবধি আমি খুব দেখি নি। বলাবাহুল্য, সেটা নৃতাত্ত্বিক খোঁজখবর, কিম্বা লোকসাহিত্য পাঠ নয়। চিন্তা নিজেকে নিজে সন্ধান করে বেড়াবার কাজ ভিন্ন ধরণের কাজ। ‘ভাব দিয়ে ভাব নেবার’ যে চর্চাকে ফকির লালন শাহ অসাধারণ মহিমা দিয়ে গিয়েছেন আমি সেই পদচিহ্নই অনুসরণ করবার বাসনা করি। কারণ এই কাজটা যারা শেখে নি তারা ‘গুরুর চরণের দাসের যোগ্য নয়’ বলে তিনি ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন।

মাঝে মধ্যে ভাষা নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা নজরে পড়বে। ভাবচর্চা বাংলা গদ্যে ঠিক কী রূপ নেয় বা কী রূপ নিলে সুবিধা আমি সে ব্যাপারে নিজের মত পাকাপাকি করি নাই। ভাবচর্চা একই সঙ্গে ভাষাচর্চাই বটে। ফলে কাব্যের সঙ্গেই দর্শনের সহোদরামূলক রিশতা—এটা আমরা জানি। সাধারণত দশজনকে বোঝাবার জন্য যে ভাষায় লিখেছি এবং যেভাবে ছেপেছি তাকে অবিকৃতই রেখেছি। আশা করি বলবার ধরণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা পাঠক মানবেন।

নিত্যানন্দকে বইটি উৎসর্গ করেছি কারণ, এক নদিয়ার ভাবের তিনি গুরু বলে প্রসিদ্ধ। দুই এমনকি শ্রীচৈতন্য নদিয়ায় যা কিছু ‘লীলা’ করেছেন সবই তাঁরই নির্দেশে—এই সত্যও প্রচারিত আছে। তিন, নদিয়ার ‘তিন’ পাগলের এক ‘পাগল’ নিত্যানন্দ ‘নদিয়া’ ছেড়ে যান নি। এই ইতিহাস না জানলে ফকির লালন শাহের ‘দয়াল নিতাই কারও ছেড়ে যাবে না’—এই বিখ্যাত দৈন্যগানের ভাবগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য কিছুই বোঝা যাবে না। গৌরঙ্গ নদিয়া ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যেতে পারেন, উচ্চবর্ণের গরিমা, জ্ঞানের অভিজাত্য এবং ক্ষমতার বৃত্তে পড়ে তিনি আর নদিয়ায় ফিরে আসেন নি। এমনকি মনোকষ্টে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলে অনেক ঐতিহাসিক দাবি করেন। অদ্বৈতাচার্য জ্ঞাতপাতবিরোধী আন্দোলনের চেয়েও গৌরঙ্গের শাস্ত্রীয় তর্ক ও ভাবের মূর্ছায় আপ্ত ছিলেন, গরিব ও নিপীড়িত মানুষের কাতারে তিনি কি নেমেছেন? কিম্বা নামলেও তিনি কি আবার ফিরে যাননি উচ্চ কোটিতে? কিন্তু দলিত বা নমঃশূদ্র, আদিবাসী—অর্থাৎ সমাজের সবচেয়ে নিগৃহীত, নিপীড়িত, অত্যাচারিতদের ছেড়ে নিতাই নদিয়া ছেড়ে বৃন্দাবনে যান নি। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না। অর্থাৎ দলিত ও নিপীড়িতের জগত ত্যাগ করে উচ্চবর্ণ ও অভিজাতদের জগতে নিতাইকে উন্নীত হবার দরকার পড়ে নি। গোয়ামীদের শাস্ত্রীয় প্রকল্প হয়ে বাংলার ‘ভক্তি’-র ধারা বৃন্দাবন হয়ে যেভাবে আবার বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ফিরে গিয়েছে নদিয়ার রাজনীতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফকির লালন শাহের সংশয়, ‘নদিয়ার ভাবের কথা, অধীন লালন জানে কি তা!’ আসলেই। আমরা কি এখনো জানি?

দয়াল নিতাইকে এই বইটি উৎসর্গ করেছি এই কথা ঘোষণা করার জন্য যে ভাবান্দোলন ঐতিহাসিক ভাবে সমাজের নিম্নবর্ণের আন্দোলন—নিপীড়িতের, অত্যাচারিতের, সমাজের সবচেয়ে নিগৃহীত মানুষটির—এমনকি যার বেদ, শাস্ত্র,

ধর্মগ্রন্থ, পাণ্ডিত্য, ক্ষমতা, রাষ্ট্র—কোন কিছুতেই অধিকার নাই সেই মানুষগুলোর ঐতিহাসিক ও ভাবগত উপস্থিতি জানান দেবার জন্য। এটাও সূরণ করিয়ে দেওয়া দরকার বাংলাদেশ নিম্ন বর্ণের আর আতরারদেরই দেশ। ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণাশ্রম প্রথা, নারীপুরুষ ভেদ ও সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেই এই দেশের জনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। ইসলামের প্রতি এই দেশের মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে দলিতদের মুক্তির কথা ইসলাম শুনিয়েছে বলেই, দোজখের ভয়ে বা বেহেশতের লোভে নয়। শূদ্র যদি বেদ শোনে তবে তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেবার ইতিহাস অতিক্রম করে আসতে হয়েছে এই জনগোষ্ঠীকে। কোন কিছুতেই যার কোন অধিকার নাই—সমাজের সেই তলানি থেকে উঠে আসা মানুষদের রাজনীতিই ভাবান্দোলনের ইতিহাস, তার বিকাশ ঘটেছে লড়াই থেকেই। এই রাজনীতিটুকু না বুঝলে ভাবান্দোলনের ‘ভক্তির’ ব্যাপারটা আসলে কি, কিম্বা ‘নদিয়ার ভাব’ কেন বৈপ্লবিক আমরা তা ধরতে পারব না। ভক্তদের এই বইটি তার প্রাথমিক নজির মাত্র। জাতপাত, শ্রেণী ও নারীপুরুষ ভেদ বিরোধী লড়াইয়ের ধারাই বাংলার ভাবান্দোলনের মূল ধারা। সেই লড়াইয়ের চিহ্নগুলো নানা কারণে ম্লান আর অপরিচ্ছন্ন। যদি খানিক সাফসুতরো করতে পারি তবেই ধন্য জ্ঞান করবো। এই লড়াই, বলাবাহুল্য, এই উপমহাদেশে এখনো শেষ হয় নি। নিত্যানন্দের মধ্য দিয়ে ফকির লালন শাহের ভাষায় ‘নদিয়ার ভাব’ যে রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে দানা বেঁধেছে তাকে এখনকার বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জানা ও বোঝা খুবই দরকার।

২

আমার কাব্যগ্রন্থ ‘এবাদতনামা’ ও ‘ভাবান্দোলন’ যে একই ভাবচর্চার ধারাবাহিক প্রকাশ তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এবাদতনামা কাব্য হিশাবে যখন আমার কাছে ধরা দিচ্ছিল তখন আমার এই উপলব্ধি হতে শুরু করে যে জন্ম, রক্ত, গোত্র, গোষ্ঠি, জাত, পাতসহ সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীচু জাতের মানুষের যে ডাক, ‘ইসলাম’ ডাকনামের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনী ঘটেছিল বলে ইসলাম এই দেশে স্থায়ী আসন পেয়েছে। অতএব এই ডাকের ভাব ও রাজনীতি অস্বীকার করলে, ভুলে গেলে কিম্বা তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধরতে না পারলে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিশাবে আমাদের বেড়ে ওঠা বা পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হবে।

বাঙালি আমার কাছে নৃতাত্ত্বিক ধারণা নয়, ঐতিহাসিক ধারণা। নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠি জাতপাতের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক লড়াই করেছে সেই লড়াইয়ের ইতিহাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঙালি ও বাংলাদেশকে বুঝতে হবে। লড়তে গিয়ে নিজেদের রক্তে মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশীসহ আরো কতোই না আদিবাসীর রক্ত এসে মিশেছে, তাকে আর নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতায় শনাক্ত করা অসম্ভব। অতএব জাতপাত বিরোধী লড়াইয়ের ভাব ও ইতিহাসের মধ্যে আমি আমার জনগোষ্ঠিকে আবিষ্কার করার তাগিদ বোধ করি। এখানেই ইসলামের জাতপাত বিরোধিতা আর নিম্নবর্ণের মানুষের লড়াইয় এক বিন্দুতে এসে নানান সময়ে মিশেছে। এই মুহূর্তগুলো শনাক্ত না

করা গেলে বাংলাদেশে বিপ্লবী রাজনীতির পুনর্গঠন অসম্ভব। ধর্ম সূত্রে আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কিম্বা স্বেচ্ছ নাস্তিক হতে পারি, কিন্তু ইসলামের এই ভাবগত ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের মানুষের সংগ্রামের তাৎপর্য বিচার না করলে, আর যাই হোক নিজেদের ‘প্রগতিশীল’ দাবি করা যাবে না।

৩

ভাবান্দোলনের দিক থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে আমাদের সমাজের তর্ক সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা দরকার। আসলে তর্কের অনুপস্থিতি বলাই সম্ভব। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ নামে যে-চিন্তা আমাদের সমাজে চালু রয়েছে তার প্রধান চরিত্রলক্ষণ হচ্ছে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্ব পর্যালোচনার কঠিন কাজ পরিহার করে ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তা বা ধ্যানধারণাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ‘নির্মূল’ করার চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে। এর পরিণতি বিরোধের মীমাংসা চিন্তার জায়গায় আর থাকছে না, চলে যাচ্ছে সরাসরি সহিংসতার জায়গায়।

ধর্ম যদি নিছকই ধর্মতত্ত্ব (theology) হয়ে থাকে, সমাজ যদি ধর্মতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে ধর্মের ভাবগত দিক বিকশিত করতে ব্যর্থ হয়, সেটা ভয়ানক বিপদের কথা। অন্যদিকে এর বিপরীতে ভাব বা জ্ঞানগত ভাবে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা না করে তাকে শুধু ‘ব্যক্তিগত ব্যাপার’ বলে আড়াল করে রাখাই ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে গণ্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মবাদীরা যখন আরো শক্তি নিয়ে প্রত্যাঘাত করে তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তাকে আর জ্ঞানগতভাবে মোকাবিলা করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বুদ্ধিবৃত্তিক আলস্য, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং সর্বোপরি সমাজে সুবিধাবাদী অবস্থান নেওয়া সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হয়ে ওঠার সময় এসেছে। ধর্ম ‘ব্যক্তিগত’ ব্যাপার — ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করবার এই প্রয়াস আসলে ধর্মতাত্ত্বিক পরিমণ্ডলেই সম্ভব, কারণ এই প্রয়াস ধর্মতত্ত্বকে অতিক্রম করে না, তাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করে মাত্র। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা এই সহজ সত্য বুঝতে পারে না। ধর্ম ‘ব্যক্তিগত’ বলা মানে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বের ভাবগত মোকাবিলা নয়, ধর্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা ধার্য করে দেওয়া। বলাবাহুল্য, ধর্মতত্ত্ব কিন্তু ধর্মকে ‘ব্যক্তিগত’ ব্যাপার মনে করে না। ফলে তর্কটা এই দিক থেকে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্ব নিয়েও নয়, বরং বিশেষ সমাজে বিশেষ দেশকালে ব্যক্তি ও সমাজের সীমারেখা কিভাবে টানা হচ্ছে সেই তর্কের ওপর নির্ভরশীল। এখানে এই বিষয়গুলো তোলার সুযোগ হয় নি, কিন্তু পাঠ করবার সময় মনে রাখলে ভাল হয়।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যারা দাঁড়ান তাঁদের মধ্যে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বের ভাবগত পর্যালোচনার অভাব থাকা সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা কাজ করে, সেটা হোল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান। আমরা এই বিবেচনার সঙ্গে একমত। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভাবান্দোলনও নিরাপোষ অবশ্যই। সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ধর্মে নয়, যে কোন আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতি, অর্থাৎ ভাষা,

ধর্ম, সংস্কৃতি ভূখণ্ড বা চাষাবাদের ধরণ— অর্থাৎ যা কিছুই আত্ম-পরিচয় নির্মাণের মানদণ্ড হয়ে ওঠে ও সেই মানদণ্ডে অন্য সকল জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করায় তা ‘সাম্প্রদায়িকতা’ ছাড়া আর কি? মাত্রাভেদের তারতম্য বা অপরের প্রতি সহনশীলতা সেখানে বাহ্যিক বকোয়াজগিরি মাত্র। ভাবান্দোলন আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতি করে না, বা কোন বন্ধ, অন্ধ ও অনড় ‘আদর্শ’ পূজা করে না। আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও এই অর্থো ভাবান্দোলন ‘বেদ’ বা ‘শাস্ত্র’ বিরোধী। ভাবান্দোলন জীবন্ত মানুষের জীবন্ত চিন্তাকে মানে, জীবন্ত মানুষ ভজনা করে — মৃত কোন কিছুর উপাসনা করে না। কারণ একমাত্র জীবন্ত মানুষই বই, শাস্ত্র, আদর্শ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে এবং দেশকালপাত্র ভেদে নতুন অর্থ তৈয়ার করে। ধর্ম বেদে বা শাস্ত্রে যাই থাকুক — ‘মানুষে মিশিয়া হয় বেদান্তর’। মানুষে মিশে গিয়েই আক্ষরিক অর্থ অতিক্রম করে চলে যায়, বেদের অক্ষরের মধ্যে আর নির্দিষ্ট থাকে না। নতুন অর্থ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি করে। ইত্যাদি।

এর পরেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আকৃতিকে ভাবান্দোলন বুঝতে চেষ্টা করে। ভাবান্দোলন কোন মানবিক আকৃতিকে নাকচ করে না। মানুষের আকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সমাজ যদি ধর্মে ধর্মে বিভক্ত হয়েই থাকে তাহলে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উপায় কি? মানুষ অপরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চায় — এই কারণেই, দার্শনিকদের দাবি, ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, নাগরিক পরিচয়ে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সমাজে বিচ্ছিন্ন মানুষ কল্পনায় নিজেদের এক ও অভিন্ন ভাবে তগিদে বোধ করে। সমাজে মানুষ পরস্পর থেকে আলাদা, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে একজনের মাথায় আরেকজন হামেশা বাড়ি দিয়েই যাচ্ছে। অন্য মানুষ আমার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার উপায় মাত্র। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও অপর মানুষের সঙ্গে ঐক্য বোধ করবার এই আকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাবান্দোলনেও আমরা সেই আকৃতি দেখি। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের কিম্বা আল্লাহ, ঐশ্বর ভগবান বা যে কোন নামে ‘অপর’-এর মধ্যস্থতায় মানুষ অপরকে কেন ডাকে সেই রহস্য উন্মোচন না করার কারণে ধর্ম নিরপেক্ষতা পুঁজিতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সমার্থক হয়ে ওঠে। ধর্মতত্ত্ব ও রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বা ‘অপর’-এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্ন পরিচ্ছন্ন না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা দাবি করে ধর্মনিরপেক্ষতা তাকে এই আকৃতি বাস্তবায়নের সুযোগ দেবে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মতত্ত্বের জগত অতিক্রম করতে পারে না, বরং ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বকে তার প্রাচীন রূপ নিয়েই ‘ব্যক্তিগত ব্যাপার’ হিসাবে টিকিয়ে রাখে। এবং পুঁজিতাত্ত্বিক ও উদার গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় ব্যবস্থায় ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বের রাজনীতি সংগঠিত হবার শর্ত তৈরি হওয়ার কারণে ধর্মবাদী রাজনীতি শক্তিশালী দেখলে চিৎকার শুবু করে দেয়। মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং যার যার নিজের ধর্ম ব্যক্তিগত ভাবে বজায় রেখে ও চর্চা করে ‘সার্বজনীন মানুষের সমাজ’ তৈরি করার এই চিন্তা উদ্ভট ও ঋণিরোধী।

ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মতত্ত্ব টিকিয়ে রাখে বলেই ধর্মীয় বা ধর্মতাত্ত্বিক পরিচয়ে পরিচিত সংখ্যালঘুও টিকে থাকে এবং কাজে কাজেই সংখ্যালঘুর রাজনীতিও থাকে। সংখ্যালঘুকেও ধর্মীয় বা ধর্মতাত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বার করে আনার রাজনীতিটাই বাংলার ভাবান্দোলন করেছে। অর্থাৎ ভাবান্দোলনের রাজনীতি একই সঙ্গে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভেদ বিলোপ করে ‘অধরা’ বা ‘অপর’কে মানুষের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নির্মাণের ভিত্তি বানাতে চেয়েছে। এই জন্য ফকির লালন শাহের রাজনীতিই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা নিশ্চিত করবার একমাত্র রাজনীতি। সার্বজনীন মানুষের রাজনীতির মধ্য দিয়ে সকল মানুষকে একত্রিক করবার একমাত্র অসাম্প্রদায়িক পথ। আর সবই প্রতিক্রিয়াশীল। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-র দাবির মধ্য দিয়ে যারা ইতিবাচক অর্থে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা সংখ্যাগুরু/সংখ্যালঘুর ভেদ মীমাংসা করতে চান তাঁদের এই দিকটা বুঝতে হবে।

সূচিপত্র

আমার ঋণ ৭

প্রবেশিকা ১১

বাংলার ভাবান্দোলন ও ভাবচর্চার বৈপ্লবিক তাগিদ ২১

দয়াল নবীর দয়া হলে দেখবে লীলা কী চমৎকার ৬৭

বাগেন্দ্রিয় না সম্ভবে ৮৪

বাংলার ভাবান্দোলন ১০৮

ভাব, ভাষা ও দর্শন ১২৮

ভাবকথা ও তৎপরতা ১৪৯

দেহ ও ভাষা ১৮২

সত্য কাজে কেউ নয় রাজী ১৯৯

দার্ভিক ও কর্তারূপে অব্বেষণ ২১৯

আমাদের সময়: প্রসঙ্গ লালন ২২৮

ঐতহাস ও দেশকালের প্রচলিত ধারণা এবং লালন ২৩৯

মাকর লালন শাহ এবং কমলকুমার মজুমদার: স্রীর্ষা ও কবিতার কথা ২৫২

পায়ে সামান্যে কি তার দেখা ২৬৩

দাণ্ডা ও লালন : কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় ও পদ্ধতিগত প্রসঙ্গ ২৭৫

দাঁম, ভাব ও কাব্য ২৯৬

বাংলার ভাবান্দোলন ও ভাবচর্চার বৈপ্লবিক তাগিদ

বাংলার “বাউল”, বিশেষত ফকির লালন শাহ সম্পর্কে আজকাল অনেকে আগ্রহী। মনে হয় সংবেদনশীল ও সচেতন নাগরিকদের—বিশেষত তরুণদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে এই আগ্রহ আন্তরিক। এটা ভাল এবং মন্দ দুটোই হতে পারে। আমরা আউল-বাউল, ফকির-ফ্যাকড়া, দরবেশ, উদাসী, বয়াতি, পালাকার ইত্যাদি নানান নামে গণমানুষের চিন্তার যে লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস দেখি তাকে এক কথায় বাংলার ‘ভাব’ বলি। ভাবুকতার এই আন্দোলন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম থেকে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু চিন্তার ভেতরে যে লড়াই-সংগ্রাম এবং তার মধ্য দিয়ে চিন্তা বা ভাবের বিকাশ আর অন্যদিকে সমাজের বাস্তব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সমান্তরালে চলে না। উভয়ের সম্পর্ক বিচার কিভাবে সবচেয়ে সঠিক ভাবে করা যায় তার জন্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। সেই তর্কবিতর্কে এখানে আমরা প্রবেশ করবো না। সেটা আলাদা একটা কাজ। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের ভাষার মধ্যে চিন্তার বা ভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন সেই দিকেই আমাদের বিশেষ মনোযোগ। নিরক্ষরের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বাংলার চিন্তা বা ভাবচর্চার যে প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ রূপটা আমরা দেখি বাংলার দর্শনচর্চার ভিত্তি নির্মাণের কাজ সেখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। বলাবাহুল্য, এখানে কন্ঠ ও শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতিরই প্রাধান্য। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক আধিপত্য, মুদ্রণযন্ত্র ও লিখিত অক্ষরের দাপটের তলায় চাপাপড়া বাংলার ভাবচর্চার সঙ্গে আমরা একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাতে চাই। বাংলা ভাষায় দর্শন বা ভাবচর্চার যদি আমরা বিকাশ ঘটাতে চাই তাহলে এই সম্পর্ক রচনাকে আমরা পূর্বশর্ত বলেই মনে করি। যারা বাংলার ফকির ফ্যাকড়া আউল বাউল দরবেশ বয়াতি পালাকার কবিয়ালদের বিষয়ে ওৎসাহ দেখাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করবার তাগিদও আছে আমাদের।

‘ভাব’ এক অর্থে সাধারণত ‘দর্শন’ বলতে আমরা যা বুঝি তাই। কিন্তু বাংলার ‘ভাব’-কে আমরা আবার পাশ্চাত্য বা ভারতীয় ‘দর্শন’ থেকে দার্শনিক কারণেই পৃথক বলে বিচার করি। দর্শন অর্থ দেখা। দার্শনিক অর্থে এই দেখার অর্থ সত্য দর্শন করা, প্রমাণ করা বা দেখানো। দর্শনে সত্যের যে ধারণা তার সঙ্গে দেখাদেখির, নিজে দেখা বা অনেকে দেখানোর ব্যাপারটাকে অভিনুই ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দাবি বাংলার ‘ভাব’ সত্যকে ঠিক এইভাবে দেখে না। সম্ভবত এর সঙ্গে বাংলার তত্ত্বের একটা সম্পর্ক আছে যেখানে দেহ শুধু মাত্র চোখ বা দৃষ্টি নয়, পঞ্চইন্দ্রিয়মাত্রও নয় বরং ব্রহ্মাণ্ডের শরীরের সঙ্গে দেহ অভিন্ন। দেহ ছাড়া চিন্তা বলে আলাদা কিছু নাই, এতোটুকু তো পরিষ্কার। দেহ যদি ব্রহ্মাণ্ডই হয় তাহলে রক্তমাংসের মানুষ রূপে চিন্তা যখন চিন্তা করে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজেই নিজেকে নিয়ে ভাবে—এই অনুমান আমরা বাংলার ভাবান্দোলনে প্রায়ই দেখতে পাই।

সত্য দেখা বা দেখানোর সঙ্গে আলোর সম্পর্ক আছে। সত্য মানে আলোকিত করা। কিন্তু আলো মানে অন্ধকারহীনতা নয়। অন্ধকার ছাড়া আলোর ধারণাও তো অসম্ভব-তাছাড়া অন্ধকারও তো সত্য। ভাবুক যখন মৌলিক চিন্তা করেন তখন তিনি চিন্তার আলোকিত ও অন্ধকার জায়গার সীমানায় বসেই তো ভাবেন। যে চিন্তা করা হয়ে গিয়েছে, যে ভাব ইতোমধ্যেই স্পষ্ট সেই চিন্তা নিয়ে চিন্তা করাকে কি ঠিক চিন্তা বলা যায়? অর্থাৎ দার্শনিকতার দিক থেকে? তাহলে ভাব মানে যা নিয়ে আমরা ভাবি নি সেই বিষয়ের চিন্তা বা ভাব। যা ভাবি নি তাকে ভাবা, তাকে চিন্তার মধ্যে হয়ে উঠতে দেওয়াই তো ভাবের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ।

ব্যুৎপত্তিগত ভাবেও যদি বিচার করি তাহলে ভূ থেকে ভাব। ভূ মানে হওয়া, ভাব তাহলে সত্যের হয়ে ওঠা—তাহলে সত্য মানে নিছকই চিন্তার সত্য নয়। চিন্তার ভুল, স্ববিরোধিতা বা দ্বন্দ্বের মীমাংসা মাত্রও নয়। বরং যিনি একটি সমাজের মধ্যে বাস করেই চিন্তা করছেন সেই রক্তমাংসের মানুষটিরও সমাজে সত্য হয়ে ওঠা। বাংলার ভাব বা ভাবান্দোলন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনে এসেছে। আমাদের ইচ্ছা যারা দর্শন বা ভাবচর্চায় আগ্রহী তাঁদের মধ্যেও যেন এই প্রশ্নগুলো সঞ্চারিত হয়। যাতে বাংলা ভাষায় ভাবচর্চার একটা ধারা আমরা গড়ে তুলতে পারি।

কিন্তু আমাদের সন্দেহ বাংলার আউল বাউল ফকির দরবেশ বয়াতি পালাকারদের প্রতি এখন যে উৎসাহ তার পুরোটা সদর্থক নয়। ফলে যারা আন্তরিক ভাবেই বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে আমাদের কিছু আন্তরিক কথাবার্তা আছে। বিশেষত শ্রেণী ও রাজনীতির জায়গাটির ক্ষেত্রে। এই দিকটাকেই আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। কারণ এই দিকটাই সবার আগে পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপার আছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রতি বদল দেখা যাচ্ছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিগঠক ও পরিপোষক যে-শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আমরা চিনি, এই বদলটা তার ভাষা, ভাব ও সাংস্কৃতিক চিন্তায় কী

বদল ঘটাচ্ছে তার একটা আলাদা বিচার হওয়া দরকার। তবে এটা পরিষ্কার ‘বাঙালি’ সংস্কৃতিভিত্তিক যে ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত সে এক মহাসংকটে পড়েছে। ‘আবহমান’ বা ‘হাজার বছরের বাঙালি’ নামক যে ধারণার ওপর এই শ্রেণীর রাজনীতি এতোকাল দাঁড়িয়ে ছিল তার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। এই শ্রেণীর প্রধান তত্ত্ববাগীশ বা মুখপাত্রদের মুখে ভিন্ন কথা শুনছি। তারা এখন স্বীকার করছে যে ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ নামক কোন অখণ্ড বা অভিন্ন সংস্কৃতি নাই। বাঙালি সমাজ যেমন বহুভাগে আলাদা, বাঙালি সংস্কৃতিও তেমনি ‘বহু রঙে রাঙানো’। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা আগে বাংলাদেশের বাঙালি আর ভারতীয় বাঙালির মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন মানত না। সাংস্কৃতিক পরিচয়কেই রাজনৈতিক পরিচয়ের মানদণ্ড মেনে নেবার কারণে পশ্চিম বাংলার বাঙালি আর বাংলাদেশের বাঙালি যে এক নয় সেই পার্থক্য বুঝতে পারতো না। ফলে মানত না। এখন তারা বলছে, ‘রাজনৈতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করলে এই সমাজকে এখন প্রায় সমান দু ভাগে ভাগ করা যায়’ (মুরশিদ ২০০৬; পৃ-১৪)। এই বিভক্তির পরেও বাঙালি ‘সমাজ’ নামে এক কাল্পনিক সমাজ এখনও নাকি আছে—শুধু রাজনৈতিক সীমানার কারণে এই সমাজ ‘সমান দুই ভাগে বিভক্ত’। আবার ধর্মের কথা তুললেও তা নাকি দ্বিধাবিভক্ত – প্রধানত ‘হিন্দু আর মুসলিম সমাজ’। আবার একই ধর্মের মধ্যেও নাকি আছে ‘ছোটখাটো নানা বিভেদের দেয়াল’। যেমন, উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ আর নিম্ন বর্ণের হিন্দু সমাজ আদৌ এক নয়, দেবদেবীর নাম এক হওয়া সত্ত্বেও। বস্তুত ধর্মমতের সামান্য পার্থক্যের দরুনও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবধান দেখা দিতে পারে। (যদিও বর্ণাশ্রম প্রথায় নিম্ন বর্ণ আর উচ্চবর্ণের পার্থক্য মোটেও ‘ছোটখাটো’ বা ‘সামান্য’ পার্থক্য নয়। ফ.ম.)। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ‘বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আশরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—সবার সংস্কৃতি। শহরের, গ্রামের, ধনীর, গরিবের—তাবৎ মানুষের সংস্কৃতি। এবং সে কারণে এ সংস্কৃতির অবয়ব আদৌ সাদামাটা বা একমাত্রিক নয়’। (মুরশিদ ২০০৬; পৃ ১৪-১৫)

বাঙালি ‘সমাজ’ যে নানা ভাগে খণ্ডিত ও বিভক্ত—এটা নতুন কোন তথ্য নয়। ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি নামে ‘সমাজ’-কে একটা আত্মপরিচয়ের নিগড়ে বাঁধবার জন্যই বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে ‘সবার সংস্কৃতি’, ‘তাবৎ মানুষের সংস্কৃতি’ ইত্যাদি অতিকথন করতে হয়েছে। যদি সবই বাঙালির সংস্কৃতি হয় আর তার কোন বিশেষ রূপ না থাকে তাহলে ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি কথাটার কোন মানে হয় না। সোনার পাথর বাটির মতো শোনায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ দাবি করে আসছিল ‘বাঙালি’ নামক একটা বিশেষ পরিচয় আছে এবং তাকে নির্ণয় করা যায় ঔপনিবেশিক কলকাতার উচ্চবর্ণের অভিজাত ও মধ্যবিস্তের হাতে গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দিয়ে; সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, ভাব বা ভাবুকতা—যেমন, আউল-বাউল ফকির-ফ্যাকড়ার

সংস্কৃতি দিয়ে নয়। ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ধর্ম বাঙালির স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলেও ইসলামকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা সবসময়ই দুশমন হিসাবেই গণ্য করেছে। তাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামমুক্ত করবার সাধনাই হচ্ছে ‘বাঙালি’ হবার সাধনা। এমনকি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিগঠনে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক প্রভাবও কার্যত তারা অস্বীকার করে। এখন বাস্তবতা যখন তার এই সাম্প্রদায়িক বয়ানকে উদাম করে ছেড়েছে তখন সে দাবি করছে সবই ‘বাঙালি’। কিন্তু নিজের উচ্চবর্ণ ঠাট বজায় রাখবার জন্য সে যেমন বাঙালির ইতিহাসকে নিম্নবর্ণের, নিপীড়িত শ্রেণীর কিম্বা নারীর দিক থেকে বিচার করতে অক্ষম, তেমনি অক্ষম সকল আত্মপরিচয়ের উল্কে উঠে নিজেকে ‘মানুষ’ হিসাবে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য কীভাবে বাঙালি লড়েছে সেই গৌরবের ইতিহাস অনুধাবনে। অথচ বাংলার ভাবান্দোলন এই লড়াইয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে বাঙালি তার দুর্দান্ত শক্তি নিয়ে হাজির। যেমন ভাবুকতায়, তেমনি রাজনীতিতে। বাংলার ফকির দরবেশ আউল বাউল বস্মতি পালাকারদের ভাষা ও ভাবের লড়াইয়ের মধ্যে আমরা বাঙালির ভিন্ন পরিচয় পাই। যে পরিচয় বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে চাপা পড়ে আছে। আশ্চর্য যে সস্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে দুনিয়া যখন বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী তখনো প্রাণপণ নিজের সাম্প্রদায়িক ‘বাঙালি’ পরিচয় নিয়ে আত্মহারা। ইসলাম থেকে বাঙালিকে আলাদা রাখার কর্তব্য সে এখনো বড়ই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে।

এই প্রসঙ্গে একটা দিক আমাদের নজরে রাখা দরকার। ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম—অর্থাৎ কোন ধর্মেরই পর্যালোচনা করে গড়ে উঠে নাই। বাঙালিকে নিজের ইতিহাসের মধ্যে বর্তমান বা বিদ্যমান করে তোলার জন্য এটা যে ভাবুকতার দায় ও রাজনীতির কর্তব্য সেই ব্যাপারেও কোন ঈশ নাই। ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী’ শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, বরং ঘোরতর ভাবে ঐনতিহাসিক। ইতিহাসের বিপরীতে তার অবস্থান। যেন ‘বাঙালি’র কোন ধর্মীয় অতীত নাই, সনাতনী হিন্দু, ইসলাম অথবা জেন বা বৌদ্ধ—কারো সঙ্গেই যেন ধর্ম হিসাবে কোন সম্পর্ক নাই, যেন ধর্মীয় উপাদান রূপ-রসে পুষ্ট হয়ে এর শরীর পরিগঠিত হয় নি। ‘বাঙালি’ ব্যাপারটা যেন হাওয়াই জিনিস। যে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ‘বাঙালি’ ব্যাপারটার রাজনৈতিক ইতিহাস ‘৫২ সাল থেকে শুরু, যার কোন ‘আগে’ নাই ‘পরে’-ও নাই।

এই ভয়াবহ অভাব ও অ-ভাব বাংলা ভাষায় ভাবুকতার চর্চা—নিজের ইতিহাসের মধ্যে থেকে বাঙালির আন্তর্জাতিক বা সার্বজনীন হবার সাধনার অভিমুখ নির্ণয় করার জন্য খুবই জরুরি। এই ঐনতিহাসিকতার কারণে বা ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তি নাই। প্রতিষ্ঠার তাগিদ বোধও নাই। নিজের দাবী অনুযায়ী তাই ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ভুঁইফোড় ব্যাপার। পাকিস্তানী শাসকদের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে

পাকিস্তানী শাসকদের মতাদর্শ আর ইসলাম যে আলাদা সেই ভেদ জ্ঞান এই জাতীয়তাবাদ নির্ণয় করতে চায় না। জানেও না। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সে ক্রমাগত হাজির করে খেয়ে না খেয়ে একটা ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ হিশাবে। অন্যদিকে জৈন, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মের ভেতরে থেকে যেভাবে বাংলার সাধক—ফকির দরবেশ আউল বাউল বয়াতি কবিয়াল—‘সহজ মানুষ’ অন্বেষণ করেছে তার প্রতিভা, দীপ্তি ও এই কালে তার সম্ভাবনা সম্পর্কেও থেকেছে একদমই অজ্ঞ। লক্ষ করতে হবে তাঁরা বাঙালি হয়েই বাংলা ভাষায় সহজের সন্ধান করেছেন, ‘মানুষ’ নামক নামচিহ্নের তাৎপর্য নিয়ে দার্শনিক চুলচেরা বিচার করেছেন এবং এই অধরা ‘মানুষ’-কে বস্তুনির্দেশে ধরবার ‘করণ’ চর্চা করেছেন। তাঁদের কাছে বাঙালি হওয়া মানে নিজের ভাষার মধ্যে বসবাস করা এবং ভাষার ফাঁদে অধরা ধরবার সাধনা করা। ফলে তাঁরা আত্মপরিচয়ের রাজনীতির উর্দ্ধে থেকেছেন কিন্তু বাঙালি হয়ে সার্বজনীন ভাবুকতার চর্চার মধ্য দিয়েই। ফলে এখানেই—বাংলার ভাবুকতার পরিমণ্ডলে—অতি সহজে ইসলামও আত্মস্থ হয়েছে। ইসলামের নবী আনন্দের খবর হয়ে তাঁদের কাছে পৌছেছে। ইসলাম হয়ে উঠেছে বাংলার ভাবচর্চার অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জৈন, বৌদ্ধ বা সনাতন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বাংলার ভাবচর্চার যে পর্যালোচনার পদ্ধতি ও ধারা সেই পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে ইসলামের জ্ঞানগ, ভাবগত ও রাজনৈতিক রূপকে আমরা নতুন করে এখানে আবিষ্কার করি। বাংলার ভাবান্দোলন নিত্য নতুন বিষয়কে শুধু পর্যালোচনাই করে নি, একই সঙ্গে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ভাবুকতার অনুমান ও পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটিয়েছে।

বাঙালির কাছে এবং বাংলার ভাবুকতার মধ্যে ইসলামের একটা শক্তিশালী অবস্থান আছে, এটা কোন নতুন খবর নয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ খবর হোল এই যে ইসলামের এই শক্তিশালী ভাবগত অবস্থান এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ‘মুসলমান’ বলে নয় বরং তারা একদমই খাঁটি বাঙালি বলেই ইসলামের সঙ্গে তাদের এই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক মোকাবিলা। অথচ বাংলার ভাবুকতার পরিমণ্ডলে ইসলামের যে বঙ্গীয় সাধনা সেই দিকে আমাদের গবেষণা হয় নি বললেই চলে। বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন হিন্দু ধর্ম মায় খ্রিস্টীয় ভাবনার সঙ্গেও দেওয়া নেওয়ার সমৃদ্ধ ইতিহাসের মধ্যে ইসলাম একটা মুখ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। সেটা কতোটা আন্তরিক আর কতোটা বাহ্যিক সেই পর্যালোচনা হতেই পারে এবং করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটাই আমাদের ইতিহাস—লড়াই-সংগ্রাম ও ভাবগত পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যার বিকাশ ঘটেছে। এই সেই ইতিহাস যা জাতপাত বিরোধী, নারীপুরুষ ভেদ মানে না, জালিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও অসাম্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। এই লড়াই-সংগ্রাম ও মানবেতিহাসের মহৎ অর্জনগুলো ভাবগত পর্যালোচনায় আত্মস্থ করার মধ্য দিয়েই ‘বাংলাদেশ’ রাজনৈতিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অতএব এই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা বা টিকে থাকা কেবল এই ভাবচর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। এই ইতিহাস ‘এককাটা’ বা ‘আবহমান’ কোন ব্যাপার নয়—

বাঙালির জাতপাত বিরোধী, শ্রেণী বিরোধী নারী-পুরুষ ভেদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবগত ইতিহাস ধরতে না পারলে বাঙালির অধঃপতন অনিবার্য।

এই বিবেচনা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাংলার ভাবুকতা টানতে বাধ্য তা হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ‘মুসলমান’ বলে ইসলাম আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই তর্ক সঠিক নয়। বরং খুবই ভুল ও বিপজ্জনক তর্ক। বরং বাঙালির লড়াই সংগ্রাম ও ভাবুকতার সুনির্দিষ্ট ইতিহাসের মধ্য দিয়েই ইসলাম বাঙালির অবিচ্ছেদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ইসলাম প্রশ্ন বাদ দিয়ে বাঙালির কোন ইতিহাস নাই। থাকতে পারে না। অর্থাৎ আমরা বাঙালি বলেই ইসলামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আত্মিক—ধর্ম সূত্রে বা জন্মসূত্রে ‘মুসলমান’ বলে নয়। এই জায়গায় শক্ত ভাবে আমরা যতক্ষণ দাঁড়াতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে থাকবে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইসলাম বিরোধী অথচ আবার ঔপনিবেশিক কলকাতার উচ্চবর্ণের অভিজাত ও মধ্যবিত্তের হাতে গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কোন প্রকার ঐতিহাসিক ও ভাবগত পর্যালোচনা ছাড়া তৈরি জামার মত নিজের গায়ে তুলেছে। কোন পরিশ্রম নাই, কষ্ট করতে চায়নি। কিন্তু ঢাকা তো বাংলার নতুন রাজধানী, কলকাতা নয়। এই যদি বাস্তবতা হয় তাহলে ঔপনিবেশিক কলকাতার রেডিমেড জামা গায়ে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি দাঁড় করানো যাবে না। কাজে কাজেই তার রাজনৈতিক ভিত্তিও কখনই দৃঢ় হবে না। ধর্মের পর্যালোচনার যে ধারাবাহিকতা আমরা বাংলার ভাবান্দোলনে দেখি সেই ধারা বহাল রাখা ছাড়া—অর্থাৎ ধর্মের পর্যালোচনাকে তার ভাবগত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার সাধনা ছাড়া—বাংলার ভাবান্দোলনের যা আন্তরিক বৈশিষ্ট্য —বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি দাঁড় করানো অসম্ভব। বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক আগ্রহের একটি প্রধান কারণ এখানেই নিহিত।

তার মানে কি বাহান্ন থেকে একাত্তরের যে ঘটনাক্রম সেই খণ্ডকালের মূল্য বাঙালির ইতিহাসের জন্য গৌণ? মোটেও নয়, বরং বাংলার ভাবগত তাৎপর্যের দিক থেকে বাংলা ভাষায় ও বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তায় ধর্মের পর্যালোচনাকে তার অন্তর্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্য অপরিমিত। এই সুযোগকে যেন আমরা হেলায় না হারাই। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করে ফেলছে বলেই আমাদের আপত্তি।

এই সংকীর্ণতার দিকটা বুঝব যদি প্রশ্ন করি আচ্ছ ৫২ থেকে ৭১ ছাড়া কি বাঙালির লড়াইয়ের আর কোন ইতিহাস নাই? কোন ভাবের লড়াই, রাজনৈতিক কিম্বা সাংস্কৃতিক? স্বীকার বা অস্বীকার করার কিছুই যদি না থাকে তবে বাঙালি সংস্কৃতি বলে ঐতিহাসিক কিছু কি আছে? থাকতে পারে? আর যদি থাকেও তাতে অন্তত

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কোন হক নাই। ৫২ থেকে ৭১ এই কয় সালে কোন সংস্কৃতি ঐতিহাসিক দাবি নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ‘আবহমান বাঙালি’ তো বহু দূরের কথা। এই দিক থেকে জৈন, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম বাঙালির স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই অনৈতিহাসিকতার দোষে সেই উত্তরাধিকারের দাবীদার হতে পারে না। তাছাড়া সে তো ‘ধর্ম নিরপেক্ষতার’ ছুতায় ধর্মের উত্তরাধিকারও পরিত্যাগ করতে চায়।

ওপরে যে নজির দিলাম পুরানা বাঙালি মধ্যবিস্তার এখনকার চিন্তার দৌড় মোটামুটি এতোটুকুই। এমন কোন নতুন উপলব্ধিও আমরা দেখছি না যে আমাদের খুবই পরিচিত ‘বাঙালি’ তার অভিজাত ও উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির বাইরে গণমানুষের ধর্ম বা সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন কোন পর্যালোচনামূলক সম্পর্ক পাতাতে চায়। ধর্ম ‘আধ্যাত্মিক’ ব্যাপার হয়ে চিন্তার পর্যালোচনা, ভাবচর্চা ও রাজনীতি থেকে আলাদা হয়ে থাকুক এই অবাস্তব ও আজগবি অবস্থান নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা পুরানা ডুগডুগি বেদম পিটিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বাস্তবতা তাকে নতুন করে কিছুই ভাবতে শেখায় নি। বরং তার অবস্থান আগের মতোই ঘোর সাম্প্রদায়িক। বাঙালিত্বকে ইসলামের বিপরীতে স্থাপন করার পুরানা সাম্প্রদায়িক অভ্যাস সে এখনো ত্যাগ করে নি। এখন বরং তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাঙালির মধ্যে ‘নব্য-সাম্প্রদায়িকতার উত্থান’ হয়েছে। বাঙালিদের মধ্যে “চিরদিনের সহিষ্ণু এবং সমন্বয়ী” মনোভাব আর নাই। এতোই খারাপ অবস্থা যে “এখন আর, ধরা যাক, বাউল আন্দোলনের বিকাশ আশা করা যায় না। অথবা দেখা দিতে পারে না ব্রাহ্ম ধর্মের মতো আন্দোলন। বরং জাতীয়তা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে ধর্মের আধ্যাত্মিক এবং মানবিক চরিত্র আবির্ভূত হয়ে পড়েছে” (মুরশিদ ২০০৬; পৃ-২০১)। ফর্মুলাটা চেনা এবং বহুব্যবহারে জীর্ণ। ধর্মের যদি ‘মানবিক’ চরিত্র থাকেই তাহলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে আপত্তি থাকার মুক্তি কি? ভাষা বা সংস্কৃতিকে জাতীয়তা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার খুবই ভাল জিনিস—কিন্তু ধর্ম যদি একই ‘মানবিক’ কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা খারাপ। ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে নির্যাতিত শ্রেণী বা জাতি তার মুক্তির জন্য ধর্মের ঝগড়া তুলে ধরেছে। ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব থেকে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বয়ান তৈরি করেছে। আমাদের ইতিহাসে—প্রজাসত্ত্ব আন্দোলন, জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, মহাজনী শোষণের যাতাকল থেকে মুক্তির রাজনীতিতে ধর্মীয় আত্মপরিচয় আশ্রয়ের কারণেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল? পাকিস্তান আন্দোলন কি ধর্মীয় আন্দোলন?

এই বক্তব্যের সঙ্গে, বলাবাহুল্য, আমরা একমত নই। তাছাড়া বাউল বা ভক্তির ধারার বিকাশ জাত, পাত, বর্ণ ধর্মের সবচেয়ে অসহিষ্ণু এমনকি সহিংস পরিস্থিতির মধ্যেও ঘটেছে। বাউলদের চুল দাড়ি কাটিয়ে দেবার ঘটনা, নেড়ার ফকির বলে অপমান

নির্যাতনের ইতিহাস য়ারা জানেন তাঁরা বাঙালিদের আধ্যাত্মিক ও মানবিক অনাবিলতার এই মধুর কেছা শুনে কৌতুকই অনুভব করবেন। এমনকি শাক্ত আর বৈষ্ণবদের দাঙ্গাহাঙ্গামার কাহিনীও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা কিম্বা বাঙালির আধ্যাত্মিক ও মানবিক অনাবিলতা প্রমাণ করে না। বাউল আন্দোলন আগে যেভাবে হয়েছিল এখন ঠিক তেমনি হবে—এই ধারণাও অনৈতিহাসিক। কিন্তু কেন এখন বাউল আন্দোলন হবে না? কারণ বলা হচ্ছে ‘মৌলবাদী ইসলামী আন্দোলন’—“১৯৭০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পেট্রো-ডলারের উত্থান, ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসবাদী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মৌলবাদী ইসলামের প্রসারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে।” (মুরশিদ ২০০৬; পৃ ২০০) ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিরকালের নালিশ দেখে আমরা বুঝতে পারি গত কয়েক দশকে পুরানা বাঙালি মধ্যবিস্তের জীবনযাপনে বদল ঘটলেও তার চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে সামান্যই। এর বড় কারণ হচ্ছে ধর্মকে ইহলৌকিক পর্যালোচনা ও বিচার বিবেচনা থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা রাখবার আজগবি ও অবাস্তব চিন্তা। লক্ষ করার বিষয় ফিলিস্তিনীদের মুক্তিযুদ্ধকেও কতো অবলীলায় ‘সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় বাঙালির ভাবচর্চার বিকাশ ঘটাতে হলে এই বাঙালিবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া বাঙালির আর কোন পথ আছে বলে আমরা মনে করি না। এই লড়াইটা এখন প্রকাশ্য, কাজেই কাজেই ক্রমশ তীব্র হতে বাধ্য।

তাহলে বাউল ও বয়তিদের প্রতি মধ্যবিস্ত শ্রেণীর আগ্রহের যে-কথা তুলেছি তারা ঠিক পুরানা বাঙালি জাতীয়তাবাদী মধ্যবিস্ত নয়। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার তোড়ে বাংলাদেশের সমাজ ভাঙছে, গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসছে শহরে, নগরায়নের সীমা বাড়ছে, আভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হয়েছে এবং তার বিস্তার ও গভীরতাও বাড়ছে। নতুন ভোক্তাদের কথা ভেবে শিল্প ও সংস্কৃতিকেও বাজার বানাচ্ছে পুঁজি। যারা এতোকাল পাঞ্জাবি পায়জামা লালপেড়ে শাড়ি ও কপালে টিপ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমাদের ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁরা নিজেরাও এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলেন না। তাঁরা ‘আবহমান বাঙালি’-র সাধনা করছিলেন এই ভেবে যে ‘বাঙালি’ নামক স্থিরবস্তু কিছু একটা আবহমানকাল যেমন ছিল বা হয়ে আসছে তেমনি বুঝি চিরকালটিই থাকবে। যে শাস্ত্র বাঙালি সংস্কৃতির তাঁরা পূজা করে আসছিলেন, সেই বাঙালিও পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের তোড়ে কীবোর্ড, গিটার, ড্রাম নিয়ে মঞ্চ ফাটিয়ে মিস্টিরিয়াস আবহমানতায় ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে, বাঙালিয়ানার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। এমনকি ব্যান্ড সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে বাঙালিয়ানাকে অবলীলায় অপমান করতেও কসুর করেছে না। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে যতো দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছিল, যতো রক্তপাত ঘটেছিল, তুলনায় পুঁজির নতুন সাংস্কৃতিক বাজার দানা বাঁধল চোখের পলকে, বিনা রক্তপাতে। ওর পেছনে শক্তি জোগাল

কোকাকোলা-পেপসিকোলা, বেনসন এন্ড হেজেস, গোল্ড লীফ' এবং বাংলালিংক-একটেলসহ নানান নামের মোবাইল কোম্পানিগুলোর এবং সম্প্রতি 'বাংলাদেশ তোমাকে খুঁজছে' ধরণের জমজমাট 'সংস্কৃতি'। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ ও বাজার যতো দ্রুত বাড়ল ততো দ্রুত ভেঙে পড়ল বাঙালিয়ানা। এলো ফ্যাশান, ফেয়ার এন্ড লাভলী, মেরিল ক্রিম, বাহারি লিপস্টিক আর মেইকআপ আর একই সঙ্গে ডেনিম জীন ও বুক খোলা হাওয়াই শার্ট ও ছাপ কাটা পুরুষালি গেঞ্জি। শাড়ি, টিপ ও পাঞ্জাবি হারিয়ে যেতে খুব একটা সময় লাগলো না। কোর্তাকামিজ হয়ে উঠল শহুরে মধ্যবিত্তের প্রধান পোশাক। এমনকি হিন্দি সিনেমার সিরিয়াল 'বাঙালি'-কে খোলা দুনিয়ার সংস্কৃতির বিচিত্রসব পরীক্ষানিরীক্ষায় অনুরক্ত করে তুলল খুবই দ্রুত। বাঙালি উর্দুর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু হিন্দিকে তার ড্রইংরুমে টেনে নিতে আপত্তি করলো না। বাঙালিয়ানার অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠল ঢাকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোরই ভাড়া খাটা কয়েকটি এডভারটাইজিং কোম্পানি, আর সেই কোম্পানিগুলোর জন্যই বিজ্ঞাপন ও পণ্যের প্রসারের তাগিদ। পুঁজি বাঙালি সংস্কৃতিকে তার নিজের আত্মশ্রীতি ও পুঞ্জিভবনের উপায় করে ছাড়ল। পুঁজির পুঞ্জিভবন ও বিস্তার সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনায়াসেই পণ্যের প্রচারক বানিয়ে ছেড়েছে। নাট্য সংগঠন বা সাংস্কৃতিক কর্মীদের পুঁজি যেভাবে ব্যবহার করেছে সেটা ঐচ্ছিক নাকি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সেই তর্ক এখন অবান্তর। তারা ইতিহাসের মঞ্চে অভিনয় করবার চেয়েও অভিনয় করতে চেয়েছিল মহিলা সমিতি বা গার্লস গাইড মিলনায়তনে। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এখানে পুঁজির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধের সংস্কৃতি আমরা দেখি নি। যখন টেলিভিশান অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে হাজির হোল তখন শুরু হয়ে গেল নতুন এক নাটক। এই নাটকের মঞ্চ বাজার ব্যবস্থার কাঁচের বায় দিয়ে তৈরি। এই মঞ্চ কুশীলবের ভূমিকায় পুরানা মধ্যবিত্ত আর জায়গা পেলা না। মঞ্চ যখন বাঙালির ড্রইংরুমে ঢুকে পড়ল, বেইলি রোডের নাটকপাড়ার নিয়তিও ইতিহাসের খাতায় লেখা হয়ে গেল।

কিন্তু যদি আমরা বাংলার 'ভাব' আর বাংলার ভাবান্দোলন নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে বাঙালিয়ানা বিশ্ববাজারে ভালই আছাড় খেয়েছে ভেবে আনন্দ করবো না। এটা বরং বিপদেরই কথা। একদিকে পুরানা 'মফস্বলী', সাম্প্রদায়িক ও পশ্চাতপদ বাঙালি

১. ধূমপানের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ও বাংলাদেশে প্রবল আন্দোলন চলার মুখেও সিগারেট কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে সিগ্রেট বিক্রির বাজার বাড়ানোর জন্য উঠতি ব্যান্ড সঙ্গীত গায়কদের দিয়ে কনসার্ট করেছে। আন্তর্জাতিক ভাবে ধূমপান বিরোধী ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন' ও বাংলাদেশে তা বাস্তবায়নের জন্য আইন করবার পর এই উপদ্রব কমে গিয়ে সিগ্রেট কোম্পানির জায়গায় মোবাইল কোম্পানির স্থান বদল হয়েছে। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যান্ড সঙ্গীতের আঁতাতের শক্তির মুখে বাঙালি সংস্কৃতি খুব একটা দাঁড়াতে না পারার কারণ পুরাটা পুঁজির হিম্মত ভাবা ভুল হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির রক্ষণশীলতা, পশ্চাতপদতা এবং সর্বোপরী সাম্প্রদায়িকতাও এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয়তাবাদী ধারার অনিবার্য কিন্তু করুণ পরিণতি, অন্যদিকে পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের ঔরসে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব—এই দুইয়ের মুখে আমরা পড়েছি। ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবার্থ ও পর্যালোচনা আমরা সেরে উঠবার আগেই পুঁজির আধিপত্যের তোড়ে এই ধারা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই ধারার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের বা গণমানুষের সংস্কৃতি ও স্বার্থের বিরোধকে আমরা পুরাপুরি হাজির করতে পারি নি। বাংলা ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমরা সকলেই—কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার একটা বিশেষ ব্যাখ্যায় নিজেদের সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করে রেখেছে। সেই ব্যাখ্যা আশ্রয় করে বিশেষ ধারার রাজনীতি করেছে যেখানে ইসলাম হাজির সবসময়ই বাঙালির বিপরীত বিষয় হিশাবে, বাঙালির দুশমন হয়ে। ফলে কার্যত এই ধারাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশে একান্তরের পরে ইসলামী রাজনীতির আবির্ভাব ও শক্তিবৃদ্ধির শর্ত তৈরি করেছে। বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিমুখ এতে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই অভিমুখ সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি দিয়ে যেমন নিজের আত্মপরিচয় নির্মাণ নয়, ঠিক তেমনি ধর্ম দিয়েও নিজের পরিচয়কে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় নিষ্কেপ ও নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদই বাঙালির আত্মবিকাশের সবচেয়ে বড়ো বাধা। অথচ দরকার ছিল বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা এবং সার্বজনীনতাকে শনাক্ত ও উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িক ও অভিজাত বাঙালিপনা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই পরাজিত করার প্রয়োজন ছিল। এই কাজ সম্পন্ন হয় নি বলে ইসলাম ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার যে রক্তাক্ত ‘অনন্ত যুদ্ধ’ শুরু করেছে আমাদের আশংকা এই ক্ষয়িষ্ণু ধারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চিরাচরিত ঘৃণার কারণে সাম্রাজ্যবাদেরই পক্ষাবলম্বন করবে। করছেও। যদি বাংলার ভাষা ও ভাবের বিকাশ আমরা ঘটাতে চাই তাহলে দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ ও সহিংসতার মুখে এই নতুন বাস্তবতাকে আমরা কী করে মোকাবিলা করব তা নিয়ে ভাবতে হবে। এ এক নতুন বাস্তবতা। এর জন্য আমরাও তৈরি নই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া অসম্পূর্ণ থাকতে থাকতেই রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে নিজেদের পরিগঠনের নতুন কর্তব্য নির্ণয় ও সম্পন্ন করা অনেক কঠিন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে দাপট আমরা মাঝে মাঝে দেখি তাকে প্রধানত দলবাজি বা সংঘবদ্ধতার দাপট হিশাবেই আমরা হাজির দেখি যার ভাবগত বা রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নাই বললেই চলে। এই দাপট সংখ্যাগরিষ্ঠের বা গণমানুষের সংস্কৃতি ও স্বার্থের প্রশ্নকে বারবারই অস্পষ্ট করে ফেলেছে, সত্যি, কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলনের মোকাবিলার জায়গাগুলো পরিচ্ছন্ন করা গেলে একান্তরে আমাদের ঐতিহাসিক অর্জনকে বিশ্বের সভায় নিয়ে যাওয়া মোটেও কঠিন কাজ হবে না। তবে সত্যি যে বাংলার ভাষা, ভাব ও ভাবুকতার ধারাবাহিকতা বা ছেদের জায়গাগুলো পুরাপুরি চেনা হয় নি। কিন্তু সমাজ যদি এখনও এই সকল প্রশ্নে

বিভক্ত ও খণ্ডিত থাকে তাহলে সহিংস বিশ্বে আমাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হবে।

বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, ভাব ও ভাবুকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই বললেই চলে। তাদের ভাষা, ভাব ও চিন্তার খবর আমরা নিতেই পারি নি। বাংলা জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেছে উচ্চবর্ণ ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে যে বাংলা ভাষা ও চিন্তা সেটাই নাকি বাঙালির চিন্তা। মূলধারা। এর বাইরে যদি কিছু তাকে তাহলে তা 'লোকায়ত', 'অনাধুনিক' ইত্যাদি। এর বিপরীতে আমরা বলতে বাধ্য যে শ্রেণীশক্তি ও রাজনীতির দাপট বাদ দিলে ভাষার পর্যালোচনা বা ভাবের বিচারে এই দাবি ধোপে টেকে না। শুধু তাই নয়, বাংলার ভাব বা ভাবুকতার শক্তির কেন্দ্র বা জায়গাগুলো সম্পর্কেও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিশেষ খোঁজখবর নাই। তারা ঔপনিবেশিক কলকাতাকেই তাদের মনোগঠনের তীর্থভূমি ধরে নিয়ে বাংলার বিশাল ভাবের ঐশ্বর্য অন্বেষণের কাজকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে বাংলার ভাবুকতার শীর্ষস্থানগুলো অনুপস্থিত। কিম্বা আমরা খুঁজেও পাই না। অতএব বাংলার ভাষা, ভাব ও ভাবুকতাকে মুখ্য গণ্য করে গবেষণা ও পর্যালোচনা ছাড়া বাংলা ভাষা, ভাব ও ভাবুকতাকে আমরা বিশ্বসভার উপযুক্ত করে গড়তে পারব না। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের উদয়ের ফলে এই কাজটা এখন আমাদের জন্য অনেক সহজ। কলকাতা আমাদের বেড়ে ওঠার ইতিহাস অবশ্যই— কিন্তু কলকাতাকে আমরা পেছনেই রেখে এসেছি—আমাদের তাকাতে হবে সামনে। সারা পৃথিবী আজ আমাদের সঙ্গে লেনাদেনার জন্য তৈরি। সেটা সম্ভব হবে যদি আমরা আমাদের ভাষা, ভাব ও ভাবুকতাকে চিনি, জানি ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন লেনাদেনার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলি।

এই কর্তব্যের দিকে নজর রেখেই আমরা বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি উৎসাহী, বাংলার ভাব চর্চায় আগ্রহী। এই কর্তব্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে বাংলার সাধক ও ভাবুক—বিশেষত ফকির লালন শাহ আমাদের যতোটা কাজে আসেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের উপাস্য ব্যক্তির ততোটা কাজে আসেন না। ফকির লালন শাহ ও বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি এই কারণেই আমাদের বিশেষ রাজনৈতিক আগ্রহ।

তাছাড়া বাংলা দুই ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও ভাষা। কিম্বা আরো অনেক সম্প্রদায়েরও বটে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের বিভাজন ও বিরোধ বাংলার ভাষা ও ভাবের পরিগঠনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। যে ভাষা ও ভাবের মধ্যে এই দুই সম্প্রদায় বা শ্রেণীর পরিগঠন, বিভাজন ও বিরোধ, আমাদের কাজ সেই ক্ষেত্রে একের বিপরীতে অন্যের প্রতিস্থাপন নয়। বরং তাদের বিরোধ ও বিভাজনের মধ্য দিয়ে বাংলার যে ভাষা ও ভাব গড়ে উঠছে, কখনও অধঃপতিত আবার কখনো বিকশিত—তার ঐতিহাসিক অভিমুখ চিনতে পারা। সেই দিকে যাবার পথ প্রশস্ত করা। সেই দিক থেকেও আরো অনেকের চেয়ে ফকির লালন শাহ ভাল পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক।

তাহলে ফকির লালন শাহের প্রতি নতুন মধ্যবিশ্বের আগ্রহকে আমি মন্দ বলে সন্দেহ করছি কেন? এই কারণে যে ভাবের বাজারে লালন ভাবুক হিশাবে নিজের জায়গা দখল করে নিচ্ছেন বলে মনে হয় না। বরং বাজারব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় ফকির লালন শাহ পণ্য হিশাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিকাচ্ছেন ভাল। এটা মোটেও খুশির খবর নয়। আমরা যেমন আমাদের ভাব বা ভাবুকতার খবর নিই নি, ঠিক তেমনি বাজারের সঙ্গে বা পুঁজির আত্মস্বীকৃতি ও পুঞ্জিভবনের সঙ্গে ভাষা, ভাব, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্পর্ক বিচার করতে এখনও শিখি নি। একটা বিপজ্জনক মুহূর্ত আমরা পার করছি। বাজার এমন সব নতুন সম্পর্ক দ্রুত তৈরি করছে যে বাজারের প্রসঙ্গ না তুলে বাংলা ভাষা, ভাব ও চর্চার জায়গাটা এখন শনাক্ত করা পদ্ধতিগত ভাবেই ভুল হবে।

আমরা দেখি ‘বাউল’ বা ‘বাউলিয়ানা’ ইত্যাদি নব্যমধ্যবিশ্বের এক ধরনের নতুন শখ বা ক্রেইজ হিশাবে এসেছে। এর ভাল দিক হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মিটাতে ব্যর্থ হওয়ায় তরুণদের বড়ো একটা অংশ বসে থাকে নি। নিজেরা যা পেরেছে তৈরি করেছে, আমাদের শুনিয়েছে। নিজের পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে বাউল ফকির বয়াতিদের দ্বারস্থ হয়েছে। এই শখ বা ক্রেইজ বেশিদিন থাকবে না। কিন্তু যদি বাংলার ভাবান্দোলনের পরিচয় আমরা ঠিক মতো নিতে পারি—নিছকই গান হিশাবে নয়—জ্ঞানচর্চা বা ভাবচর্চার ধারা হিশাবে—তাহলে বাংলার ভাব ও ভাবুকতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটতে বাধ্য। এই ঘটনা ঘটবার পক্ষে কিছু কিছু শর্ত তৈরি হয়েছে। যদি আমরা তা ঘটাতে চাই তাহলে তার লালনপালনও দরকার। এই লক্ষ্যেই আমরা বাংলার ভাষা, ভাব ও ভাবুকতার দিকে খেয়াল দিয়েছি।

অন্যদিকে গাঁজা ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য ভোগের সুবিধার জন্য কেউ কেউ বড়ো আগ্রহে বাউল সাজছে। এটাও মন্দের দিক। বাংলাদেশে কয়েকবছরে নতুন এক ধনী শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে এই ব্যাপারগুলো বাড়ছে। কিন্তু এইসব একান্তই বাইরের দিক। বাংলার ভাবচর্চার সঙ্গে নেশাদ্রব্য ব্যবহারের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নাই। ভাবের নেশা যাদের নাই অন্য নেশা করে ভাবচর্চা হয়েছে এই দুর্ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে নজির নাই। কোকাকোলা-পেপসিকোলা বেনসন এন্ড হেইজ বা টাইগার ড্রিংক খেয়ে টাইগারের ভাব নেওয়ার সঙ্গে যেমন ব্যান্ড সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক নাই ঠিক তেমনি গাঁজার সঙ্গে ফকির বয়াতিদের সংস্কৃতিরও কোন সম্পর্ক নাই। ভাবচর্চার জন্য ক্ষতিকর অভ্যাসগুলো পরিহার অবশ্যই দরকার।

নতুন মধ্যবিশ্বের মধ্যে আমরা ব্যক্তিত্বের তীব্রতাই কি শুধু দেখছি না? সত্যি, ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তির সত্যকে হাজির করবার কাজটাও তো আমরা ভাবচর্চার বিষয় বলে আজও গণ্য করি নি। বাংলাদেশ জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু নানা কারণে রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া বিকাশের দরকারে ব্যক্তির সার্বভৌম মহিমা, মর্যাদা ও অধিকার কায়ম করতে পারে নি। যার নজির

আমরা ইউরোপের বুর্জোয়া বিপ্লবে দেখি। কখনো বাকশালি ব্যবস্থা, কখনো সামরিক শাসন আর কখনো বা জরুরী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে তার চেতনা এখনো রুদ্ধ ও একাশূন্য। এই অবস্থায় বাংলার ভাবান্দোলনের গৌরবজনক মূহূর্তগুলো অনুধাবন করা কঠিনই বটে। বিপ্লবী বুর্জোয়া রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন নাগরিকতার অভিষেক ঘটে নি বাংলাদেশে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশও ঘটছে খুঁড়িয়ে। ফলে সংবেদনশীল তরুণ নামে যাদের এখানে সম্মোহন করছি তাদের মধ্যে ‘ব্যক্তি’-র যে আবির্ভাব তাকে আমরা প্রধানত ভোগী ও স্বেচ্ছাচারী হিসাবে পাই। এটাই স্বাভাবিক। ভাষা, ভাব বা চিন্তার বিকাশ কিম্বা ইতিহাস গড়বার কর্তা হিসাবে পাই না। ব্যক্তির উপলব্ধি ঘটেছে প্রধানত ভোগের জায়গা থেকে। উৎপাদনে, ইতিহাস নির্মাণে, শিল্প-সাহিত্যসংস্কৃতি—বিশেষত ভাবুকতা ও দর্শনের কর্তাসত্তা হিসাবে নয়। অন্য ইতিহাস ও সংস্কৃতির তৈরি জিনিস ভোগ করতে শিখেছি আমরা, নিজেরা বিশ্ব ইতিহাসের কর্তা হবার সংকল্প করতে শিখি নি। নিজেরা ভাবতে শিখি নি, ভাবুক হবার সাধনা করছি না। ভোগবাদিতার মধ্যে স্বেচ্ছাচার বিশ্বাসশূন্যতা ব্যক্তিতত্ত্ব ইত্যাদির আধিপত্যই ঘটেতে বাধ্য। সেটাই ঘটেছে।

অন্যদিকে আমরা দেখে এসেছি যে চিন্তায় রুগ্ন ও অক্ষম মধ্যবিত্ত নিজেকে ‘নাস্তিক’ জাহির করে একধরনের দার্শনিক ভাব পরিগ্রহণ করে। নাস্তিক হওয়া খুব সহজ বলে এই বিরক্তিকর উপদ্রব প্রায়ই হাজির হয়। এর জ্বালাতন প্রায়ই আমাদের সহ্য করতে হয়। যে নাস্তিকতা আমরা বাংলাদেশে দেখি তা চিন্তার দৈন্যতা বা ভাবশূন্যতারই পরিণাম। নিজেকে ‘প্রগতিশীল’ প্রমাণ করার সস্তা পথ। মুশকিল হচ্ছে নব্য মধ্যবিত্ত ‘বাউল’ বা বয়াতিদের মধ্যে পুরানা বাতিকে নাস্তিকতাই অন্বেষণ করে বেড়ায় এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে একটি দুটি গানের কলির মধ্যে তাদের নজির দেখে খুবই আহ্লাদ বোধ করে। পরক্ষণেই আবার এদের মধ্যেই জিকির, আল্লাহ দৈন্য, নবীতত্ত্ব, গৌরগান, কীর্তন, গোষ্ঠগান দেখে নব্য মধ্যবিত্ত হতভম্ব হয়ে যায়—মেলাতে পারে না। বাংলার ভাবান্দোলন আস্তিকতা/নাস্তিকতা এই ভেদরেখার বহাল রাখার লড়াই নয়। কিন্তু বিপদ হোল এই যে পুরানা মধ্যবিত্তের ‘নাস্তিক’ হওয়ার ফ্যাশানে ভাটা পড়ায় বাউল বা বাউলিয়ানার ভেক ধরে নাস্তিক হওয়ার নজিরই আশেপাশে দেখা যায়। এই পরিশ্রেক্ষিতগুলো মনে রাখলে বাউল ও বয়াতিদের এখনকার জনপ্রিয়তায় খুব উৎসাহিত হবারও কারণ দেখি না। জীবনযাপনের স্বেচ্ছাচারিতা, নীতিহীন নষ্টামি, ইন্দ্রিয়পরায়নতা, জীবনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এবং চরম ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সঙ্গে নব্য মধ্যবিত্তের ‘বাউল’ ধারণা দারুন খাপ খেয়ে যায়। সত্যিই, বাউল সাজার সুবিধা অনেক।

তবুও বাউলেপনা বা বাউলিয়ানার এই স্বেচ্ছাচারী তামাশা ও সংকীর্ণ সংস্কৃতিবাদিতার চৌকাঠ পেরিয়ে এর উজ্জ্বল অন্তরমহলে প্রবেশ করবার একটা পণ্ডব্য হাজির হয়েছে বাংলাদেশে। কারণ বাংলার ভাষা, ভাব ও ভাবুকতাকে অন্যান্য

ভাষা, ভাব ও ভাবুকতার কাতারে না নিয়ে আনতে পারলে দুনিয়ার ভাবের বাজারে আদান প্রদানের সম্ভাবনা আমাদের খুবই ক্ষীণ। সেই মহল ‘আয়নামহল’ বা নিছকই রহস্যের গুহ্য কায়কারবার নয়। সেটা দর্শনের মহল—জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্বেষণের জগৎ। আর বাংলার ‘দর্শন’ মানে বাংলার ‘ভাব’—বাংলার ভাবান্দোলন। বাংলার ভাবান্দোলনকে পাশ্চাত্য বা বৈদিক বা শাস্ত্রবিদ্যার মতো শুধু ‘দর্শন’ বা সত্যকে দেখা বা প্রমাণ করবার ব্যাপার হিসাবে বুঝলে চলছে না। এই ভাবকে প্রথমে বুঝতে হচ্ছে এর ব্যুপস্তিগত অর্থে—ভূ, হওয়া বা হয়ে ওঠার অর্থে। আমাদের হয়ে ওঠার কাজ হিসাবে। দ্বিতীয়ত তার রাজনীতি জাত, পাত নারীপুরুষ ভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঝাবুঝি। যদি লড়াই-সংগ্রামের জায়গা থেকে আমরা বাংলার ভাবুকতাকে বুঝতে না পারি তাহলে গোলোকায়ন বা সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে মানুষের সত্যিকারের ইতিহাসের শুরু করবার যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে সেই আয়োজনে আমরা পিছিয়ে থাকব। সর্বোপরি এই ভাবকে বুঝতে হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য গড়ে তোলার ভাব ও চর্চা হিসাবে। অর্থাৎ রাজনৈতিকতার পরিমণ্ডলে—নিছকই ভাব বা দর্শন হিসাবে নয়। রাজনৈতিক ভাবে, বিশেষত বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলার ভাবান্দোলনকে নতুন করে বোঝা ও বিচারের কাজ মোটেও সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেই দিকেই আমাদের আগ্রহ।

গত কয়েকদশকে বাংলার ভাবান্দোলনের প্রধান একজন মানুষ ফকির লালন শাহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মনোযোগ কেড়েছেন বলে তাঁকে আশ্রয় করে কথা তোলা এখন খানিক সহজ হয়েছে। কিন্তু এখনো তিনি নিছকই একজন উদাসী “বাউল” বা “ফকির”—এতোটুকুই। ভাবুক হিসাবে তাঁকে তাঁর যোগ্য জায়গা করে দিতে পারা তো অনেক দূরের কাজ। তাছাড়া ফকির লালন শাহের ভাবের সঙ্গে মোকাবিলার শর্ত আমরা তৈরি করে উঠতে পারি নি এখনো। এমনকি বাংলার ‘ভাব’ নামক আদৌ কিছু আছে কিনা সেই প্রশ্নের মীমাংসাও করি নি। সেই ‘ভাব’ বা প্রথাগত অর্থে বাংলার দর্শনের পার্থক্যসূচক দিকগুলো আমাদের চিনতে হবে। বুঝতে হবে। এই ভাবের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কি? অন্য ভাষা ও ভাবের সঙ্গেও বা কি সম্পর্ক? ভাষা ও সংস্কৃতির ধর্ম হচ্ছে বৈচিত্র্য, কিন্তু ভাব তো বৈচিত্র্যের সাধনা করে না—সাধনা করে ঐক্যের। যে বিষয়গুলো সকল ভাষায় সকল মানুষের বিচার্য বিষয় সেই বিষয় নিয়ে কারবার করে ভাব বা দর্শন। কিন্তু কাজটা করে বা করতে পারে নিজ নিজ ভাষায়। ভাবচর্চা মানে বৈচিত্র্যের মধ্যেও নিজ নিজ ভাষায় সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। মানুষ ‘অনেক’ নয় ‘এক’—এই সত্যের দিকে নিজ নিজ ভাষায় ইঙ্গিত ও ইশারা দিয়ে যাওয়া ভাবের কাজ। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন এক রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে আমাদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই আবির্ভাব ঘটেছে নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ঘোষণা করে। এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে

বাংলাভাষায় ভাবচর্চার দিক থেকেও এক অসাধারণ অর্জন। বাংলার ভাবান্দোলনের সঙ্গে একাত্তরের এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং ঐতিহাসিক। বাংলার ভাবান্দোলন ও ভাবচর্চার দিক থেকে এই ঐতিহাসিক ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য বাংলা বা বাঙালিকে ভাবের জগতে আলাদা একটি ‘সম্প্রদায়’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা নয়, সাম্প্রদায়িকতা এর ঐতিহাসিক অভিমুখ নয়। বরং বাংলা ও বাঙালি কী করে আর সকল ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ‘অনেক’ না হয়ে থেকে ‘এক’ হয়ে উঠছে তারই রাজনৈতিক প্রমাণ দাখিল করা। বাংলা একেই সাধনা করে। তার রাজনীতিও একেই সাধনা। বাংলা ভাষার মধ্যে এই সার্বজনীন একের অধিষ্ঠান কী করে ঘটছে সেই ইতিহাসের অভিমুখটা ধরব বলেই আমরা বাংলার ভাবান্দোলনে আগ্রহী।

বাংলার ভাবান্দোলনের এই রাজনীতিটা জানি বা বুঝি বলেই বাংলার ভাবান্দোলনকে ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ ভাবে বিচার করতে গিয়েও আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের উপাস্য পুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে ফকির লালন শাহকে প্রতিস্থাপন করি না। দুই জনের অবদান একই কাতারের বলেও মনে করি না। আমরা বাঙালিরা, অন্যান্য ভাষাভাষীর মতোই নিজের ভাষার মধ্যেই বসবাস করি। কোন্ বর্ণ কোন্ সম্প্রদায় বা কোন্ শ্রেণী কিভাবে বাংলা ভাষায় ঘর বাঁধে বা বেঁধেছে সেটা জানা আমাদের দরকার। তাদের পারস্পরিক টানাপড়েন জানতে ও বিচার করতে পারলেই ঐক্যের সাধনার ঐতিহাসিক অভিমুখটা আমরা ধরতে পারব। আমাদের জানা দরকার। সেটা জানলে বাংলা ভাষা ও ভাবের মধ্য দিয়ে যে ঐক্যের সাধনা চলেছে—রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে বিষয়ে সজ্ঞান ছিলেন—সেই জানাজানি ও বিচারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ও ভাব আজ অবধি উপেক্ষিত বলে তাদের ভাষা ও ভাবের দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

এই দিক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে এখনো দেখে আর আমাদের বিচারের মধ্যে পার্থক্যটা খানিক ধরিয়ে দেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করছেন, “বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডিত ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি” (মুরশিদ ২০০৬; পৃ-১৫)। রবীন্দ্রনাথ ভাষার মধ্যে “এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে” বলেছেন। বাঙালি তার ভাষার মধ্যে যেভাবে বসবাস করে আসছে তাকে চিনবার একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন আমাদের। সেই ইশারাটুকু আমরা আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করি। সেই ধারা শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নয়—সংখ্যাগরিষ্ঠের—সকলের ভাষার মধ্যে সন্ধান করতে হবে। আমরা এইভাবে বুঝি। রবীন্দ্রনাথ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি বলেই আমরা বাঙালি। এখানেও তাঁর সঙ্গে আমরা একমত। কারণ এই ব্যাখ্যা রাজনৈতিক নয়। বাংলাভাষায় কথা বলি বলে

বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলা এক দেশ নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ দাবি করে ভাষার পরিগঠনের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে এবং এই জাতি গড়ে ওঠার অনিবার্য ফল হচ্ছে বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে মেনে স্বীকার করে নিয়েছেন ‘অন্তরের ভাগ’ যেমন আমাদের আছে, সমাজেরও ‘মিল’ নাই। আমাদের অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও অতএব মোটেও এখন অভিন্ন নয়। কিন্তু ভাষায় আমরা যে ঐক্যের সাধনা করি সেখানে আমরা বর্তমানের ঐতিহাসিক পার্থক্যকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে যাবার শর্ত তৈরি করি।

অন্যদিকে আবার ফকির লালন শাহ কোন ভাষা, সংস্কৃতি, দেশ, জাতি, ভূখণ্ড, শ্রেণী বা লিঙ্গের উপাসনা করেন নি। জাতীয়তাবাদী বা কোন প্রকার আত্মপরিচয়ের রাজনীতির খাপে তাঁকে আমরা সেই কারনে ফেলতে পারি না। বাংলায় কথা বলি বলে বাঙালি হওয়া যদি আত্মপরিচয়ের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে ওঠে, ফকির লালন শাহ সেই মানদণ্ডে পড়বেন না। তিনি বাংলাভাষায় মানুষ ভজনা করেছেন, কিন্তু বাংলাভাষার ভজনা করেন নি। সেই ভজনা করতে গিয়ে তিনি বাংলাভাষায় যে ভাবচর্চা করেছেন সেটা আর বাঙালির ‘ভাব’ হয়ে থাকে নি—সকল মানুষের ভাব হয়ে উঠেছে। ফলে তিনি বাংলা ভাষায় বাস করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালির কথা বলেছেন, লালন সেই অর্থে ‘বাঙালি’ নন কিন্তু বাঙালি তার ভাষায় যে ঐক্যের সাধনা করে সেই ঐক্যের চর্চা বাংলা ভাষায় কতোটা বিকশিত হয়েছে তার খোঁজ নেবার জন্য তাঁকে সহ আরো সব বাউল দরবেশ ফকির বয়াতিদের কাছে আমাদের যেতে হবে। এই ভাষায় গোষ্ঠগান, গৌরগানে নদীয়ার উদযাপন যেমন আছে, ঠিক একই ভাবে নবীতত্ত্বে নবীর দার্শনিক তাৎপর্য কিম্বা জগৎ জননী ফাতেমার ভাবকথাও সমান প্রচারিত হয়েছে। যে প্রশ্ন মানুষের, যে প্রশ্ন তুলে ও উত্তরের সন্ধানে জীবনপাত করে মানুষ ভাষায় ও ইতিহাসে সমভাবে মানুষ হয়ে ওঠে, মানুষের ভাষার মধ্যে যে মানুষকে আমরা তখন শনাক্ত করতে পারি—সেই মানুষের মধ্যে অন্য সব মানুষ, সকল পরিচয় ও জগৎ সংসার একাকার হয়ে যায়। সেখানে কোন ভেদবুদ্ধি নাই, খাটে না। মানুষ সেখানে এক ও অনন্ত সম্ভাবনাময়। অতএব মানুষের ঐতিহাসিকতা যেমন সত্য, অন্তরের ভাগ ও সমাজের অমিল যেমন বাস্তব, ঠিক তেমনি ভাষায় এই বর্তমানকে মানুষই যে অতিক্রম করে যেতে পারে তাও সমান সত্য। তার গতি সামনের দিকে, নতুনের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নয়, বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই তার মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা।

কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে এই ভাবে বোঝে না। রবীন্দ্রনাথের ওপরের উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দিচ্ছে এই ভাবে: “অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতিতে যেসব অভিন্ন উপাদান আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হোল বাংলাভাষা। সমাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব বাংলা ভাষা সব বাঙালির ভাষা। এবং সে কারণে যখন থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা।”

গণাধিনাথের ভাষায় ঐক্যের ধারাকে এই সংকীর্ণ অর্থেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বোঝে, এতোটুকুই শুধু মানে। কিন্তু কুকুরের লেজ টানলে যেমন আবার সোজা হয়ে যায় ঠিক তমনি ঘাড় নেড়ে রবীন্দ্রনাথকে তারা এই বলে আবার অমান্য করে যে, “অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বাংলা ভাষার জন্মের আগে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর যে-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিল, তাকে আমরা অস্বীকার করছি। বস্তুত অস্বীকার করে নয়, বরং সেই বাংলা-পূর্ব ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে সত্যিকার বাঙালি সংস্কৃতি”। (মুরশিদ ২০০৬; পৃ ১৫)

‘বাংলা-পূর্ব ভিত্তি’! তার মানে বাঙালির আবির্ভাব বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে— রবীন্দ্রনাথের এই সরল অবস্থান গ্রহণ করতেও চরম সাম্প্রদায়িক, পশ্চাতপদ ও অতীতমুখি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রাজি নয়। রবীন্দ্রনাথকে তারা পূজা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাদের বদ্ধমূল সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিরোধ দেখা দিলে তাকেও তারা অনায়াসেই অমান্য করে। বাঙালি সংস্কৃতি নাকি গড়ে উঠেছে ‘বাংলা-পূর্ব ভিত্তির ওপর’! এই ‘বাংলা-পূর্ব ভিত্তি’—অর্থাৎ বাংলা বাংলা হয়ে উঠবার আগে, বাঙালি যখন বাঙালি হয় নাই তারও আগের কথা। কবে? বাংলা ভাষাও যখন তৈরি হয় নি, বাঙালি বলেও যখন কিছু ছিল না তখনকার যে অখণ্ড প্রাচীন ভারত সেই ভারতে? হিন্দু পুরাণে মহাভারতে রামায়ণে গীতায়? উপনিষদে? কোথায়? বাঙালির ভিত্তি গাঁড়া হয়েছে এক মিস্টিরিয়াস ‘বাংলা-পূর্ব’ কাল্পনিকতায়। সেখানেই নাকি সত্যিকারের বাঙালিকে আমরা খুঁজে পাব। আজ দুই হাজার ছয় সালে এসেও গোলাম মুরশিদ তাঁর ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’তে মনগড়া এই ‘বাংলা-পূর্ব’ ভিত্তিটাই খুঁজতে নেমেছেন। এই বইটিকে ঘটা করে প্রথম আলো পুরস্কৃত করেছে। সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের যারপরনাই অধঃপতন এতে আরো দৃশ্যমান হোল।

কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীর এই পশ্চাতপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি থেকে আমাদের শিক্ষা নেবার দরকার আছে। এর আপাদমস্তক অন্তঃসারশূন্যতার কারণে সে বাংলাদেশের ভাষা, ভাব ও গণমানুষের রাজনীতির মধ্যে আর টিকে থাকতে পারবে না। এই শেকড়হীনতার মধ্যে আমরা বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক বিপদ দেখি। বাহ্যিক জৌলুস ও ডামাডোলের পেছনে নিজের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে এই ধারার নিজেরই এক করুণ ও পরাজিতের উপলব্ধি আছে। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাচেতনায় ও রাজনীতিতে তার আর স্থান হবে না। যার কারণে তাকে টিকে থাকতে হবে অনিবার্য ভাবেই জর্জ বুশ ও টনি ব্ল্যারের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ স্থানীয় বরকন্দাজ হয়ে। ইসলামের বিরুদ্ধে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-র সিভিলাইজিং মিশন হওয়া ছাড়া বাংলাদেশে তার আর কোন সাংস্কৃতিক বা ভাবগত ভূমিকা রইল না। আফসোস। ইসলামী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জুসেড পরিচালনার মধ্যেই সে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে এখন বদ্ধপরিকর। আমাদের চোখের সামনেই তাদের এই ভূমিকা এখন ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে উঠছে।

দুই

ওপরের পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে গিয়ে ফকির লালন শাহ সম্পর্কে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে থাকি তার মধ্যে দু'একটি প্রশ্ন নিয়ে এখানে আলোচনা করব। যাদের কথা মনে রেখে লিখছি তাঁরা অধিকাংশই বয়সে তরুণ এবং রাজনৈতিক কর্মী। বলাবাহুল্য, তাঁদের কাছে আমার নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দায়ও আছে। কথাগুলো অতএব তাঁদের কথা মনে রেখেই বলা।

শুরুতে বাউল শব্দটির ওপর উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়েছি এই কারণে যে বিষয়টি বাউল বনাম নাগরিকদের মামলা নয়। আদতে শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়। অধিপতি শ্রেণী তাদের ভাষাকেই ‘প্রমিত ভাষা’ বলে দাবি করে, যে ভাষাতে তারা কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদির চর্চা করে। তাদের সংস্কৃতিকেই তারা ‘বাঙালি’-র সংস্কৃতি বলে। ‘প্রগতি’, ‘আলোকিত বা অগ্রসর চিন্তা’, ‘আধুনিকতা’ ইত্যাদির যে সংজ্ঞা তারা খাড়া করে সেটা কাজে কাজেই উচ্চবর্ণের, অভিজাতদের বা শাসক শ্রেণীর সংজ্ঞা। এই শ্রেণীর চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতি অন্য সকল শ্রেণীর—সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের সংস্কৃতি বিচারের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এই মানদণ্ডই গণমানুষের সংস্কৃতিকে ‘বাউল’, ‘লোকাযত’, ‘ঐতিহ্য’, ‘গ্রামীণ’ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বাতিল কিম্বা নিচু স্তরের সংস্কৃতি বলে মূল্যায়ন করে। নামকরণের মধ্যেই যে শ্রেণী রাজনীতি আছে সেই বিষয়ে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে, শুরুতেই শাসক সংস্কৃতির অহংকার পরিহার করতে হবে। তাহলে দার্শনিক বা ভাবগত ভাবে—অর্থাৎ চিন্তার সার্বজনীন গতিপ্রকৃতি—বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বাংলার ভাব কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক অভিমুখটা আমরা ধরতে পারব। শাসক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক মানদণ্ড ও বয়ান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আমরা বাংলাভাষায় বৈপ্লবিক চিন্তার সংগ্রাম, স্ফূর্তি ও বিকাশের ধারাকে “ভাবান্দোলন” বলে উল্লেখ করি। বলাবাহুল্য চিন্তার বৈপ্লবিক স্ফূর্তি শাসক শ্রেণীর মধ্যে সাধারণত ঘটে না, ঘটে শাসক চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিরোধিতা ও পর্যালোচনা করে। বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি আমাদের আগ্রহ অতএব নিছকই ‘বাউল’, ‘লোকাযত’ বা ‘গ্রাম্য’ সংস্কৃতির প্রতি শাসক শ্রেণীর শোখিন আগ্রহ নয়। বাংলা ভাবগত ভাবে চিন্তার পরিমণ্ডলে যে বিপ্লবগুলো ঘটিয়েছে তাকে জানা ও আত্মস্থ করাই আমাদের কাজ। কেন জানবো এবং আত্মস্থ করবো? কারণ বৈপ্লবিক ভাব বা চিন্তার চর্চার জন্য এই জানা ও বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদি বাংলার চিন্তার বা ভাবের বৈপ্লবিক দিকগুলো আমরা ধরতে না পারি তাহলে রাজনৈতিক ভাবে যতোই আমরা বিপ্লবের কথা আওড়াই, তাতে কোথাও কোন কটুটিও নড়বে না। যদি বাংলার ভাবজগতের বৈপ্লবিক অভিমুখটা আমরা ধরতে পারি তার পরের প্রশ্ন হবে এই অভিমুখটা এখন রুদ্ধ কেন? কেন আমাদের ভাষায় ভাবে সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক কোন আলোড়ন ঘটছে না। তাহলে বাংলার ভাব যেন নিজেকে নিজে চিনতে পারে, বুঝতে পারে এবং এখনকার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ভেঙে জোরকদমে সামনে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্যই আমাদের চেষ্টা।

শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তরুণদের ফকির লালন শাহ সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রধানত অধিপতি শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের লক্ষণ। কলকাতার বাবুসংস্কৃতির অনুকরণে যে ঢাকাকেন্দ্রিক “আধুনিকতা” ও সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, সেই ধারার চেহারা এখন আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। এখন তাকে আরও ভালোভাবে চেনার আরাম বাদ দিলেও এটা পরিষ্কার যে জনগণ দূরে থাক অধিপতি শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতেও এই ধারা অক্ষম। সকল প্রকার রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিপুল উদযোগ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে স্থান করে নিতে সক্ষম হন নি অথচ কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা বা রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ছাড়া বাংলার ‘বাউল’ আর ‘বয়াতি’ ঠিকই সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতির মধ্যে দাপটের সঙ্গে টিকে আছেন। অধিপতি শ্রেণীর মনস্ত্বষ্টির জন্য যারা ব্যান্ড সঙ্গীত করতে এলেন, তাঁদের শুধু ড্রাম, গিটার আর কীবোর্ড দিয়ে কাজ হোল না। ওখানেও তাঁরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের গান ‘লোকসঙ্গীত’ নামে আত্মস্থ করলেন। অনেকে কার গান বা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই কথা উল্লেখও জরুরি বোধ করলেন না। সংস্কৃতি কারও একার সম্পত্তি নয়। ফলে তাঁরা সেটা করতেই পারেন। কিন্তু যখন গানগুলো ব্যবসার জন্য বাজারে ছাড়া হয় এবং ব্যবসার মুনাফা যখন ব্যক্তির পকেটে যায়, তখন এটাকে নির্জলা চুরি বলে। এই ধরনের intellectual piracy বা লোকসম্পদ চুরির বিরুদ্ধে ইউনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আজকাল কথা উঠেছে। গরিবের সম্পদ বড়োলোক চুরি করে এটা নতুন কিছু নয়, সেটাও না হয় সহ্য করা গেল। তারা রবীন্দ্রনাথের গান বা সুর এক অক্ষর এদিক-ওদিক করতে পারেন না, কিন্তু এই শ্রেণীর ধৃষ্টতা হোল বাউল ও বয়াতিদের গানের কথা ও সুর তাদের খুশি মতো বদলানো। বিকৃত করতেও তাদের বাধে নি। তখন বোঝা যায় বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি অধিপতি শ্রেণীর মনোরঞ্জকদের শ্রদ্ধা দূরের কথা এগুলো তাদের কাছে নিছকই কাঁচামাল ছাড়া অধিক কিছুই নয়। কাউকে না বলে এবং কারও কাছে জবাবদিহী না করে তারা যেমন খুশি তেমন এই মাল ব্যবহার করতে পারে।

অধিপতি শ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক সংকটটা অবশ্য অনিবার্য ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক বাবুসংস্কৃতির অনুকরণে কিম্বা একই পরিমণ্ডলে নতুন বাংলাদেশের সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে না, এটা বোঝার জন্য অনেক জ্ঞানী হওয়া লাগে না। কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট। যে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করল তারা কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ এবং ধর্মসূত্রে অধিকাংশই মুসলমান। অতএব বাঙালি সংস্কৃতির সামনে দুটো প্রশ্ন মোকাবিলার জন্য হাজির হোল, (১) সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতির প্রশ্ন এবং (২) ইসলাম প্রশ্ন^১। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপর যে নতুন অধিপতি শ্রেণী

^১ এই বিষয়ে ইংরেজি দৈনিক New Age পত্রিকার বিশেষ চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বায়িকী সংখ্যায় 'Islam Question in Bangladesh' শিরোনামে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য রয়েছে। দেখুন <http://www.newagebd.com/store/anni07/12.html> (৬ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে পাওয়া লিঙ্ক)।

গড়বার তোড়জোড় শুরু হোল সেখানে এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকেই হয় ধামাচাপা দেওয়া হোল। ‘বাঙালি’ নিজেকে বাংলার ‘ভাব’-এর সঙ্গে যুক্ত করল না। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গেও না। দুই একজন শক্তিমান লেখক, নাট্যকার ও কবি ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা জয় করা তার সাধনার অংশ হয়ে উঠতে পারল না। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি হিশাবে নিজেকে গড়ে তুলবার সাধনা না করে কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির তল্লিপবাহক হয়ে রইল। প্রধানত সেই ভাষাতেই গল্প কবিতা সাহিত্য করল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভাবে অন্যান্য সংস্কৃতি—বিশেষত আদিবাসী ও প্রান্তিক লোকায়ত ধারার সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের প্রকল্প হিশাবে তার সাংস্কৃতিক সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও সম্প্রদায়িক করবার লড়াইও এই ঔপনিবেশিক ধারা করে নি। সংখ্যালঘুর সংস্কৃতিকে বিশেষ মর্যাদা, সুবিধা ও অধিকার দিয়ে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়বার জন্য সকল নাগরিকের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্র মজবুত করাই ছিল আসল কাজ। সেই কাজ হয় নি। বরং এই ধারা উগ্র বাঙালি সম্প্রদায়িকতার জায়গা থেকে এই কর্তব্যকে ক্রমাগত বানচাল করেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী (চিহ্নিত – অচিহ্নিত) জনগোষ্ঠীগুলো যে কারণে ‘বাঙালি’-কে কখনই সঙ্গত কারণে আস্থায় নেয় নি। এখনও নেয় না।

তার মানে কী দাঁড়াল? মুক্তিযুদ্ধ ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি বিকশিত ও নিজেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি হিশাবে পরিগঠিত করে তোলার সম্ভবনাই মার খেয়ে গেল। অতি দ্রুত নস্যং হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধ যে প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছিল এবং তার মীমাংসার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক দলবাজিতা দিয়ে খামোশ করে দিল। সাধারণ মানুষ যে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে ‘বাঙালি’ পরিচয় দিয়ে আত্মাহুতি দিল তাকে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের কেন্দ্রে স্থাপন না করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হোল সেই পুরানা ঔপনিবেশিক শহুরে বাবুসংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের আধিপত্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা, ভাব, ধর্ম, আচার বা সংস্কৃতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি না হওয়ার এই ধারার হাঁকডাক শহুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। মফস্বল শহরগুলোতে তারা তাদের চক্র গড়ে তুলেছিল অনেকটা রাজনৈতিক মাস্তান বাহিনীর মতো, বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে আন্তরিক কোন আন্দোলন-সংগ্রাম হিশাবে নয়। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনমত তৈরি ছাড়া এই ধারা বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশে মৌলিক কোন অবদানই রাখতে পারে নি। আজ তা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

কলকাতা ঔপনিবেশিক ও ঐতিহাসিক কারণে বাঙালিকে, বাঙালির ভাব ও ভাষাকে সার্বজনীন করতে পারে নি। এই সীমাবদ্ধতা ঐতিহাসিক। তার বিকাশ ঘটেছে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি হিশাবে। এটা হিন্দুর অপরাধ কিম্বা ব্রাহ্মণ্যবাদিতার দোষ হিশাবে দেখলে আমরা ইতিহাস বুঝতে পারব না। কিন্তু একান্তরে

আমরা যখন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলাম দুই বাংলার জন্যই সেটা ছিল এক দুর্দান্ত ঐতিহাসিক সুযোগ। ‘বাঙালি’ ব্যাপারটিকে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, গণের, জাতের ও শ্রেণীর সংকীর্ণ পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিতে পরিণত করবার। সেই প্রকল্প, বলাবাহুল, কখনই ইতিহাস অস্বীকার করে কিম্বা ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে হতে পারত না। অর্থাৎ কলকাতা যা অর্জন করেছে সেই অর্জনের ইতিবাচক পর্যালোচনা ও আত্মস্থ করেই সামনে এগিয়ে যাবার দরকার ছিল। ঠিক যে আমাদের দেশ আলাদা, রাজনৈতিক পরিচয়ও আলাদা। আলাদা হলেও আমরা একই ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। তাহলে সকলে মিলেই বাংলা সংস্কৃতিকে নিজ নিজ জায়গা থেকে একসঙ্গেই এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে কাজ করতে পারতাম। যদি বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি কলকাতার চিবিয় ফেলা জিনিসকেই আবার বাঙালি সংস্কৃতির উপজীব্য না করে মুক্তিযুদ্ধের গণতান্ত্রিক তাৎপর্য সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করত, তাহলে আমরা আমাদের কর্তব্য বুঝতাম — ঔপনিবেশিক আমলে ঐতিহাসিক কারণে বাঙালির যে সংস্কৃতি, ভাব ও ভাষাকে আমরা উপেক্ষা করেছি, প্রায় হারিয়ে ফেলেছি তাকে তার বাঙালির ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির সপ্রাণ কেন্দ্রে অভিযুক্ত করা, চর্চা করা। বাংলার যেসকল জনগোষ্ঠীর ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক ও ঐতিহাসিক কারণে নিপীড়িত হয়েছে, এখনও গৌণ হয়ে রয়েছে তাকে সার্বজনীন আদান প্রদানের অংশীদার করে তোলা ছিল জরুরি কাজ। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে এই কাজটি করা গেলে ফল হোত বিদ্যুতের মতো। এই উপমহাদেশে এবং কাজে কাজেই সারা বিশ্বে বিশ্বকোটি বাঙালিকে গণতান্ত্রিক লড়াই-সংগ্রামে সামনের সারিতে নিয়ে আসবার সাংস্কৃতিক কাজ করবার বিশাল সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল একাত্তর।। বলাবাহুল্য আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগাই নি।

কেন পারি নি? হয়তো রাজনৈতিক ভাবে তা অসম্ভবই ছিল। কারণ একাত্তরে বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি ঠিকই, কিন্তু গণমানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে রাজনৈতিক ভাবে আমাদের সংবিধান, ও শাসনব্যবস্থায় আমরা কয়েম করতে পারি নি। গণমানুষের রাজনীতি খারাপ করেছেন—উচ্চবর্ণ, আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী এবং জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে খারাপ লড়ে আসছিলেন একাত্তরে তাঁদের রাজনীতির জয় হয় নি। জয় হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই অংশের যাদের কাছে বাঙালি মানে সেই পুরানা ঔপনিবেশিক বাংলায় গড়ে ওঠা শ্রেণীরই আত্ম-পরিচয়। যে পরিচয়ের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক খেটে খাওয়া মানুষ অনুপস্থিত, যে পরিচয় ইসলামকে তার শত্রু হিসাবেই জ্ঞান করতে শিখেছে—তার সঙ্গে ভাবগত বা সাংস্কৃতিক মোকাবিলার প্রয়োজন বোধ করে নি। ধর্মের সঙ্গে ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির জটিল সম্পর্কে যে পরিচয় ক্রমাগত অস্বীকার করেছে। বাঙালি হবার ধারণাকে হাজির করেছে ইসলামের

বিপরীতে আত্মপরিচয় নির্মাণ হিশাবে। বাংলাদেশে এবং পশ্চিম বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতির ধারা মার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষের ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিশ্রুতিও মার খেয়ে গেল।

এই বার্থতা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার কোন কোন কবি ও লেখক কথায় কথায় নানান সময়ে ঢাকাকে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আগামি পীঠস্থান বা কেন্দ্র বলে যখন আন্দাজ করছিলেন আমরা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হীনমন্যতায় একধরনের আত্মপ্রসাদ ও পুলক অনুভব করেছি মাত্র। এতো বড়ো কাজের দায়, দায়িত্ব ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এক ফোঁটাও ভাবি নি। অতএব কলকাতার চিন্তাশীল শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ধারাও অবাক হয়ে দেখল যে আমরা বরং তাদের অধীনস্থ থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। নতুন ঐতিহাসিক দায় ও কর্তব্য পালনে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি নাই বললেই চলে। এতোবড়ো মুক্তিযুদ্ধ করবার পরও আমরা কোন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে পারি নি। এমনকি বাঙালি হিশাবে নিজেকে চিনবার, জানবার ও ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করবার কর্মসূচী নেবার হিম্মতও আমাদের নাই। বাঙালিপনা, বাংলা ভাষা বা ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভোটসংখ্যা বৃদ্ধির হাতিয়ারই হয়ে রইল। কোন মৌলিক প্রয়াস দেখা গেল না। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য ক্রমে ক্রমে সাংস্কৃতিক দলবাজি ও সংঘবদ্ধ মান্তানিতে পরিণত হোল। নিজেরা নিজেদের বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক ও আরো নানা ভাবে ভূষিত ও পুরস্কৃত করে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করল বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের তারাই মূলধারা। যে কোন মূল্যে একটি রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবার জন্য নগ্ন সাংস্কৃতিক লেজুডবৃত্তি বাঙালি সংস্কৃতিকে যে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক জায়গায় নিক্ষেপ করেছে বাংলার ভাষা, ভাব ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য তার ফল হয়েছে মারাত্মক। বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্যও এর ফল হয়েছে বিভেদাত্মক ও বিপজ্জনক।

প্রতিক্রিয়া হিশাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যখন ইসলামের প্রশ্নকে অনিবার্য ভাবেই হাজির করলো ততোদিনে তা আর বাঙালির ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির সংকট মীমাংসা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে হাজির হওয়া প্রশ্নের মোকাবিলা হয়ে এলো না। এলো নিতান্তই বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে মোকাবিলা করবার দরকারে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিশাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠে ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির মীমাংসা বা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রশ্ন এখানেও গরহাজির—কারণ যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা তারা নতুন মধ্যবিত্ত ও নতুন ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। ‘বাঙালি’ ধারণার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতি এবং ইসলাম প্রশ্ন মোকাবিলার কর্তব্য ছিলনা এই শ্রেণীর। পুরানা মধ্যবিত্ত বা পেটিবুর্জোয়া ‘সমাজতন্ত্রী’-দের অর্থনীতির বিপরীতে বিশ্বব্যাপক, আইএমএফের কাঠামোগত সংস্কারের মধ্য দিয়ে বাজার ব্যবস্থা কায়ম ও

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করবার সঙ্গে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ও শক্তিবৃদ্ধি বিচার্য। এই নিবন্ধে সেই সুযোগ কম। একদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর তার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ হিশাবে আবির্ভাব ঘটল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের। একদিকে ‘বাঙালি’ সংস্কৃতি আর অন্যদিকে ‘বাংলাদেশী’ সংস্কৃতি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিজেকে বাংলাভাষীদের সার্বজনীন সংস্কৃতি হিশাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সেই ব্যর্থতার সুযোগ পেল। ‘বাঙালি’ নামে ঔপনিবেশিক কলকাতায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে বাংলাভাষী বড়ো একটি সম্প্রদায় কার্যত অনুপস্থিত—এই কথা সহজেই প্রচার করা গেল। কিন্তু গণমানুষের ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতি এবং ইসলাম প্রশ্ন—এই সকল মৌলিক বিষয়ে কোন মীমাংসা বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিতে পারে নি। তার হিশাবের মধ্যেও ছিল না।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম। তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি হিশাবে ইসলামকে বাঙালি কোথায় স্থান দেবে? গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন হিশাবে একে মোকাবিলা করা দূরে থাক সংস্কৃতির হর্তকর্তারা কথায়, লেখায়, নাটকে, নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, সাংস্কৃতিক চালচলনে এটাই ক্রমাগত বুঝিয়েছেন যে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ধর্মীয়ও নয় এমনকি সাংস্কৃতিকও নয়। আর বাংলা ভাষার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু বাঙালির সঙ্গে ইসলামের সম্পর্কটা ‘ধর্মীয়’ এই দৃশ্যমান বাস্তবতা স্বীকার না করেও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের উপায় নাই। কিন্তু এই স্বীকারটাও করা হয় একটা ভুল স্বীকার করার মতো: বাঙালিদের ইসলাম গ্রহণ করাটাই ছিল একটা ঐতিহাসিক ভুল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা চাইছে ‘আধুনিক’ হওয়ার বর্তমান সুযোগে সেই ঐতিহাসিক ভুল বাঙালিরা কাটিয়ে উঠুক। নিজেদের ধর্মহীন করে তুলুক। মুছে যাক উপমহাদেশে জাতপাত বিরোধী ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সংকল্প ও প্রেরণার ইতিহাস।

বাংলাভাষায় আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারও অন্যায়। ওতে বাংলাভাষার পবিত্রতা নষ্ট হয়। ইসলামের সঙ্গে বাঙালির কোন সম্পর্ক যদি থাকেও সেটা নিছকই ধর্মতাত্ত্বিক (theology)—কাজে কাজেই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়—এই ব্যাখ্যা দিয়ে ‘ধর্ম নিরপেক্ষতা’ ধর্মকে যেভাবে নিছকই বিশ্বাস বা ধর্মতাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করে, ধর্মতাত্ত্বিক রাজনীতিও একই কাণ্ড করে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ধর্মতাত্ত্বিক রাজনীতিকে আলাদা মনে হয়, কিন্তু ধর্মের প্রশ্নে বা ভাবগত বিচারে তারা উভয়েই এক ও অভিন্ন। উভয়েই ধর্মকে ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অধিক কিছু ভাবতে অক্ষম। উভয়েই ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে ধর্মের ভাবগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অন্য কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা স্বীকার করে না। ইসলামের সঙ্গে বাংলা ভাষার বা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে বাঙালির গড়ে ওঠার সম্পর্ক ও ইতিহাস আছে। এই বাস্তবতা কোন পক্ষই জানতে বা এই বিষয়ে অন্বেষণ করতে রাজি না। মানেও না। ধর্মের প্রশ্ন পর্যালোচনার গুরুত্ব অনুধাবনের অক্ষমতা

উভয়েরই মধ্যে একই মাত্রায় বিদ্যমান। সমাজে ধর্মতাত্ত্বিক রাজনৈতিক দলের প্রাদুর্ভাবে যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মকে ‘প্রাইভেট’ ব্যাপার গণ্য করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ভাবচর্চার প্রাণ আরো ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবাদী সকল ধারার রাজনীতির কাছে ধর্ম থিওলজি ছাড়া অন্য কিছু নয়। একপক্ষ ধর্মের প্রশ্নকে নিছকই ‘বিশ্বাস’ গণ্য করে তাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করতে চায়, অন্য পক্ষ শুধু বিশ্বাসকেই সামষ্টিক রাজনীতির একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে কায়ম করতে চায়। উভয় রাজনৈতিক ধারার সাথে বাংলার ভাবান্দোলনের মৌলিক ফারাক রয়েছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কাছে ইসলামকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক করবার তো কোন প্রশ্নই আসে না। বরং বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে ঘরছাড়া হয়েছে, এখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তারা নাকি ঘরে ফিরে এসেছে। এটা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যারা শ্রেণী রাজনীতির চর্চা করছেন বলে প্রগতিশীল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন তাঁরাও এই ধরনেরই যুক্তি দিয়েছেন। (উমর ১৯৬৯; ‘মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’)। মনে রাখা দরকার বাঙালি জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়েছে শ্রেণী রাজনীতির নামে। কিন্তু ‘ঘরে ফেরা’, ‘স্বদেশে প্রত্যাবর্তন’ ইত্যাদি ধারণার মধ্য দিয়ে বাঙালি হওয়া বলতে ইসলাম ত্যাগ করাই এই ধরনের শ্রেণী রাজনীতিওয়ালারা বোঝাতে চেয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতির দিক থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অর্থ নিষ্পীড়িত জাতিসত্তার পক্ষে আপোষহীন লড়াই করা, কিন্তু কোন প্রকার জাতীয়তাবাদী পরিচয় দাঁড় করানোর সংগ্রাম নয়। ইতিহাস প্রমাণ করে যে জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে পর্যবসিত হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সার কথা হোল বাঙালি ইসলামকে তাদের পরিচয় নির্মাণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হিসাবে পরিহার করেছে। এই ধরনের লেখালিখি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা থেকে প্রচ্ছন্ন বা পরিষ্কারভাবে যে দাবিটা পাকাপোক্ত করা হয় তার মূল কথা—একাত্তর হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে বাঙালির বিজয়। যেন উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস থেকে ‘বাঙালি’ নিজেকে চিরকালের জন্য পৃথক করেছে। অথচ এই অনুমান ও দাবি ছিল একান্তই অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা এই প্রশ্নকে কখনো চ্যালেঞ্জ করেছে দেখি নি। বরং ইসলাম নিছকই ধর্ম—অতএব ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বাঙালির ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতি নির্মাণে তার কোন ভূমিকা নাই বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের এই অবস্থানই তারা মেনে নিয়েছে। ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী যখনই ধর্মের পরিচয়ে নিজের পরিচয় জাহির করতে চেয়েছে, তখন তাকে ‘মুসলমান’—ই মনে হয়েছে বাঙালি মনে হয় নি। উভয়েরই অনুমান বাঙালি ও ইসলাম দুটো পরস্পরবিরোধী ব্যাপার। তেল জলের মতো মিশ খায় না। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইসলামকে নিছকই ধর্ম অতএব ‘ব্যক্তিগত’ ব্যাপার বলে

বাঙালির ইতিহাস নির্মাণে ইসলামের অবদানকে খারিজ করতে চেয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই সংকটের মীমাংসা করাকে তার রাজনৈতিক কর্তব্য গণ্য করে নি। একই সঙ্গে বাঙালি ও বাংলাদেশী থাকতে গিয়ে শুধু স্ববিরোধী নয়—বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। দুই প্রতিক্রিয়াশীল ধারার মধ্যে আমরা ক্রমাগত খাবি খেয়েছি।

বলাবাহুল্য বাংলার ভাবান্দোলন সংস্কৃতির এই যান্ত্রিক বিভাজন কখনই মানে নি। তারা দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে নিপীড়ক ও শোষকের পক্ষে ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যেমন মোকাবিলা করেছে ঠিক তেমনি ইসলামের ভাবগত বা দার্শনিক প্রস্তাবনার ইতিবাচক ও বৈপ্লবিক দিককে সাদরে পর্যালোচনা, গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিকশিত করেছে। ফকির লালন শাহ তার শক্তিশালী নজির। ফকির লালন শাহ নদীয়া পরিমণ্ডলের ভাব, ভাষা ও রাজনীতির মধ্যেই ইসলামের প্রস্তাবনা মোকাবিলা করেছেন। আরব দেশে বসে নয়, আরবি ভাষাতেও নয়, কিম্বা আরবদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও নয়। বলাবাহুল্য, তিনি আরব নন। বাঙালি। বাঙালি হিশাবে উপমহাদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাব ও ভাষার ওপর তাঁর অধিকার যোল আনা। অথচ আবার তিনি বেদ ও শাস্ত্র বিরোধী মানুষ। কিন্তু বেদ ও শাস্ত্র পর্যালোচনা ও ভাবকতার বিকাশ সাধনের দিকেই তাঁর খেয়াল। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি জাত, পাত, বর্ণ, শ্রেণী ও নারীপুরুষ ভেদ মানে না—এমনকি তিনি কোন ভূখণ্ড, জমি, রক্ত, বংশ, ভাষা, বা সংস্কৃতির পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সাধনাও করেন নি। কোন প্রকার জাতীয়তাবাদেরও তিনি ভজনা করেন না। তিনি ভজনা করেন ‘সহজ মানুষ’। যার খবর তিনি গৌরাজের কাছে পেয়েছেন। এই অর্থেই তিনি নদীয়া পরিমণ্ডলের যে নদীয়া পরিমণ্ডলে ভাবুকতার যে ধারা গড়ে উঠেছিল সেটা শুধু বাংলা ভাষায় নয়, বাঙালিদের মধ্যে নয়—দুনিয়ার ভাবজগতেও নতুন ঘটনা। ঐ অবস্থান থেকে সনাতন ভারতের নানান ধর্ম চিন্তা ধ্যানধারণার মোকাবিলা যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি ধর্মসূত্রে আরবদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচার ও মোকাবিলাও সম্ভব যা সম্পন্ন করা গেলে ‘বাঙালি’ হিশাবে এশিয়ায় কি সারা দুনিয়ায় আমাদের গ্রহণযোগ্যতা আমরা বাড়াতে পারব। বিশ্ব ইতিহাসে নিজের শক্তি নিয়ে নিজে হাজির হতে পারার এটাই রাজনৈতিক-দার্শনিক পূর্বশর্ত। যদি আমরা এই ভাবুকতার পদ্ধতি ও শক্তিটা ধরতে পারি তাহলে পাশ্চাত্য বা তথাকথিত ‘আধুনিকতা’-র সঙ্গেও একটা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মোকাবিলা সম্ভব বলে আমার দাবি। এই মোকাবিলা প্রতিক্রিয়াশীল মোকাবিলা হবে না, হীনমন্যতার হবে না, ‘পাশ্চাত্য এখন যা ভাবছে আমরা বহু আগেই তা ভেবে রেখেছি’—এই ধরনের বালখিলা মূর্খতাও হবে না—হবে দেবার ও নেবার। বিশ্ব নাগরিকদের আদান ও প্রদানে উজ্জ্বল।

বলে রাখা দরকার ফকির লালন শাহ নদীয়া পরিমণ্ডলের ভাবগত জায়গা থেকে ইসলামের মোকাবিলা করলেও তাঁর আগেই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামের

ধর্মতাত্ত্বিক ও ভাবগত দিকের একটা বঙ্গীয় রূপ খাড়া করে রেখেছিল। ইসলামের যে চর্চা তা আরব সংস্কৃতি হিশাবে নয় বরং বাংলার সংস্কৃতি হিশাবে আত্মস্থ করণের প্রক্রিয়া জারি ছিল। সেখানে বাঙালির বিস্ময়কর চিন্তাশক্তি ও প্রতিভার যে সাক্ষাৎ আমরা পাই অসংখ্য পুঁথিতে, গানে, কাব্যে, নাটকে, নানান লৌকিক মানত ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আমরা অনায়াসেই পাই। ওট মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও স্ববিরোধিতা ছিল অবশ্যই। কিন্তু সেই ইতিহাসে প্রবেশ করলে আমরা অন্য এক বাঙালির সাক্ষাৎ পাই যার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্তের বয়ানের সঙ্গে মিল খুব অল্পই।

এতদিন ঔপনিবেশিক ও ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা টিকে থাকার পেছনে ভারতের অধিপতি শ্রেণীর আধিপত্য এবং রাষ্ট্র হিশাবে এই অঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ কারণ কিনা তার একটা আলাদা বিচার হতেই পারে। ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার দরকারে কলকাতার বাবুসংস্কৃতির যারা ধারক এবং বাহক তাদেরকে সবসময়ই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মদদ দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। হতে পারে। এই দাবি আছে এবং তার আলাদা বিচার হোক। কিন্তু আমরাও তো সঠিক প্রশ্নগুলো তুলি নি এবং তা মীমাংসার চেষ্টা করি নি। বাংলার ভাবান্দোলনের জায়গা থেকে এই দিকগুলো বাহ্যিক।

কলকাতার বাবুসংস্কৃতির তৈরি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে অধিপতি শ্রেণীর আরেক অংশের কাছ থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের হাঁকডাক আমরা শুনি। সত্যি যে আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল হাশিম প্রমুখ বাঙালি মুসলমানের জায়গা থেকে—অর্থাৎ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অবস্থান থেকে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। তাঁদের চিন্তার শক্তিশালী দিকগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। একান্তরের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের তুমুল উত্থানের পর তাঁদের প্রস্তাবনা অতলেই হারিয়ে গিয়েছে। অনেক সময় তাঁদের বরাত দিলেও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিশাবে আমাদের বিকাশে কোন উন্নত সাংস্কৃতিক বোধশোধের প্রমাণ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারার মধ্যে পাই না। অধিকাংশ সময় এই ধারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া হিশাবেই থেকে গেছে। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আর বাঙালি জাতীয়তাবাদকে যদি আমরা একই মূদ্রার দুই পিঠ ধরি তাহলে সংকটের রাজনৈতিক চরিত্রটা আমরা ভাল বুঝব। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকাটা আসলে কী এই প্রশ্ন আবুল মনসুর আহমেদ বা আবুল হাশিম তুলেছিলেন, কিন্তু আমরা পরিষ্কার ভাবে শুনি নি। এখন হাজির হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা কীভাবে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব? আরও বড়ো পরিসরে প্রশ্নটি হচ্ছে এই উপমহাদেশেই—বা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকাটা কী? ইসলাম কি ভারতবর্ষের নিছকই বাইরের জিনিস? যেমন, ইংরেজ ও তার ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে তুলনায় মুঘল শাসন ও ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার কি একই জিনিস? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দুত্ববাদীরা ইংরেজ শাসন ও ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে যে

চোখে দেখে, ইসলাম ও মূঘল শাসন কালপর্বকে সেই চোখে দেখে না। এই দিক থেকে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের আশ্চর্য মিল আছে। থাকুক। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস একই সঙ্গে ভারতবর্ষেরও ইতিহাস, ঠিক যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাস একই সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসও বটে। এই কথা কতোটুকু সত্যি? বাংলাদেশে ও এই উপমহাদেশে বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য এই প্রশ্নগুলো আমরা এখন আর এড়িয়ে যেতে পারবো না।

বাংলাদেশের ভাবান্দোলনের নানান ধারাকে ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতির সংকট মীমাংসার মধ্য দিয়েই জনগণের মন জয় করতে হয়েছে। তাঁদের সকলে একই রকম প্রশ্ন বা একই ধরনের উত্তর দিয়েছেন সে কথা বলা যাবে না। কিন্তু তাঁরা যে জ্ঞানকাণ্ডের ধারক ও বাহক এবং যে-প্রশ্নগুলো তাঁরা নিজেরা তাঁদের ভাবচর্চার পরিমণ্ডলে তুলছিলেন, সেখানে থেকেই তাঁরা ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও বিধিবিধান মোকাবিলা করবার চেষ্টা করেছেন। ফাঁকি দেন নি। বুর্জোয়া উদারনৈতিক ইতিহাস চর্চার একটি ধারা তাঁদের এই প্রয়াসকে “সমন্বয়বাদী” (syncretism) আখ্যা দিয়ে থাকেন। বাংলার ভাবান্দোলন বিভিন্ন ধর্ম থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা, ধর্মের ইতিহাস ও প্রতীক তাঁদের ভাবচর্চায় ব্যবহার করেন। অধিকাংশ সময় সেগুলো গ্রহণ করবার বা নিজেদের চিন্তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটাবার জন্য নয়, বরং তা পর্যালোচনা কিম্বা নাকচ করবার জন্য। বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা সেটা ধরতে পারেন না। তারা পুরো ব্যাপারটিকে একধরনের রাজনীতিবর্জিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবে দেখে থাকেন, রাজনৈতিক সংগ্রাম বিশেষত উচ্চবর্ণ ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত, শোষিত ও নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর মতাদর্শিক লড়াই আকারে দেখেন না। ফলে বুঝতে পারেন না যে ব্যাপারটা নিছক বিভিন্ন ধর্ম থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা বা প্রতীক ব্যবহারই বাংলার ভাবান্দোলনের বৈশিষ্ট্য, প্রধান চরিত্রলক্ষণ, গন্তব্য বা উদ্দেশ্য নয়। বরং নিজেদের জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশের জন্য পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্কই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জ্ঞানচর্চার বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের ভাবান্দোলনে তত্ত্বের ভূমিকা আছে, অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু গোড়ায় শুধু তত্ত্ব ছিল না। আর্যপূর্ব ‘অনার্য’ চিন্তা ও চর্চার অনুমান দিয়েও এর গোড়া ধরা মুশকিল। অনেক মিশালের সঙ্গে আছে জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তা, জৈন ও বৌদ্ধ জ্ঞানের পরিমণ্ডল এবং তাদের চর্চা ও বিকাশের নানান তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক চর্চা। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ঘটবার ফলে উচ্চবর্ণ ও শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মতাদর্শিক সংগ্রামে ইসলামও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। সেটা যতোটুকু ধর্ম হিসাবে ইসলামের কীর্তি, তার চেয়ে অনেক বেশী কীর্তি লড়াই শ্রেণীর। কারণ এখানেও ইসলাম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে বারবার। ইসলামের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ। আপসে আপ গ্রহণ করে নি। এখনও বাংলাদেশের বয়াতিরা তাঁদের গানে এবং পালায় ইসলামের সঙ্গে মোকাবিলায় গুরুতর ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন তাঁদের জ্ঞানকাণ্ডের জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্থাপন করেন এবং

করছেন। হিন্দুত্ববাদী বা ইসলামবাদী সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে গানে ও কথায় মতাদর্শিক লড়াই চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তাঁদের জুড়ি নাই।

ফকির লালন শাহকে আমরা উদাহরণ ধরেছি। তিনি নদীয়ার ভাবপরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছেন। ‘নদীয়া ভাবপরিমণ্ডল’ জাতপাত বিরোধী, গড়ে উঠার ইস্যু জাতপ্রথার বিরুদ্ধতা থেকে দার্শনিক-রাজনৈতিক লড়াইয়ের বৃহত্তর সূত্রে প্রথিত। একই অবিভক্ত সনাতন ভারতের বাংলাদেশ অংশে আজ জাতপ্রথা কোন ইস্যুই নয়, অথচ আজকের ভারত অংশে তুলনায় সবচেয়ে প্রভূত অর্থনৈতিক বিকাশ সত্ত্বেও জাতপ্রথা একটা ইস্যু ও নিষ্পেষণ সবচেয়ে বেশী কেন? আজকের বাংলাদেশে বসে জাতপ্রথা কী জিনিষ অনুভব করা যাবে না। কিন্তু ইসলামের ও নদীয়া পরিমণ্ডলের এই ক্রেডিটের কথা বাঙালি জাতীয়তাবাদীকে মনে করিয়ে দেবার দরকার আছে।

সেই ভাবপরিমণ্ডলের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কীভাবে ইসলামের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন তার কিছু নজির আমার সাইজীর দৈন্য গান বইটিতে দিয়েছি (মজহার ২০০০)। ফকির লালন শাহকে বুঝতে হলে তাঁর একটি কি দুটি গান ধরে বিচার করা যাবে না—সামগ্রিক ভাবেই বিচার করতে হবে। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে তাঁর মোকাবিলার ধরণটা বোঝার জন্য আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব।

‘পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়/রূপকাষ্ঠের নৌকাখানি নাই ডুবাব ভয়’—এই ধরনের গানে মনে হয় ইসলামের দার্শনিক অবস্থানের তিনি বাইরে রয়েছেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। তিনি নদীয়া পরিমণ্ডলের অবস্থান থেকেই ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবগত শিক্ষা গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছেন সেই দিক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আলোচনা হয় নি। এই ধরনের গানের ভাবগত প্রতিভা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনই এই ধরনের গানে উত্থাপিত প্রশ্নের বিচার বাংলার ভাবাদোলনে শেষ হয়েছে ভাবারও কারণ ঘটে নি। এই গানে নবীর নৌকাকে তিনি বলছেন “রূপকাষ্ঠে”—র নৌকা। তার মানে তিনি যেমন তেমন নবীর নৌকায় আমাদের ডাকছেন না। একটা রূপক নৌকায় আরোহন করবার জন্য ডাকছেন। সেই রূপকের রহস্য গানের শেষে তিনি উন্মোচন করে দিচ্ছেন :

যে মুর্শিদ, সেই তো রসুল, খোদাও সে হয়
লালন বলে নাই এ কথা, কোরানে কয়।।

যাঁর কাছে আমরা দীক্ষা নিয়ে থাকি, শিক্ষার ও জ্ঞানের পিপাসা মেটাবার জন্য যাঁর কাছে আমরা যাই, যিনি একটি কালে মানুষের জ্ঞানচর্চার চূড়া হয়ে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে হাজির থাকেন, যাঁর ভাব বা জ্ঞান থেকে আমাদের সংবিধান, বিধিবিধান, লড়াই সংগ্রাম ও সমাজের পরিগঠনের নির্দেশগুলো আমরা পাঠ করতে পারি, সেই মুর্শিদই তো রসুল বা নবী। তিনিই তো নিরাকার জ্ঞান বা ভাবের সাকার প্রতিনিধি। তিনিই তো তাহলে আল্লা বা খোদা। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি মুর্শিদ, রসুল এবং খোদা। তিনি রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ। তাঁরই রূপক নৌকায় চড়বার জন্য আমি, ফকির

লালন, তোমাদের ডাকছি। লালন বলছেন, এই কথা আমার নয়। এই কথা কোরানশরিফেরই কথা।

নবী বা রসুল মানে একেকটি কালে একজন রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ অবশ্যই, কিন্তু তাঁরা নিছকই মানুষ নয়—বিশেষ মানুষ। যিনি গুরু, যিনি তাঁর ভক্তদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন তাঁর মধ্যেই নির্বিশেষ নিজেকে বিশেষ রূপে বিশেষ দেশকালপাত্রে হাজির করেছেন। লালন বলছেন আসো তাঁর রূপকাষ্ঠ দিয়ে তৈরি নৌকায় আমরা উঠি। সব কালে সব জনগোষ্ঠীর কাছে আল্লা এই ধরনের বিশেষ পথ প্রদর্শক পাঠান।

যারা নদীয়া পরিমণ্ডলের ভাব বা তকবিতর্কে অনভিজ্ঞ তাঁরা মনে করবেন লালন বুঝি নবী আর খোদাকে একাকার করে ফেলছেন। অনেক লালনপন্থীও কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন। মুর্শিদই রসুল আর রসুলই খোদা। লালন নদীয়ার ভাবুক—তবুও নিরাকার আর সাকার এক বলে মনে করেন না। তিনি সুফি ধারারও নন যে আল্লাকে আগে থেকেই ‘আছে’ অনুমান করে নেবেন। তারপর আল্লার মধ্যেই ফানা ফিল্লাহ হবেন। আল্লা তাঁর কাছে প্রমাণসাপেক্ষও নয়—কারণ এই নিরাকার সকল প্রমাণের আগেই ‘আছে’ হয়ে আছেন। সাকার ছাড়া নিরাকারের ধারণা যেমন অর্থহীন ঠিক তেমনি নিরাকার ছাড়া সাকারের ধারণাও সমান অর্থহীন। লালন উভয়কে তাদের অন্তর্গত সম্পর্ক দিয়েই চিনতে, বুঝতে ও জানতে আগ্রহী। যে রূপকাষ্ঠের নৌকার কথা বলে তিনি মুর্শিদ-রসুল আর খোদা ‘এক’ করে দেখছেন সেই একত্বকেও তাহলে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না—রূপকার্থে গ্রহণ করতে পারি। মুর্শিদ, রসুল আর খোদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ব্যাপার আছে। কিন্তু পার্থক্য থাকার পরেও তাঁদের রূপকার্থে এক বলে গণ্য করছেন লালন। দাবি করছেন কথা কোরানেই আছে, তিনি বলছেন না।

নদীয়া যখন বলে গৌরাজ্জ কৃষ্ণের অবতার—তখন কৃষ্ণ আর গৌরাজ্জ এক হয়ে যায় না। কারণ এর পরেও ফকির লালন প্রশ্ন তোলেন কৃষ্ণ তো কালো আর গৌরাজ্জ ফর্সা। তাহলে কী সাধন করে গৌরাজ্জ গৌর হোল? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এখানে কল্পনা ও বাস্তবের, ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিচারের জটিল দার্শনিক প্রশ্ন তো আছেই কিন্তু গৌরাজ্জের সাধনাটা কি ছিল তাকে জানা ও বোঝা দরকার। কি এমন কাজ করলেন গৌরাজ্জ যে তাঁকে আমরা কৃষ্ণের অবতার বলে গণ্য করি, অথচ তিনি কৃষ্ণের মতো কালো নন? তাহলে নিরাকার ও সাকারের মধ্যে সম্পর্ক রচনার সাধনা বা চর্চার একটা ব্যাপার থেকেই যায় যাকে লালন ‘করণ’ বলতেন। অর্থাৎ সাকার মাত্রই নিরাকারের প্রকাশ নয়। তথাকথিত পীরমুর্শিদের দাবিদারদের হয়ে কেউ নিজেকে মুর্শিদ দাবি করলেই তিনি মুর্শিদ হয়ে জান না, আর পীরমুর্শিদ গুরুগোস্বামি মাত্রই ‘খোদা’ নয়। নিরাকারকে নিরাকার রূপেই ভাবা, জানা ও উপাসনাই যে ইসলামের মর্ম কথা ফকির লালন তার বৈপ্লবিকতা জানেন। সাকার মানুষের জন্য নিরাকারই উপাস্য। সাকার নবীকে তিনি নিরাকার খোদা বলে দাবি করছেন না। কারণ নিরাকার আর সাকার যদি

একই কথা হয় তাহলে একই কথাকে দুই নামে ব্যবহারের কি দরকার? একবার সাকার, আবার নিরাকার? এটা কি নিছকই ভাষার মুশকিল। মোটেও না। ঐক্য ও পার্থক্যের, এক ও অনেকের ভাবগত প্রশ্নগুলোই এখানে বাংলার ভাবান্দোলন তুলেছে এবং মোকাবিলা করেছে।

লালন বলছেন নিরাকার ‘আছে’, নিরাকার আছেন। সাকার সম্পর্কে ‘আছে’ কথাটা যে অর্থে বলি নিরাকার ‘আছে’ কি সেই অর্থে বলি? মোটেও না। তাহলে ‘আছে’ বা আছেময়তারও দুরকম মানে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু নিরাকারের এই আছেময়তা আমরা বুঝতে পারি ও প্রমাণ করতে পারি আমাদেরই সাকার রূপের মধ্য দিয়ে, কারণ নিরাকারের ধারণা তো মানুষই করতে সক্ষম, সাকার মানুষই তা করে।

আবার তর্কে আল্লা ‘আছে’ যেমন প্রমাণ যেমন করা যায় তাকে অপ্রমাণও করা যায়। কেউ খোদা আছে—এই বাক্য বারবার বললেও খোদা যে আছে তা প্রমাণিত হয় না। কারণ এই ‘আছে’ সম্পর্কে আমরা জানি, বুঝি, অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং সেই জানা ও বোঝা চালাচালি করি একমাত্র মনুষ্যরূপের মধ্য দিয়ে। মানুষের মধ্য দিয়ে—সাকার মনুষ্যের ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়েই নিরাকার নিজেকে সাকার রূপে জানে, নিজেকে নির্মাণ করে, নিজের সামনে নিজেকে হাজির রাখে বা হাজির রাখতে পারে। ‘খোদা’ বা ‘আল্লাহ’ নামক অক্ষরগুলো সাকার। নিরাকার নয়। কিন্তু এই অক্ষরগুলো কাকে প্রকাশ করে আমরা দাবি করি? নিরাকারকে। তাহলে নিরাকার তো সাকার না হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। আর যদি দেশকালপাত্রের তার প্রকাশই না থাকে তাহলে তাকে আমরা ‘আছি’ বলি কি করে? ঠিক তেমনি গুরু বা মুর্শিদও নিরাকারেরই সাকার প্রকাশ। জ্ঞানস্বরূপ হয়েই পরম। নিরাকারের সাকার কণ্ঠস্বর বলেই মুর্শিদ সাকার হয়েও একই সঙ্গে খোদা। এই অর্থেরই: ‘যে মুর্শিদ, সেই তো রসূল খোদাও সে হয়’। কেউ যদি বলে তাহলে খোদা নাই—মুর্শিদ বা রসূলই খোদা। ফকির লালন শাহ তা মূর্খের, অজ্ঞানতার, জাহেলির চরম নিদর্শন বলে গণ্য করবেন। কারণ এই সিদ্ধান্তে সাকার এবং নিরাকারের মধ্যে যে একটা সপ্রাণ সম্পর্ক বর্তমান সেই সম্পর্ককেই অস্বীকার করা হচ্ছে।

সেই কারণে লালনপন্থায় গুরুকে ‘ভক্তি’ দেওয়া সিদ্ধ—কিন্তু ‘সেজদা’ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভক্তকে এই জন্য কীভাবে ‘ভক্তি’ দিতে হয় তা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে শিখতে হয়। যেন, কোন ভাবেই এই ভক্তি দেওয়া ‘সেজদা’ দেওয়ার মতো বা সেজদা দেওয়ার নামাস্তুর না হয়। গুরুকে পূজা করাও একই কারণে নিষিদ্ধ।

গুরু রূপে নিরাকারের বা পরমের এই হাজিরা আবার নিছকই হাজিরা নয়, কারণ এই নিরাকার অনন্ত সম্ভাবনাময়। যখনই সাকার মানুষ—মুর্শিদ বা রসূল বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য চিন্তা করেন, ভাবেন, নিজের জীবন যাপনকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে নিজেকে নিরাকারের কণ্ঠস্বর বানাবার সাধনা করেন—তখন তাঁর ভাব, ভাষা ও জ্ঞানচর্চায় সাকার আর নিরাকারের মধ্যে নতুন ধরণের

সম্পর্ক রচনার শর্ত তৈরি হয়। অর্থাৎ যা নাই, যা বিদ্যমান নয়—তাকে হাজির করবার শর্ত মুর্শিদ করেন। এই চর্চায় সাকার নিরাকার থেকে ভিন্ন কি অভিন্ন সেই তর্ক ফকির লালন শাহের কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না। মূল প্রশ্ন হচ্ছে উভয়ের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্থিরনির্দিষ্ট কোন সম্পর্ক নয়, অস্থিরও নয়। সেই সম্পর্কের চর্চায় থেকে নিজেকে নিরাকারের কণ্ঠস্বর হিসাবে তৈরি করা গেলে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির প্রতিটি বিপ্লবী রণধ্বনিই দৈবী নির্দেশ ছাড়া আর কী! কারণ বিপ্লব মাত্রই যা নাই তাকে আবাহন করা।

যদি এই সম্পর্ক স্থির বা অস্থির কোনটিই না হয় তাকে আমরা কীভাবে বুঝব? বাংলার ভাবাদোলন একে ‘খেলা’, ‘লীলা’ ইত্যাদি নতুন ধরণের ধারণা দিয়ে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করেছে। এই খেলার সম্পর্ক কখনো সাকার কখনো নিরাকার, আবার কখনও সাকার রূপে নিরাকারের প্রকাশও হতে পারে। সবই সম্ভব। এই দিকটা আরো ভালো বুঝব যদি লালনের অন্য একটি গান আমরা উদ্ধৃত করি :

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
জীবের কি সাধ্য বলে গুণে পড়ে তাই বলা

কখনও ধরে আকার কখনও হয় নিরাকার
কেউ বলে আকার-সাকার অপার ভেবে হই ঘোলা।।

অবতার অবতারাী সেও তো সম্ভব তারি
দেখি জগৎ ভারি এক চাঁদে হয় উজালা

বক্ষাও ভান্ড মাঝে সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয় নাম ধরে সে কৃষ্ণ ও করিম কালা।।

লালন বলছেন নিরাকার বা আল্লাহ কখন কোন রূপ ধরবেন এটা গোনাগুনি পড়াশোনা করে আগে থাকতে কখনই জানা যায় না, যাবে না। বিশেষ দেশকালপাত্রে মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি কোন না কোন বিশেষ রূপ ধরতেই পারেন, কিন্তু বিশেষ রূপটাই তাঁর একমাত্র রূপ বা সেই বিশেষ রূপে তাঁকে দেশকালপাত্রের জানি বলে তিনি সাকার হয়ে যাচ্ছেন না—নিরাকার সদাই দেশকালপাত্রের অতীত নিরাকারই থেকে যান। এই নিরাকারই সকল কিছুই আবির্ভাব বা উদয়ের শর্ত। মানুষ যদি নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশ দেখতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই তার জন্য সাধনা করতে হবে, চর্চা করতে হবে। দেশকালপাত্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে হবে। যদি এই নিরাকারকে সার্বভৌম কর্তাসত্তা বলে আমরা গণ্য করি তাহলে নিরাকারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এমনকি অবতার বা অবতারাী হওয়াও খুব সম্ভব। ‘সাঁই’ নামে যে নিরাকারকে আমরা ধারণা করছি তিনি কখন কোন খেলা খেলবেন কে জানে!

সবকিছুই তিনি, সবকিছুই তাঁর মধ্যে আছে—এমনকি সময়ও। কিন্তু জগৎ সংসার আর ‘সাঁই’ এক কথা নয়।

নদীয়া পরিমণ্ডল ইসলামের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে নিরাকার আর আর সাকার অভিনু এই শেরিক যেমন করে নি—অন্যদিকে নিরাকার শুধু নিরাকারই থাকেন আর কিছুই তিনি নন—এই ধারণাকেও সঠিক গণ্য করে নি। ‘সাঁই’ সার্বভৌম ও অনন্ত সম্ভাবনাময়। তাঁর লীলাও বহু ও বিচিত্র। নিরাকারকে সার্বভৌম ইচ্ছা হিশাবেও বাংলার ভাবান্দোলন মনে রেখেছে। তিনি অতএব যা খুশি তা হতে পারেন। নিজেকে সাকারও রূপে প্রকাশ করতে পারে—‘অবতার’ গুরু মুর্শিদ রসুল যা ইচ্ছা তাই হওয়া তাঁর জন্য কখনই অসম্ভব নয়। যদি আল্লাহ ধারণার মধ্যে এই সার্বভৌম ‘খেলা’ বা লীলার ধারণা না থাকে তাহলে তাঁকে আল্লাহ বলি কী করে? আল্লা এটা হতে পারবেন আর ওটা হতে পারবেন না—এই সীমা টেনে দেওয়া আল্লার ধারণার সঙ্গে মেলে না।

বৌদ্ধ চিন্তা বা নদীয়ার ভাবপরিমণ্ডলের সঙ্গে তার যোগ বা ধারাবাহিকতাও আছে এখানে। গুরু মানে বুদ্ধ, যিনি জ্ঞানী, যিনি রক্তমাংসে নিরাকারের সাকার উপস্থিতি, যিনি সত্য। সত্য কোন বাক্যে প্রমাণ বা প্রকাশ করা যায় না। বরং জীবনচর্চার দ্বারাই গুরু সকলের কাছে সত্য হয়ে ওঠেন, জ্ঞানের প্রতীক হয়ে ওঠেন, আইন বা বিধিবিধানের উৎস হয়ে উঠেন। অতিশয় প্রথাগত মার্কসীয় অর্থে তত্ত্ব ও চর্চার (practice) সঙ্গতি সম্পর্কে যেসকল কথা আমরা শুনে আসছি এখানে হয়তো সেই কথাই আমরা শুনছি। মানুষকে সত্য হয়ে উঠতে হয়। ইতিহাস সচেতন হয়ে উঠতে হয়। কমিউনিস্ট মাত্রই ইতিহাস সচেতন। তত্ত্বে সত্য নাই, সত্য চর্চায়। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক জীবনচরণে ও চর্চায় মধ্য দিয়েই শুধু সত্য বা ‘কমিউনিস্ট’ হয়ে ওঠা যায়। তাহলে চিন্তা ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে কালের প্রতিনিধি হয়ে ওঠা এবং জনগণের মুক্তির ইচ্ছা, সংস্কৃতি বা প্রতীক হয়ে ওঠার যে-কথা বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতি বলে বেড়ায় তার সঙ্গে ফকির লালন শাহের ভাবের অমিল নাই। এই দিকগুলো নিয়ে কোন গবেষণাই হয় নি বলা চলে। সম্প্রতি এইসব নিয়ে কথাবার্তা উঠেছে। বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দিকগুলো নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন আছে। যাঁরা বাংলাদেশের গণবিপ্লবী রাজনীতি বিকাশের দায় এখনো বোধ করেন তাঁদের দায়িত্বই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি।

আমরা এই ছোট উদাহরণ দিচ্ছি শুধু অতোটুকু বলার জন্যই যে বাংলা ভাবগত ভাবে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্ম বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে যেমন মোকাবিলা করেছে ঠিক তেমনি ইসলামের মোকাবিলাও করেছে নতুন ভাবের প্রস্তাবনা হিশাবে। ইসলামের বৈপ্লবিক দিকটা বাংলা কখনোই অস্বীকার করে নি ঠিক যেমন অন্যান্য ধর্মের বৈপ্লবিক প্রস্তাবনার দিকগুলোও। অবশ্যই ঝাড়াইবাছাইও করেছে। দৃঢ় ভাবে বহু আবর্জনা ত্যাগ করেছে। ইসলামের সঙ্গে বাংলার ভাবের এই মোকাবিলার ফল সমন্বয় (syncretism) হয় নি মোটেও। সমন্বয় দূরের কথা, রীতিমতো নতুন কথা বলছেন

ফকির লালন শাহ। ভারতবর্ষের সনাতন গুরুত্বের সঙ্গেও এর মিল বাহ্যিক, অন্তর্গত নয়। প্রথাগত ইসলামী ধর্মতত্ত্ব থেকে নিজেকে যেমন তিনি আলাদা রেখেছেন, কারণ তা ইসলামের দীক্ষা ও বৈপ্লবিক শিক্ষা থেকে অনেকাংশেই বিচ্যুত। অন্যদিকে সাকার আর নিরাকারের সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ভাবগত প্রস্তাবের অধীনে বিচার করবার পথ আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। এই জন্যই দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন, এটা আমার কথা নয়, এটা কোরানশরিফেরই কথা। একেই আমি বলছি নদীয়া পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে ইসলামকে আন্তরিকভাবে—অর্থাৎ তার বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য বহাল রেখে—ইসলামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আত্মস্থ করা। মানবজাতির জ্ঞানচর্চার ধারাকে সার্বজনীন করে তোলা। অন্য কথায় বাংলার ভাষা ও ভাবের মধ্যে ইসলাম প্রশ্নের মোকাবিলা ও নিজের বিকাশের জন্য আত্মস্থ করা।

ফকির লালন শাহের গানের জনপ্রিয়তা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বেড়েছে। ফরিদা পারভীন ও আরও অনেক শিল্পীর গুণে লালন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ড্রইংরুমে খানিক জায়গা করে নিয়েছেন। ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে পাকিস্তান আমলে মকসুদ আলী কিম্বা খোদা বক্সের মতো বড়ো মাপের অসাধারণ শিল্পীরা মধ্যবিত্তের ড্রইংরুমে ঢুকতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা শুধু শিল্পী ছিলেন না, লালনপন্থী সাধকও ছিলেন। ভাবচর্চাই ছিল তাঁদের গান গাওয়ার প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চোখে এঁরা ‘লোকশিল্পী’। একজন গায়ক বা গায়িকাকে ড্রইং রুমে স্থান দেওয়া যতো সহজ, একজন লালনপন্থী সাধক বা ভাবুককে স্থান দেওয়া ততো সহজ নয়। লালনের গান এই শ্রেণীর কাছে আরও হাজার ‘লোকগীতি’-র মধ্যে একটি। ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি গানের চেয়েও অপরিচিত। আবদুল আলিম তাঁর গান গেয়েছেন, কিন্তু ‘লোকগীতি’ হিসাবে। বাংলার ভাবচর্চা, জীবনচরণ, রাজনীতি ও সমাজ গঠনের তত্ত্ব ও দিকনির্দেশনা হিসাবে এই গানগুলো কখনই মর্যাদা পায় নি। এখনও মর্যাদা পায় না।

বাংলার ভাবান্দোলনকে অতএব শুধু ভাব, দর্শন বা জ্ঞানের জায়গা থেকে বিচার করলে চলবে না। তার রাজনীতি বা রাজনৈতিকতার বিচারও চাই। বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের এটাই প্রধান দিক। শুধু ‘ভাব’ হিসাবে বিচারের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বিপ্লবী রাজনীতি—অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যবস্থার খোলনলচে পালটে দেবার যে রাজনীতি বাংলার ভাষায় ও ভাবে সেই বৈপ্লবিকতার আবাহন করবার তাগিদেই বাংলার ভাবান্দোলনে আমরা আগ্রহী হয়েছি। বিশ্বব্যবস্থার বদল ঘটাবার জন্য যারা ভাবে ও তৎপরতায় সক্রিয় তাঁরাই বাংলার ভাবান্দোলনের সত্যিকারের ছাত্র—আশা করি অন্যরাও একই অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হবেন।

তিন

পুনরুজ্জী হবে, কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলনের রাজনৈতিক দিক ও আমাদের কর্তব্য বোঝার জন্য সারমর্ম টানব।

‘আধুনিক’ সংস্কৃতি বনাম ‘লোকসংস্কৃতি’র শ্রেণী ভেদটা রাজনৈতিক। অধিপতি শ্রেণী জনগণের সংস্কৃতিকে সবসময়ই লোকসংস্কৃতি, পল্লীগীতি ইত্যাদি বলে উপেক্ষা করে। যখন গুরুত্ব দেবার ভান করে তখন তাকে ‘আধ্যাত্মবাদ’ বা ‘মরমিবাদ’ বানিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে এই ধারার মানুষের চিন্তা, প্রজ্ঞা বা জ্ঞানচর্চার মূল ধারার কোন বিষয় নয়। এক ধরনের রহস্যবাদী মিস্টিক তৎপরতা যা সমাজের প্রান্তিক কোন গোষ্ঠীর বা গুহ্য কায়কারবারের সঙ্গে যুক্ত। আভিজাত্যের এই বিভাজন মেনে লোকসংস্কৃতির প্রতি সময় সময় অধিপতি শ্রেণীর সদয় আতিশয্যে আমাদের মোহিত হবার কোন কারণ নাই। যাকে আমরা ‘আধুনিক’ সংস্কৃতি বলি, সেই সংস্কৃতিকে বিশ্বপরিমণ্ডলের দিক থেকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং এখনকার ইঙ্গমার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ, ধ্বংস ও পরদেশ দখল থেকে আলাদা করে বিচার করা যাবে না। বাংলার ভাবান্দোলন লড়াই করেছে জাত, পাত, শ্রেণী ও নারীপুরুষ ভেদের বিরুদ্ধে। তাহলে বাংলার ভাবান্দোলন নামে আমরা যা শনাক্ত করতে চাইছি তার অভিমুখ ঔপনিষিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, ধ্বংস ও সহিংসতার বিরুদ্ধে। বাংলার ভাবান্দোলনের এই রাজনৈতিক মর্ম বাদ দিয়ে একে নিছকই ‘মরমিবাদ’ বা ‘আধ্যাত্মবাদ’ বলে হাজির করবার ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এখন দরকারি কাজ।

বাংলা ভাষায় দর্শন বা ভাবচর্চার ঐতিহ্য নাই বললেই চলে—ভাবচর্চার সঙ্গে রাজনৈতিকতার সম্পর্ক বিচার তো দূরের কথা। কাজের দিক থেকে মনে হতে পারে আগে বাংলার ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরিচয় তারপর ভাবের সঙ্গে রাজনৈতিকতার সম্পর্ক বিচার করা যাবে। কিন্তু এটা ভুল পদ্ধতিই হবে। চিন্তার সঙ্গে তৎপরতার কিম্বা ভাবের সঙ্গে রাজনৈতিকতার সম্পর্ক বিচার মাথায় রেখেই বাংলার ভাবান্দোলনের ইতিহাস পড়তে হবে।

বাংলার ‘ভাব’ অবশ্যই বাংলা ভাষা এবং বাংলার হৃদয়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিকাশেরই ইতিহাস। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে ভাষা ও সংস্কৃতিকে ‘আবহমান বাংলার ঐতিহ্য’ বা ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ বলে একটি স্থিরনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে চায়—একটা বিশেষ রাজনৈতিক আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে চায়—বাংলার ভাবান্দোলন চর্চার অভিমুখ তার বিপরীত। বাংলার ভাবচর্চার টানাপড়েন দ্বন্দ্বসংঘাত উত্থানপতনের ইতিহাস আছে—কিন্তু বাংলা মানে এই বিশেষ ‘ভাব’—এই ধরনের কোন নামের স্থির নির্দিষ্ট সত্তা নাই। অতএব এই ভাবকে জীবন্ত বা চলিষ্ণু প্রক্রিয়া হিসাবে বোঝা এবং এখনকার বিশ্বপরিমণ্ডলের চিন্তা ও প্রজ্ঞার সীমান্তে দাঁড়িয়ে বোঝাই আমাদের কাজ—যাতে মানুষের চিন্তা বা ভাবের সীমান্তবর্তী তর্কবিতর্কে আমরা বাংলা ভাষায় প্রতিভা ও যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারি।

বাংলার ভাব বা ভাবুকতার সঙ্গে আধুনিকতার বিরোধ সত্য। তার মানে এই নয় যে বাংলার ভাবচর্চার অর্থ আধুনিকতার আগের মুহূর্তে ফিরে যাওয়া বা আধুনিকতার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। এখন বাংলাদেশে বাংলার ভাবচর্চার একটিই মানে হতে

পারে — ‘আধুনিকতা’ নামে যে চিন্তা, ধারণা বা অনুমান মানুষের চিন্তা ও তৎপরতা বিকাশের ক্ষেত্রে চরম প্রতিকূলকতা হিশাবে হাজির হয়েছে তাকে নস্যাত্ন করে এগিয়ে যাওয়া—চিন্তা বা ভাবকে মুক্ত করা—চিন্তাকে চিন্তা করতে দেওয়ার শর্ত তৈরি করা। মানুষকে তার ভাবুক স্বভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এই অর্থে বাংলার ভাব আধুনিকতার বিরোধী।

বাংলাদেশে ‘আধুনিকতা’ ঘোরতরভাবে সাম্প্রদায়িকও বটে। কলকাতাকেন্দ্রিক ‘আধুনিকতা’—সেটা সাহিত্য, নাটক, গান, যাই হোক না কেন—তার গোড়া ঔপনিবেশিকতায়, তার পরিমণ্ডল বাবুসংস্কৃতির মধ্যে, হিন্দুত্ববাদী চিন্তাচেতনায় আপ্ত ও আচ্ছন্ন। বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির নামে যেসব আবর্জনা আমরা দেখি সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হয় সংরক্ষিত অথবা পরিত্যক্ত জিনিস। অন্যদিকে এর সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচ্যবাদী ও বর্ণবাদী চিন্তাচেতনা মিলেমিশে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তার জট না খুললে বাংলার ভাবান্দোলনের শক্তির জায়গাগুলো আমরা শনাক্ত করতে পারব না। অন্যদিকে এর জট খোলা বা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানে একে একাট্টা অস্বীকার নয়, এর ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ও অবদান সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে সচেতন থেকে পর্যালোচনা। ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিগঠন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক তেমনি একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাও একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। বাংলাদেশ তার নিজের তাগিদেই ইতিহাস নতুন করে পড়বে, নতুন করে ব্যাখ্যা করবে। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয় মানে উপমহাদেশে নতুন ভাব, রাজনীতি ও কর্মতৎপরতারও আবির্ভাব বটে। নতুন করে অনেক কিছু গড়বার ব্যাপার, ঘটিয়ে দেবার ব্যাপার। বাংলাদেশ এখন দুর্দশাক্রান্ত। কিন্তু তা সাময়িক। বাংলা নিজের ভাবকে নিজে যতো তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে ততোই এই পরিস্থিতি কাটিয়ে তুলবার শর্ত তৈরি হবে। সে জন্যই বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু সেটা ‘আধুনিকতা’র বিপরীতে ‘লোকায়ত’ চিন্তাচেতনার বা বাংলার ভাবের সর্দারি বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়—বরং বিভাজনের খোদ পদ্ধতিকেই প্রশ্ন করা, নাকচ করে দেওয়া এবং ভাবের পরিমণ্ডল প্রসারিত করা।

বাংলার ভাবান্দোলনের সামনে দুটো অসম্পূর্ণ রাজনৈতিক কাজ সম্পন্ন করা বাকি আছে। এক, গণমানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রশ্নে বাংলা ভাষা ও ভাবের বিচার দুই ইসলাম প্রশ্নের মোকবিলা। বাংলার ভাবান্দোলনে এই দুটো কাজ কীভাবে করতে হবে তার নজির আছে। সেই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়েই এখনকার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আরব ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতি অবশ্যই মহৎ ও গৌরবজনক সংস্কৃতি—কিন্তু বাংলা আরব নয়। ভাব বা প্রজ্ঞার চর্চা একমাত্র মাতৃভাষাতেই সম্ভব। বাংলাদেশে বা এই উপমহাদেশে ইসলামে কায়ম করার যদি কোন ভাবগত অর্থ থাকে তাহলে তার

অর্থ বাংলার ভাব ও ভাষার মধ্যে ইসলামের বৈপ্লবিকতাকে আত্মস্থ করা। কীভাবে তা সম্ভব তার নজির হচ্ছে বাংলার ভাবান্দোলন। নিছকই ধর্মতত্ত্ব হিসাবে নয়, ইসলামকে দার্শনিক বা ভাবগতভাবে—একদিকে গ্রিক-খ্রিস্টীয় চিন্তা ও ইহুদিবাদ অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সভ্যতা, বর্ণাশ্রম ও অভিজাততন্ত্র থেকে পৃথক ভাবে বিচারের কাজ তো পড়েই আছে। কীভাবে এই কাজ করতে হবে তার ভূরি ভূরি নজির আমরা বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে পাই। অতএব বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংকট, সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি কাটিয়ে তোলার পথ ভাব, ভাষা বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দিক থেকে ‘বাঙলা’র বিপরীতে ‘বাংলাদেশ’ বা ‘বাংলাদেশ’-এর বিপরীতে ‘বাঙলা’ প্রতিস্থাপন নয়। হতে পারে না। হয় না।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলার ভাবান্দোলনের ভাব, ভাষা ও রাজনীতি অনুধাবনের অনুকূল নয়। অন্যদিকে ‘আবহমান’ বাঙালি ঐতিহ্যের বিপরীতে বা প্রতিক্রিয়ায় ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’ নামে যে ধারা আমরা দেখছি তা ‘বাঙালি’-র ভাব, ভাষা ও সাংস্কৃতির সংকট ও সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব হিসাবে পরিগণিত হয় নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সেই উৎখাতকরণের যৌক্তিকতা হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। অতএব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদও বাংলার ভাবান্দোলনের অনুকূল কোন রাজনৈতিক চিন্তা নয়। গণমানুষের সাংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দিক থেকে বাংলার ভাবান্দোলন অনুকূল রাজনীতি আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল হাশিম প্রমুখের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও ভাষা ও সাংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান ও শক্তির কারণে তার বিকাশ আমরা দেখি নি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সেই সমস্যা তো আছেই। এই ধারা রাজনৈতিকভাবেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যর্থতার বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের অনেক সময় শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের স্বাভাবিক ও আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে যে নিশ্চয়তাবোধ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের সেটা নাই। তারা বাঙালি হতে চায় না, আবার ইসলামী রাজনীতির ধর্মতাত্ত্বিক (theological) ভিত্তির নিশ্চয়তার ওপর দাঁড়িয়েও রাজনীতি করতে চায় না। অন্যদিকে বাংলার ভাষা ও ভাবের জায়গায় দাঁড়িয়ে ইসলামের ভাবগত (philosophical) মর্ম আত্মস্থ করার হিম্মতও তার নাই। এই ধারা সে কারণে সবসময়ই দৌলুমান। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ধারা আজ অবধি নিজের কোন ভিত্তি গড়বার চেষ্টা করে নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দাবি করে বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই অনিবার্য পরিণতি। জাতি মাত্রই রাষ্ট্র গঠনের অনিবার্য পরিণতিতে পৌঁছায় কিনা কিম্বা রাষ্ট্র মাত্রই জাতি রাষ্ট্র কিনা সেই তর্ক তো

আছে। তাছাড়া জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কও তর্কসাপেক্ষ। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের প্রচার ও প্রপাগান্ডার বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিজে থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের অনিবার্য বিকাশ বলে প্রমাণ করতে পারে নি, প্রতিক্রিয়া হিশাবেই হাজির করেছে। এর ধারার উপস্থিতি ছন্দপতনের মতো মনে হয়। আবার এই ধারার কাছে একটি দলের ভোটবাক্স নিরাপদ করা ছাড়া বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আর কোন ইতিবাচক ভূমিকা আমরা দেখি নি। এই ধারার কোন ভাবগত পরিমণ্ডল বা শেকড় আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বা মতাদর্শিক সংগ্রামের দিক থেকে বাংলার ভাবান্দোলন কোন সমন্বয়বাদ বা আপোসে বিশ্বাস করে নি। এখনও করে না। কারণ হোল, জ্ঞানের জগতে যে-প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে তার উত্তর অন্ত্রেষণ ও মীমাংসাই জ্ঞানচর্চার রীতি। প্রশ্ন বুলিয়ে রাখা বা চাপা দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া নয়, যা কিনা পেটিবুর্জোয়ার স্বভাব। প্রশ্ন হচ্ছে কী করে প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে এবং উত্তর দেওয়া হচ্ছে তার কৌশলগত দিকে খেয়াল রাখা। কৌশলের সুবাদে নীতিগত আপোস নয়।

ধর্মতত্ত্বে মানুষের চিন্তা, ভাব ও প্রজ্ঞা যদি আড়াল হয়ে থাকে ভাবান্দোলনের কাজ তাকে প্রশ্ন হিশাবে সামনে হাজির করা। বিশেষ দেশকালপাত্রে ধর্ম যে প্রশ্ন তোলে তার নেকাব বা পর্দা সরিয়ে দেওয়া। সে কারণে ভাবান্দোলনের কাজ ধর্মের বিপরীতে নিজে থেকে হাজির করা নয়, বরং ধর্মতত্ত্বের হাত থেকে মানুষের ধর্মকে মুক্ত করা। বাংলার ভাবান্দোলন সে কারণে কখনই নিজেদের নাস্তিক বা ধর্মবিরোধী বলে ধর্মাত্মক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে খাড়া করবার নীতিগত ও কৌশলগত ভুল করে নি। দ্বিতীয়ত ভাবচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা অবাধে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মের ইতিহাস, ধর্মীয় প্রতীক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন, জনগণের সঙ্গে নাড়ির যোগ কখনই হারাতে চান নি। ধর্মকে কার্ল মার্কস বলেছেন, “সকলে বুঝবার মতো লজিক”। ফলে ধর্মের লজিককেই তাঁরা ধর্মের পর্যালোচনায় ব্যবহার করেছেন, ধর্মবাদীদের সঙ্গে আপোষ করেন নি। জালাল উদ্দীন ঋা একটি গানের কলি এই রকম :

মানুষেতে বিবাদ ঘটে মানুষে মিটায় গোল

মানুষেতেই জ্ঞানবুদ্ধি, মানুষেতেই ভুল

কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোল, মরিসনে আর বিষের জ্বালায়।।

মানুষ দিয়েই মানুষের কাঁটা খোলা, বাংলার ভাবচর্চার শুধু নয়—দর্শন মাত্রেরও স্বভাব এরকম। লড়াই চলছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নয়, বরং তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বের। অর্থাৎ লড়াই চলছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর। কারণ শ্রেণীর লড়াই শুধু বন্দুক হাতে লড়াই নয়—চিন্তার লড়াই। সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম, আল্নার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব, মৃত্যু, মানুষের নীতি ও নৈতিকতা, নারীপুরুষ সম্পর্ক, জীব ও পরম তত্ত্ব—ইত্যাদি বিষয়ে শোষক শ্রেণীকে নিজ শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখতে হলে তত্ত্ব দিতে হয়। সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি বড়ো দিক হচ্ছে অধিপতি শ্রেণীর তত্ত্ব তন্ন তন্ন পর্যালোচনা এবং

তাদের মতাদর্শিক আধিপত্য নস্যাৎ করা। সে কারণে ধর্ম, তত্ত্ব বা চিন্তার সঙ্গে সমন্বয় বা আপোস বাংলার ভাবান্দোলনের বৈশিষ্ট্য নয়, ধারাবাহিক সংগ্রামের বিশেষ মুহূর্ত মাত্র। ফকির লালন শাহ কিম্বা বাংলার বয়াতিদের যে-ধারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে আদরণীয়, সেখানে সমন্বয় বা আপোসের ধারা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অতএব বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ যারা চাইছেন তাঁদের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হোল, আপোস বা সমন্বয় নয়, কঠোর পর্যালোচনা। এটাই বিপ্লবী ভাষা, ভাব সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিকাশের প্রধান শর্ত।

বাউল বা বয়াতি মাত্রই প্রগতিশীল বা গণভাবুক, এই বদান্যতা ভয়ানক বিপজ্জনক। এই ধারা ‘গ্রামীণ’ সংস্কৃতির ধারা, এই ধারণাও ভুল। কৃষক, কারিগর, কামার, কুমার ও অপরাপর নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেণী বিভাজন আছে। অতএব কোন্‌ শ্রেণীর মধ্য থেকে ভাবান্দোলনের কোন ধারাটি গড়ে উঠছে, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার মানে হোল, বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতিটি ধারাই প্রগতিশীল—এই ধারণার কোন যুক্তি নাই। কারণ বাউল বা বাউলিয়ানার নামে বিকৃতির চর্চাও সমাজে আছে। সমাজে নানান শ্রেণী আছে, তাদের জীবনযাপন আলদা অতএব চিন্তার মধ্যে বিভিন্মতা আছে। লালনের গান উঠে এসেছে কৃষকদের মধ্য থেকে নয়, বরং কারিগরদের মধ্য থেকে। তিনি বাস করেছেন তাঁতীদের মধ্যে। তাঁতীরাই তাঁর প্রধান সমর্থক ছিল এবং কৃষকদের তুলনায় তাঁর কথা গ্রহণ করার অর্থনৈতিক শর্ত তাদের মধ্যেই অধিক ছিল। গ্রামীণ বাংলার কৃষক ও কৃষি তাঁর ভাব ও চিন্তা পরিগঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে হাজির, সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে কুমারখালি তাঁর জীবদ্দশায় বেশ বড়ো শহর। নাগরিকতার ছাপ তখন কুমারখালি ও তার আশে পাশে পড়তে শুরু করেছে। তার মানে হোল বিপ্লবী ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচারের পদ্ধতির দিক থেকে ভাবান্দোলনের প্রতিটি ধারার স্বাধীন পর্যালোচনা জরুরি। ফকির লালন শাহকেও এই পর্যালোচনা থেকে বাদ দিয়ে অতি ভক্তি প্রদর্শন রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক বিপদের কারণ হতে পারে।

অভিজাত, উচ্চবর্ণ ও ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের লড়বার ধরন সম্পর্কে নানা কারণে আমাদের মধ্যে কিছু ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে। যেমন, যদি ‘বিপ্লবী’ কথাবার্তা না থাকে, ‘সমাজতন্ত্র’ না থাকে, ‘সাম্যবাদ’ না থাকে, ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের ক্রোধ ও হিংসা না থাকে তাহলে সেই গানকে গরিবের গান বা নির্যাতিতের পক্ষের গান বলে আমরা মনে করি না। দেখা যায় গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর জন্য মধ্যবিস্তদের মধ্য থেকে প্রগতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তির ‘শ্রেণী সচেতন’ গান রচনা করেন। সেই ধরনের শ্লোগানসর্বস্ব গান গরিবের গান বা প্রগতিবাদী গান বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই ধরনের গানের প্রচারমূলক ভূমিকা আছে, অবশ্যই। শিক্ষিত মধ্যবিস্ত শ্রেণী নিজের শ্রেণীর জায়গায় দাঁড়িয়ে যে-সকল বিষয়কে সংস্কৃতির

লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করে সেই সকল বিষয়ই গরিবদের বিষয় হওয়া উচিত বলে ধরে নেয়। সে কারণে তাদের কাছে সাধকদের গান ‘আধ্যাত্মিক’ গান বলে মনে হয়। একে তারা ‘মরমিবাদ’ বলে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে বাংলার ভাবান্দোলন বা ফকির লালন শাহের ভাব, চিন্তা ও জীবনচর্চার বস্তুবাদী ভিত্তি নজরে পড়বে না। বাংলার ভাবান্দোলনের মতাদর্শিক সংগ্রামের ধরন আর মধ্যবিস্তের প্রচারমূলক গানের পার্থক্য মনে রাখতে হবে। ফকির লালন শাহ এই কারণেই বিপ্লবী যে তিনি ‘মরমিয়াবাদ’ বা ‘আধ্যাত্মিকতা’-কে তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা অসম্ভব করে তুলেছেন। অথচ মধ্যবিস্তের ধারণা লালন আধ্যাত্মবাদী বা মরমিয়া। এই ধারণা দ্রুত ত্যাগ করা দরকার।

বাংলার ভাবান্দোলন আভিজাত্য, বংশমর্যাদা জাতপাত ও রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছে। লালন সেই ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠেছেন। তাঁর অনেক গানে খুবই পরিস্কারভাবে জাত-বর্ণ-বংশের বিরুদ্ধে কথা আছে। ‘জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা’ বা ‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/লালন কয় জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে’—এই রকম আরো গান আছে তাঁর। কিন্তু গান ছাড়াও আভিজাত্য রক্ত বংশ জাত বর্ণের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের আরো একটি অসাধারণ দিক আছে। তিনি কখনোই নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন নি। এখন ছেঁউড়িয়ায় যেখানে তাঁর মাজার তাঁর আসল জন্মস্থান সেটা নয়। এখানে তিনি মলম শাহ ও তাঁর স্ত্রী মতিজান বিবির কাছে প্রতিপালিত হন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত অবস্থায় কালীগঙ্গা নদীতে তিনি ভেসে এসেছিলেন। সেখান থেকে ঐদের সেবা শুশ্রূষা পেয়ে লালন সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং মলম শাহ আর মতিজান বিবির কাছে থেকে যান। অথচ কোনদিনই লালন নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন নি। মানুষের আসল পরিচয় তার জন্মসূত্রে বা রক্তসূত্রে নয় এই সত্য তিনি তাঁর নিজের জীবনেই যেন প্রমাণ করে গেছেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখার মধ্যেও লালনের এক গভীর দূরদর্শিতা কাজ করেছে। বংশ, রক্তের সম্পর্ক, বর্ণ বা জাতের চিহ্ন নিজের জীবন থেকে দূরে রাখতে, অচিহ্নিত করতে বা মুছে ফেলতে চেয়েছেন তিনি। মানুষকে বিচার করতে হবে তার নিজের অর্জন দিয়ে। লালন কে সেটা লালনের জীবন, তাঁর কর্মকাণ্ড, তাঁর গান ও তাঁর জীবনচ্যার দিয়েই সেটা বুঝতে হবে, লালনের বংশবৃত্তান্ত দিয়ে নয়।

বাংলার সাধকদের গান সাধারণ গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীই বেশি গেয়ে থাকেন। গরিবের গান মানে গরিবদের জন্য গান নয়, সকল মানুষের জন্য গান। গরিব বা খেটে খাওয়া শ্রেণীর চিন্তা তখনই বিপ্লবী যখন সে চিন্তা সকল শ্রেণীর মুক্তির শর্ত হয়ে ওঠে। তখন খেটে খাওয়া শ্রেণী সমাজের সকলের পক্ষে কথা বলতে পারে। একটি বিশেষ শ্রেণীর কথা তখন সকলের কথা হয়ে ওঠে। বাংলার সাধকরা যখনই গরিবের জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলের জন্য কথা বলতে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁরা চিন্তা বা ভাবের দিক থেকে খুব গভীরে চলে গেছেন। তাঁরা গরিবদের জন্য গান লেখেন নি—লিখেছেন সকলের জন্য। উপরি উপরি কোন প্রশ্ন তোলেন নি, এমনকি কোন প্রশ্নের দায়সারা উত্তর

দেবারও চেষ্টা করেন নি। ‘বিপ্লব’, ‘সমাজ বদল’ সম্পর্কে ফাঁকা বুলি আওড়ান নি। অথচ যে গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে চেয়েছেন তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে অপরিসীম।

বাংলার ভাবান্দোলন ‘মানবতাবাদী’ আন্দোলন নয়। মানবতাবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর দর্শন, বিপ্লবী দর্শন নয়। বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষকে তার প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাবি করে ‘মানুষ’ বা ‘মানব’ মাত্রই স্বাধীন—ব্যক্তিত্বই ইতিহাসের চরম পরিণতি। এই দর্শন বলাবাহুল্য বাংলার ভাবান্দোলনের দর্শন নয়। যদি তাই হতো তাহলে নিশ্চয়ই লালন গাইতেন না ‘ভাব জানি নে প্রেম জানি নে/ দাসী হতে চাই চরণে’। যদি ব্যক্তি স্বাধীনতাই বাংলার ভাবান্দোলনের মুখ্য উপজীব্য হতো তাহলে গুরুদাসী হওয়া নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না।

বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির মুখ্য বিষয় সম্পর্ক—অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক এমন ভাবে নির্ণয় করা যাতে প্রকৃতির বিকাশ ও মানুষের বিকাশ সমার্থক হয়ে ওঠে। তাহলে বিপ্লবের কারবার ‘মানব’ বা ‘মানুষ’ নামক কোন বিমূর্ত সত্তা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিচার ও তার বৈপ্লবিক রূপান্তর। বাংলার ভাবান্দোলন গুরুর চরণে ‘দাসী’ হতে যখন চায় তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের অপরিচিত এক সম্পর্কের সামনে এসে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি। যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিচার আমাদের বিবেচনায় মুখ্য হবে তখন বাংলার ভাবান্দোলনের ‘দাসী’-র সম্পর্কও পরিচ্ছন্ন হবে। গুরুর দাসত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে সার্বভৌম নয় বরং ‘অপর’-কে সার্বভৌম জ্ঞান করবার ভাবগত ও রাজনৈতিক দিক আমরা বুঝব। বিপ্লবের দাসত্বও অপরের প্রতি, বিপ্লবীর দায় অন্যের প্রতি—নিজের প্রতি নয়। ফলে বিপ্লবের জন্য নিজেকে ত্যাগ করতে বিপ্লবী সবসময়ই প্রস্তুত থাকে। লালন যখন বলেন, ‘সহজ মানুষ ভজ্ঞে দেখনারে মন দিব্য জ্ঞানে’—তখন তিনি মানুষ ভজন্যের কথা বলে আসলে সেই সম্পর্কের বিচারে প্রবেশের প্রস্তাবই করেন। বাংলার ভাবান্দোলনের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে প্রচুর পাঠ ও গবেষণার কাজ বাকি আছে।

রক্ত বংশ জাত বর্ণ আভিজাত্য মানুষের পরিচয় নয়, এটা স্পষ্ট। বুর্জোয়া শ্রেণীও এটা স্বীকার করে। কিন্তু রক্ত বংশ জাত বর্ণ ও আভিজাত্যের জায়গায় তারা প্রতিস্থাপন করে অর্থনৈতিক বিভাজন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা পরমের জন্য জীবের জীবনচর্যার জায়গায় তারা প্রতিস্থাপন করে ব্যক্তির রাষ্ট্রসে বিকার — তাত্ত্বিক তালে সেই ভোগবাদী ইচ্ছা যা কখনই পরিতৃপ্ত হবার নয়। সমাজে এক এবং অনেকের সম্পর্কের জায়গায় কিছু লোকের ভোগ, ইচ্ছা ও সংকল্প হয়ে ওঠে সকলের জীবন-জীবিকার নির্ধারণক। বলাবাহুল্য বাংলার ভাবান্দোলনের সঙ্গে বুর্জোয়া ‘মানবতাবাদ’র বিরোধটা অতএব মৌলিক হতেই বাধ্য।

বুর্জোয়া ‘সাম্য’ স্ববিরোধী। রাষ্ট্রের চোখে সকল মানুষ সমান অথচ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ধনী/নির্ধন, পুঁজিপতি/মজুর ইত্যাদি বিভাজন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে থেকেই যায়। এই স্ববিরোধিতা মনে রাখলে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে বাংলার ভাবান্দোলনের মৌলিক ফারাক সহজেই ধরা পড়ে। ‘সাম্য’ কথাটাই অর্থহীন, স্ববিরোধী ও ভাবের দিক থেকে অপরিচ্ছন্ন। কারণ জীব রূপে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগত ভাবে বিভিন্ন। বিচিত্র। প্রতিটি মানুষেরই সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বা বস্তুগত অবস্থান আছে, প্রকৃতি এই অর্থে অসম বলেই ওর বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য, ওর মধ্যে চলমান গতি বা চলিষ্ণুতা। আর এর পরম রূপে তো কোন ‘অনেক’ নাই, সকলই ‘এক’—সকলই একেরই প্রকাশ। যে জীব এই ‘এক’-কে বোঝে, জানে ও আশ্বাদন করে তার কাছে সাম্যই কি আর অসাম্যই বা কি? তাছাড়া রাষ্ট্র তো টিকে থাকতে পারে ততদিন যতোদিন মানুষের মধ্যে ‘আমি’ থাকে, ‘আমি’-ই তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ গঠনের গোড়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে এই ‘আমি’ নৈর্ব্যক্তিক রূপ নেয়। যখন এই সম্পত্তি ‘আমার’ বলে দাবি করা হয় তখন ‘আমি’ ব্যাপারটি আর্থ-সামাজিক রূপ লাভ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই ‘আমি’ কিম্বা ‘আমি’-ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্য দিয়েই হাজির থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্রই ‘আমি’-র নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতি। বাংলার ভাবান্দোলন আত্মতত্ত্ব নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলে আসছে তাকে তাহলে অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্বের দিক থেকেও বিচার করা দরকার।

বাংলার ভাবান্দোলনের ভাষা এরকম: যতোদিন মানুষ ‘ফকির’ না হয় এবং বাইরের শাসন বিধিবিধান থানাপুলিশকে বাইরে বিলোপ করে দিয়ে নিজের মনের মধ্যে না বসায় ততোদিন তো কলি যুগ। আইয়ামে জাহেলিয়া। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে নিজে ফিরে পায়, নিজের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে নীতিনৈতিকতা বিবেকও তার ফিরে আসবে। তার মানে বাইরের পুলিশ আর লাগবে না, মনের পুলিশই মানুষকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করবে। তাহলে মানুষের মনের চিন্তার ভাবের বিকাশ মানে বাইরের পুলিশেয়াদা আইন-আদালতের বিলুপ্তি। আজ হোক কাল হোক রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরা। বাংলার ভাবান্দোলনের এই রাজনৈতিক কর্মসূচী বাংলার ভাবুক নিজের ভাবে রাষ্ট্রের আগে কায়ম করে। নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই ও রূহের মুক্তি তার কাছে প্রথম ও প্রধান রাজনৈতিক সংগ্রাম। এখানেই প্রথাগত বিপ্লবীর সঙ্গে তার ফারাক। সমাজকে ফকিরী পথে নেবার আগে নিজে ফকির হতে হয়। আপনি আচারি ধর্ম পরকে শেখাও—এটাই বাংলার ভাবান্দোলনের রাজনীতি চর্চার নীতি। যে পথে গেলে রাষ্ট্র থাকে না, রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে, সেই পথে যাও। একদিকে ‘রাষ্ট্র’, সংবিধান, থানা-পুলিশ-মিলিটারী-আমলাতন্ত্র ইত্যাদি আর অন্যদিকে মানবতাবাদ, মানুষে মানুষে সমান ঘোষণা, সাম্য, সাম্যবাদ ইত্যাদি বুজঝুঝু। যদি মানুষের সঙ্গে ভেদ নাই থাকে তাহলে রাষ্ট্র থাকে কী করে? রাষ্ট্র থাকা মানেই তো ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য বহাল থাকা।

একারণে বাংলার ভাবান্দোলন কখনই মনে করে না জ্ঞানী আর অজ্ঞানী সমান। জীব রূপে তারা সমান, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া আহার বাসস্থানের প্রয়োজন সকল জীব

যেমন তাদেরও তেমন। সেই ক্ষেত্রে গুরুছাগল যা, মানুষও তাই। বাংলার ভাবান্দোলনের কাছে শুধু মানুষ নয়, সকল জীবই ‘সমান’। সেই ক্ষেত্রে সাধু বা জ্ঞানীর কাজ হচ্ছে জীবে দয়া। প্রয়োজনে নিজের জৈবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ত্যাগ স্বীকার করে জীবের সেবা করা। কারণ জীবের সেই পরমার্থিক প্রজ্ঞা নাই। জীব ক্ষুধার্তকে নিজের থালা থেকে খাওয়া তুলে দিতে পারে না। কারণ তার জৈবিক ক্ষুধার প্রবৃত্তি থেকে তার ‘মানুষ’ আলাদা নয়। অর্থাৎ তার মধ্যে পরমজ্ঞান নাই, কিম্বা প্রকৃতিগত ভাবেই পরমজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। তাই পরমার্থিক বিচারে ‘জীব’ আর ‘মানুষ’ এক হতে পারে না। অতএব সাধু আর অসাধু কখনও এক সমান নয়। তারা জৈবিক বৈশিষ্ট্যে একরকম হতে পারে। অর্থাৎ তারা দেখতে মানুষের মতো হতে পারে, কিন্তু তারা সমান না। নিজের আমিত্ব ত্যাগ করে যিনি পরমের আশ্বাদন নেবার জন্য আপন জীব-জীবনকে ‘উপায়’ হিশাবে ব্যবহার করছেন তাঁর সঙ্গে আশপাশের মানুষ এক হতে পারে না।

বাংলার ভাবান্দোলনের দিক থেকে বস্তুবাদ ও ভাববাদ বিচার করবার কাজও আমাদের বাকি। বস্তুবাদ নামে যেটা আমাদের কাছে প্রচলিত বা পরিচিত সেই চিন্তার ধারাটা এই রকম যে মানুষের অস্তিত্বকে আগাম “আছে” ধরে নিয়ে মানুষের বাইরে অস্তিত্বমান জগতের বিচার আমরা করতে বসি এবং বস্তুর বস্তুময়তাকে বস্তুর নিজস্ব গুণ হিসাবে ধরে নাই। বস্তুকে ‘আছে’ বলে নির্ণয় করি। অথচ বস্তুকে আছে বলে তার যে গুণ নির্ণয় করি সেই গুণের নাম নির্ণয় বা স্বভাব বিচার একমাত্র মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। সেই হিসাবে বস্তুর এইসকল গুণারোপ তো মানুষের দেওয়া, মানুষেরই আরোপিত। অথচ যে-মানুষ বস্তুকে বস্তু বলে জানছে, বিচার করছে বা পরখ করছে সেই সক্রিয় সত্তা সবসময়ই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। বাংলার সাধকরা জানতেন এটা ভুল পদ্ধতি। এটা অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা। কারণ যে জানছে বা যে জানে তাকে তার বস্তুময় সত্তাসহ বুঝতে হবে। বস্তুজগত মানুষের বাইরে ‘আছে’ ধরে নিয়ে একই ভাবে গাছ বা পাথরের মতো মানুষও আছে এই ভাবে ‘মানুষ’ নামক সত্তার কোন বিচার বিবেচনা চলে না। এই পথে ‘মানুষ’কে পাওয়া যাবে না। ‘মানুষ’ অন্বেষণের পথ ভিন্ন। ‘মানুষ’-কে অন্বেষণ, মানুষকে জানা মানুষকে বোঝা বাংলার সাধনার প্রধান অঙ্গ ঠিকই, কিন্তু খেয়াল করতে হবে ‘মানুষ’ বলতে আমরা যা বুঝি বাংলার ভাবান্দোলন তা বোঝে না।

বিজ্ঞানীও মানুষকে কাটাছেঁড়া করে, ডাক্তারি বিদ্যা ফলিয়ে মানুষকে জানে বলে দাবি করে। পাথর ভেঙে পাথরের কণা দেখিয়ে যদি কেউ বলে এই কণা দিয়েই পাথর তৈরি সেই রকম মানুষের গঠন উপাদান দিয়ে মানুষ কী, তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে বিজ্ঞানী। কিন্তু বিজ্ঞানীর মধ্যে যে সত্তা এইসকল জানছে বলে ভাবছে সে কে? সে কোথেকে এলো? তার ধর্ম বা স্বভাবটাই বা কী? তাকে না জানলে এই রকম এক পোশে জানা তো এক ধরনের বিকৃতি, এক প্রকার অবিদ্যা। বাংলার সাধকদের ‘মানুষ’ অন্বেষণ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ থেকে সেই কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

যদি মানুষকে না জেনে আমরা বস্তু ‘আছে’ বলি তাহলে আমরা পরাবিদ্যার (metaphysic) ফাঁপরে পড়ি। আসলে যে ধারাকে ‘বস্তুবাদ’ বলে আমরা জানি, সেটা এক ধরনের অসম্পূর্ণ পরাবিদ্যা। এক ধরনের আধ্যাত্মিক কায়দায় আমরা বস্তুর অস্তিত্ব মানছি। যেমন করে স্রেফ বিশ্বাসের জোরে আল্লার অস্তিত্ব মানি। ঠিক তেমনি বস্তুকেও ‘আছে’ বলে বিশ্বাস করি। কে কিভাবে কেমন করে ‘আছে’ বা ‘আছি’ বলতে সক্ষম তার হৃদিশ না নিলে আমরা জগত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। ফকির লালন শাহ যে ভাব বা দর্শনের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন সেটা কোন আধ্যাত্মবাদী বা পরাবিদ্যামূলক ধারা নয়। তাঁর সাধনা ছিল ‘মানুষ’ নামক সত্তা তার হৃদিশ জানা। কিন্তু মানুষকে বিচ্ছিন্ন বা একাকি সত্তা হিশাবে নয়, কিম্বা শুধু সামাজিক সত্তা হিশাবেও নয়—সমাজ ও প্রকৃতির নানান সম্পর্কের সেতু হিশাবে বোঝা। বাংলার ভাবান্দোলন ‘বস্তু’—কে কিভাবে বুঝেছে সেটা তাহলে আমাদের জানা দরকার। লালন আধ্যাত্মবাদ বা পরাবিদ্যা পরিহারে লড়াই করেছেন, সেই কারণে বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনে তাঁর চিন্তার সঙ্গে পরিচিতি আমাদের জন্য জরুরি।

‘মানুষ’কে জানতে গিয়ে দুটো পথ বাংলার সাধকরা সাধারণত পরিহার করে এসেছেন। বিজ্ঞানী তার সামনে হাজির জিনিসের ওপর নিজের ইচ্ছার আধিপত্য খাটিয়ে তাকে ভেঙ্গেচুরে যে পদ্ধতিতে জানে সেই পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞেয় বস্তুর ওপর দখল কায়মের চর্চা, জ্ঞানচর্চা নয়। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের পথ এটা। যার একটা পরিণতি প্রকৃতির ওপর দখল কায়ম বা মালিকানা প্রতিষ্ঠা। মানুষের আগ্রাসন, দখলদারি স্বভাব এবং স্বার্থবুদ্ধির জয়জয়কার সেখানে। আজ আমরা দেখছি বিজ্ঞান মানে বহুজাতিক কোম্পানীর বিজ্ঞান কিম্বা যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের পক্ষের বিজ্ঞান। এই আগ্রাসী পথ বাংলা গ্রহণ করে নি।

দ্বিতীয় যে পথ সাধকরা পরিহার করেছেন সেই দিক অনুধাবন করা খুবই জরুরি। ‘মানুষ’ নামক কোন সামান্য (universal) ধারণা বুদ্ধিতে বেঁধে নিয়ে তার সংজ্ঞা তাঁরা অনুসন্ধান করেন নি। ধঁরা যাক ‘মানুষ’ নামক সামান্য ধারণার বিশেষ রূপ হচ্ছে রাম রহিম যদু মধু প্রভৃতি। এই সকল বিরাজমান বিশেষের যে সাধারণ গুণ বা ধর্ম সে সম্পর্কে একটা বিমূর্ত ধারণা বা সংজ্ঞা নির্মাণ করে ‘মানুষ’ বোঝার চেষ্টা তাঁরা পরিহার করেছেন। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ধারা বা humanism এই পথ ধরেই এগিয়েছে যার গোড়া গ্রীক দর্শনের মধ্যে প্রোথিত। মানুষের মানবিক হয়ে ওঠা আর মানবতাবাদ সমার্থক নয়।

বাংলার সাধক জানতেন যাকে তাঁরা খুঁজছেন তিনি অধরা। তাঁকে ধরা যায় না। এই অধরা কিন্তু সামান্য (universal) নয়। কারণ সে এক এবং অদ্বিতীয়। অতএব

সামান্য ও বিশেষের সম্পর্ক বিচার করা, তাদের ভেদ পরিচ্ছন্ন করা অবিদ্যা থেকে মুক্তির জন্য জরুরি। কিন্তু তাতে তাকে জানা যাবে না, ধরা তো দূরের কথা। অথচ সে আছে, একই সঙ্গে সামান্য ও বিশেষ হয়ে। তাকে ধরতে হবে, বা ধরতে জানতে হবে। কী দিয়ে ধরব? কেমন করে ধরব? ধরতে হবে রক্তমাংসের মানুষ দিয়ে, নিজেকে দিয়ে। জীবরূপী মানুষের দেহ দিয়েই। বাংলার ভাবান্দোলনের কাছে ভাব আর দেহ এ কারণে বারবারই একাকার হয়ে যায়। বাংলার ভাবান্দোলনকে সেই কারণে দেহাত্মবাদী বলা যেমন মূর্থতার লক্ষণ, তেমনি ভাববাদী বলাও সমান আহাম্মকি।

কেন মানুষ দিয়েই মানুষ ধরতে হবে? কেন ‘বিশেষ’ দিয়ে ‘সামান্য’-কে? কারণ যার মধ্যে, যে ‘আছে’-র মধ্যে এই অধরার ভাব জাগে সে তো এই রক্তমাংসেরই মানুষ। এই রক্তমাংসের মানুষ বিশেষ দেশে এবং কালে আছে। এই অর্থে এই মানুষ আছে, আমি নিজে আছি। ‘বিশেষ’ মানুষ বিশেষ ভাবে আছে। কিন্তু ‘সামান্য’ বা অধরা তো দেশ কাল পাত্র থাকে না। কিন্তু নিজেকে দেশকালপাত্রগুণ সম্পন্ন মানুষের মধ্য দিয়ে জানান দিয়ে যায়। তাহলে মানুষের শরীরের মধ্যেই অধরাকে ধরবার কলকল্লা রয়েছে। যদি ‘মানুষ’ নামক অধরাকে ধরতে চাই তাহলে রক্তমাংসের শরীরকে ধরবার শিক্ষা দিতে হবে। শরীর সাধন করতে হবে, শরীরের বিশেষ চর্চা ছাড়া সেই অধরাকে ধরা যাবে না। কারণ শেষাবধি মূল কথা হোল দেশকালপাত্রের অতীত যে অধরা তার প্রকাশ দেশকালপাত্রগুণ সম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়েই ঘটবে। সামান্য এবং বিশেষ নিজ স্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষের মধ্য দিয়েই আবির্ভূত হবে। সাধকদের কায়-সাধনার বা দেহতাত্ত্বিক চর্চার দার্শনিক যৌক্তিকতা কিছুটা এখান থেকে বোঝা যাবে। বাংলার ভাবান্দোলনের এই বস্তুবাদী তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

এরপর আছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। মৃত্যু। মৃত্যু একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক অবিদ্যা, পরকাল, পরলোকের ধারণা ইত্যাদির দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয় এই কারণে যে মানুষ নিজের বিলয়কে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারে না। বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির এটা একদমই গোড়ার জায়গা। এই দিকটার মীমাংসার ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনে বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা। মৃত্যুর সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির মোকাবিলা অবশ্যই জরুরী। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তার অর্থ নিজের অনিবার্য বিলয়ের মুখোমুখি হবার সাহস ও দৃঢ়তা। মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।

বাংলার ভাবান্দোলনের মতাদর্শিক সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্যকে যদি এককথায় আমরা প্রকাশ করি, তাহলে সেটা হচ্ছে মৃত্যুকে সাংস্কৃতিক ভাবে মোকাবিলার নীতি

ও কৌশল আবিষ্কার ও চর্চা। কারণ মানুষ যে মরবে এই সত্যের সামনে সকলকেই নতজানু হয়ে উঠতে হয়। সদাই মৃত্যুর সম্মুখস্থ যে মানুষ তাকে নিয়েই বাংলার ভাবান্দোলনের কারবার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার ভাবান্দোলনে এই মানুষ তাই নিজেকে প্রশ্ন করে :

হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে নিল কালে
আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে।।

মানবদলেরই আশায়
কতো দেবদেবতা ব্যঙ্কিত হয়
হেন জনম দীন দয়াময়
দিয়েছে কোন ফলে ।।

কত কোটি লক্ষ যোনি
ভ্রমণ করেছে তুমি
মানবকূলে মনরে তুমি
এসে কী করিলে ।।

ভুলনায়ে মন রসনা
সমঝে করে কর বেচাকেনা
লালন বলে কূল পাবানা
এবার ঠকে গেলে।।

কতো বস্তুর রূপান্তর কতো প্রাকৃতিক ইতিহাস পেরিয়ে এসে প্রকৃতি সমভাবে কর্তা, প্রক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে মানুষ রূপে হাজির হয়। সেই মনুষ্যরূপ নিয়ে আমরা জীব-জীবনে কি করেছি? কী করলাম! এই হিসাব তো আমাকে এই ইহলোকে ‘সাধুসঙ্গে’ সাধকদের দরবারে অবশ্যই দিয়ে যেতে হবে। পরকালে নয়। তাঁরাই বিচার করবেন আমার জীবের জীবন ছিল নাকি আমার জীব ও পরমের লড়াইয়ে আমি পরমের পক্ষে থেকেছি, লড়েছি। যা পেরেছি তাইতো আমার জীবজীবনের কীর্তি, মনুষ্য জীবনের অর্জন। কারণ এরপর তো মনুষ্যরূপ নিয়ে আমার আর আসা হবে না। কারণ – ‘আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে’।

কথাতি হচ্ছে ‘সাধুর মেল’ (সাধুর মিল নয়)। “সাধুর মেল” বাংলার ভাবান্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। সাধুরা সাধকদের পরস্পরের কর্ম বিচার করবার জন্য সাধুসঙ্গে যে বিশেষ ভাবে আসন নিসে বসেন—সেই ‘মেল’ বা মেলবন্ধন সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এই ‘সাধুসঙ্গে’ বসতে পারা—ইহলোকেই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুর সীমান্তে সাধকদের সঙ্গে বাংলার সাধনার ধারায় নিজের কাজের বিচার করতে পারা—এই জনম কি আমি আর পাবো?

আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে। এইখানে, নশ্বর জীবের মৃত্যুর সামনে কাতর অভিক্ষেপ নয় এই কালাম। বরং নশ্বরতার বিপরীতে অবিদ্যার ‘সহজ মানুষ’ – প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদরেখা যেখানে নাই কিন্তু আছে—মানুষ আর প্রকৃতি যেখানে এসে ইতিহাস নাম নিয়ে একাকার—সেই চিহ্নেই বাংলার ভাবান্দোলনের বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইশারা। আমরা এখনো পাঠ করে উঠতে পারি নি। পাঠ করতে শিখি নি। এই আকুতিটুকু যতো তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ততোই বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে এবং সারা বিশ্বে নতুন ভাষা ও ভাবের কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে যাব। মানুষ যা এখনো হয় নি, কিন্তু হতে পারে সেই খবর সকলকে পৌঁছাতে পারব কি আমরা? এখনকার কাজগুলো কি শনাক্ত করতে পারব? বাংলাভাষাকে দুনিয়ার ভাবজগতের আবাসে পরিণত করতে পারব।

সেটা বাংলায়, বাংলাদেশে খুবই সম্ভব। তার শর্ত পরিণত করে তোলাই আমাদের এখনকার কাজ।

দয়াল নবীর দয়া হলে দেখবে লীলা কি চমৎকার

শেখ রাজ্জাক কোন আধুনিক কবি নন, তাঁকে বাংলাদেশের কবিরা কোন ভাবেই চেনেন না। অবশ্য তার ব্যতিক্রম হয়তো থাকতেও পারে। বাংলাদেশে কাব্যচর্চার ধারা ও ইতিহাসে শেখ রাজ্জাকের মতো গ্রামীণ পদকর্তার স্থান নাই। তাঁর মতো বহু গ্রামীণ পদকর্তা আছেন বাংলাদেশে, যারা গান রচনা করে, গান গেয়ে, শহরের সংস্কৃতি ও তার দাপটের বাইরে খুবই অলক্ষ্যে একটা অসাধারণ শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি করে চলেছেন সেই বহুকাল ধরে।

শেখ রাজ্জাকের সঙ্গে লালনের সঙ্গে তো আলবৎ এমনকি জালালউদ্দিনেরও পার্থক্য আছে। শেখ রাজ্জাকের মতো জালালউদ্দিন অপরিচিত নন, জালালউদ্দিন খাঁর একটা খ্যাতি আছে। যারা গ্রামে গ্রামে গান করে বেড়ান, তথাকথিত ‘আধ্যাত্মিক’ বা মরমী সাধনার পেছনে ছোটেন, সেই গ্রাম্য বাউলদের কাছে জালালউদ্দিন খুবই চেনা নাম। মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতে জালালউদ্দিনের কোন ঠাই না হলেও জালালউদ্দিন তাঁর ক্ষেত্রে খ্যাত। শেখ রাজ্জাকও হয়তো হবেন একসময়। কিন্তু শেখ রাজ্জাক এখনো এতোই অপরিচিত যে তাঁর খুব কম গানই বাউলদের মুখে শোনা যায়। তবে তাঁকে যতোটা চিনেছি তাঁর একটি গান চিনেছি তার চেয়েও গভীরভাবে। গানটি শুনেই খোঁজ নিয়ে পদকর্তার নাম জেনেছি। শেখ রাজ্জাক নামে একজন কবি এটি রচনা করেছেন, সেই খবর পেয়েছি। শুনেছি তিনি মানিকগঞ্জের একজন কবি। এর বেশি আপাতত কোন তথ্য আমার নাই। সেই হিসাবে পরিচিতির দিক থেকে শেখ রাজ্জাক কম পরিচিত এবং অখ্যাত।

এই অখ্যাতি এবং অপরিচয়টাই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই দিক থেকে দারুণ অর্থবহ। যে একটিমাত্র গানের কথা উল্লেখ করেছি, সেই গানটি নিয়েই আমরা এখানে আলোচনা করব। গ্রামে, শহরের মধ্যবিত্ত

সংস্কৃতির দাপটের বাইরে, সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সকল গান লিখা হয় এই গানটি হচ্ছে সেই রকমই একটি গান, একটি কবিতা। সত্যিকারের বাংলা কবিতার বিবর্তনটা কীভাবে ঘটেছে, কী ধরনের বিষয় নিয়ে লিখা হচ্ছে সেই সব কবিতা, তার একটা স্বাদ এখানে মিলবে। পাশাপাশি মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর তথাকথিত ‘আধুনিকতা’ বা ‘আধুনিক কবিতার’ সঙ্গেও তার একটা তুলনা চোখে পড়বে।

গান আর কবিতার ফারাক

শেখ রাজ্জাকের গান বা কবিতাটি এখানে উল্লেখের আগে একটি কথা শুধু ধরিয়ে দিতে চাইছি। সেটা হোল, গান এবং কবিতার মধ্যে যে পার্থক্য এখন আমরা করি, সেটা ঐতিহাসিক, শাস্ত্রত নয়। কবিতার বিবর্তন ঘটেছে গান থেকে। পৃথিবীতে আদিতে কোন ছাপাখানা ছিল না যেখানে কবিরা পদ্য লিখে ছাপাত এবং আবৃত্তিকাররা সেই মুদ্রিত কাগজ চোখের সামনে তুলে ধরে চোখের ভাষাকে গলার শব্দে অনুবাদ করত। কানে শোনা পদ্য থেকে চোখে পড়া কবিতা একটা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠেছে। সেই ইতিহাস এখানে আলোচনা করব না। তার যেমন একটা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আছে তেমনি আমাদের নান্দনিকতারও একটা ইতিহাস আছে। কবিতাকে এখন বোঝার জন্য বেশি জরুরি। মাধ্যমের বিবর্তনগুলো বোঝা এবং তার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অভ্যাসের যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে সেই বদলের ইতিহাসটাও বোঝা। কিন্তু এখনই এখানে সেই আলোচনা করা আমাদের খেয়াল নয়। আমাদের শুধু এতোটুকু মনে রাখলেই চলবে যে গলায় যা উচ্চারিত হয় এবং কানে যা আমরা শুনি সেটা যেমন কবিতা, তেমনি কলমে লিখে বা ছাপাখানায় ছেপে আর চোখে পড়ে বা দেখে আবৃত্তি করবার যে কবিতা সেটাও কবিতা। কানে শুনে কাব্যস্বাদ উপভোগের সঙ্গে চোখে দেখে কবিতা পড়ার স্বাদের তফাত আছে অবশ্যই, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

গানকে একই সঙ্গে কবিতা দাবি করছি। এটা আবেগের বশে নয়, ভুল করে তো নয়ই। আমাদের অনেকের ধারণা রূপ তো বটেই—খোদ মর্মের দিক থেকেও গান আর কবিতা আলাদা জিনিস। রূপের পার্থক্য আছে, সেটা ভিন্ন কথা। সম্ভবত ‘আধুনিক কবিতা’ নামক ধারণার আধিপত্যের কারণে কবিতা সম্পর্কে আমরা ঐতিহাসিক ভাবে আর ভাবতে পারি না। কবিতার এখনকার অধিপতি রূপকেই আমরা কবিতার একমাত্র রূপ বলে ভুল করি। কবিতা নিজের এই ইতিহাস মনে রাখতে পারত। কিন্তু তথাকথিত ‘আধুনিক’ কবিতা মূল কাব্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়ে ধরে নেয় যে তাদের চর্চাই কাব্য চর্চা, এর বাইরে কবিতা বা কাব্য নাই। দ্বিতীয়ত নিজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আধুনিক কবিতাকে গান থেকে আলাদা করে নিজেকে দেখাতেই হবে। কারণ আধুনিক কবিরা গান করতে অক্ষম। এখানে হঠাৎ মোরগ আর পাখির একটা উপমা মনে ধরেছে। একটু বলি, তাহলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

পাখি ওড়ে, ওর পাখা আছে, এই ওড়াটাই তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব। মোরগেরও পাখা আছে, কিন্তু মোরগ ওড়ে না, বা উড়তে পারে না। জাতের দিক থেকে দেখলে মোরগকে আমাদের পাখিই বলতে হয়। অথচ তার পাখা থেকেও নাই। এখন মোরগ যদি নিজেকে পাখি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তাকে প্রমাণ করতেই হবে যে না উড়তে পারলেও সে পাখি। ওড়ার ক্ষমতাটাকে সে একেবারেই গৌণ করতে চাইবে। সে বলবে, ‘দেখো আমার পাখা আছে, আমি পাখি। কিন্তু আমি আধুনিক আর পাখিরা হচ্ছে বন্য। পাখিরা মানুষের সঙ্গ পায় নি। অতএব তারা অজ্ঞ, ফলে তারা অনাধুনিক আর পশ্চাদ্গত। আমরা গৃহপালিত। গৃহস্থের খুঁদকুড়ো খাই, ডানা ঝাপটাই আর কবিতা লিখি।

তবুও মোরগ পাখি হয়েও পাখি নয়, মোরগের দুঃখ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু মোরগকে আমাদের নাকচ করে দেবারও কোন কারণ নাই। নানান জাতের পাখির মধ্যে এইটি হচ্ছে একটি মাত্র জাত, গৃহপালিত। গৃহে মাটিতে মানুষের ঘরদোরের মধ্যে থাকতে থাকতে মোরগ ভুলে গেছে যে একদা সে উড়তে পারত। কিন্তু এখন নিজের উট বজায় রাখতে হলে তাকে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করতেই হবে। সেটা হোল, ক্রমাগত সে দাবি করবে—‘আমি হচ্ছি মোরগ, আর ওগুলো হচ্ছে পাখি’। আমি সম্ভ্রানে ‘মোরগ’ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেছি, স্ত্রীলিঙ্গ নয়। কারণ আধুনিক কবিতার লিঙ্গে এখনও পুরুষের চিহ্নই প্রধান।

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও মোরগ-ব্যাপার ঘটেছে। এই কবিতা গান করতে জানে না। অর্থাৎ তার কন্ঠ এবং শ্রুতি খসে গিয়েছে। গৃহপালিত মোরগের ওড়া ভুলে যাওয়ার মতো তার গলা থেকেও আর শব্দ বেরোয় না। সে তখন দাবি করে বেড়ায় সে হচ্ছে কবিতা আর ওগুলো হচ্ছে গান। স্বভাবচ্যুত হয়ে পাখির গৃহপালিত মোরগ হবার ইতিহাস এখন আমরা আর খুঁজে দেখি না। তেমনি স্বভাবচ্যুত হয়ে গান যখন কবিতা হয়ে উঠল তার বিবর্তনটাও আমাদের আর নজরে নাই। গান এবং কবিতার মধ্যে এমন একটা শাস্ত্র ফারাক কামিয়াব হয়েছে যে সহজে তাকে ভাঙ্গা মুশকিল। কবিতা এখন ভাব ধরেছে মোরগের। এই গৃহপালিত ভাব থেকে এখানে আমরা মুক্ত থাকতে চাই। সে কারণে গান এবং কবিতা কিম্বা কবিতা এবং গান এখানে সমার্থক বলে গণ্য হবে। তাদের রূপের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়।

মোরগ যখন তার স্বভাব থেকে চ্যুত তখন একটা বড়ো ক্ষতি হয়েছে। ওড়ার স্বভাব ণা উড্ডয়নশীলতার শৈলীও কবিতা হারিয়েছে। তার মধ্যে বিকাশ ঘটেছে অন্য ধরনের চরিত্রের, ছাপাখানার টেকনলজির আধিপত্য যে স্বভাব তৈরি করে। এই ঐতিহাসিক ণপান্তর ভাল কি মন্দ সেই তর্ক আমরা করবো না। তবে মোরগের উপমাটা সংক্ষেপে অনেক কথা বলবার জন্যই এখানে দেওয়া। আরো একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

কবিতা এবং গানের অঙ্গাদী সম্পর্ক বা কাব্যের মধ্য দিয়ে মানুষের যে স্বভাব ঋতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত সেটা হোল তার ভাব—চিন্তাশীলতা, দার্শনিকতা, ইত্যাদি।

কবিতা আসলে একই সঙ্গে ভাব বা দর্শন। বিষয় হিসাবে কবিতার আগে আলাদা করে কোন দর্শন শাস্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সেটা গবেষণার বিষয়।। অন্যদিকে দর্শনের আদি রূপ হচ্ছে ধর্ম। প্রতিটি ধর্মই হয়তো সে কারণে নিজেকে মন্ত্র বা কবিতার মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছে। কোরান শরিফ বোধহয় তার সবচেয়ে স্পষ্ট একটি উদাহরণ। শুধু তাই নয় কোরান শরিফ যখন নাজিল হয় তখন তাকে প্রমাণ করতে হয়েছে মানুষের রচিত কবিতার চেয়েও এই কাব্য শ্রেষ্ঠ। আল্লা নিজে যা প্রণয়ন করেছেন তা নিশ্চয়ই ইমরুল কায়েস বা সেই সময়কার অন্য যে কোন আরব কবির কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে বাধ্য। কোরান শরিফ নিজেকে সামাজিক ও নান্দনিকভাবে আল্লার কালাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে শ্রেষ্ঠ কবিতাকর্মের দাবি নিয়ে। দৈবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সেটা ছিল জরুরি। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে নান্দনিক শিল্পকর্ম হিসাবে আবেদন সৃষ্টি করতে হয়েছে। অলৌকিক গ্রন্থের সেই ইহলৌকিক ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ধর্ম, দার্শনিকতা আর ভাবুকতার যে শক্তি, কাব্যময়তার যে অন্তর্নিহিত শৌর্য সেটা পরবর্তী কালে অর্জিত মোরগ-স্বভাবের জন্য কবিতা ভুলে গিয়েছে। কবিতা ‘ভাব’ হিসাবে যে অধরাকে আগে ধরে, আগে গ্রেফতার করে – সেই ভাবটাকেই ‘বিষয়’ হিসাবে ব্যাখ্যা অথবা অর্থ প্রদানের চেষ্টা করে দর্শন। সেই ‘ভাব’ বা ‘বিষয়’ যদি আগে থাকতেই কাব্য হয়ে হাজির না হয় তাহলে প্রেফ গদ্য পদ্ধতি, যুক্তি বা বিশ্লেষণের ওপর দর্শন দাঁড়াতে পারে না।

বাংলার ভাবান্দোলনে গান এবং কবিতা সমার্থক ও একাঙ্গ। এই তথ্যটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কবিতা ও দর্শনের স্বভাবগত ঐক্যটাই প্রধান। বলাবাহুল্য গান, কবিতা, ধর্ম এবং দর্শনের যে পার্থক্য আমরা এখন দেখি সেই পার্থক্য একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। ঐক্যের দিকটাকে এখানে প্রধান করে আলোচনা করার মানে তাদের ঐতিহাসিক পার্থক্যটাকে গৌণ ভাবা নয়।। শুধু সেই সত্যের ওপরই আমরা জোর দিচ্ছি যে ঐতিহাসিক পার্থক্যটা শাস্ত্রত কোন পার্থক্য নয়। এখন যে পার্থক্য আমরা দেখছি সেটা চিরকাল এমন ছিল না, ফলে চিরকাল এমন থাকবে না। বাংলা কবিতার বিকাশের জন্য এই উপলব্ধিটা আমাদের এখন খুবই দরকার। যে গানটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাকে অনুসরণ ও অনুধাবন করবার জন্যে গান, কবিতা, ধর্ম এবং দর্শনের স্বভাবগত ঐক্যের কথা খেয়ালে রাখা দরকার। সেই দিকে নজর নিবিষ্ট করবার জন্যই শেখ রাজ্জাকের গানটিকে আমরা নজির গণ্য করেছি।

প্রশ্নের ধারাবাহিকতা

কবিতার ভাবুক রূপগুলোতে, অর্থাৎ শব্দের মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর ছাপাখানার মুদ্রিত হাবিজাবির বাইরে গ্রামের—অর্থাৎ খাঁটি কবিস্বভাবের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হোল ধারাবাহিকতা। কবিতায় যে দার্শনিক প্রশ্ন বা বিষয়ের উত্থাপন ঘটে তার একটা

ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ কোন রচনাই হঠাৎ নয়, বিষয়ের দিক থেকে একটির সঙ্গে অন্যটির ধারাবাহিক যোগসংযোগ স্পষ্ট। এর মানে হোল কোন পদকর্তা কোন প্রশ্ন তুললে সেই প্রশ্ন হারিয়ে যায় না, হারিয়ে যায় নি। প্রশ্নের গোড়া অনেক সময় পরিব্যাপ্ত নাথসম্প্রদায় আর তাত্ত্বিক সাধকদের কালপর্বে, অনেক সময় তার গোড়া খুঁজে পাওয়া যায় সুফি দরবেশদের সময়কালে যখন এদেশে ইসলাম প্রচারিত হচ্ছিল, আবার কখনোবা শাক্ত ও বৈষ্ণবদের উত্থাপিত তর্ক বিতর্ক প্রশ্নাপ্রশ্নের মধ্যে। কিম্বা অনেক সময় কথা ও কাহিনীর শেকড়টা দেখা যায় উঠে আসছে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকে।

যে গানটি এখানে উল্লেখ করবো তার সঙ্গে লালনের গানের একটা সম্পর্ক আছে। আরো অন্যান্য গানের সঙ্গেও তার যোগসাজশ আছে। কিন্তু লালনের গানটি বেশি পরিচিত বলেই সেটা আগে উল্লেখ করবো। লালন একবার একটা দারুণ প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেটা হোল এই রকম :

*নিগূঢ় প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে
কোন প্রেমেতে আল্লা নবী মিশলেন মেরাজে ?*

এই গানটিকে সাধারণত সুফিতন্ত্রের প্রেম বা ‘এশেক’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে উত্থাপিত প্রশ্নের দার্শনিক দিকটাকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। যেহেতু এখানে প্রেমের কথা সরাসরি আছে সে কারণে আক্ষরিকভাবে ধরে নেয়া হয় যে আল্লা ও নবীর প্রেমটাই এই গানের মুখ্য বিষয়। অথচ এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আল্লার সঙ্গে নবীর সম্পর্কটা আসলে কী? কী সম্পর্কের ভিত্তিতে কালাম যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং কালাম যিনি গ্রহণ করেছেন সেই দুইয়ের সাক্ষাৎকার হয়? ঐক্য ঘটে? মেরাজে নবী আল্লার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই ‘মিলন’ নিয়ে এখানে প্রশ্ন নাই। প্রশ্ন হচ্ছে এই ‘মিলন’ কেমন মিলন? তার ভাবগত তাৎপর্য কি? ‘মিলন’টা কিসের ভিত্তিতে ঘটল? কালাম যিনি সৃষ্টি করেন আর কালাম যিনি গ্রহণ করেন তাদের উভয়ের সম্পর্ক বিচার বাংলার ভাবান্দোলনের খুবই গুরুত্ব প্রসঙ্গ। বিচারের বিষয়টা শুধু প্রেম বা ‘এশেক’ নয়, ‘সম্পর্ক’।

মেরাজের ঘটনাটিতে যারা বিশ্বাসী তাঁরা তাঁদের এই সাক্ষাৎকারের প্রেমকাহিনী বোঝেন। কিন্তু এখানে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস খুবই গৌণ একটা ব্যাপার। মেরাজ ঘটেছিল কিনা কিম্বা কিভাবে ঘটেছে সেই তর্ক এখানে তোলা হচ্ছে না। বরং মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ঘটনা তার মনোগঠনের মনোযোগ অধিকার করে আছে তার যে বয়ান সেখানেই এর মূল্য। এখানে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটা বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কেউই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না।

দর্শন দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রশ্ন তুলছে বার বার, সেটা হোল চেতনা ও ভাষার সঙ্গে সম্পর্কটা কী? চেতনা ভাষা তৈরি করে, চেতনা না থাকলে ভাষার উদ্ভব ঘটতে পারতো না, চেতনাই ভাষার স্রষ্টা, কিন্তু সেই চেতনাই আবার নিজেকে প্রকাশ করে ভাষার মধ্য

দিয়ে। তাহলে উভয়ের ঐক্য ও পার্থক্যের দিকটা কোথায়। কোথায় তারা এক ও অভিন্ন এবং কোথায় তারা ভিন্ন?

অন্য দিকে ভাষাসম্পন্ন চেতনা মানেই মানুষ। চেতনা নামক বিমূর্ত কিছু নাই। চেতনাসম্পন্ন মানুষই কথা বলতে সক্ষম। অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়েই চেতনা ভাষা হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বা ব্যক্ত করে। তাহলে প্রশ্নটা যা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা কী? এই প্রশ্ন বাংলার ভাবান্দোলনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। ভাবের চর্চার ধারাবাহিকতার মধ্যে এই প্রশ্ন নানান সময়ে নানান ভাবে নানান কৌশলে তোলা হয়েছে। এটা যে কেবল ‘মেরাজের’ প্রশ্ন নয় সেটা পরের পংক্তিগুলোতে আরো স্পষ্ট। লালন লিখছেন :

‘মেরাজ ও ভাবের ভুবনে

গুপ্ত ব্যক্ত আলোপ হয় দুজনে

কে পুরুষ আকার কে প্রকৃতি শাস্ত্রে তার প্রমাণ লিখেছে’

পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। এর ব্যক্ত দিক আছে, গুপ্ত দিক আছে। সাংখ্য দর্শনের উৎক্ষেপগুলো এখানে রয়েছে। সেই কারণে মেরাজের উদাহরণের মধ্য দিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেটা কেবল আল্লা এবং নবী মুহম্মদের সম্পর্কের প্রশ্ন নয়। সকল প্রকাশেরই সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন। ‘মেরাজ’ যে এখানে একটি উদাহরণ কেবল সেটা বোঝা যায় যখন ভাবের ভুবনের কথাও একই সঙ্গে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশ্নটা সকল ‘ভাবের ভুবন’-এরও প্রশ্ন, অর্থাৎ দর্শনের প্রশ্ন। সহজ করে যদি বলি তো প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই রকম যে ‘ভাব’ নিজেকে রক্তমাংসের রূপের মধ্যে প্রকাশ করে কীভাবে? কী সম্পর্ক ভাবের সঙ্গে তার প্রকাশ্য রূপের? ‘ভাব’ রক্তমাংসের মানুষ বা নবীর রূপ ধারণ করেই কী ইহলৌকিক ইতিহাসে হয়? নাকি ভাব আর মানুষের সীমান্তরেখা নির্ণয় দুঃসাধ্য। মানুষ হয়েই ভাব হজির থাকে, বাক্য হয়ে যদি তা আলাদা রূপ নেয় তবে তা মানুষের মধ্য দিয়েই ঘটে। তাহলে কালাম বা বাক্যকে আলাদা করে যদি আমরা বিচার করি তবে যেন তার ‘ভুবন’ বা আবির্ভাবের শর্ত আমরা ভুলে না যাই। ‘মানুষ’ সেই শর্ত। অতএব যে কোন বাক্যের বিচার একই সঙ্গে মানুষেরও বিচার। কারণ তার উদয় বা আবির্ভাবের গোড়া মানুষে।

শেখ রাজ্জাকের গানটির পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্য এই পুরনো প্রশ্নটি খেয়ালে রাখতে হবে। রাজ্জাক প্রশ্নটি তুলছেন এই ভাবে:

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার?

অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে ভাষার বা আল্লার সঙ্গে নবীর সম্পর্ক আবার বুঝতে চাইছ কেন তুমি? প্রশ্ন। কিসের ভেদ? যে নিজেকে প্রকাশ করছে আর যার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে সেই উভয়ের সম্পর্ক। কে কাকে প্রকাশ করছে? কে কাকে প্রকাশ করে? রাজ্জাক শুরুতেই বলে নিচ্ছেন, সেই ভেদ তো খোদ জিব্রাইল ফেরেশতাই বোঝে নি,

মানুষ তো কোন ছার ! মানুষ হয়ে সেই ভেদ বোঝার চেষ্টা করা আহাম্মকি ছাড়া আর কী ? অতএব —

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার

যাহার ভেদ বুঝতে পারল না জিব্রাইল ফেরেশতা খোদার ?

রাজজ্ঞাকের গানটি আসলে একটি কাহিনী। প্রশ্নটি তুলেই তাঁর কাহিনীর শুরু। আমরা গল্পটি বলবার জন্য বরং পুরো গানটি এখানে এখানে তুলে দিচ্ছি।

সেই ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার

যাহার ভেদ বুঝতে পারল না জিব্রাইল ফেরেশতা খোদার ?

খোদার তরফ হইতে কালাম আনিত জিব্রাইল আল-আমিন

পোঁছাইত নবী যথায়, ছিল সে নবীর অধীন

কালাম লইয়া রাহা ভর

জিব্রাইল তখন ফিরে ঘর

দীন মুহম্মদ যে ঘরেতে বন্ধ ছিল সে ঘরের দ্বার

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

খোদার দরবার হতে জিব্রাইল কালাম যখন আনতে যায়

আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে ছিলেন নবী নিরালায়

বলছেন বাণী বিবির সনে

দ্বার খুলে জিব্রাইল তখনে

দাঁড়াইল নবীর সামনে, লজ্জা পায় দীনের সারোয়ার

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

লজ্জা পেয়ে দীনের সারোয়ার জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করে

যথা হতে আনছ কালাম দেখছনি তা নজরে

এই বলিয়া দীন পয়গম্বর

জিব্রাইলকে কয় আনতে খবর

সত্তর হাজার পর্দার আড়ে দেখ কালাম কে দেয় তোমার ?

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

শুনিয়া জিব্রাইল কালাম রাসুলুল্লাহর জবানে

সত্তর হাজার নূরের পর্দা ভেদ করে যায় তখনে

জিব্রাইলের পড়িল নজর

স্ফটিকের এক স্তম্ভের ওপর

দেখে কালাম হচ্ছে তাহার ভিতর, জিব্রাইল কয় একি ব্যাপার ?

সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

রাগে জোরে চাপট মারে স্ফটিকের স্তম্ভের ওপর
 চুরমার হয়ে গেল যবে দেখে নবী তাহার ভিতর
 তথায় বসিয়া রাসুলুল্লা
 পাগড়ি বান্ধে নিরাল
 জিব্রাইল কয় একি জ্বালা বুঝতে নারি কুদরত তোমার
 সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

আতঙ্কিত হইয়া জিব্রাইল গেল সিদ্ধিকার ঘরে
 তথায় পাগড়ি বান্ধে নবী দেখে আপন নজরে
 সালাম করিয়া আদায়
 জিব্রাইল কয় মিছা দৌড়াই
 তোমার কালাম তোমায় পৌছাই বুঝবার সাধ্য নাইকো আমার
 সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

রাজ্জাক বলে ভ্রান্ত জ্ঞানে সেই ভেদ বুঝতে চাও কেনে ?
 (নবীর) কদমের ওপরে বিশ্বাস রেখো অতি যতনে
 যদি বিশ্বাস হারাবে মূলে
 ভেদ বুঝবে না জীবন গেলে
 দয়াল নবীর দয়া হলে দেখবে লীলা কি চমৎকার
 সে ভেদ বুঝতে চাও কেন আবার ?

দয়াল নবীর দয়া হলে দেখবে লীলা কী চমৎকার ! কিন্তু দয়াল নবী সকলের ওপর দয়া করেন না। অতএব রাজ্জাকের এই কাহিনীর মর্ম বোঝার জন্য আমাদের আরো চেষ্টা করতে হবে। আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত সৎস্কৃতির মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দারুণ আক্রোশ লক্ষ করা যায়। যা কিছুই ইসলামের সঙ্গে যুক্ত তাকেই হেয় করা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বদ্ধ পরিবেশে শেখ রাজ্জাক বা তাঁর মতো কবি-দার্শনিকদের আমরা কী করে চিনব ? কী করে বাংলা কবিতা ও বাংলার দর্শনকে তার ধারবাহিকতায় স্থাপন করব আমরা ?

ভাব ও তার প্রকাশের সম্পর্ক নিয়ে গল্প এবং সেই বয়ানকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উত্থাপন। শেখ রাজ্জাকের বয়ান একটি অসাধারণ নজির। আমরা আগেই বলেছি বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে প্রশ্নগুলো সবসময়ই জারী থাকে। হারিয়ে যায় না।

কাহিনীকথা

কবিতাটি একটি কাহিনীর ওপর দাঁড়ানো। কাহিনীটি এখানে আবার দরকারি ব্যাখ্যাসহ সহজ করে বললে আলোচনার সুবিধা। বলছি :

নবীজী মুহম্মদের কাছে আল্লার তরফ থেকে কালাম নিয়ে আসতেন জিব্রাইল। তিনি ছিলেন ফেরেশতা। ফেরেশতা হয়ে মানুষের জন্য বহন করতেন আল্লার কালাম,

পরওয়ারদিগারের বাক্য। সেদিক থেকে জিব্রাইল ছিলেন নবীজীর অধীন, কারণ নবীজীর দরকারেই তো তাঁকে আল্লার অলৌকিক বাক্যরাশি ইহলৌকিক রসুলের জন্যে বহন করতে হচ্ছে।

একদিন তিনি আল্লার কাছে নবীজীর জন্যে কালাম নিয়ে ফিরছেন। তিনি মুহম্মদের অধীন—হঠাৎ এই বোধ তাঁর মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক করলো। সেটা তো হবারই কথা। জিব্রাইল হচ্ছেন গিয়ে ফেরেশতা, আর নবী হচ্ছেন মানুষ, আর সেই ফেরেশতাই কিনা এই মানুষের জন্য বহন করছেন পাক পরওয়ারদিগারের কালাম! সারা পথ অতিক্রম করে তিনি এসে দাঁড়ালেন নবীজীর ঘরের সামনে। দেখলেন ঘরের দরোজা বন্ধ; মুহম্মদ রয়েছেন ভেতরে, আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে। জিব্রাইল যখন আল্লার কাছে কালাম আনতে গিয়েছিলেন তখন নবীজী ‘নিরালায়’ বিবির সঙ্গে কথা বলছিলেন। জিব্রাইল দরোজা খুলে নবীর সামনে দাঁড়ালেন। মুহম্মদ স্বভাবতই লজ্জা পেলেন। বিবি আয়েশার সঙ্গে তাঁর নিরালা সময়-যাপনের সময় তিনি জিব্রাইলকে প্রত্যাশা করেন নি। জিব্রাইল যে দরোজা খুলে ঢুকে পড়বে সেটাও আশা করেন নি। কিন্তু জিব্রাইলের মনে ঈর্ষা, জিব্রাইলের মনে প্রশ্ন। নবীজী মুহম্মদ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় লজ্জা পেলেন ঠিকই কিন্তু জিব্রাইলের মনের তোলপাড়টাও বুঝে ফেললেন। বুঝতে পারলেন জিব্রাইল ঠিকই ফেরেশতা, কিন্তু ফেরেশতা আল্লার ‘ভেদ’ বুঝতে সে অক্ষম। কী করা যায়?

মুহম্মদ প্রশ্ন করলেন, ‘যেখান থেকে তুমি আমার জন্য আল্লার অলৌকিক বাক্যরাশি নিয়ে এসেছ সেই উৎসমুখ কি স্বচক্ষে দেখেছ? যাও, গিয়ে পরখ করে আস সত্তর হাজার পর্দার অন্তরালে থেকে কে তোমাকে আমার জন্যে কালাম দিচ্ছে? দেখে আস কে পয়দা করছে কালাম? কালামের উৎস, কালামের কর্তা বা কালামের উৎপাদক ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি ধারণার নানান ধারণার প্রস্তাবনা আছে এখানে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণও বটে। সর্বোপরি রয়েছে ‘কালাম’ ও ‘ওহির’ ভেদ বিচার। এই প্রশ্নগুলোকে জারী রাখা এবং কালাম ও ওহির ভেদ প্রতিষ্ঠাও এই গানের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য।

রসুলুল্লাহর জ্বানে এই আদেশ শুনে জিব্রাইল সত্তর হাজার নূরের পর্দা ভেদ করে ছুটে যায়। তাকে জানতে হবে কে পাঠাচ্ছে কালাম? কে সেই আল্লা যার কাছে ফেরেশতার চেয়ে মানুষ বড়ো? কে সেই অলৌকিক বাক্যরাশির অধিকারী যিনি তাকে মুহম্মদের অধীন করেছেন? সত্তর হাজার পর্দা ভেদ করে ছুটে গিয়ে দাঁড়াবার পর একসময় জিব্রাইলের নজরে পড়ল একটি স্ফটিকের স্তম্ভ। জিব্রাইল অবাক হয়ে দেখলেন সেই স্তম্ভের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে কালাম, তৈরি হয়ে চলেছে পবিত্র বাক্যরাশি। বিস্মিত জিব্রাইল নিজেই নিজেই শুধালেন, ‘একী ব্যাপার?’

রাগ হোল জিব্রাইলের। এই বুঝি কালামের পয়দা-রহস্য! আর এই কালাম নিয়েই তিনি গোলামি করে চলেছেন বাহক হিসাবে মুহম্মদের। রেগেমেগে দিলেন সেই স্ফটিকের স্তম্ভের ওপর দারুণ জোরে এক থাপ্পড়, বিশাল এক চাপট। খান খান চুরমার

হয়ে গেল স্ফটিকের স্তম্ভ। আর দেখলেন কি, স্তম্ভের ভেতরে ‘নিরালায়’ মুহম্মদ পাগড়ি বাঁধছেন। ওখানেই স্বয়ং মুহম্মদ! স্বগতোক্তি করলেন, ‘এ তো আরেক জ্বালা, এই কুদরতি তো বুঝতে পারছি না’।

ভয় পেলেন জিব্রাইল। আতংক জাগল তাঁর মনে। ভীত হয়ে ছুটে এলেন পৃথিবীতে, আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে, যেখানে তিনি নবীজীকে দেখে গিয়েছিলেন। দেখলেন এখানেও তিনি। ঠিকই সেই একই মুহম্মদ আয়েশার ঘরে বসে একই ভাবে সেই পাগড়িটিই বাঁধছেন। জিব্রাইলের আর আতংক গেলো না। মুহম্মদকে এবার শুধু সালাম আদায় করে বললেন, ‘মুহম্মদ মিছেই আমি দৌড়াচ্ছি। তোমার কলামই আমি নিয়ে আসছি তোমার কাছে। এই ভেদ বোঝার সাধ্য আমার নাই’।

খোদার ফেরেশতা জিব্রাইল যে ‘ভেদ’ বুঝতে পারল না, সেই ভেদ আবার বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা কেন? এই প্রশ্ন বার বার তুলে কাহিনীটি কওয়া হয়েছে। যে ভেদ ফেরেশতার বোধের অতীত তার মীমাংসা শেখ রাজ্জাক দিয়েছেন ঠিকই, অথচ বলছেন সেই ‘ভেদ’ বুঝতে চাও ক্যান আবার? কী করতে হবে তাহলে? তাঁর সোজা কথা, নবীজীর কদমে বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি ‘মূলে’ এই বিশ্বাসটাই না থাকে তাহলে সারা জীবন তন্ন তন্ন করে বেড়ালেও সেই ভেদ বোঝা যাবে না। তবুও মানুষ ‘ভ্রান্ত জ্ঞানে’ সেই ভেদ বোঝার প্রয়াস চালায়। ভ্রান্ত জ্ঞান নিয়ে তো ভেদ বোঝা যাবে না।

এই হোল কাহিনী। এই হোল গান। এই হোল কবিতা। এই হোল ভাব। এই হোল দর্শন।

প্রশ্ন উত্থাপনের ধরন এবং প্রতীক ও কাহিনী-কাঠামোর মধ্য দিয়ে দার্শনিক প্রশ্ন মীমাংসা করার দুর্ধর্ষ কায়দা এখানে বিস্ময়কর। অসাধারণ। পদকর্তা শেখ রাজ্জাক মোটেও তেমন পরিচিত কেউ নন। তাঁর তেমন খ্যাতি নাই। এই অখ্যাতিটাকেই এর আগে আমরা বলেছি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন বলেছি? এই কারণে যে এই ধারার কবিতা বাংলাদেশে মোটেও তেমন নতুন কিছু নয়। যাকে আমরা অসাধারণ বলে সাব্যস্ত করছি তা আসলে বাংলা কাব্যের বা ভাবান্দোলনের খুবই চেনাজানা একটা রূপ। খুবই সাধারণ একটা ধারা। শেখ রাজ্জাকের অখ্যাতির তাৎপর্যটা হচ্ছে এই যে এই খ্যাতিহীনতাই বরং ইঙ্গিত করছে এই ধারার কবিতার প্রাচুর্য। শেখ রাজ্জাকের মতো আরো অনেক অখ্যাত কবি আছেন বাংলাদেশে। বলা বাহুল্য মর্ম ও প্রকরণের দিক থেকে এই কবিতাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। কিন্তু কাহিনী নির্ভর প্রকরণ আর ধর্মীয় উপমা ও প্রতীকের এই ধারা অতি পুরনো ও পরিচিত ধারা। যে বিষয়টা এখানে তোলা হয়েছে এবং যেভাবে তোলা হয়েছে সেখানেই এর বৈশিষ্ট্য ও শৌর্য। কিন্তু গ্রামবাংলায় এই ধরনের কাহিনীনির্ভর কাব্য প্রকরণের ছড়াছড়ি আছে। বহু গান আর কবিতা আছে এই প্রকরণে তৈরি, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে ভরপুর। জারি গান বলতে যা বোঝায় তার মৌলিক প্রকরণটা কাহিনীনির্ভর। তেমনি কৃষ্ণকীর্তনের নানান পালা ও কাহিনী। বিষয়ের দুর্ধর্ষতার দিক থেকেও যদি দেখা হয় তাহলে এই প্রকার বিস্তারিত কবিতার

উল্লেখ করা সম্ভব। শেখ রাজ্জাকের অখ্যাতিকে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ বলছি এ কারণে যে চিন্তার এই প্রাচুর্য বা কাব্যিকতার এই সমৃদ্ধি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির বাইরে ঘটছে। খ্যাতিবর্জিত চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হিসাবে। কিন্তু সেটা প্রতিপত্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কারণে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিটাই ‘সংস্কৃতি’ হিসাবে গণ্য। সেটাই আদর্শ ও অনুকরণীয়। এই শ্রেণীর চিন্তাচেতনা ভাবুকতা দার্শনিকতা যতোই পশ্চাদ্দপদ আর প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন সেটাই মূলধারা হিসাবে বিবেচ্য। এই শ্রেণীর বাইরে যেন কোন সংস্কৃতি নাই, চিন্তা নাই দর্শন-ভাবনা নাই। শেখ রাজ্জাক বা তাঁর মতো অখ্যাত কবিদের রচনা সে কারণে নিছকই ‘পল্লীগীতি’ হিসাবে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে।

কবিতার যে ‘আধুনিক’ বিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে শেখ রাজ্জাকের মতো কবিদের কবিতার একটা ফারাক সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক বাংলা কবিতার যে ধারা এখন প্রতিষ্ঠিত সেখানে বিষয়ের প্রতি কবি মনোযোগ আঙ্গিকের তুলনায় গৌণ। তার মানে আধুনিক কবিতায় ‘বিষয়’ গৌণ এই কথা বলছি না। কবির কাব্য ভাবনা আঙ্গিক-কেন্দ্রিক, গঠনের দিকেই কবির নিবিস্ততা বেশী। ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা বানানোর দিকে কবির ঝোঁক। ভাব এবং তার প্রকাশকে একসঙ্গে গ্রেফতার করবার চর্চা নাই বললেই চলে। আবার আঙ্গিক বলতে একান্তই শব্দ, ধ্বনি, ছন্দ ও বাক্য নির্মাণ বোঝানো হয়। কাহিনী বা কাহিনীর বিন্যাস কবিতার বিষয় থেকে বহু আগেই বাদ পড়েছে। কাহিনী বা কাহিনীর বিন্যাসের মধ্যে যে কাব্য বা দর্শন হাজির থাকে আধুনিক কবিতা তা নিয়ে চর্চা করে না। বিষয় মুখ্য না হবার কারণে এটা ঘটেছে। ‘ভাব’ বা বিষয় মুখ্য না হবার কারণে কবিতা খোদ কাব্যের দিগন্ত থেকেই বিচ্যুত হয়েছে। কবিতা ভোলাতে চায় শব্দে, অলংকারে, প্রতীকে, উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়। ওর মধ্যে বিষয় আছে অবশ্যই। কিন্তু পাঠকের মধ্যে যা দিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে চায় আধুনিক কবিতা সেটা বিষয় দিয়ে নয়, ঘটাতে চায় প্রধানত আঙ্গিকে, মুন্সিয়ানায়। কবিতার বিষয় কোন ভাবের প্রশ্ন তোলে না, কাব্যের ইতিহাসের কোন অমীমাংসিত প্রশ্ন মোকাবিলা করে না কবিতা আর, আঙ্গিকের প্রশ্ন ছাড়া। কবিতারও প্রশ্ন আছে, কিন্তু তা ভাব বা দর্শনের প্রশ্ন থেকে বিচ্যুত এখন। আঙ্গিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আদি কাব্য বা ভাবুকতা থেকে উঠিত প্রশ্ন বা বিষয় নিয়ে কবিতা নিজের মধ্যে নিজের বিকাশ ঘটায় নি। কাব্য ও কবিতার মধ্যে একটা ছেদ ঘটেছে। ভাবুকতার কোন ধারাবাহিকতা আর রক্ষিত হয় নি। বিষয়ের দরকারে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে নি। বা আঙ্গিক ও গঠন অথবা ভাবকে ধরবার সংকল্প নিয়ে আবর্তিত হয় নি।

বলে রাখা দরকার আধুনিক কবিতার এই দুর্দশা ঘটেছে প্রধানত আমাদের মতো দেশগুলোতে। ইউরোপে ধর্ম, ভাবুকতা বা কাব্য যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করে এসেছে তার ইতিহাস ভিন্ন। তার আবাস খ্রিস্টধর্মে আর গ্রীক সভ্যতায়। ধর্মকে ভেতর থেকে তাদের দার্শনিকরা ভেঙেছেন, খ্রিস্টধর্মের পরিমণ্ডলে থেকে তার দার্শনিক অর্থ দাঁড়

করিয়েছেন। তারপর তার ‘মর্ম’ প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন ঠিকানাবিহীন বিমূর্ততায় যাতে তাঁদের কথা শুধু খ্রিষ্টের অনুসারীদের অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে নয়, বিশ্বের সকল মানুষের ‘সার্বজনীন আদর্শ’ হিসাবে আমরা মানি বা মানতে বাধ্য হই। ঘটনাটি শুধু দর্শনের শক্তির জ্বারে ঘটে নি। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ও সহিংসতার ইতিহাস। ইউরোপের বিশেষ ইতিহাসের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাবনা তাকে ‘বিশেষ’ দৃষ্টিভঙ্গি বলেই গণ্য করতে হবে। তার দর্শনের সে সার্বজনীনতার দাবি—তা শুধু তার বিশেষত্বের জন্য বা ইউরোপীয় চিন্তার গুণে হয় নি—তাকে ক্ষমতা দিয়ে রাজনৈতিক ভাবেই সকলের জন্য সার্বজনীন সত্য হিসাবে কায়ম করতে হয়েছে।

ইউরোপীয় চিন্তার ভেতর খ্রিষ্টিয় ও গ্রীক ঐতিহ্য বহাল আছে, কিন্তু তাকে এখন আর ধর্মীয় চেহারায় শনাক্ত করা যায় না। ধর্ম, ভাবুকতা ও দার্শনিকতার ভেতর খ্রিষ্টিয় চিন্তা পরিমণ্ডলের বিবর্তন ঘটেছে। অপরদিকে চার্চের বিরুদ্ধে বা নিপীড়নমূলক আচারসর্বস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ইউরোপের মানুষ লড়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে। ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান অন্য সকল জনগোষ্ঠীর সমস্যা নাও হতে পারে, তার সমাধান কোন কাজেও না লাগতে পারে। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়েই যে মানুষের সার্বজনীন ইতিহাস গড়ে উঠবে তা আজ প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যদিকে আমাদের অন্বেষণ তাহলে সেদিকেই ধাবিত হতে হবে যাতে আমরা আমাদের সমস্যা চিনতে পারি, সমাধান করতে পারি।

ইউরোপে কবিতার আঙ্গিক বা ধরনের বদলের সঙ্গে সে কারণে আমাদের ‘আধুনিক’ কবিতার সমান্তরাল ব্যাখ্যা চলে না। এখানকার ধর্ম, ধর্মচর্চা, ভাবচর্চা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিবর্তনে ছেদ পড়ে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য। নিপীড়নমূলক আচার সর্বস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াই আমাদের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত কোন সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহণ করে নি। ধর্মকে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আলাদা করবার বুদ্ধি আমরা পাশ্চাত্য থেকেই ধার নিয়েছি। একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকেই মানুষের সার্বজনীন ইতিহাস বলে বিবেচনা করেছি। আমাদের ইতিহাসকেও পাশ্চাত্যের হতে হবে সেই দাবি করেছি। ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা দূরের কথা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে ধর্মের ভূমিকাকে তার বিশেষ ইতিহাসের জায়গা থেকে না দেখে ইউরোপীয় ইতিহাসের মানদণ্ড দিয়েই বিচার করতে শিখেছি। খেলাফত আন্দোলনে মধ্যবিস্তৃত মুসলমানরা ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করেছে, তেমনি জাতীয়তাবাদী হিন্দুরাও ব্যবহার করেছে হিন্দু ধর্মকে। ঔপনিবেশিকতার পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা দুই মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর এই লড়াই অধিকাংশ সময় ইউরোপীয় চিন্তার পরিমণ্ডলে পরিগঠিত কিম্বা ইউরোপ দিয়েই প্রভাবিত। তার প্রকট দিকটা আমরা দেখি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আত্ম-পরিচয়ের

রাজনীতির মধ্যে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের ঐতিহাসিক অভিমুখ এক ছিল না। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র পরে আলোচনায় ফিরে আসতে হবে।

ভাবগত দিকের প্রতিও আমরা বিশেষ মনোযোগ দেই নি। নিজের পরিমণ্ডলের মধ্যে যে ভাবগত বিপ্লবগুলো ঘটছিল তাকে আমরা বাইরে থেকে নিছকই ‘ধর্মীয়’, ‘আধ্যাত্মিক’, ‘মরমী’ ইত্যাদি বলে বুঝেছি। কিন্তু ওর মধ্যে চিন্তার যে লড়াই চলছিল—কাব্যের ও দর্শনের যে দিগন্তগুলো উন্মোচিত ও বিস্তৃত এবং বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল—তাকে ইউরোপীয় অন্ধতার কারণে আমরা দেখি নি, বা দেখার সামর্থ্য রাখি নি। ভাবের কাব্যের বা দর্শনের যে কাজগুলো চলছিল তাদের কাজের অসমাপ্ত চিহ্ন বা সীমান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। ঔপনিবেশিক কালপর্বে এই কাজটাতে আমরা পিছিয়েছি, আণ্ডয়ান হই নি। অপরদিকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই কঠিন কাজে হাত দেওয়া দূরের কথা, এর গুরুত্বটাই বোঝে নি। উল্টো ধর্মের প্রশ্নে, বিশেষত ইসলামের প্রশ্নে এই শ্রেণীর মধ্যে দুই ধরনের অতি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা এখন লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে আছে নানান ধর্মতাত্ত্বিক ধারা। ধর্মকে তার চিন্তা ও ভাবুকতার ভিত্তি থেকে সরিয়ে একে নিছকই বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই গণ্য করতে তারা রাজি নয়, অন্যদিকে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার একচেটিয়াও তারা তাদের কুক্ষিগত রাখতে চায়। আর অপরদিকে ‘আছে এর বিপক্ষ ধারা যারা মনে করে ধর্ম বা ইসলাম মানেই প্রতিক্রিয়াশীলতা, পশ্চাদ্দপদতা। ধর্মে ‘বিশ্বাস’ করে না বলে এরা খুব গৌরব বোধ করে, যেন ধর্ম শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে থেকে এই পরম্পরবিরোধী ধারাকে প্রতিপক্ষ মনে হলেও ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধারণা একই। ধর্মকে তারা ধর্মতত্ত্ব হিশাবেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার হিশাবে বোঝে। এর সঙ্গে ভাষা, ভাব বা দর্শনের সম্পর্ক ধরতে পারে না।

শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ইউরোপীয় ‘আধুনিকতা’ এসেছে তার নিজের ধর্ম, ভাবুকতা বা সংস্কৃতির বিবর্তন হিসাবে নয়, এসেছে স্রেফ বাইরের অনুকরণ হিসাবে। কারণ যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইউরোপ অগ্রসর হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা তার ঘটে নি। ‘আধুনিকতা’র অভিজ্ঞতা তার নিজের অভিজ্ঞতা নয়। অথচ আধুনিকতার সাধনা করতে গিয়ে সে নিজের সঙ্গে নিজের ছেদ ঘটিয়েছে। তার কাছে ‘আধুনিকতা’ এসেছে স্রেফ বাহ্যিক আঙ্গিক বা প্রকরণ হিসাবে, বহিরঙ্গই তাকে ভুলিয়েছে। এই অর্থে যে ইউরোপকে সে বাইরে থেকেই শুধু দেখেছে, ইউরোপের বিপ্লবটাকে সে আত্মস্থ করতে পারে নি। ইউরোপের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি কৃৎকোশলের বিপ্লবের সঙ্গে কাব্য ও দর্শনচর্চার যোগসূত্র আন্তরিক—এই মর্মটা এই দেশের ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী জানলেও সে প্রক্রিয়ার ফলটা গ্রহণ করেছে, প্রক্রিয়াটা নিজের জায়গা থেকে বোঝে নি। ধূতি লুঙ্গির ওপর কোট প্যান্ট চাপিয়ে এই শ্রেণী সাহেব হবার সাধনা করেছে। আসলে ধূতি লুঙ্গির ওপরে আলাদা পালেন্তরার মতোই সে চাপিয়ে বসে আছে শার্ট কোট আর নেকটাই। তার সমাজের পুরো ধর্ম,

ভাবুকতা, চিন্তাচেতনার ধরনসহ আগাগোড়া সংস্কৃতিটাই রয়ে গিয়েছে তার বাইরে— অন্যদিকে ইউরোপও তার বাইরের পোশাক ছাড়া অধিক কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। বাইরে স্যুট টাই কোট পরে সে ভেবেছে তার সংস্কৃতির হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব বৃদ্ধি পোশাকের জোরেই আপসে আপ কেটে যাবে। আজ এই উপমহাদেশে ভীতিকর সাম্প্রদায়িকতার উত্থান আর হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্বের বড়াই দেখে বোঝা যায় কতো ঠুনকো এই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধুনিকতা।

কবিতার ক্ষেত্রেও ইউরোপ এসেছে বাইরের ব্যাপার হিশাবে। এই চর্চার ধারায় যেহেতু নিজের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির জমিনে দাঁড়িয়ে বিপ্লবটা কখনোই প্রধান কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে ওঠে নি ফলে কবিতা রচনার ব্যাপারটিও শব্দ বা বাক্য রচনার অধিক কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। সাধারণভাবে দেখা যায় এই শ্রেণীর কবিতায় শব্দ ও বাক্য নির্মাণের বাহাদুরি ছাড়া মৌলিক কোন প্রশ্নের অবতারণা নাই, অথচ প্রশ্ন তোলা ও উত্তর অনুসন্ধান করাই হচ্ছে কবিতার খোদ কুদরতি। এর মধ্য দিয়েই কবিতা নতুন ‘ভাব’কে গ্রহণ করার করে যা পরে দর্শনের বিষয় হয়ে ওঠে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবিতায় সাধারণত এমন কোন ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতার উপাদান থাকে না যা আমাদের চেনাজানা অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দিতে পারে। এমন কোন কৌশলী দুঃসাহস নাই যেখানে শেখ রাজ্জাক জিব্রাইলের মুখ দিয়ে বলছেন, ‘মুহম্মদ তোমার কালামই আমি তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আনি, এই কুদরতি বোঝার সাধ্য আমার নাই।’

এই ভেতর থেকে বিপ্লবী ভাবুকতার কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি, অর্থাৎ চিন্তা ও ভাবুকতাকে নিজের ভাষা, ভাব ও ধর্মের মধ্যে বিচার ও বিকাশ ঘটানোর কর্তব্যে অবহেলা—সেখানেই আধুনিক কবিতা ও কাব্যের দ্বিতীয় তাৎপর্যমূলক পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে। বলাবাহুল্য, আমরা সেই কারণেই কথায় কথায় ‘কবিতা’ আর কাব্যকে এখানে আলাদা করছি।

কাব্য জানে যে তার খোদ লড়াইয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে ধর্ম। মানুষের ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার প্রথম অভিপ্রকাশ ঘটেছে ধর্মের মধ্য দিয়ে এবং সে কারণে প্রতিটি ধর্মই আদতে কাব্য। আদি ভাবুকতার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই ভাবুকতার বা চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিতে পারে নতুন প্রশ্নের। ফলে আদি প্রশ্নগুলো সত্যিকারের কবি ও কবিতা ভোলে নি, বা ভোলে না।

ধর্মকে এড়িয়ে গিয়ে বা ধর্ম সম্পর্কে চুপ থেকে চিন্তার কোন পর্যালোচনামূলক ধারা যে গড়ে উঠতে পারে না সে সম্পর্কে কার্ল মার্কস দারুণ সজাগ ছিলেন। জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন সকল পর্যালোচনার শুরু হয় ধর্মের পর্যালোচনা দিয়ে। ইতিহাসের প্রগতিশীল রূপান্তরের জন্যে ধর্মের পর্যালোচনা খুবই দরকারি এবং প্রাথমিক একটা কাজ। তাঁর কাছ থেকে সে শিক্ষাটা অবশ্য বাংলাদেশে আমরা মোটেও

গ্রহণ করি নি। উল্টো প্রগতিশীলতার নামে যা করা হয়েছে তা হোল ধর্মকে একটা ফালতু কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। আর যারা এক অক্ষর মার্কস না পড়েও মহা মার্কসবাদী তারা নাস্তিক বনে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিপ্লবী হবার চেষ্টা করেছেন খেটে খাওয়া শ্রেণীগুলোর কাছে মার্কসকেও নাস্তিকবাদী প্রমাণ করে।

আর দশটা বস্তুর মতো আল্লা আছেন কি নাই দর্শনের দিক থেকে সেটা খুবই নিচু স্তরের প্রশ্ন। এ নিয়ে আমরা আলাদা ভাবে অন্যত্র আলোচনা করেছি (মজহার ২০০৬)। আসল কবিতা বা ভাবুকতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আল্লা আছেন কি নাই সেই ধরনের নিচু স্তরের প্রশ্ন কখনোই তোলা হয় না। এই ক্ষেত্রেও অন্যথা হয় নি। যে প্রশ্নের উত্তর এখানে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সেটা হোল কালাম কোথেকে সৃষ্টি হয়, কে তার স্রষ্টা? এই প্রশ্নের মধ্যে আল্লা ও তাঁর রসুলের সম্পর্কের প্রশ্নটিও নিহিত রয়েছে। এই কবিতায় জিব্রাইল নিজে বলছেন যে মুহম্মদের কালামই তিনি মুহম্মদের কাছে নিয়ে আসছেন। সত্তার হাজার নূরের পর্দা ভেদ করে স্ফটিকের স্তম্ভের ভেতর তিনি মুহম্মদকেই দেখেছেন, আল্লাকে দেখেন নি। তাহলে ঠিকই প্রশ্ন ওঠে যে আল্লা কী আছেন না নাই? কিন্তু এই গান বা কবিতা যিনি রচনা করেছেন তাঁর কাছে সেটা একদমই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কেন? কারণ খোদ প্রশ্নটা হচ্ছে ‘ভেদ’ জ্ঞানের। অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে তাঁর রসুলের সম্পর্কটা কী সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। কোথায় তাঁরা আলাদা আর কোথায় তারা এক—সেই মৌলিক প্রশ্নটাই এখানে মুখ্য। যে কথাটা খেয়াল না রাখলে কবিতাটি মোটেও বোঝা যাবে না সেটা হোল সেই ‘ভেদ’ জিব্রাইল নিজেও বুঝতে পারেন নি। কবিতাটি শুরুও হয়েছে এই কথা বলে যে খোদার ফেরেশতা জিব্রাইল নিজেও আল্লা এবং তাঁর রসুলের ‘ভেদ’ বুঝতে পারেন নি। কেন বোঝেন নি? জিব্রাইল তো ঠিকই বুঝেছেন যে আয়েশার ঘরের নবীজী আর স্ফটিকের স্তম্ভে বসে থাকা মুহম্মদ একই সত্তা। কিন্তু এই দেখা আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। কারণ জিব্রাইল শুধু ঐক্যের দিকটা দেখেছেন, পার্থক্যের দিকটা দেখেন নি। কালাম বা বাক্য যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সেই উৎস আর যার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটছে সেই মাধ্যম তো এক নয়। ঐক্যের মধ্যে পার্থক্য বা পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য অবলোকন করতে জিব্রাইল ব্যর্থ হয়েছেন। এই কারণে কি যে তিনি মানুষ নন? আসলেই। তিনি ফেরেশতা। কারণ ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতা তাঁর স্বভাব নয়। সেটা মানুষেরই স্বভাব। সে কারণেই মানুষ আশরাফুল মখলুকাত এবং জিব্রাইলের মতো ফেরেশতাকেও মুহম্মদের গোলামি করতে হয়েছে। সেই ভাবুকতা ও চিন্তার চলন ভঙ্গি হচ্ছে দ্বাদ্বিক—পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য কিম্বা ঐক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেই চিন্তা নিজেই চিন্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, কেবল তখনই চিন্তার বাক্যরূপ সম্ভব। বিষয়টি খানিক স্পষ্ট করা দরকার।

খুবই সাধারণ একটি বাক্যের উদাহরণ নেয়া যাক ধরা যাক একটি দৃশ্যগ্রাহ্য স্পর্শগ্রাহ্য গোলাপ দেখে একটি বাক্য উচ্চারিত হোল : ‘গোলাপ একটি ফুল’। এখানে

‘গোলাপ’ একটি বিশেষ নাম, সসীম। সসীম এ কারণে যে তাকে বিশেষ দেশে বিশেষ কালে আমরা দেখতে পারি, ধরতে পারি, স্পর্শ করতে পারি। আর ‘ফুল’ হচ্ছে সকল ফুলের সাধারণ নাম। সার্বজনীন ও অসীম। অসীম এ কারণে যে কোন বিশেষ দেশে বা বিশেষ কালে ফুলকে আমরা দেখি না, ধরতে পারি না স্পর্শ করতে পারি না। ‘ফুল’ দেশ কালের উর্ধ্বে বা বাইরে। যখনই আমরা কোন ‘ফুল’ দেখতে চাই স্পর্শ করতে চাই সংগ্রহ করতে চাই তখন আমরা কেবল বিশেষ ফুলকেই পাই। সেটা হতে পারে গোলাপ, ফুঁই, চামেলি বা মালতি বা অন্য যে কোন নাম না জানা ফুল। সে কারণে ‘ফুল’ অসীম, ‘গোলাপ’ সসীম; একটি ‘সাধারণ’ অপরটি ‘বিশেষ’। তাই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ‘গোলাপ একটি ফুল’ বলার মধ্য দিয়ে আমরা সেই পার্থক্যকে নাকচ করে দিচ্ছি। যাকে গোলাপ বলছি তাকেই আবার ফুল বলছি একই সঙ্গে। একটা সুবিরোধিতা ঘটছে, দ্বন্দ্ব ঘটছে গোলাপ ও ফুলকে একই সত্তা হিসাবে শনাক্ত করার কারণে। সাধারণ আর বিশেষকে বা অসীম আর সসীমকে একবার আলাদা করা হচ্ছে আবার এক করে দেখা হচ্ছে। পার্থক্যের মধ্যে—সাধারণ ও বিশেষের কিম্বা অসীম ও সসীমের দ্বাদ্বিকতার মধ্যে নির্ণয় করছি ঐক্য। সেই পার্থক্য বা দ্বাদ্বিকতা যদি মনে না রাখি তাহলে ‘গোলাপ একটি ফুল’ এই বাক্যটি প্রণয়ন করা যেতো না, গোলাপ ও ফুলের যে ঐক্য এখানে ঘোষিত হচ্ছে তার কোন মানে দাঁড়াত না। দেখা যাচ্ছে অসীম ও সসীমের বা সাধারণ ও বিশেষের পার্থক্য ও ঐক্যের মধ্য দিয়েই তৈরি হচ্ছে বাক্য কিম্বা কালাম। আল্লামের সেরা সৃষ্টি মানুষ বা আশরাফুল মখলুকাতের এটাই হচ্ছে বাক্য নির্মাণের ধর্ম—কালাম নির্মাণের কুদরত। অতএব জিব্রাইল যখন সসীম মুহম্মদকেই কালাম রচয়িতা হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তিনি ভুল করেছেন। কারণ তিনি অসীমকে দেখতে গিয়েও দেখেন নি। সত্তর হাজার নূরের পর্দা ভেদ করে যে অসীমকে দেখার জন্যে মুহম্মদ জিব্রাইলকে পাঠিয়েছিলেন জিব্রাইল সেই অসীমকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন স্তম্ভের ভেতর সসীম মুহম্মদই পাগড়ি বাঁধছেন। সেই কারণেই রাজ্জাক বারবারই সাবধান করে দিচ্ছেন অসীম ও সসীমের বা সাধারণ ও বিশেষের যে ‘ভেদ’ খোদ জিব্রাইল নিজেই বুঝতে পারলেন না, সেটা আবার বুঝতে চাওয়ার দুঃসাহস দেখাই কেন আমরা?

শেখ রাজ্জাকের বয়ান ধরে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন তুলতে পারি। প্রথমত, ‘কালাম’ বাংলার ভাবান্দোলনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী, রসুল বা যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উচ্চারিত ‘কালাম’ বা বাক্য আর ‘ওহির’ মধ্যে কি পার্থক্য? তারা কি একই কথা? এটা পরিষ্কার যে ‘কালাম’ বলতে শেখ রাজ্জাক ‘ওহি’ বুঝিয়েছেন—আবার নবীর সঙ্গে তাঁর কথা বিনিময়ও হয়েছে। নবীর বাক্যও ‘কালাম’ অবশ্যই। কিন্তু যে ‘কালাম’ জিব্রাইল বহন করে আনেন তা নিশ্চয়ই ইহলৌকিক উচ্চারণ নয়। তার আবির্ভাব ‘অপর’ লোকে। এই পার্থক্য বজায় রাখার ভাবগত তাৎপর্য অনেক গভীর। জিব্রাইল দেখল যে ওহির উৎস আর ওহির গন্তব্য বা ওহির উৎপাদক ও ওহির প্রাপক

একই ব্যক্তি। ওহি যে শুধু জিব্রাইল বহন করে আনতেন তা নয়, নবী আরো নানান ভাবে ওহি পেতেন, তাঁর কাছে ওহির ‘অপরলোক’ মধ্যস্থতায় বা অব্যবহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নাজিল হতো—প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, ইশারায় ইঙ্গিতে। শেখ রাজ্জাক আলোচনা করছেন কারো মধ্যস্থতায় ‘কালাম’ নাজিল সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে ফেরেশতা মধ্যস্থতা করলেও ওহির উৎপাদক ও প্রাপকের পার্থক্য সে বুঝতে পারে কিনা? শেখ রাজ্জাক শুরুতেই দাবি করছেন বাহকের পক্ষে সেই ‘ভেদ’ বোঝা সম্ভব নয়। গানটির শুরু সেই কারণে এই খোদ প্রশ্নটা দিয়েই যে যদি ফেরেশতাই বুঝতে না পারল তাহলে রাজ্জাকের গানের যারা শ্রোতা তারা কি করে বুঝবে? তারা তো রসিক নয়। তারা ‘দ্রাস্ত’ জ্ঞানে ‘ওহির যিনি প্রেরক আর যিনি তা পান উভয়ের ভেদ কী করে বুঝবে? অরসিকের জন্য অতএব পরামর্শ—এতো কিছু বুঝে কাজ নাই। নবীর চরণে ওপর বিশ্বাস রাখাই কাজ। কারণ যিনি সত্য হয়ে উঠেছেন তাঁকে বিশ্বাস করেই আমাদের চলতে হবে—অথবা ‘দ্রাস্ত জ্ঞান’ নিরসন করতে হবে। নবী যদি দয়া করেন তখন দেখা যাবে কালাম ও ওহির এই লীলা কতো চমৎকার!

সাধারণ ও বিশেষের পার্থক্য এবং একই সঙ্গে ঐক্য, কিম্বা অসীম ও সসীমের ফারাক এবং ‘মেরাজ’—এর যে লীলার কিছু ইশারা এখানে আপাতত পেশ করা হোল। যদি দয়াল নবীর দয়া হয় তাহলে এই চমৎকার লীলার আরো আখ্যান বাংলাদেশে লেখা হবে।

বাগেন্দ্রিয় না সম্ভবে

‘অনামক অচিনা বচন বাগেন্দ্রিয় না সম্ভবে’ ফকির লালন শাহের একটি অনির্বচনীয় গানের কথা। ‘কোন নামে ডাকিলে তারে হৃদ-আকাশে উদয় হবে/ আপনায় আপনি ফানা হলে সে ভেদ জানা যাবে’—গানটির প্রথম দু’টি কলি। কে কাকে ডাকছে। বাগযন্ত্র কোথায় সম্ভব নয়? এই সব দারুণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোর পেছনে কদ্রুর ছোট্টা যায় বা আদৌ যায় কিনা বাংলার ভাবান্দোলনে তার পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে বিস্তর। প্রায় আমাদেরই সমসাময়িক কালের একটি পরীক্ষা নিয়ে এই লেখা।

হালিম মিয়া চিনলো না তোমারে, আপন ঘরে...

হালিম মিয়া কী চিনলো না? এই প্রশ্ন করার আগে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, হালিম মিয়াটা আবার কে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর ঘরবাড়ির ঠিকানা এখানে দেব না। এক কথায় বলব, ইনি বাংলাদেশের খুবই বড়ো মাপের একজন কবি।

বলে আমি অবশ্য মুশকিলে পড়ব। জেনেশুনে মুশকিলে পড়তে সাধ হয় কি কারো? আমার হয়। শিক্ষিত, পড়ালেখায় পোক্ত, সংস্কৃতিবান আর শহুরে প্রায় সকলেই বড়ো বড়ো কবিদের নাম জানেন। যেমন, শামসুর রাহমানের নাম জানে না এমন ‘সংস্কৃতিবান’ মধ্যবিত্ত আছে কিনা সন্দেহ। এই শ্রেণী আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ—সকলেরই নাম জানে। আমিও জানি।

নিজেকে ‘সংস্কৃতিবান’ বা ‘আধুনিক’ জাহির করবার জন্য এঁদের আমাকে জানতে হয়েছে। তবে আমার ক্ষেত্রে অন্য সত্যও আছে। আমি পদ্য লিখি। এখন পদ্যকার বা কবি হিসাবে এই সময়ে ‘শিক্ষিত’ শ্রেণীর কাছে স্বীকৃতি পেতে হলে তারা যাকে পদ্য বলে সেই ভাবেই লিখতে হবে। সমাজে অধিপতি শ্রেণীই ঠিক করে দেয় কোনটা শিল্প হোল, আর কোনটা হোল না বা কোনটা পদ্য আর কোনটা অ-পদ্য।

আমি পদ্য লিখতে চেয়েছি। অতএব অধিপতি শিক্ষিত শ্রেণীর কবিদের আমাকে চিনতে হয়েছে, জানতে হয়েছে, বন্ধুত্ব করতে হয়েছে, ওঠাবসা করতে হয়েছে। এঁদের কবিতা পড়েই আমাকে দিশা ঠিক করতে হয়েছে ‘কবিতা’ কাকে বলে। কী করে কবিতা লিখতে হয়। কী করে ‘আধুনিক কবি’ হতে হয়। এইসব। কবি হতে হলে হালিম মিয়া নামক কাউকে চিনবার দরকার পড়ে না। একদমই না।

এই ব্যাটা হালিম তাহলে কে? ইনি আবার কোথেকে? ঐকে বাংলাদেশের বড়ো মাপের কবি বলার কী কারণ? শুধু আবদুল হালিম নন, বাংলাদেশের বড়ো মাপের কবি আছেন আরো অনেকে। এই তো এই লিখাটি যখন লিখছি তার কয়েকদিন পর ২৪ এপ্রিল জালালুদ্দিন খাঁর জন্মশতবার্ষিকী। অসাধারণ কবি তিনি। খুবই নীরবে, এই বিশাল কবি প্রতিভা মধ্যবিস্তার নজর এড়িয়ে এক শ’ বছর পার করে দিলেন। বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নাই যেখানে তিনি নাই। অর্থাৎ কেউ না কেউ তাঁর গান গাইছে। ‘মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এ মস্তগা কে দিয়াছে?/ মানুষ ভজ কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে’—তাঁর খুবই চেনা একটা গান।

গান? অবশ্যই। কারণ অক্ষর বা মধ্যবিস্তার শিক্ষিত শ্রেণীর মুদ্রণ কণ্ঠকৌশলের বাইরে যে-সংস্কৃতি ডালপালা শাখা কাণ্ডে সজীব তার মাধ্যম ছাপা-পৃষ্ঠা নয়, মানুষের কণ্ঠ। যে-ইন্ড্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার নির্মাণ সেটা শ্রুতি বা কান। চোখ নয়। এঁদের গান অক্ষর-কণ্ঠকৌশলের বাইরে সাধারণ অনক্ষর বা নিরক্ষর মানুষের প্রাণবস্ত, সচল ও শক্তিশালী সংস্কৃতির ধারা হিসাবে বহাল। মধ্যবিস্তার শ্রেণী এই ধারাকে অস্বীকার করে। মধ্যবিস্তার শ্রেণীর ছাপা পদ্য মধ্যবিস্তারই পড়ে, সাধারণ মানুষ সেগুলো পড়ে না, কারণ পড়তে পারে না। যদি সাধারণজনের কেউ পড়তেও শেখে তবু বশ করতে পারে না, মজা পায় না। ওর মধ্যে যে মাল তার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়শীলতা বা উপলব্ধির কোন যোগ সে খুঁজে পায় না। একটা শ্রেণীগত ফারাকে দুটো জগত দু দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মধ্যবিস্তার শ্রেণী মনে করে তার জগতটাই সকলের জগত, তার সংস্কৃতিটাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি। অনক্ষর বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এই ফালতু গোমর দেখে হাসবে না অবাক হবে বুঝতে পারে না।

বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতি দারুন শক্তিমান। জালাল, হালিম, রজ্জব আলী দেওয়ান এদের গানের বা কাব্যের যে জনপ্রিয়তা তার ধারে কাছেও মধ্যবিস্তার কবির পৌছাতে পারবে না। ‘মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এ মস্তগা কে দিয়াছে/মানুষ ভজ কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে’—ধর্ম বা ধর্মতত্ত্বের একাটা ব্যাখ্যা বা একচেটিয়া বয়ানের বিরুদ্ধে মানুষ/আল্লাহ বা জীব/পরমের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিস্তার শিক্ষিত শ্রেণীর, তারা ধর্মনিরপেক্ষ হোক বা ইসলামপন্থী হোক—শিল্পসাহিত্য, চিন্তা, ভাষা, কবিতা লিখার ধরন প্রভৃতি একরকম, আর এই শ্রেণীর বাইরে জনগণের যে বিশাল সংস্কৃতি তার স্বভাব ও চলন আলাদা। উদাহরণ দেই। শামসুর রাহমান কি এখনো লিখবেন—

শামসু মিয়া চিনলো না তোমারে, আপন ঘরে... ইত্যাদি ?

না। কাব্যের ধরন এবং আঙ্গিকের মধ্যেই শ্রেণীগত ফারাক খচিত থাকে। তরুণ কবির শামসুর রাহমানকেই অনুকরণ করবে, আবদুল হালিমকে নয়। কারণ রাহমানের দিকেই আছে আভিজাত্য, নিজেকে 'আধুনিক' বা অগ্রসর মনমানসিকতার অধিকারী হিসাবে পরিচয় দেবার সদর রাস্তা। অন্যদিকে, আবদুল হালিমদের দিকে আছে 'গ্রাম্যতা', 'অনাধুনিকতা', আর তথাকথিত 'পশ্চাদপদতা'; সেই সড়ক চলেছে 'আধুনিকতা'র উল্টো দিকে, কে যাবে সেই সড়কে ?

ব্যাপারটা বরং সম্পূর্ণ উল্টো। ঔপনিবেশিকতার ওরসে যে মধ্যবিত্ত আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে তার পক্ষে 'আধুনিক' ইউরোপীয় চিন্তা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে; ভাবুকতা, দার্শনিকতা, চিন্তা নিয়ে চিন্তা—এইসবের কারবার অনুধাবন এই শ্রেণীর পক্ষে কষ্টকর। এর নানান কারণ আছে। মূল দু'একটা কারণের কথা বলি। ইউরোপ চিন্তার ক্ষেত্রে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেই পৌঁছানোর কীর্তি শুধু হাতে কলম, টেবিলে কাগজ আর গালে হাত দিয়ে ভেবে ভেবে ঘটে নি। তার পেছনে আছে দীর্ঘ রাজনৈতিক আর সামাজিক সংগ্রাম। তাকে 'রক্তাক্তভাবে পুরনো, প্রাক-পুঁজিতাত্ত্বিক সম্পর্কগুলোকে উপড়ে ফেলতে হয়েছে। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে গ্রিক-খ্রিষ্টীয় চিন্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। এই দেশের মধ্যবিত্ত সেই মুরোদ এখনও দেখায় নি। রাজনৈতিকভাবে এবং আর্থ-সামাজিক ভাবে পুরনো সমাজের রূপান্তর ঘটাবার লক্ষ্যে নিজের সংস্কৃতিসহ সমাজের গোড়ার দিকে তাকাবার হিম্মত এই শ্রেণীর এখনো হয় নি। ইউরোপ নিজের চিন্তার পরিমণ্ডল নিয়ে ভেবেছে এবং নিজেকে গ্রিক-খ্রিষ্টীয় বলে শনাক্ত করেছে ও পরিচিতি দাঁড় করিয়েছে। নিজের চিন্তার পরিমণ্ডল চিনবার খাটুনি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী খাটে নি; দুই ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পরদেশের গোলামি করতে হয় নি। ফলে তার সংস্কৃতির মধ্যে গোলামগিরি নাই। মনিব বা শাসকের দৃঢ়তা ও শক্তি তার মধ্যে আমরা দেখি, ফলে অন্য জাতি বা জনগোষ্ঠীর প্রতি যে নির্মমতা বা নিষ্ঠুরতা আমরা ঐতিহাসিক ভাবে দেখে আসছি সেটা ভিনজাতির বা ভিনদেশীয় চিন্তার প্রতিও তার সমান মাত্রায় আছে। তিন, অন্যের অনুকরণ করে সে 'সভ্য' হয় নি, তার সভ্যতাই সে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে কিম্বা অন্যেরা অনুকরণ করেছে।

ঔপনিবেশিকতার মধ্যে উৎপাদিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে আশ্চর্যজনক ভাবে সংস্কৃতির ভিন্ন একটি ধারা আজ অবধি বয়ে চলেছে। এই ধারা ঔপনিবেশিক 'আধুনিকতা' অনুকরণ করে নি, নিজের ঘরে বসে, নিজের ভাষায় বসবাসের সুবাদে ও তাগিদে এই ধারা মানুষের গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলো তুলেছে এবং তার নিজস্ব কায়দায় উত্তর দিয়েছে। উত্তর দিতে গিয়ে অসাধারণ মৌলিক এক চিন্তা পদ্ধতি, প্রকরণ ও বক্তব্য গড়ে তুলেছে, যার তুলনা নাই। এই অর্থে যে তাকে ইউরোপীয় চিন্তা ও চিন্তার প্রকরণ থেকে ভিন্ন বলে সহজে যেমন চেনা যায়, অন্যদিকে মানুষের চিন্তার সার্বজনীন

স্বভাবকেও শনাক্ত করা যায়। সেই ধারা মোটা দাগে ঔপনিবেশিক মধ্যবিস্তার সংস্কৃতি থেকে আলাদা, কিন্তু তার মধ্যে বিস্তার ভিন্ন ভিন্ন ধারা এবং উপধারা, তর্ক বিতর্ক, বিচার, পর্যালোচনা, নতুন অন্তর্দৃষ্টি, ইত্যাদি নানামুখে বইছে। এই ধারাই বাংলাদেশের মূলধারা এই অর্থে যে বাংলাদেশের সংস্কৃতির নাড়িটা এই ধারার মধ্যে। এর ভাষা ও ভাবের যে পরিমণ্ডল সেখানে বসেই বাংলার ভাবুকতা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই মূলধারার একজন একালের কবি হচ্ছেন আবদুল হালিম। এই ভাষা ও ভাবকে হালিম মিয়া নিজেও চিনতে পারেন নি বলেই কি বলছেন, হালিম মিয়া চিনলো না তোমারে, আপন ঘরে...? মূল গান থেকে আলাদা করে শুধু এই বাক্যটি পেশ করলে এই রকম একটি অর্থ হতেও পারে। ক্ষতি নাই। কবিতা তো নানান দিকে একসঙ্গে তর্জনী নির্দেশ করতেই পারে।

সে যাই হোক। এই বিশাল বিষয় নিয়ে বিস্তার কথাবার্তা বলতে হবে। আমি এখানে শুধু গানটির দুটো লাইন নিয়ে নিজের কথা গোছাবো। বা আমার নিজেকে আমার নিজেরই নাড়ির সঙ্গে ঝাঁধব। আমি নিজে মধ্যবিস্তার শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত ধারায় ‘শিক্ষিত’ হয়েছি। ফলে বাংলার ‘মূলধারা’—বা বাংলার ভাবুকতার ভাষা ও ভাবের নাড়ির সঙ্গে আমার নিজেরও বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেই নাড়ি এখন খুঁজছি। ‘মূলধারা’ কথাটা আমি খুবই শিথিল অর্থে এখানে ব্যবহার করছি। ভাল কোন শব্দ বা ধারণা হাতে এখন গজালো না। শিথিল কেন? কারণ একটি ধারাকে মূলধারা বলা মানে এই নয় অন্য ধারা নকল বা বাইরের কোন জিনিস। এই ধারণাটি শ্রেণীগত পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করছি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল ঔপনিবেশিকতা আমাদের চিন্তায়, ধ্যানধারণায় এবং সংস্কৃতিতে যে ছেদ ঘটিয়েছে সেই ছেদের অসুখ এই ধারায় নাই। এই ধারার মধ্যে কোন রূপান্তর বা বদল ঘটে নি যে তা নয়। এর একটা একক ধারাবাহিক ইতিহাস আছে সেটাও সত্যি নয়। এর মোড়, মোচড়, দিকভ্রান্তি, নতুন পথ আবিষ্কার—সবই আছে, যেমন একটি জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে সবসময়ই এই ধারা তার নিজের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে পুরনো ধারাবাহিকতার অভ্যস্তর থেকে কথা বলছে। সে সেটা পেয়েছে কারণ তার বসবাসটা তার নিজের ভাষা ও ভাবুকতার মধ্যে। বেদ, উপনিষদ, নাথপন্থা, বৌদ্ধ সহজিয়া, চৈতন্যতন্ত্র, ইসলাম, সুফি আন্দোলনসহ যা কিছুই নিম্নবর্ণের মানুষের ভাবনাচিন্তায় নাড়া দিয়েছিল নড়ে উঠবার সেই সাড়া এবং সজীব উপলব্ধি এখানে অনায়াসেই চোখে পড়ে। বাংলার এই মূলধারার মধ্যেই মৌলিক ভাবুকদের জন্ম হয়েছে। আমাদের ভাবুকতার জমিকে যদি উর্বর করতে হয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি চাষ শুরু করতে হবে এইখানে। যদি নতুন কিছু আমরা ভাবতে চাই, তাহলে শুরু করতে হবে এখান থেকেই। কারণ বাংলার নাড়ি ঠিক এখানে, এঁদের সঙ্গেই ঝাঁধা। আর ঠিক ছেদবিন্দুও এইখানেই।

কী করে করব তার কায়দা তৈরি মালের মতো পেটেন্ট করে ছাড়ব সেই তাকত আমার নাই। আমার কাজ মূলধারার দিকে—নিজের ভাষা ও ভাবের দিকে নিজের

নজর ফেরানো এবং অন্যদের নজর ছিনতাই করে এখানে বসানো। বাংলার মৌলিক ভাবনাচিন্তা করবার জায়গাটির খোঁজ খবর করা। শেখা। জানা। সেই জন্যে এখানে হালিম মিয়া'র দুটো লাইন নিয়ে নাড়াচাড়া করব।

কি সেই দুটো লাইন? সেগুলো হোল :

তাল্লা মারা কালেমাতে [১]

চাবি রয় মুর্শিদের হাতে

মুর্শিদ ছাড়া খুলবি কেমন করে?

কালেমা বা কলেমা—যে-উচ্চারণ মধ্য দিয়ে সত্য বা যে-কোন বিষয় নিজেকে ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠা করে তার চাবি মুর্শিদের হাতে। গানটি আমি প্রধানত বয়াতির মুখেই শুনেছি। তাঁরা 'কালেমা'কে কখনো 'কলেমা', কখনও 'কলমা' এই রকম উচ্চারণ করেন—গানের সুরের খাতিরে। এখানে আমি 'কালেমা'ই লিখেছি। এখন থেকে শুধু 'কালেমা' লিখব। কালেমা সাধারণ অর্থে কালাম বা বাক্য। তাহলে এর সাধারণ অর্থ দাঁড়াচ্ছে বাক্যের চাবি মুর্শিদের হাতে। মুর্শিদ ছাড়া সেই চাবি খোলা যাবে না।

কেন? কালাম বা বাক্যের মধ্যেই কি বাক্যের অর্থ নিহিত নাই? সত্য হাজির নাই? না। কারণ বাক্যের মধ্যে বাক্যের অর্থ নাই, বাক্যের সত্য বাক্যের ভেতরে হাজির থাকে না। যাঁরা মনে করেন বাক্যের মধ্যেই বাক্যের অর্থ নিহিত তারা নেহায়েতই বেকুব। তাহলে কোথায় বাক্যের অর্থ? কোথায় কালেমার মানো? সেটা মুর্শিদের কাছে। মুর্শিদ? যিনি সত্য জানেন, সত্য চেনেন, সত্যের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। যে-বিষয় নিজেকে বাক্যে প্রকাশ করছে, যিনি সেই বিষয়ের সাকার রূপ—অধরা বিষয় বাক্যের আগেই যিনি ধরেছেন। জানেন। অভিজ্ঞ যিনি। বাক্যের অর্থ কেবল তাঁরই জানা। তাঁর কাছেই বাক্যের চাবি। যিনি গুরু। যাঁর কাছে অধরা কালেমা বা বাক্য ধরা দিয়েছে।

কিন্তু মুর্শিদ মানে তিনি কারো না কারো মুর্শিদ। তাহলে মুর্শিদ ও আশেকানের সম্পর্কের মাঝখানে এই 'চাবি'—এই 'কালেমা'। হয়তো সম্পর্ক সূত্রও। তার মানে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিকতার মধ্যেই এই 'তাল্লা' ও 'চাবি' আমাদের বুঝতে হবে। কাউকে এই সম্পর্ক থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে নয়।

কি বিষয়ের ওপর এই গান? এই কাব্য? বাক্যার্থের ওপর। বাক্যের অর্থ কোথায় থাকে তার ওপর এই গান। অর্থাৎ বিষয়টি ভাষাতত্ত্বের। কিন্তু কিসের অর্থ? কার অর্থ? পুরো গানটি তুলে দেওয়া যাক।

রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে, আপন ঘরে

রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে

যে-জন তোমার হৃদ-মাজারে নিজীবকে সজীব করে

দেখবে তারে প্রেমদীর কিনারে, আপন ঘরে।।

লাহুত, নাজুত, মালাকুত, জবরুদ
মোকাম আওরুত, মোকাম হাহুত
খাদ মোকাম মাহমুদার ওপরে
লা-মোকামে খুললে তালা
দেখবি সেদিন রূপের মেলা
সোনার মানুষ সদাই বলক মারে, আপন ঘরে।।

তালা মারা কালেমাতে
চাবি রয় মুর্শিদের হাতে
মুর্শিদ ছাড়া খুলবি কেমন করে।।

ঘরে তোমার ভাঙা বেড়া
রিপুতে কইরাছে টেরা
মনের বেড়ি লাগাও শক্ত করে, আপন ঘরে।।

যে হইয়াছে ভাবের মরা
চর্মচোখ তার বন্ধ করা
মাশুক বিনে কান্দে জারে জারে।।

যেদিকে তাকাই আঁখি
সেদিকে তোমারে দেখি
হালিম মিয়া চিনিল না তোমারে, আপন ঘরে...

‘রূপসাগর’ শব্দটির গুণে রবীন্দ্রনাথের ‘রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপরতন আশা করি’ গানটির মিল খোঁজার কোন দরকার নাই, বরং তুমুল পার্থক্য খেয়াল করলে বাংলার ভাবাদোলনের শক্তির জায়গাটা আমরা ধরতে পারব। শব্দ ব্যবহার বা প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য শুধু নয়, মূল দর্শনের বা ভাবচর্চার পদ্ধতি, প্রকরণ ও মীমাংসার ফারাক অনুধাবন করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথের গান গীতিকবিতা—তার মধ্যে ততোটুকুই ভাব যতোটুকু বাক্যের অলংকার, উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রতীক খানিক ইশারা করে, করতে পারে—কবিতার স্বভাবের মধ্যে এটা আছে। কিন্তু আবদুল হালিম গীতিকবিতা লিখতে বসেন নি, ভাবচর্চা করতে নেমেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবকুতার চর্চা হিশাবে কবিতা বা গান লেখেন নি। তাঁর কবিতা আমাদের মধ্যে ভাবের রেশ ঘটায়, অবশ্যই। কিন্তু ভাবের চর্চা করা, ভাবকুতার প্রশ্ন তোলা ও মীমাংসার যে প্রক্রিয়া, প্রকরণ ও তাকে একটা মীমাংসার দিকে নিয়ে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথে তা অনুপস্থিত। থাকার কথাও নয়। ভাবকুতা মাত্রই কাব্য, কিন্তু কবিতা মাত্রই ভাবকুতা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুল হালিমের তুলনামূলক বিচারের সুযোগও এখানে নাই। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গান বাক্য আর বাক্যার্থের সম্পর্ক নিয়ে কিম্বা গুরুশিষ্যের পারস্পরিকতা ‘তালা’ ও ‘চাবি’-র সমস্যা নিয়ে ভাবিত নয়। তবে পাঠক ইচ্ছা করলে নিজে তুলনা করে দেখতে পারেন।

আবদুল হালিমের পুরো গানটি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার আছে আমার। কিন্তু এখানে গানের দুটো কলির ভেতর দিয়ে ভাষাতত্ত্বে প্রবেশ করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করব। ভাষাতত্ত্ব নিশ্চয়ই বাক্যের অর্থ নিয়ে অনেক কথাই বলেছে। আবদুল হালিমের গানটিকে ‘আধ্যাত্মবাদী’ বা ‘মারফতি’ গান বলে আমরা উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু বাক্যের অর্থ কি করে তৈয়ার হয় সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। হালিম বলছেন একটা ‘রূপসাগর’ আছে, ওর মধ্যে ডুবলে ‘তঁাকে’ পাওয়া যাবে। আমরা তো থাকি এই রূপের জগতেই। তাহলে কি রূপের জগতের মধ্যেই ডুব দিতে হবে। যদি ডোবা যায় তাহলে আমরা দেখব যে হৃদয়ের যে স্থানটি উপাসনার পবিত্র স্থান, সেই ‘হৃদ-মাজারে’ যিনি ‘নিজীব’-কে ‘সজীব’ করছেন তিনি আছেন ‘প্রেমনদীর’ কিনারায়।

তিনি কে? তিনি সত্য। সকল দর্শনের শেষ দর্শন তিনি, সত্যের সত্য। আবদুল হালিম কিন্তু এখানে একবারও ‘আল্লাহ’র কথা বলেন নি বা এমন কোন পরমার্থিক সত্তার কথাও তোলেন নি। শুধু বলছেন, রূপসাগরে ডুবে দেখ। কিন্তু এই রূপসাগরকে আবার বলছেন ‘আপন ঘর’। ভেতর বাহির এখানে একাকার হয়ে আছে। নির্দেশ হচ্ছে ‘ডুবে দেখ’, নিজের ঘরেই যা খুঁজছ তা পাবে। নিজের ঘর? নাকি ‘আপন ঘর? ‘নিজ’ এবং ‘আপন’—এই দুইয়ের ভাবগত পার্থক্য বিশাল। একটি হচ্ছে মালিকানার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মামলা। কিন্তু ‘আপন ঘর’ মানে যে ঘরে ‘আমি’ বসত করে। ‘আমি’ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বসত করে না, বসত করে ‘আপন ঘরে’। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ‘আমি’ আর আপন ঘরের ‘আমি’—এই দুইয়ের একটা ফারাক ইঙ্গিতে হলেও থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সেই দিকে এখানে যাবে না।

ডোবাডুবির কথা নতুন ব্যাপার নয়। এর আগেও বলা হয়েছে। কিন্তু রূপসাগরের আপন ঘরে নিজের মধ্যে ডুবব কেন? ডুবব এ কারণে যে ‘আমি’ নামক যে সত্তা ‘তঁাকে’ খুঁজছে সেই ‘তিনি’ তো ‘আমি’র মধ্যেই আছে। ‘আমি’/‘তিনি’—এই ভাগটাও তো করছে ‘আমি’। অতএব ‘আমি’/‘তিনি’র অর্থ এবং এই দ্বিবিভাগের মানে খুঁজতে হবে নিজের মধ্যেই, রূপসাগরের মধ্যে ডুবে। ঘুরে ফিরে তাহলে শব্দগুলোর উৎপত্তি, অর্থ কিম্বা অন্তর্নিহিত মর্ম বিচারের কথাই বলা হচ্ছে। রূপ—শব্দ এবং অর্থের যে বিচিত্র জগৎ—তার উৎপত্তির কারণ খুঁজতে হলে এই রূপসাগরের বাইরে যাবার কোন উপায় নাই, রূপসাগরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে চিন্তার ‘বিষয়’ গণ্য করলে রূপের উৎপত্তি কারণ বোঝা যাবে না। ‘ডুবতে’ হবে রূপের মধ্যেই। ‘ডুব’ দেওয়া কথাটার মানে এখন অনেক গভীর হয়ে উঠল।

আমরা বেশি গভীরে ‘ডুব’ দেবো না। যে –‘আমি’ থেকে জগতের এই বিচিত্র রূপের উৎপত্তি বুঝতে পারছি—যার কোন ভেতর/বাহির নাই—ডুবুরি হতে হবে সেই ‘আমি’র মধ্যে। ডুবাক হতে হবে নিজের মধ্যে নিজেেকেই—রূপ ধারণ করে রূপের মধ্যেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আমিত্বের মধ্যে আমিত্বের ডোবাডুবি নয়—আমার মধ্যে আমার।

‘আমি’-কে যদি এতোটুকু আপাতত বুঝি তাহলে ভাষার দিক থেকে মামলাটা এইভাবে একরকম সাজানো যায় যে ‘আমি’ নামক উচ্চারণের উৎপত্তি কী করে ঘটলো? অনুমান করা যায় এই উচ্চারণের মধ্য দিয়েই ‘আমি’ নিজের অস্তিত্ব জাহির করে, করতে পারে। ‘আমি’ নামক একটা ব্যাপার যে আছে ভাষার মধ্যে তার চিহ্ন আমরা পাই। যদি ‘আমি’ উচ্চারিত না হোত তাহলে ‘আমি’ নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে পারত কিনা আমরা জানি না। কিন্তু সেটা অনেক দূরের অনেক গভীরের প্রশ্ন। ‘আমি’ ব্যাপারটা আমরা বুঝি বলেই ধরে নি, বুঝছি মনে হলেও ‘আমি’ আসলে কী তার কিনারা আবিষ্কার আজো দর্শনে বা ভাবুকতার অসম্পূর্ণ কাজ হয়েই রয়েছে। স্বীকার করি যে ‘আমি’ কথাটার অর্থ দুই একটি বাক্যে কখনই পরিষ্কার করা যাবে না, এখানে সেটা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তাহলে আরো সহজ স্তরে এসে আমরা প্রশ্ন করি: ‘আমি’র অর্থ কী?

‘আমি’ ভাষার একটি প্রতীক। ভাষা। শব্দ বা ভাষার ‘অর্থ’ খোঁজা মানে ভাষার মধ্যেই ভাষার অর্থ খোঁজার কথা প্রস্তাব করা হোল। আবদুল হালিম ভাবুকতার যে বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে ‘আমি’-কে চিহ্নিত করতে চাইছেন, আমরা সেই পরিমণ্ডলে থেকেও আরো সংক্ষিপ্ত পরিসরে টেনে এনেছি। কারণ আমরা দেখতে চাইছি আমরা তাঁর কয়েকটি বাক্য ধরে ভাষাতত্ত্বে বা ভাষার দর্শনে প্রবেশ করতে পারি কিনা। আমাদের অনুমান যে এটা সম্ভব। কারণ ‘আমি’ নিজে একটি ভাষা। এর অর্থ বোঝা মানে আবার ভাষাতেই শব্দটি ব্যাখ্যা করা। যেমন, এখন এখানে করছি। ভাষা দিয়ে ‘আমি’-কে ব্যাখ্যা করা —ভাষা দিয়ে ভাষার ব্যাখ্যা করা। হয়তো ‘আমি’র উৎপত্তি বিচার একই সঙ্গে ভাষারও উৎপত্তি বিচার।

ভাষা কি নিজের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজে ব্যাখ্যা করতে পারে? এটা বিশাল একটি প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটি শুধু মনে রাখতে বলব, এখানে তা আলোচনার অবসর পাবো না।

‘আমি’র অর্থ খোঁজার কথা বলে বা রূপসাগরে ডোবার কথা বলেই পরক্ষণে বলা হোল উল্টো কথা। ভাষার মধ্যে, বা ‘আমি’র মধ্যে অর্থ খুঁজলে ভাষা বা ‘আমি’র অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থ রয়েছে ‘আমি’র বাইরে, ভাষার বাইরে। সেই অর্থের চাবি মুর্শিদের কাছে। নিজের অর্থ যদি নিজে বুঝতে চাও, বলা হচ্ছে, মুর্শিদের কাছে যাও। তোমার মধ্যেই আছে তোমার অর্থ, কিন্তু চাবি রয়ে গেছে মুর্শিদের হাতে, তাঁকে ছাড়া অর্থের দরোজা খোলা যাবে না।

এটা ভাষাতত্ত্বের প্রশ্ন ঠিকই, কিন্তু খুব সংকীর্ণ অর্থে ভাষাতত্ত্বের মামলা নয়। ‘কালেমা’র কথা বলে গুরুশিষ্যের পারস্পরিকতার মধ্যে ‘আমি’-র বিষয়টিকে ভাষার প্রশ্ন আকারেই কিন্তু উত্থাপন করা হোল। বাক্যের মধ্যে বাক্যের অর্থ আছে কি নাই এই প্রশ্নটার উত্তর তাহলে খুঁজতে হবে। সে বিষয়ে যাবার আগে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে দু একটা কথা বলব।

ভাষাতত্ত্ব, কম্পিউটার এবং মানুষ

বাক্যের অর্থ কি করে তৈয়ার হয়? ‘তৈয়ার’ শব্দটায় মেশিন-মেশিন ভাব লাগে। তবে এখনকার ভাষাতত্ত্ব যখন পড়ি তখন কলকারখানারই আওয়াজ কানে ভাসে। নোআম চমস্কির ট্রান্সফরমেশনাল গ্রামার নিয়ে প্রথম যখন একটু আধটু পড়ার চেষ্টা করছিলাম তখনও কানে কম্পিউটারের আওয়াজ পেয়েছিলাম, তবে পরিষ্কার ধরতে পারি নি তখন। বোধ করি, বয়স ছিল কম আর তার ওপর ছিল চমস্কির ব্যাকরণের প্রতি যতোটা নয় তাঁর ‘নৈরাজ্যবাদের’ প্রতি দারুণ আগ্রহ। তবু চমস্কির ব্যাকরণের ওপর প্রথম এবং একমাত্র লিখা যখন লিখি তখন টের পেলাম মন খচখচ করছে। ভাষার একটা বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, শরীরবৃত্তিক দিক আছে। এই বস্তুতাত্ত্বিকতা বীহেভিয়রবাদী বি এফ স্কিনারের মতো নয়, এটা বুঝলাম, কিন্তু ভাষার পেছনে ‘মন’ নামক যে সত্তাটাকে ধরতে চাইছিলেন চমস্কি সেটাকেও যেন যান্ত্রিক মনে হোল। মনে হোল একটা হাত-মেশিন চলছে, ওর নাম গমপেয়াই কল, একদিকে গম ঘুরছে, মেশিন ঘুরছে, অন্যদিকে আটা বেরিয়ে আসছে। গমপেয়াই কল? দুঃখিত, Recursive logic। অর্থাৎ বিশেষ্যপদ (Noun Phrase) আর ক্রিয়া পদ (Verb Phrase) চমস্কির লজিকমেশিনে ঢুকে বাক্য হয়ে বেরিয়ে আসছে। চরিত্রের দিক থেকে গ্রাম্য আর আদ্যোপান্ত বঙ্গীয় খাসিলতের কারণে তত্ত্বটা খুব মনে ধরলো না। টের পেলাম আমি চমস্কি বা প্রায় কাছাকাছি ক্লদ লেভী-স্ট্রাস-এর ‘মন’ খুঁজছি না। চমস্কির ওপর লিখে ভাল হোল, নিজেকে চিনলাম। লিখার মধ্যে এই তত্ত্বের প্রতি সন্দেহটা প্রচ্ছন্ন হলেও লুকিয়ে রইল না (মজহার ১৯৭৭)।

তখনই কম্পিউটারের আওয়াজ পেয়েছি। ‘মন’-এর যে-মডেল বেরিয়ে আসছে ট্রান্সফরমেশনাল গ্রামার থেকে সেটা কম্পিউটারের মডেল। ‘সীমিত’ বিশেষ্যপদ আর ক্রিয়াপদ থেকে ‘অসীম’ সংখ্যক বাক্য উৎপাদন করার মেশিন। ষাট দশকের শেষের দিকে কম্পিউটারের যুগ আসি আসি করছে। ট্রান্সফরমেশনাল গ্রামার হয়তো-বা চাইছিল এমন এক ব্যাকরণ তৈরি হোক যাতে কম্পিউটার মানুষের মতো কথাবার্তা বলতে সক্ষম হয়ে ওঠে। কম্পিউটার মানুষের মতো সমান সৃষ্টিশীলভাবে বাক্য উৎপাদন করবে বা ভাষাসম্পন্ন হবে সেটা দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। তাহলে কম্পিউটারকে মানুষ হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু ঘটনা ঘটতে থাকল অন্যরকম। মানুষের ভাষা-স্বভাবকে কম্পিউটারের অনুকরণযোগ্য করতে গিয়ে কখনো সচেতন বা কখনো অসচেতনভাবে এই তত্ত্বই দাঁড় করানো হোল যে ভাষা কম্পিউটারের মতো। ফলে ভাষাতত্ত্বের একটা ধারা কম্পিউটার টেকনোলজির অধিক কিছু আর হয়ে উঠতে পারল না। তারপর দেখা গেল ‘মানুষ’ নামক ব্যাপারটির যে মডেল দাঁড় করানো হোল সেটা রক্তমাংসহাড় দিয়ে তৈরি একটা কম্পিউটার মাত্র।

ভাগ্য ভালো যে মানুষ কম্পিউটারের মতো নয়। ফলে ভাষাতত্ত্ব ইতোমধ্যে বিস্তর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসেছে। চমস্কির প্রতি আমার আগ্রহ কমে নি, বরং বেড়েছে।

কারণ, ভাষার একটা গমপেয়াই দিক আছে। সেটা তিনি ধরেছেন, এবং তা করতে গিয়ে ভাষার স্বভাব বুঝতে চাইলে সদর রাস্তা কোন দিকে সেই ইশারা তিনি করতে পেরেছেন। ভাষাকে গমপেয়াই কলের ধারণা দিয়ে পুরাপুরি বোঝাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলে সেই ব্যর্থতা থেকে আমরা সদররাস্তার দিশাটাও পেয়ে যাই। সেই সদর রাস্তা শুধু বাক্যতত্ত্বের দিকে নয় একই সঙ্গে অর্থতত্ত্ব নিয়েও। বাক্য আর অর্থকে আলাদা জ্ঞান করে ভাষার রূপ আর মর্মের যে পার্থক্য আমরা করি ভাষার স্বভাব বোঝার জন্য তা প্রতিবন্ধক। রূপ আর মর্মের ফারাকের মামলা নয় এটা। ভাষা যদি এই অর্থেই ভাষা হয় যে তার দ্বারা মানুষ অর্থ উৎপাদন করতে পারে তাহলে ভাষায় উচ্চারিত বাক্যকে তার অর্থ থেকে আলাদা করে বিচার করলে ভাষার স্বভাব আমরা ধরতে পারব না। ভাষা মাত্রই অর্থোৎপাদনের সম্ভাবনার ভরপুর চিহ্নব্যবস্থা। ভাষার অর্থ মানে ডিকশনারি খুঁজে অর্থ করবার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। কারণ এক অর্থ থেকে আরেক অর্থে আমরা যতোই কম্পিউটারের মতো ক্লিক করতে থাকি বা ভাষাকে হাইপারটেক্সট জ্ঞান করে এক টেক্সট থেকে অন্য টেক্সটে যাই – ততোই আমরা ভাষা বিচারের মুশকিলে খাবি খেতে থাকি।

একটি ভাষাচিহ্নের ‘অর্থ’ মানে কি তাহলে ডিকশনারিতে পাওয়া আরেকটি ভাষাচিহ্ন? আরেকটি শব্দ ব শব্দবন্ধ? কিন্তু ভাষায় আমরা যদি কোন কিছু প্রকাশ করি, সেই প্রকাশ তো অভিধানের আরেকটি শব্দ নয়। ভাষার ব্যাকরণও নয়। ভাষাকে উপায় জ্ঞান করে যা আমরা প্রকাশ করতে চাই তাকে প্রকাশ করার মানে কী তাহলে? সেই প্রকাশকেই তো আমরা ‘অর্থ’ বলছি। প্রকাশের ‘বিষয়’ আর প্রকাশিত ‘অর্থ’ এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে। এই ভেদের মীমাংসা সম্ভব কি? ‘অর্থ’ মানে কি ভাষা দিয়ে যে-বিষয় আমরা প্রকাশ করতে চাই তাকে আরেকটি শব্দ হিসাবে ডিকশনারিতে পাওয়া ভাষা? একটি চিহ্ন দিয়ে আরেকটি চিহ্নের প্রকাশ? তাহলে যাকে আমরা ‘ভাষা’ বা উপায় বলছি আর যাকে অর্থ বা ‘বিষয়ের প্রকাশ’ গণ্য করছি তাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন পার্থক্য নাই। একটি চিহ্ন অন্য একটি চিহ্নের অর্থ হতে পারে। একবার ভাষা ‘উপায়’ আরেকবার ভাষা ‘অর্থ’ হতে পারে। একটা চক্রের ফাঁদে আমরা পড়ে যাচ্ছি। এই ভাবে যদি দেখি তাহলে ভাষার মধ্যে ‘অর্থ’ অনুসন্ধানের ধারণাই এখানে দারুন মুশকিলে পড়ে যায়। আবদুল হালিম আমাদের এই সব প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়।

তাহলে অর্থ মানে কি? ভাষার মধ্যে অর্থ কি সাক্ষাৎ বা অব্যবহিত ভাবে হাজির? বোধ হয় না। ভাষার মধ্যে যা নাই, যা গরহাজির, যাকে আমরা ভাষাচিহ্নের মধ্যে অনুসন্ধান করে বেড়াই—সেটাই কি তাহলে ভাষার অর্থ? এই অর্থেই কি আমরা ভাষার মধ্যে ভাষার অর্থ নিহিত নাই কথাটা বলছি? ইয়া, এটা প্রধান কারণ। অর্থাৎ যা হাজির নাই, বা কখনোই হাজির থাকে না, ভাষার মধ্যে নাই, অনুপস্থিত—সেই গরহাজির ‘বিষয়’ আমাদের আলোচনার বিষয় করবার জন্যই এই আলোচনা। কিন্তু করছি আবার ভাষার মধ্যেই। এই কথাটা মনে রাখলে আবদুল হালিম বা বাংলার ভাবুকদের ভাবের পরিমণ্ডলের গৌরব আমাদের সহজে নজরে আসে।

হালিম আমাদের এই সকল প্রশ্নের দিকে নিয়ে যান অবশ্যই, কিন্তু প্রশ্নগুলো তোলেন বাংলার ভাবান্দোলনের পরিমণ্ডল থেকে। সেই দিক থেকে ‘তালা’ এবং ‘চাবি’ সম্পূর্ণ অন্য এক অভিধা তৈরি করে। আমরা যদি সত্য জানতে চাই, সত্য প্রকাশ করতে চাই, সত্য নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাই তাহলে তা ভাষা, বাক্য বা কোন না কোন চিহ্ন ব্যবস্থা দিয়ে করি। সত্য সেই ভাষায় বা চিহ্নব্যবস্থায় ‘অর্থ’ হিশাবে থাকে বলে আমরা অনুমান করি এবং সেই অর্থ উদ্ধার করতে বা কথাবার্তার অর্থ বুঝলে সত্য আমরা জানি। কিন্তু ভাষার মধ্যে যদি সেই অর্থ হাজির না থাকে তাহলে সত্য জানব কি করে? সত্যকে তাহলে ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

হালিম ভাষার এই মুশকিল মানবেন। কিন্তু ভাষা বা তাঁর ভাষায় ‘কালেমা’-র গৌরব ছাড়বেন না। কালামে অর্থের অনুপস্থিতির দরজাও বন্ধ থাকে, আর তার চাবি থাকে মুর্শিদ বা গুরুর কাছে। কেন? কারণ এই যে আমরা ‘গরহাজির’, অনুপস্থিতি’ — ইত্যাদি ভাষারও তো একটা অর্থ আছে—তারও একটা সত্য আছে। ‘ভাষা বা কালামের মধ্যে অর্থ সদাই অনুপস্থিত’—এই ধরনের বাক্যের অর্থোদ্ধার বা সত্যোদ্ধারের সংকট তো থেকেই যায়। একটা স্ববিরোধিতার মধ্যে আমরা খাবি খেতে থাকি। একবার বলছি ভাষার মধ্যে অর্থ হাজির থাকে না। কিন্তু দাবি করছি এই যে ভাষা দিয়ে বলা হোল যে, ‘ভাষার মধ্যে অর্থ হাজির থাকে না’—তার অর্থ করব তাহলে কীভাবে?

হালিম বলছেন, ব্যাপারটা ‘তালা’ আর ‘চাবি’-র মামলা। আসলে কালেমায় সদাই তালা মারা থাকে, ফলে আমরা তা খুলতে পারি না। আর ‘চাবি’ থাকে মুর্শিদ বা গুরুর কাছে। তিনি যদি সেই তালার চাবি খুলে দেন তাহলে আমরা সেই গরহাজির ঘরে প্রবেশ করতে পারি। সেখানে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। কেন? কারণ ভাষা বা কালেমার মধ্যেই ‘আমি’ বসবাস করেন। কারণ কালেমাই মানুষের ঘর।

এই অবস্থান বাক্যের বিভিন্ন অর্থ তৈরির সম্ভাবনাকে নাকচ করছে না, যে কোন কালামেরই অর্থোৎপাদন ক্ষমতা অসীম। একটি বাক্য দেশকালপাত্র ভেদে আমাদের মধ্যে নতুন অর্থ তৈরি করতে পারে। এমনকি একই বাক্য আগে যে অর্থ হয়ে নিজের ঘর খুলে দিয়েছিল, সেই বাক্যের অর্থও অন্য সময় বদলে যেতে পারে। বাক্য বা কালামের এই অনিঃশেষ অর্থোৎপাদনের সীমা তাহলে কোথায়? পাশ্চাত্য দর্শনে জাক দেরিদা এবং এই কালে ভাষার নানান দর্শন এই উত্তর সম্ভান করতে গিয়ে দেশকালপাত্রভেদে বাক্যের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা বা না থাকার তর্কে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু শেষাবধি এক টেক্সট থেকে আরেক টেক্সটে ছুটে বেড়ানো ছাড়া অর্থের শেষ গন্তব্যের কোন নির্দেশ তাঁরা দিতে পারেন না। যদি বাক্য বা কালামের অর্থ সবসময়ই অনিশ্চিত থাকে তাহলে ‘সত্য’ নামক কোন নিশ্চিত অর্থ তৈরিও অসম্ভব। সত্য যদি আদৌ থেকে থাকে তাহলে বাক্য বা কালামের মধ্য দিয়ে তাকে হাজির করতে পারার কথা। কিন্তু বাক্য বা কালামের যখন কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ সম্ভব নয়, তখন সুনিশ্চিত সত্য প্রতিষ্ঠাও বাক্য বা কালামে

অসম্ভব। যদি নিশ্চয়-সত্যই না থাকে বা ভাষা-সম্পন্ন মানুষ ভাষার মধ্যে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানতে না পারে তাহলে সত্য কায়মের জন্য লড়াই বা রাজনীতিও এই ধরণের ভাষা দর্শনে অসম্ভব।

দেখা যাচ্ছে আবদুল হালিমদের কালাম-দর্শন অবিনির্মাণবাদীদের পর্যালোচনাও বটে। অবিনির্মাণবাদী বা সমগোত্রের অন্যান্য ভাষা দার্শনিকদের সঙ্গে আবদুল হালিম একমত যে কালাম, বাক্য বা ভাষার অর্থোৎপাদনের সম্ভাবনা অসীম। কিন্তু গুরু সেই অর্থের সীমাও বটে। কোন বাক্য, কালাম বা ভাষার সুনির্দিষ্ট অর্থ কি হবে তা জানার চাবি সুনির্দিষ্ট ভাবেই গুরুর কাছেই থাকে। কালামের অর্থ কি হবে তার কর্তৃত্ব একমাত্র গুরুর। গুরুই জানেন। শুধু দেশ কাল পাত্র ভেদে বা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিচারে নয়, একই সঙ্গে নির্বিশেষ বিচারেও একটি বাক্যের অর্থ কী হতে পারে গুরু তা নির্ণয় করেন। গুরু একই সঙ্গে বিশেষ ও সামান্য। শিষ্য ভেদে একই বাক্যের অর্থও তিনি ভিন্ন ভাবেও করতে পারেন। যে যেমন লায়কে সেই বিবেচনা করে তিনি শিষ্যের কাছে বাক্যের তালা খোলেন।

পাশ্চাত্যের অবিনির্মাণ (deconstruction) তত্ত্ব বা জাক দেরিদার প্রস্তাবনার সঙ্গে বাংলার গুরুবাদী ধারার কোথাও মিল এবং কোথায় পার্থক্য সেই দিকে সতর্ক নজর থাকা দরকার। এই দিকটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অবিনির্মাণতত্ত্বে আদৌ রাজনৈতিক তৎপরতা সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু আবদুল হালিমদের কালাম-বিচারে এই প্রশ্ন ওঠে না। বাক্য এই ক্ষেত্রে গুরুর অধীন, কিন্তু গুরু বাক্যের অধীন নন। নতুন অর্থের এবং নতুন সত্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানের একমাত্র কর্তৃত্ব গুরুর। রক্তমাংসসম্পন্ন বিশেষরূপী গুরুর বাইরে বাক্যের কোন সার্বভৌম অস্তিত্ব আবদুল হালিম মানবেন না। গুরুই বাক্যের অর্থ করেন, অতএব কালামের অর্থোৎপাদনের সীমা গুরুর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। বাংলার ভাব বাক্যের অর্থোৎপাদনের অপার সম্ভাবনার কথা মানবে অবশ্যই। বাক্যের মধ্যে আগে থাকতেই তৈরি হয়ে অর্থ হাজির আছে বলে ধরে নেবে না বা বাক্য আগে থেকেই হাজির থাকা কোন সত্য প্রকাশ করছে গণ্য করে কালামকে সত্য প্রকাশের উপায়-মাত্র গণ্য করবে না। কিন্তু দাবি করবে দেশকালপাত্র ভেদে অবশ্যই প্রতিটি কালামের সত্য আছে আর সেই সত্যে প্রবেশের চাবি গুরুর কাছেই থাকে। এখানে অর্থের ওপর গুরু বা রক্তমাংসের মানুষের কর্তৃত্ব মানে বাংলার ভাবান্দোলন। কাজে কাজেই গুরুর কারণে বাক্যের দেশকালপাত্র নির্দিষ্ট সত্যও আছে। বাক্যের সত্য গুরুরূপে যদি হাজির থাকে তাহলে তার রাজনীতিও সম্ভব। নিশ্চয়-সত্যের অধিবিদ্যার (Metaphysics of presence) সমালোচনা করে অবিনির্মাণতত্ত্ব রাজনৈতিক তৎপরতাকে সংশয়বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু গুরুবাদী ধারা অবিনির্মাণতত্ত্বের এই অভাবের উত্তর, সম্ভবত।

গুরুর কর্তৃত্বের আরো গভীর তাৎপর্য আছে। সেটা সত্য বহু নয়, এক। বহু সত্যের যে তত্ত্ব অবিনির্মাণবাদীরা তৈর করার ফলে বহু মত ও চিন্তার রাজনীতির নামে

যেভাবে উদারবাদী রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ায় গুরুবাদে সেই সমস্যা নাই। সত্য যদি এক ও একনায়কী হয়, গুরু ও এক ও একনায়কী। গুরুবাদী ধারা বহুবাদী রাজনীতির উপাসক নয়, প্রতিটি যুগে যে সুনির্দিষ্ট রাজনীতির জন্য কর্তৃত্ব তৈরি অত্যাবশ্যক সেই রাজনীতিরই পোষক হবে বলে আমার ধারণা। এই দিক থেকে বাংলার গুরুবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য অসামান্য।

ফলে কালেমা বা ভাষা মাত্রই ‘তালা মারা’। খোলা যায় না। এক চিহ্ন থেকে আরেক চিহ্নে দৌড়ঝাঁপই সার, অনন্তকাল অভিধান উল্টানো, ডিকশনারির মধ্যে উইপোকা হয়ে কাগজ খেয়ে যাওয়া। কিন্তু অর্থ কই? অর্থ নাই। গরহাজির। অনুপস্থিত। যাকে খুঁজি সে তো ভাষায় নাই। চাবি মুর্শিদের হাতে, গুরুর কঙ্জায়। তাঁকে ছাড়া কী করে ভাষার চাবি খুলি আমি? আবদুল হালিমের প্রশ্ন।

দেখা যাচ্ছে এখনকার পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে আবদুল হালিমের মিল যতোটা তার চেয়ে অমিলও অনেক বিশাল। ভাষা বা কালেমার যে পাঠ তিনি আমাদের দিলেন সেখানে গুরুশিষ্যের পারস্পরিকতা পুরো মাত্রায় বর্তমান। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কালেমার চরিত্র বিশ্লেষণ। ভাষার অর্থবিচার।

আমরা ‘আমি’ নামক ভাষাচিহ্নের অর্থ সন্ধান করছিলাম। আমাদের অনুমান ছিল যদি তার ‘অর্থ’ আবিষ্কার করতে পারি তাহলে ‘আমি’ ব্যাপারটা আমরা বুঝব। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা সম্ভব নয়। কারণ ভাষা বা ভাষাচিহ্নের অর্থ ভাষার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া এমন ধারণা ভুল—এমনকি অর্থও ভাষার মধ্যে অনুপস্থিত। এটাই ভাষার স্বভাব। হালিম বলছেন ভাষাচিহ্ন মাত্রই তালা মারা আর চাবি রয়েছে গুরুর হাতে। তাহলে ‘আমি’ ব্যাপারটা কি সেটা তাহলে গুরু ছাড়া বোঝা যাবে না।

চমস্কি এইসকল গুরুর প্রশ্ন সরাসরি তোলেন নি। সেটা তাঁর বিষয় ছিল না। কিন্তু বাক্যের অর্থ কী করে তৈরি হয় সেই প্রশ্ন দানা বাঁধাতে তিনি ভাষাতাত্ত্বিকদের সহায়তা করেছেন। তাঁর গম্যপেটাই মেশিন দিয়ে তিনি কার্যকর কোন অর্থতত্ত্ব দাঁড় করাতে পারলেন না। এই ব্যর্থতাটাই প্রমাণ করেছে ভাষাসম্পন্ন ‘মানুষ’ মানে মানুষ। মানুষ আর কম্পিউটার এক জিনিস নয়। অতএব ‘আমি’র অর্থ খোঁজা, ‘আমি’ নামক ভাষাচিহ্নের দরজা খোলা একটা জরুরি এজেন্ডা হিসাবে থেকেই যাচ্ছে। ‘আমির’ অর্থ কী করে হয়, সেই প্রশ্ন আবাবো তুলেছেন দার্শনিকেরা। চুটিয়ে এখন তর্কবিতর্ক চলছে আবাব।

ধরে নিতে পারি, বলা বাহুল্য যে, আবদুল হালিম এইসব কাহিনী একদমই জানেন না। তিনি সরাসরি প্রশ্নগুলি তুলেছেন কারণ এগুলো বাংলার ভাবুকতার খুবই প্রাথমিক প্রশ্ন। এখনকার ভাষাতত্ত্বের পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য চমস্কি ছাড়া অন্য যে কোন ভাষাতাত্ত্বিকের উদাহরণ দেয়া যেত। চমস্কির কথা এখানে তুলেছি কারণ চমস্কিকে অনেকেই আমরা চিনি। নেহায়েত সেই কারণে।

ভাষা-বিচারের ক্ষেত্র এখন দাপটের সঙ্গে বিচরণ করছে অর্থতত্ত্ব। তাহলে সরাসরি অর্থতত্ত্বেই যাওয়া যাক। চমস্কিকে রেখে এমন একজনকে দিয়ে শুরু করব যিনি

আমাদের অতো পরিচিত নন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জগতে ও দর্শনের জগতে সুপরিচিত। তাঁকে সামনে খাড়া করে আবদুল হালিমকে বিচার করব। দেখব কেন হালিম নিজেই নিজে বললেন, হালিম মিয়া চিনলো না তোমারে...। ইত্যাদি।

হালিম মিয়া এবং রুথ কেম্পসন

তালা মারা কালেমাতে, চাবি রয় মুর্শিদের হাতে, চাবি ছাড়া খুলবি কেমন করে? এটা একটি প্রশ্ন। হালিম মিয়া প্রশ্ন করছেন, কি করে কালাম বা বাক্যের তালা খোলা যায়। শব্দের অর্থ খুলবো কি করে আমরা? কারণ তালার চাবিটাতে রয়েছে মুর্শিদের কাছে।

সাধারণ অর্থে কালাম মানে কথা, বাক্য, শব্দ, ইত্যাদি। ইংরেজিতে statement যে অর্থে একই সঙ্গে উচ্চারণ, ঘোষণা এবং বাক্য, কালেমাও সেই অর্থে উচ্চারণ, ঘোষণা বা বাক্য।

তাহলে এই কলি কয়টি কী ইঙ্গিত করছে? কালেমা, statement বা বাক্যের 'চাবি' মুর্শিদের হাতে। 'চাবি' কথাটার মানে কী? একটা সম্ভাবনা আমরা ওপরে বলেছি যে এর অর্থ কালেমার মধ্যে 'আছে' বলে যা মনে হয় অথচ নাই—সেই গরহাজির ঘরে প্রবেশের উপায়: গুরুশিষ্য সম্পর্ক, গুরুশিষ্যের পারস্পরিকতা। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কালাম, statement বা বাক্যের অর্থ বা মানে সম্পর্কে। বলা হচ্ছে, কালাম, statement বা বাক্যের মধ্যে তাদের অর্থ নেই, অর্থের চাবিকাঠি ওদের বাইরে, মুর্শিদের হাতে। অর্থ আছে অন্যত্র, অন্যের কাছে, অপরলোকে। মামলাটা তাহলে অর্থতত্ত্বের। সে কারণেই আমরা একজন ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে যাচ্ছি। দেখি, বিষয়টি আসলে কী।

রুথ কেম্পসন (Ruth Kempson) অর্থতত্ত্বের ওপর একটি দরকারি বই লিখেছিলেন। বইটি কেন্দ্রিভ থেকে ১৯৭৫ সালে ছাপা হয়েছিল, নাম *Presupposition and the Delimitation of Semantics*। মোটামুটি বিখ্যাত বই। সেখানে দেখা যায় রুথ কেম্পসন 'প্রিসাপোজিশান', পূর্বানুমান বা বাক্যের মধ্যে আগেই-ধরে-নেওয়া অর্থের কী সংজ্ঞা হতে পারে তা নিয়ে ফাঁপরে পড়েছেন। যদি ধরে নি যে কোন বাক্যের মধ্যে বাক্যটির অর্থ নিহিত থাকে আছে তাহলে সেই অর্থ আগেই বাক্যের পূর্বানুমান হিসাবে হাজির থাকার কথা। নইলে তো তার অর্থ করা যাবে না। এখন রুথ বলছেন, 'প্রিসাপোজিশান'-কে সংজ্ঞায়িত করা যাবে 'in one of two ways—either as relation between statements (parallel to entailment, synonymy, etc) or as a property of the speaker's belief in uttering a sentence'.

তাহলে রুথ বলছেন, দুভাবে এই পূর্বানুমান জাতীয় বাক্যার্থের সংজ্ঞা খাড়া করা যেতে পারে। এক নম্বর: বিভিন্ন বাক্য বা statement-এর মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে, ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে। অথবা, দুই নম্বর: যিনি বাক্য উচ্চারণ করছেন বা যার কাছ থেকে

statement-টা আসছে তাঁর বিশ্বাসের স্বভাব পর্যালোচনা করে। মুর্শিদের চরণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের খুব বেশিদূর যেতে হোল না। স্পিকার বা যিনি কалаম বা বাক্য উচ্চারণ করছেন, সেই উচ্চারণের পেছনে তাঁর বিশ্বাসের ‘প্রপার্টি’—মানে, বিশ্বাসের স্বভাব বা গুণাগুণ বিচার করে বাক্যের অর্থ ঠিক হবে। হালিমের মুর্শিদ মানে তাঁর গুরু। যিনি নিজের কалаম বা বাক্য তাঁর সামনে উচ্চারণ করেন, কিম্বা অন্য কалаম তাঁকে শেখান, পথ দেখিয়ে দেন। রুথ কেম্পসনের কথা ধরলে মনে হয় মুর্শিদ যা কিছুই বলেন বা উচ্চারণ করেন না কেন তার অর্থ উচ্চারিত কалаম বা বাক্যের মধ্যে থাকে না। থাকে তাঁর নিজের মধ্যে। উচ্চারণের পেছনে তাঁর নিজের যে ধারণা, পূর্বানুমান, বিশ্বাস—ইত্যাদির মধ্যে। কалаম বা বাক্যের অর্থের ‘চাবি’ তাহলে মুর্শিদের কাছেই থাকে—বাক্যের উচ্চারিত ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে নয়।

‘প্রিসাপোজিশন’-এর সংজ্ঞা খোঁজার দুটো সম্ভাবনা বা পথের কথা বলছেন রুথ কেম্পসন। দুটো পথের ফারাক আকাশ আর পাতাল। একটি পথ হোল, ভাষার মধ্যেই—কалаম বা বাক্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে বাক্যের অর্থ। ভাষা বা বাক্যের মধ্যে আগে থেকেই যদি কোন অর্থ নিহিত থেকে থাকে তাহলে ভাষার বিমূর্ত সাংগঠনিক নির্মাণের মধ্যেই তৈরি হয়ে আছে তারা। ভাষার উপাদান, কাঠামো, মালমশলার মধ্যে আছে ভাষার অর্থ। ভাষা কোথায় কোন জায়গায় কিভাবে কেমন করে ব্যবহৃত হোল তার সঙ্গে ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থোৎপাদন ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নাই। আর এর ঠিক উল্টোটি হোল, ভাষার অর্থ বস্তুর মনে কী আছে তার দ্বারা নির্ধারিত। কোথায় কখন কিভাবে কেমন করে একটি কথা উচ্চারিত হচ্ছে তার দ্বারা ঠিক হচ্ছে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে তার মানে। স্পিকার বা মুর্শিদের মনে কী আছে তার দ্বারা অর্থ হয়ে উঠছে ভাষা। জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা, কোন বাক্য উচ্চারণের আগে যে পরিস্থিতিতে স্পিকার বা মুর্শিদ থাকে, জগতের সঙ্গে সেই মুহূর্তে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাক্য অর্থ লাভ করে। অর্থাৎ ভাষার বিমূর্ত সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ভাষার অর্থ খুঁজে কোন লাভ নাই। ভাষা নিজে নিজের অর্থোৎপাদন করতে পারে না। ভাষার ‘চাবি’ অন্যত্র। স্পিকার বা মুর্শিদের হাতে তার চাবি।

এই দুই সম্ভাবনার আকাশপাতাল ফারাক রেখে তো আর ভাষাতত্ত্ব এগুতে পারে না। পারছেও না। এই নিয়ে মহা বিতর্ক চলছে, সে বহুদিন হোল। আমি নিশ্চিত হালিম মিয়া এই সব তর্কবিতর্কের খোঁজ রাখেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় ভাষা এবং তার অর্থোৎপাদনের ক্ষমতা বা অক্ষমতার গুরুতর দার্শনিক প্রশ্ন তাঁর কাছে অজ্ঞাত। কারণ ভাষা এবং তার অর্থোৎপাদনের ক্ষমতা বা অক্ষমতার প্রশ্ন একটা খাঁটি দার্শনিক প্রশ্নই শুধু নয়, এটা কাব্যের আদত প্রশ্ন। বাংলার এইসকল কবি, যারা যথার্থই কবি, তাঁরা মধ্যবিস্তৃত শব্দে কবিদের প্যানপ্যানে ‘আধুনিক’ পদের পেছনে কখনই ছোটেন নি। ফলে দর্শনের বা ভাবুকতার মূল প্রশ্নগুলো থেকে সরে আসেন নি তাঁরা কখনোই। ধরে রেখেছেন প্রশ্নগুলো। নানান কায়দায়, নানান উপমায়, নানান প্রতীকে। ফলে যখন রুথ

কেম্পসন বা পাশ্চাত্যের যে-কোন ভাষাতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের রচনা পাঠ করি তখন এই কথা ভেবে মজা লাগে যে এক অপক্লপ সারল্যে বহু প্রশ্ন বাংলার ভাবুকরা তুলেছেন। গ্রামে গ্রামে গেয়েছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রশ্নগুলো বুঝেছে, ভেবেছে, উত্তরের জন্য কাতর হয়েছে। সারারাত ধরে হাজার হাজার মানুষ সাধকদের, বয়াতিদের, কবিরালদের গান শোনে। ভোরে ধানক্ষেত আর গাঁয়ের পথে যখন সকাল ফুটে উঠতে থাকে তখন, হালিম মিয়া চিনলো না তোমারে ধরনের ভাব আর বিহ্বলতা সুরে আর কথায় ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ফেরে। কারণ সেই সাত সন্ধালেই তাকে আবার পাস্তা খেয়ে মাঠে গরু-হাল নিয়ে নেমে পড়তে হবে। উৎপাদন এবং ভাবুকতার যোগ ছাড়া খাঁটি দার্শনিক প্রশ্ন তৈরি হতে পারে না। আর কিনা এই পুরো ধারাটাই মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর কানের লতি ছুঁয়ে বাতাসে বেকার হয়ে যাচ্ছে, কারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি।

রুথ কেম্পসন কিন্তু এই দুই সম্ভাবনার কথা কয়ে ফাঁপরে পড়েছেন। সেটা আলোচনা না করলে মজা জমবে না। তিনি বলছেন, ‘যদি বক্তার বিশ্বাস বা ধ্যানধারণাকে (speaker's belief) বাক্যের অর্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অংশ (semantic interpretation of sentences) বলে আমরা গণ্য করি তাহলে এটাই মনে হয় যে বাক্যের অর্থ হতে হবে বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রতীক বা একগুচ্ছ প্রতীক এবং যে-বিষয় বা যে-অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়’। ভাষাতত্ত্বের চেষ্টা হোল যে-বিষয় বা অবস্থার বর্ণনা ভাষায় করা হয় ভাষার প্রতীক কাঠামো এবং বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্কের মধ্যে তার অর্থতাত্ত্বিক (semantic) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ ভাষার ফর্মাল বা সাংগঠনিক গুণাগুণের মধ্যে ভাষার অর্থ তৈরি হবার কলকল্লা নিহিত রয়েছে এটা প্রমাণ করা ভাষাতত্ত্বের একটা গরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। না হলে ভাষাতত্ত্ব নিজের অসারতাই প্রমাণ করল। ভাষা যে উপাদান দিয়ে তৈরি—তার শব্দ, বাক্য গঠন, ব্যাকরণ প্রভৃতি—সেই উপাদান ও তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিচার করে যদি কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ উদ্ধার অসম্ভব হয় তাহলে ভাষাতত্ত্বের তো আর কোন ভূমিকাই রইলো না রুথ কেম্পসন টের পেয়েছেন যে ভাষার সাংগঠনিক স্বভাব থেকে অর্থ তৈরি হবার তত্ত্ব বা ভাষাতাত্ত্বিক বাক্যার্থ সংক্রান্ত প্রকল্পটি তখনই হয়ে যাচ্ছে। কারণ শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পিকার বা বক্তার ‘প্রিসাপোজিশন’ কী ছিল তার সঙ্গে সম্পর্কিত—এই সত্য ভাষাতত্ত্বের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ বা হুমকি হয়ে উঠেছে।

যদি এই বিপদ মেনে নেওয়া হয় তাহলে, বাক্য যে-উপাদান দিয়ে গঠিত তার দ্বারা বাক্যের অর্থ তৈরি হয় এই প্রচলিত ধারণাটা পরিত্যাগ করতে হবে। কেন? কারণ কোন বাক্যের যদি সুনির্দিষ্ট একগুচ্ছ পূর্বানুমান (a unique set of presupposition) আছে এই কথা প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে বাক্যের অর্থ ঠিক হবে বক্তা আর শ্রোতার (speaker-hearer) মনে কী আছে তার দ্বারা। অর্থাৎ গুরুশিষ্যের সম্পর্ক কিম্বা মুর্শিদ এবং তার আশেকান বা প্রেমিকের সম্পর্ক স্থির করে দেবে বাক্যের অর্থ কী। কালামের

মর্মার্থ স্থির হবে কোন শাস্ত-মর্মার্থ সম্পন্ন কোরাণ শরিফ দিয়ে নয়, বা খোদ কলমা বা কলাম দিয়ে নয়; জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানপিপাসুর কিম্বা মুর্শিদের সঙ্গে সত্যের পেছনে পাগল হয়ে ছুটে আসা আশেকান বা প্রেমিকের ওঠাবসা চলা ফেরা আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি সহ মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং সেই সম্পর্ক বিশেষ যে দেশকালপাত্রের গড়ে উঠছে তার দ্বারা। অর্থাৎ সমাজ বা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত অর্থোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিত হয়ে উঠবে। সত্য বা জ্ঞান কখনোই বাক্যের মধ্যে নিহিত থাকে না। যিনি জ্ঞান দিচ্ছেন এবং যিনি নিচ্ছেন তাঁরা কখন কোথায় কোন জগতে কোন অবস্থায় কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে বাক্য চালাচালি করছেন তার ওপর নির্ভর করবে ব্যবহৃত কলাম বা বাক্যের অর্থ। তাহলে কি ভাষা, বাক্য বা কলামের কোন দরকার নাই? আবদুল হালিমের আলোচনা করে আমরা দেখিয়েছি, এই অনুমান মেনে নিয়েও বাংলার ভাবান্দোলন ভাষা, বাক্য বা কলামের পক্ষে, কারণ ভাষার মধ্যেই ‘আমি’ বাস করে, মানুষের বসবাস। কলাম মিথ্যা নয়, কিন্তু তার অর্থের ঘরে ‘তালা’ মারা এবং তার ‘চাবি’ মুর্শিদের কাছে থাকে। অতএব মুর্শিদ ছাড়া এই ‘তালা’ কি করে খুলবেন এই হচ্ছে আবদুল হালিমের প্রশ্ন।

বলাবাহুল্য, আমি রুথ কেম্পসনের কথার জের ধরে আমার কথা বলছি। তিনটে কাজ আমাকে এক সঙ্গে এখানে করতে হচ্ছে, সেটা বেশ মুশকিলের। এক হোল রুথ কেম্পসনের কথা তুলে ধরা। আর তার পাশাপাশি আবদুল হালিমের কথা ভেঙে তার মর্মার্থ উদ্ধার করা। তিন নম্বর: নিজের কথা পাঠককে সহজ করে গুছিয়ে বলা। নিজের কিছু কথা না থাকলে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কেউই কাগজকালি নষ্ট করেন না। আমিও করি না। তবে কথা হোল এই, আমার নিজের কথা মানে আমার নিজের কথা মোটেও নয়। নিজের কথা বলে আগাগোড়া মৌলিক কোন কথা কেউ বলতে পারে এটা আর যাই হোক জ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। ফলে আমাকে এখানে দেখাতে হচ্ছে আমি যা বলতে চাইছি সেটা আবদুল হালিম এক ভাবে বলেছেন। বলেছেন আরো অনেকে। কিন্তু যদি আমি ‘গ্রাম্য’ কবি আবদুল হালিমের কথার পিঠে আমার কথা বলতাম তাহলে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে খুব একটা দাম পেতো না। ফলে আমাকে রুথ কেম্পসনের কথা তুলে বাধ্য হয়ে আঁতেলি করতে হচ্ছে, যা কিনা আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ভেতর কাজ করার এ এক কিস্তি পরিস্থিতি যেখানে নিজের কথা সহজ ও সরল করে বললেও স্রেফ কথার গুণে সেটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। বিদেশি সাক্ষী খাড়া করতে হয়। আবদুল হালিমরা সেটা সক্ষম হন নি বলে তাঁরা এখনো অধিপতি সংস্কৃতির বাইরে রয়ে গেছেন। অখ্যাত। অস্বীকৃত।

সে যাই হোক, রুথ কেম্পসনকে খুব ভেবেচিন্তে ডেকে এনেছি, তাও নয়। হালিমের গান ভাঁজতে ভাঁজতেই এসে গেলো। তাঁর সম্পর্কে প্রথমে আমি পড়েছি স্টেনলি ফিশের Doing What Comes Naturally গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে (ফিশ ১৯৮৯)। ফিশ রুথ কেম্পসনের কথার যে সারমর্ম টেনেছেন আমাদের আলোচনা জন্য তাই যথেষ্ট। ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের দায় দায়িত্ব একান্তই আমার।

রুথ বলছেন, যদি বাক্যের একগুচ্ছ পূর্বানুমান আগে থেকেই তৈরি আছে এটা ভাষাতত্ত্ব দেখাতে না পারে, বাক্যের অর্থ আগেই তৈরি হয়ে আছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বক্তা এবং শ্রোতা ভেদে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ভেদে বাক্যের অর্থ হবে নানান রকম। তাহলে, ‘বিশেষ অবস্থায় স্পিকার (বা বক্তা কিম্বা হালিমের মুশেদ) কী বলছে তার বাইরে স্বাধীন ভাবে বাক্যের কোন অর্থ নির্ণয় করা যাবে না’। খুবই মুশকিলের কথা।

ব্যাপারটি যদি এখানেই শেষ হোত তাহলে এক রকম হোত। কিন্তু রুথ কেম্পসন আরো এগিয়ে গেছেন। আরো বিপদ আছে ভাষাতত্ত্বের জন্য। যদি একটি বাক্যের এই রকম হাজার মানে হয়, আর বাক্যের অর্থ যদি বাক্যের গঠন দিয়ে তৈরি না হয়ে একটা অনির্ণীত জায়গায় গিয়ে ঝুলে থাকে তাহলে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের অন্বয়, কিম্বা বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সুবিরোধিতা এগুলো সম্পর্কে আগে থেকে স্থির নির্দিষ্ট কিছু বলা যাবে না। এমনকি, রুথ কেম্পসন বলছেন, ‘....এ থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা হোল বাক্যের ব্যাকরণশীলতার (grammaticality of sentences) ব্যাপারটিও যে-পরিস্থিতিতে বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে তার বাইরে নির্ণয় করা যাবে না’। অর্থাৎ ব্যাকরণ ঠিক হোল কি ভুল হোল সেটাও ঠিক হবে কোন পরিস্থিতিতে কেমন করে কোন অর্থে একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছে তার দ্বারা।

বাক্যের অর্থ নিয়ে এই বিবাদ গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে বাংলার ভাবাদোলনে—আবদুল হালিমকে যার উদাহরণ হিসাবে নিয়েছি—সেখানে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক এবং কালামের আবশ্যিকতার তুলনা চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। ভাষা, বাক্য বা কালেমার অর্থ নিশ্চয়তা গুরুশিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অবশ্যই নিরীত হতে পারে—এর একটা ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। কালেমা নিজে নিজে অর্থ করতে পারে না। অন্যদিকে গুরু কালেমার মধ্য দিয়ে শিষ্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক রচনা করেন সেখানে অর্থের নিশ্চয়তা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত হতে হয় না। মুশকিলটা তখনই শুরু হয় যখন মানুষের জীবন্ত সম্পর্কের পারস্পরিকতার বাইরে, ভাষাকে সমাজ বা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার রেওয়াজ প্রবল হয়ে ওঠে। মানুষ বাদ দিয়ে কোন কালেমা নাই, আবার কালেমার বাইরেও মানুষ বাস করে না। গুরু নিজেও কালেমার উর্দ্ধে নন। কালেমা আশ্রয় করেই গুরু কথা বলেন, বাক্য হয়ে ওঠেন। এটা শুধু ধর্মবাক্য সম্পর্কে সত্য নয়। সকল ভাষা সম্পর্কেও। আমরা যে ভাষায় কথা বলি সে ভাষা আমাদের নয়, সামাজিক। এই সামাজিকতার মধ্যেই, দেয়া-নেয়া শোনা-বলার মধ্যেই ব্যক্তিগত উচ্চারণ সকলের ভাষা হয়ে ওঠে—অর্থসম্পন্ন হয়। নির্দিষ্ট দেশকালপাত্রের তার অর্থের ভিন্নতা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত হবার প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে গুরু-কালেমা-শিষ্যের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে অর্থও হাজার রকম হয় না। তার ‘অবস্থা ভেদে যদি অর্থভেদও ঘটে তবুও একই অবস্থায় কালেমার দশ রকম মানে হয় না। তাহলে কালামের ঘরে ‘তালার’ ও গুরুর হাতে ‘চাবি’ —কথাটির মধ্য দিয়ে গুরু-

কালেমা-শিষ্যের ‘সম্পর্ক’ সম্পর্কে নতুন ভাবগত অবস্থান আমরা টের পাচ্ছি, এখনকার পাশ্চাত্য চিন্তার কাঠামোর মধ্যে—রুথ কেম্পসনের নজির যেমন —আমরা ধরতে পারছি না। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তুললে বাংলার ভাবান্দোলনের নানান ধারার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারাতিকে চিনতে আমাদের সুবিধাই হচ্ছে।

একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল রুথ কেম্পসনের মনে। যদি পরিস্থিতির বাইরে স্বাধীন ভাবে বাক্যের কোন অর্থ তৈরি না হয়, যদি ভাষার বৈশিষ্ট্য ও গঠন থেকে ভাষার অর্থ বিচ্ছিন্ন বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কোথায় গিয়ে ব্যাপারটি গড়াবে? এ তো এক অন্ধকার রাস্তার দিকে চলছে ভাষাতত্ত্ব। ভাষাতাত্ত্বিক রুথ কেম্পসন ভয়ে একটা পিছটান দিলেন। এতোই হ্যাঁচকা সেই পিছটান যে তিনি সম্পূর্ণ উল্টো একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর অবস্থান হোল এইরকম: যেহেতু অর্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সম্ভাবনার এই ধারা ভাষাতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে ফেলা যায় না, এবং তার গতিমুখ যেহেতু একটা অনিশ্চয়তার দিকে, অতএব স্পিকার-ভিত্তিক অর্থের এই ব্যাখ্যা অর্থতত্ত্বের মধ্যে ঢোকানো যাবে না। অর্থাৎ কথক কোন কথা বলবার আগে যে অনুমান নিয়ে কথা বলেন সেই অনুমানই বাক্যের অর্থ—ভাষাতত্ত্বের আলোচনা থেকে একে ছেঁটে ফেলতে হবে বা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে।

বেশ কৌতুকের। তত্ত্বে ফিট করছে না ফলে নিজের জায়গা আঁকড়ে ধরে রাখার এটা ভাল উদাহরণ। এই মুশকিল স্বভাবতই আবদুল হালিমের নাই। ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোল কি না হোল তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। যে সত্য তিনি ব্যক্ত করছেন তার মধ্যেই ভাষাতত্ত্বের মুশকিল নিহিত রয়েছে। সেই মুশকিল বা সংকট ভাষাতত্ত্ব নতুন করে আবিষ্কার করছে মাত্র। রুথ কেম্পসন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ভাষাতত্ত্ব একটা মস্তো ফাঁপরে পড়েছে। ভাষাতত্ত্বের প্রধান প্রকল্প হচ্ছে ভাষার সাংগঠনিক দিক ব্যাখ্যা করা এবং দেখানো যে ভাষার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই অর্থ উৎপাদিত হয়। যদি ভাষাতত্ত্ব সেটা দেখাতে না পারে তাহলে তার পুরো প্রকল্পটাই বানচাল হয়ে যাচ্ছে। রুথ দেখছেন, অর্থ ভাষার সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে উৎপাদিত হয় এই সত্য হাঙরের মতো পুরো ভাষাতত্ত্ব নামক বিজ্ঞানকে গিলে খেতে ছুটে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে ভাষাতত্ত্বের সদর রাস্তায় উঠতে না দিয়ে মাঝ পথেই পেছনে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। বলবাহুল্য, এটা বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাব নয়। রুথ কেম্পসনের এই পিছটান নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরকার নাই। কারণ ভাষার সাংগঠনিক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা খারাপ কিছু নয়। ভাষাতত্ত্ব যদি দাবি করে যে কালাম বা বাক্যের ভেতরেও অর্থ তৈরি হয় বা কালাম বা বাক্য নিজে নিজেই অর্থ তৈরি করতে সক্ষম তখন ভাষাতত্ত্বকে ঘাড় ধরে বের করে দিলেই হোল। এই বেয়াদপি ভাষাবিজ্ঞানীরা হামেশাই করে থাকেন। সেই বিব্রত পরিস্থিতির মধ্যে যেন পড়তে না হয় তার জন্যই রুথ কেম্পসন আগে ভাগেই সটকে পড়েছেন। কালাম বা বাক্য কিভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে বা বাংলার

ভাবান্দোলনের দাবি অনুযায়ী গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে অর্থ তৈরি করে, সেই ক্ষেত্রে বিচরণ, বিশ্লেষণ বা অনুধাবনের যোগ্যতা ভাষাতত্ত্বের নাই। সেটা ভাবুকতার মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সেখানে বারবার আবদুল হালিমদেরই জিত হবে। জিত হবে ভাবুকদের, সাধকদের বা সোজা কথায় দার্শনিকদের। এতেটুকু যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে বাংলার মূল ভাবুকতার ধারার গৌরবের দিকটা আমাদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়বে।

তো আমরা আরো দুই একটি কথা বলে রূপসাগরে ডেবাডুবির কথা শেষ করব।

ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব

অনেকের ধারণা আবদুল হালিম বা তাঁর মতো বয়াতিদের এইসব গান নেহায়েতই আধ্যাত্মিক গান বা মরমিয়া গান। ওপরের আলোচনায় অন্তত এটা পরিষ্কার যে এটা শুধু মূর্খতা বা অজ্ঞতা মাত্র নয়। আমাদের মধ্যে ভাবুকতা বা দর্শন চর্চার অভাব আছে এবং এই সকল গানে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝা শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে অসম্ভবই বটে। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ও সভ্যতার কারণে নিজের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে ছেদ ঘটে গিয়েছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যকে চিন্তার জায়গা থেকে বোঝার কোন চেষ্টা নাই—এই দুটো অভাব একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাস্তিক্যবাদের চর্চা আর সাধারণ ভাবে ইসলামের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘৃণা। ইসলামের প্রতি ঘৃণা তার ভাষা ও ভাবের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা হিসাবে সক্রিয়, যে কারণে ‘কালেমা’, ‘মুশ্বিদ’ ইত্যাদি শব্দ বা ধারণার প্রতিও অন্ধ প্রতিক্রিয়া কাজ করে। এখানে ধর্ম বা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক দুই একটি কথা বলা অন্যায্য হবে না।

কোন বাক্য বা কালেমা যদি নিজেকে মানুষের বাইরে বা ওপরের কথামতো গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বা সাধারণ ভাবে সামাজিকতা বা মনুষ্যমূলক সপ্রাণ পারস্পরিকতার বাইরে স্বয়ম্ভু, সত্য ও শাস্ত্র গণ্য করে তাহলে সাধারণ ভাবে তাকে আমরা বলতে পারি ‘ধর্মতত্ত্ব’। খেয়াল করতে হবে গুরুশিষ্যের সম্পর্ককে প্রথাগত গুরুবাদ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করছি না। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরম মূর্খতা আছে। বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে এইরকম যে এই সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রেই একরকম—অর্থাৎ গুরুর প্রতি শিষ্যের অন্ধ আনুগত্য আর যে অর্থে তারা ‘দাস’ কথাটি মধ্যবিত্ত আক্ষরিক অর্থে বোঝে সেই ধরনের দাসত্ব। বুঝি এই সম্পর্কের ঐতিহাসিক কোন রূপান্তর নাই—আদিকাল থেকেই স্থির।

বিশেষ বাক্য বা কালেমাই নিজে নিজের অর্থ করতে সক্ষম এই ‘বিশ্বাস’—ই যখন সত্যের নিশ্চয়তা নির্ণয় করে তাকে এখানে আমরা ‘ধর্মতত্ত্ব’ বলছি। সত্যি যে ধর্মতত্ত্বের কারবার বিশ্বাস নিয়ে। আমরা একে বাক্যপূজা বা কালেমাপূজাও বলতে পারি। এই ধরনের ‘বিশ্বাস’ কোরান শরিফ বা রামায়ন মহাভারত গীতার ওপর যেমন থাকতে

পারে, ঠিক তেমনি থাকতে পারে মার্কস-লেনিন-মাও জে দং চিন্তাধারার নামেও। এই কারণে আমরা দেখি ভাবান্দোলনের সঙ্গে সকল ধরনের ধর্মতত্ত্বের বিরোধ আছে। আছেই। কারণ ভাবান্দোলন মানেই হোল কালেমা বা বাক্যের নতুন অর্থের সম্ভাবনা দেখানো, নতুন অর্থ তৈরি করা বা প্রথাগত অর্থকে বানচাল করে দেওয়া।

ধর্ম আর ধর্মতত্ত্ব আলাদা ব্যাপার। জিব্রাইল যে কোরান বহন করে আনছেন সে কোরান নিছকই একটা ‘গ্রন্থ’ বলে বাংলার ভাবান্দোলন মানে নি। কোরান কী তাহলে আর দশটা বইয়ের মতো বই? আর দশটা বই যেভাবে আমরা পড়ি তেমনি পড়লে কি কোরানের কোন ‘অর্থ’ উদ্ধার করা যাবে? কোরান শরিফকে অধিকাংশ সময় বাংলার ভাবান্দোলন বিচার করেছে নূরনবী মোহাম্মদ ও আল্লামার সম্পর্কচিহ্ন হিশাবে, যে সম্পর্কের দরোজা খুলতে হলে মুরশিদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আর যখন সেই “লা-মোকাম” (যে মোকাম আছে আবার নাই-ও) তালা খোলা যায় তখন সেখানে ‘রূপের মেলা’ দেখা যাবে বলে হালিম ঘোষণা দিচ্ছেন (‘লা-মোকামে খুললে তালা / দেখবি সেদিন রূপের মেলা / সোনার মানুষ সদাই ঝলক মারে, আপন ঘরে’। খেয়াল করার ব্যাপার ‘লা-মোকাম’, ‘সোনার মানুষ’, ‘রূপ’ ইত্যাদি যেসব ধারণা এখানে তৈরি হয়েছে তার অর্থ এখন আমাদের কাছে আর আক্ষরিক নয়। নতুন একটি ভাবের দ্যোতক হয়ে উঠছে তারা এবং সামগ্রিক ভাবের ছবিটা যদি আমরা ধরতে পারি তখন তাদের অর্থও তুলনামূলক অনেক পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ছে। ‘কালেমা’ ও তার অর্থবিচারের এই গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলোও আমাদের মুখোমুখি হচ্ছে।

ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং মনুষ্যসমাজে তাদের ভূমিকাও একরকম নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা নামে মধ্যবিন্ত শ্রেণী যা চর্চা করে তারা অধিকাংশ সময়ই ধর্মের একাত্মা বিরোধিতা করে, এই কাত্মা বিরোধিতার মধ্যে এই পার্থক্য কোন অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ যা ধর্ম তাই ধর্মতত্ত্ব আর সেটাই মসজিদ মন্দির গির্জা ইত্যাদি। নাস্তিকতা মসজিদ, মন্দির, জায়নামাজ আর পূজাঅর্চনা থেকে ধর্মকে আর আলাদা করতে পারে না, এমনকি অনেক সময় নীতিনৈতিকতাকেও আলাদা করে না। ধর্মের বিরোধিতা বা নাস্তিক হওয়া মানে তখন সবকিছুই বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নেয়। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই ধরনের প্রতিক্রিয়া নীতিনৈতিকতা-ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হওয়ারই নামান্তর। যেহেতু ভাবুকতার চর্চা মধ্যবিন্ত শ্রেণীর মধ্যে নাই বললেই চলে অতএব তাদের নাস্তিকতা অতিশয় নিম্নশ্রেণীর চিন্তাচেতনার আশ্চর্যজনক ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না। ধর্ম বা ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মও যে চিন্তা ও চিন্তার বিষয় হতে পারে এই ধারণা তাদের নাই। এই ধরনের বালখিল্য নাস্তিকতা বা মুর্থতার স্থান বাংলার ভাবান্দোলনে নাই।

বাংলার ভাবান্দোলনের এই ব্যাপারগুলোকে অনেকে শরিয়ত মারেফাতের দ্বন্দ্ব বলে চালান বলে দেখেছি। বয়াতিরাও শরিয়ত/মারেফাতের পালাগান করেন এবং

উভয়ের পার্থক্য নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে। কিন্তু সেটা ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেও আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং সমাজে এদের ভিন্ন কিন্তু প্রয়োজনীয় ভূমিকা কী হতে পারে তা নির্ণয়ের তাগিদে। যে কারণে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে ভাবান্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মের বিরোধিতা নয়, ধর্মের বিচার। ‘মানুষ’ কী?—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মানুষের ‘ধর্ম’, ‘স্বভাব’ বা ‘স্বরূপ’ নিয়ে কথা ওঠে। শরিয়ত মানি, মারেফাত মানি না, কিম্বা মারেফাত মানি, শরিয়ত মানি না—এই ধরনের ভেদবিচার বাংলার ভাবান্দোলনেও আছে। এই সকল বিষয় নিয়ে তুমুল দার্শনিক তর্কবিতর্কও আছে—কিন্তু সেই তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য ধর্মের বিরোধিতা বা শরিয়ত বিরোধী মারেফাতের ধারা নয়। বরং ধর্মচিন্তার মধ্যেই বিপুল প্রাণের সাড়া বা মানুষের মধ্যে মানুষকে ‘ডুববার’—‘ডুবাকু’ হবার আহ্বান মাত্র।

এই দিকটা খাঁরা বুঝতে ভুল করেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞান বা ভাবচর্চার মোল্লা আর পুরোহিতের যেমন আছেন, মূর্থ নাস্তিকরাও সমান পাল্লায় আছেন। এই দুই শ্রেণীর বাহ্যিক বিরোধের পেছনে তাদের আন্তরিক মিল চিনতে যেন আমরা ভুল না করি। মোল্লা আর পুরোহিতদের একটা অংশ মনে করে নামাজ আর পূজাঅর্চনাই ধর্ম। নাস্তিকরাও ধর্ম বলতে এটাই বোঝে। প্রায়শই নিজেদের এরা নাস্তিক বলে গর্ব করে অথচ বাংলাদেশের বাস্তবতায় সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রশ্নে এদের ভূমিকা হয় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীলের। মানুষের ভাব, দর্শন বা সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হিসাবে ধর্মের কোন ভূমিকা মানতে এরা রাজি না। ধর্মের আচারের দিক বা প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে ধর্ম বা ধর্মের মর্মকে অনেকে আলাদা করেন এবং আলাদা বিচারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতাও অনেকের মধ্যে দেখি। এঁরা তুলামূলক ভাবে সম্ভ্রম ও সচেতন হলেও তাঁদের অবস্থান ধর্ম বিরোধীদের মতোই। ধর্মের রূপ আর মর্মের পার্থক্য বহাল রাখা আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন।

কিন্তু আমরা আবদুল হালিমের গানটির দিকে যদি খেয়াল করি দেখব যে তাঁর প্রশ্ন সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। একটা শাস্ত্র অনন্তকালীন ‘গ্রন্থ’ বা ‘বাক্য’ নিজেই নিজে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষকে অর্থ দান করছে, অনন্তকাল একই রকমের অর্থোৎপাদন করছে এই ধারণাকেই আসলে আক্রমণ করছেন হালিম—ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত মুশকিল উদাম হয়ে যাচ্ছে। কোরান শরিফ হচ্ছে আল্লাম কালাম এবং এর অর্থ সুনির্দিষ্ট। এই কালামের মধ্যেই আছে কালামের অর্থ। ব্যক্তি, সমাজ, পরিস্থিতি, ইতিহাস নিরপেক্ষ সেই অর্থ; উর্দু, কোন এক অনন্ত অর্থোৎপাদনের মেশিন থেকে তৈরি হচ্ছে হাজার বছর ধরে একই ধরনের ‘অর্থ’, যার ওপর বিশেষ এক ধর্মবাদী শ্রেণীরই একচেটিয়া অধিকার; আসলে তাদেরই অর্থ তারা আল্লামের তরফে চালায়। —হালিম একচেটিয়া অর্থোৎপাদনের এই এখতিয়ারকেই তো নাকচ করছেন। সেই অর্থে ইসলামবাদী বা দিব্যবাদী যে কোন দল সম্পর্কেই এই কথা বলা যায় একচেটিয়া অর্থোৎপাদনের এখতিয়ার শুধু তাদেরই—এই দাবিই তো তারা করে। তাদের দাবি—অনন্তকাল ধরে

ঐশ্বরিক কালাম থেকে একই অর্থ উৎপাদনকারী ‘বাক্য’/‘কালাম’ বা text হিসাবে কোরানকে গণ্য করলে জ্ঞান বা ভাবের দিব্যচরিত্র নষ্ট করা হয়—মাশুকের সঙ্গে তার নবীর এবং কাজে কাজেই তার ‘অপর’ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এই সম্পর্কই যদি মানুষের ধর্ম হয় তাহলে এই সম্পর্ক নষ্ট হওয়া মানে অনিবার্য ভাবেই মানুষের ধর্মচ্যুত হওয়া—মানুষের অধার্মিক হয়ে ওঠা। কালাম বা বাক্য থেকে একচেটিয়া অর্থোৎপাদনের এখতিয়ার যদি আমরা না মানি তাহলে ধর্মতত্ত্ব (theology) অসম্ভব। বাক্যই অর্থ তৈরি করে, সেই অর্থ আল্লার কাছে আগাই ছিল, তিনি কালামে তা প্রকাশ করেছেন; সেই অর্থ সুনির্দিষ্ট ও শাস্ত্রত; কোরান পড়লেই সেই অর্থ বোঝা যাবে; এই অর্থের কোন ক্ষয় নাই, পরিবর্তন নাই, হেরফের নাই;—কালাম বা বাক্য সম্পর্কে এই ধারণারই পর্যালোচনা আমরা হালিমের গানে দেখলাম। ধর্মতত্ত্ব চায় বাক্য বা কালামের মধ্যেই কালামের অর্থ আছে এবং সেই অর্থ একমাত্র বাক্য উপাসক বা কালাম পূজারিরাই জানে – আর আবদুল হালিমের কথা হচ্ছে বাক্য বা কালামে সবসময়ই চাবি মারা থাকে, আর তালা থাকে গুরুর কাছে। কী করে তার অর্থ করব সেটা তো গুরুর কাছ থেকে চাবি আদায় করে না নিলে করা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে বাক্যের মধ্যেই বাক্যের অর্থ নিহিত—ভাষাতত্ত্বের এই প্রকল্প টেকে না। ভাষাতত্ত্বের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই প্রকল্প প্রমাণের পরিবর্তে ভিন্ন রাস্তার দিকে ভাষাতত্ত্ব চলে যাচ্ছে দেখে রুথ কেম্পসন ছিটকে পিছিয়ে এসেছেন। এই প্রকল্প আবদুল হালিমও মানতে রাজি না। তাঁর প্রকল্প ঠিক উল্টা। হালিম মানতেই রাজী নন যে বাক্য নিজের অর্থ নিজে করতে পারে। এটা নির্ভর করছে আগাগোড়াই স্পিকার কিম্বা মুর্শিদ বা গুরুর ওপর। তাঁর তালাচাবির সহজ একটা ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় যে কোন কালেমা বা বাক্যের অর্থ জ্ঞানসাধক বা ভাবুকরাই করেন। তাঁরা পরিস্থিতি, ইতিহাস, সমাজ বিবেচনা করে বাক্যের অর্থোৎপাদন করেন। কোন পরিস্থিতিতে কে কিভাবে কেমন করে কালামের ব্যাখ্যা করছে তার বিচার অনিবার্য করে তোলেন। গ্রন্থকেন্দ্রিক সকল বিশ্বাস প্রশ্নাত্মক হয়ে ওঠে। মার্কস-লেনিন-মাও জে দংয়ের চিন্তাধারা নামক বইসর্বস্ব ধর্মতত্ত্বেরও। তবুও হালিমের প্রকল্প এমনকি নতুন ব্যাখ্যা বা বয়ান তৈরির আকুলতাও নয়। তাঁর দাবি কালাম, বাক্য বা গ্রন্থের ঘরে প্রবেশের চাবি তাঁর নাই, সেটা মুর্শিদের হাতে। তাঁকে ছাড়া সেই ঘর তিনি কী করে খুলবেন? খুবই নতুন এই প্রশ্ন। বিস্ময়কর। কারণ একই সঙ্গে গুরু বা মুর্শিদ সম্পর্কেও নতুন ধারণা তিনি পেশ করছেন যার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের সম্পর্ক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ভাষাতত্ত্ব ধরে নেয় বা দাবি করে যে বাক্যের মধ্যেই, বা কালামের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে শাস্ত্রত অর্থ, আল্লা জিব্রাইলের মাধ্যমে যে অর্থ মুহম্মদকে পাঠিয়েছেন, কোরানেই তা আছে। যাঁরা নিজেদের নাস্তিক দাবি করেন অথচ ভাষার মধ্যেই ভাষার অর্থ খোঁজেন তাঁদের অবস্থা আরো করুণ। ধর্মতত্ত্ব অন্তত মনে করে একটা দিব্য মানুষের অগম্য ও জ্ঞানের অতীত উৎস থেকে অর্থ বাক্যে নাজিল হয়েছে।

নাস্তিক মনে করে একটা হাওয়াই কায়দায় বাক্যের মধ্যে আগেই অর্থ তৈরি হয়ে ঢুকে রয়েছে। ভূতের মতো।

ভাষাতাত্ত্বিকতা বা বাক্যে বিশ্বাসীগণ শেষাবধি মানুষের নয়, গ্রন্থের আধিপত্য কায়েম করে। করতে বাধ্য। সমাজ বা মানুষের পারস্পরিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রন্থকেন্দ্রিকতা সত্যকে নয়, দেশকালপাত্রে নির্দিষ্ট ঘোষণাকেই জ্ঞানের পরিণতি গণ্য করে। যা চিরায়ত সত্য ও শাস্ত। আবদুল হালিম মানুষকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অর্থোৎপাদনের কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং মানুষের অপার সম্ভাবনার পথ বারবার পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

হালিম মিয়া চিনলো না তোমারে...। এটা অবশ্য কথার কথা। আমি বিশ্বাস করি বাংলার ভাবুক বহু কিছুই বহুকিছু জেনেছেন। আমরা নতুন করে আবিষ্কার করছি মাত্র।

বাংলার ভাবান্দোলন

‘বাউল’ নামচিহ্নের নিশানা উড়িয়ে বিস্তর জঞ্জাল তৈরি হয়েছে। অথচ বাংলার ভাবান্দোলনের একটা বিশাল ব্যাপ্তি ও শক্তির দিক আছে। নানান জনের অনুসন্ধান ও গবেষণায় তার দীপ্তি খানিকটা আমরা এখন আঁচ করতে পারি। সেই ব্যাপ্তি ও শক্তির যে দিক বা দিগন্ত বাউল তাকেই পটভূমি গণ্য করে নিজের গ্রাম গড়ে তুলেছে, নির্মাণ করেছে তার ঘর। সেই দিগন্তের জ্যামিতির নজরে থাকলেই তার বসতির বিন্যাস কিংবা ঘরের স্থাপত্য টের হয়^১। সেই দৃষ্টিপাত থেকে দিগন্তের ভাষ্য খানিকটা তো নির্ণয় করা দরকার। নইলে বাংলার ভাবান্দোলন যেসকল বৈচিত্র্যে নিজেকে জাহির করতে উৎসুক তার সংবেদনা বোঝা দুঃসাধ্য। তখন লালন, পদ্যলোচন, ফটিক গোসাঁই, যাদুবিন্দু, রশীদ, রাধাশ্যাম, পাঞ্জু শাহ, হাউড়ে গোসাঁই, অনন্ত গোসাঁই, দুদ্দু শাহ, হাসন রাজা, রাধারমণ, দ্বিজদাসসহ আরো অনেককে মনে হবে নিছকই এক বান্দিলা নাম। এদের চিন্তার ঐক্য, পার্থক্য এবং বিরোধগুলো কোনো জীবন্ত তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াবে না।

তাছাড়া বাংলার ভাবান্দোলন তো শুধু বাউলদের ব্যাপার নয়। খবর নিতে বসলে কমপক্ষে বঙ্গের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম, সুফিতত্ত্ব ও সুফিদের ভূমিকা, শ্রীচৈতন্যের

^১ ‘দিগন্ত’ কথাটা খুব গুছিয়ে বোঝানো হোল না এখন। আমরা সাধারণত এইসকল ক্ষেত্রে ‘জ্ঞানকাঠামো’ বা চিন্তার ‘কাঠামো’ ধরনের যান্ত্রিক ভাবনায় অভ্যস্ত। আমি সেই যন্ত্রে ধরা পড়তে চাইছি না। গণিতের দর্শন নিয়ে যেভাবে কথাবার্তা আজকাল হয় সেখানে ‘গ্রাউণ্ড’ বলে একটা ধারণারও চল দেখেছি। সেটা চলে তবে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা খরচ করতে হয়। পটভূমি অর্থে গ্রাউণ্ড চলে। মঞ্চের পেছনের স্ক্রিন যেমন। স্ক্রিন মঞ্চের ঘটনাবলীর অংশ। ঘটনা অস্থির, কিন্তু পেছনের স্ক্রিন স্থির। নাটক যে ভাব তৈরী করে সেই ভাব বা অর্থোৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পেছনের পটভূমি। পটভূমি মানে পেছনের ‘ইতিহাস’ নয়। কারণ নাটক যখন চলছে পটভূমি কিন্তু স্থির। বাংলার ভাবান্দোলনের যে দিগন্তের কথা আমি বলছি সেও এই প্রকার স্থির। অথচ এই স্থিরতা অস্থিরেরই ব্যাকরণ মাত্র। এই ব্যাকরণ না জানলে বাক্য রচনা যেমন কঠিন, অর্থোৎপাদনও সমান অসম্ভব।

আন্দোলন-সংগ্রাম, শাস্ত্র ধ্যানধারণা ও শক্তি আন্দোলন এবং কবিতা ও বয়াতিদের নানান আন্দোলনের খোঁজ তো পড়বেই। বৌদ্ধ—বিশেষত মহাযান তরিকা এবং শাস্ত্র তন্ত্রের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত চর্যাপদ ও চুরাশি সিদ্ধার খোঁজ না নিলে বাংলার ভাবান্দোলনের যে দিক বা দিগন্তের কথা বলছি তাকে ফর্সা করা যাবে না। শহুরে কিছু শৌখিন মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বিনোদনমূলক পল্লীসঙ্গীত হিশাবে বাউল গান হাজির করার বেয়াদপিটা ক্রমশ পোক্ত হচ্ছে। ভাবগানের সঙ্গে তার মর্মকথা প্রচারের উদ্যোগ নেওয়াটা জরুরী। অন্যদিকে আমাদের বুদ্ধির কাছে সেই দিক বা দিগন্তের জ্যামিতি ধরা দেবার শর্তও বোধহয় খানিকটা তৈরি হয়েছে। এটা বড়ো কাজ। তামাশাগুলো না কমলে সেই কাজ শুরু করা দুঃসাধ্য হবে।

মনে হয়, নানান ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা সহজ ভাবুকতা এখন ক্রমশ নিজের স্থান নিজে করে নিতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের কি হাল সেই কথা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে বাংলার ভাবান্দোলনের একটা সজীব ও জীবন্ত রূপ বাংলাদেশে রয়েছে। অভিজাতদের ভাষায় বা তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা নয়। গ্রামের অতি সাধারণ কবি-ভাবুক বা বয়াতিদের মধ্যে এটা স্পষ্ট, বাংলার ভাবান্দোলনের ধারাবাহিকতা যারা এখনো ধরে রেখেছে। ভাব ও ভাষার দিক থেকে কলকাতা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেনি। গিয়েছে উল্টো পথে। সচেতনভাবে ভাষার সংস্কৃতায়ন হয়েছে, কিন্তু সেটা সংস্কৃত দর্শন ও জ্ঞানকাণ্ডকে আত্মস্থ করার জন্যে নয়, কিংবা তার সঙ্গে একটা ধারাবাহিক কিন্তু সজীব যোগসূত্র রচনার প্রয়োজনেও নয়। বাংলার বৃহৎ একটি সম্প্রদায় আরবি-ফারসি শব্দ তাদের কথাবার্তায় ব্যবহার করে। সেই ব্যবহারের ধর্মীয় প্রয়োজন তো আছেই, তাছাড়া ধর্মের সূত্রে ইসলামনিষ্ঠ সংস্কৃতির ক্রমাগত প্রভাবও রয়েছে। সেই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতি বঙ্গীয়করণের প্রক্রিয়াও সচল। মনে রাখা দরকার পাকিস্তান আমলে বাংলাভাষার ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চলেছিল সেটা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এখানে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের কথাই বলছি। বাংলাভাষার সংস্কৃতায়নের চেষ্টার একটা দিক হচ্ছে বাংলাভাষা থেকে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার বাদ দেওয়া। কিন্তু একই সঙ্গে তাকে আরো সংস্কৃতির অনুগামী করে তোলার চেষ্টাও চলেছে এবং এখনও চলছে। এতে সাধারণ মানুষের ভাবের ভাষা আর অভিজাতশ্রেণীর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে পার্থক্য বেড়েছে বিশাল।

কান টানলে মাথা আসে, এটা চলতি কাণ্ডজ্ঞান। কিন্তু কথটা আক্ষরিক মেনে নেওয়া রীতিমতো মুশকিল। কান টানলে অনেক সময় মাথা আসা দূরের কথা, কান ছিড়ে হাতের মুঠায় রক্তাক্ত উপড়ে উঠে আসতে পারে। মাথা থাকে অন্যত্র। বাংলার ভাবুকতা, জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস জানা এবং তাকে আমাদের সজীব দর্শনচর্চা ও তৎপরতার অংশ করে তোলা একটা বড়োসড়ো দায় হয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে বাউল বিষয়ে খোঁজখবর খুবই কাজের হতে পারতো। ওকে ধরে টান দিলে বাংলার ভাবগত দিকের একটা সজীব ছবি গড়া হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সেটা হয় নি মাথা থেকে গিয়েছে

আলাদা, কান উঠে এসেছে জ্বরদন্তি টানে। বাউলের কাব্য, ভাষা এবং দার্শনিকতা বাংলার এতোই সজীব ও জীবন্ত ব্যাপার যে হাতে একতারা আর ঝাঁয়া-ডুগডুগি নিয়ে বাজনা বাজিয়ে চিন্তা ও তৎপরতার বিশাল একটা পথ অতিক্রম করে দুনিয়ার জ্ঞান জগতে একটা পোক্ত জায়গা দাবি করে নেওয়া খুব একটা কঠিন হোত না। বাউলদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে বাংলার ভাব, ভাষা, চর্চা, চিন্তার প্রকরণ ও ব্যাকরণ ইত্যাদির একটা জীবন্ত ও সম্যক ধারণা গড়ে ওঠার কথা। কিন্তু সেটা হয় নি। হয়েছে উল্টাটা। পুরো ব্যাপারটাই হয়ে উঠেছে নিছকই বাইরের গবেষণার বিষয়। ওর মধ্যে আমরা নই, যেন ওই ভাষা ও ভাব আমাদের নয়—ওই জগতের কোন কিছুর মধ্যেই যেন আমাদের দৈনন্দিন বসবাস হয় না। এরা যেন অন্য কেউ, ‘অপর’। একদিকে বাউল জিনিসটা সমাজ-বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড, মরমী আর আধ্যাত্মিক একটা ব্যাপার বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে ওর প্রতি তৈরি হয়েছে এক খামাখা ঔৎসুক্য, বেকার রহস্য। আর এই ধরণের রহস্যের প্রতি তো আধাখোঁচড়া শহুরে শিক্ষিতের একটা মহা রোমান্টিক তাগিদ আছেই। তাছাড়া দেহচর্চা সংক্রান্ত যতো প্রকার আজগুবি ধ্যানধারণা মধ্যবিভেক্ত অবদমিত যৌনচর্চার সঙ্গে জড়িত তার ওপর নানান রস চড়িয়ে বাউলদের সম্পর্কে নানান কেছাকাহিনী ফাঁদা হচ্ছে ক্রমাগত।

যথা, তাদের ‘প্রকৃতি সঙ্গ’ কিংবা নারী সঙ্গ, ‘চারি চন্দ্র ভেদ’ সংক্রান্ত তত্ত্ব, ইত্যাদি। চটকদার বিষয়ে অতীব গুরুগম্ভীর গবেষণা খুবই উপাদেয়। কোন তত্ত্ব বা তার চর্চা বাংলার তাত্ত্বিক সাধনার মধ্যে আছে কি নাই তার খোঁজখবরের তো অবশ্যই দরকার আছে। সত্যি যে বাংলার তত্ত্ব সাধনার মধ্যে নানান দেহচর্চার ধারা রয়েছে। বাংলার দার্শনিকতার কেন্দ্রে ‘দেহ’ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন্দ্রীয় বিষয়। একই সঙ্গে ‘করণ’ বা চর্চারও বিষয়। কিন্তু কি তার হেতু আর কীইবা তার পরিপ্রেক্ষিত? সেই প্রশ্ন তোলা না হলে পুরো দেহতত্ত্বই একটা দৈহিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত যা হয়ে ওঠে যৌনচর্চারই নামান্তর।

দেহকে মন বা চৈতন্য থেকে আলাদা সত্তা—বিচ্ছিন্ন ‘দেহ’ ছাড়া আর কীইবা আমরা ভাবতে সক্ষম? অর্থাৎ চৈতন্য ও দেহের নিত্য ভেদ আগে থেকেই তো আমরা ধরে নিই। মন এবং দেহকে দুটো আলাদা ব্যাপার বা আলাদা সত্তা ভেবে নেওয়া যে নিছক একটা অনুমানও হতে পারে সেই প্রশ্ন কি আমরা করি? সন্দেহ, নিছকই সন্দেহ আকারে কি এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে? অথচ এই অনুমানের ওপর নির্ভর করেই আমাদের জগৎ সম্পর্কে ধারণা দানা বেঁধেছে, আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দেহ আর মন কিংবা শরীর আর চৈতন্যের এই নিত্য ভেদ তো নিদারুণ ভাববাদী, ঘোরতর অবিদ্যা বা মায়া। অথচ এই ধারণার ওপর দাঁড়িয়েই বাউলদের বলা হয় ‘মরমী’, বলা হয় ‘আধ্যাত্মিক’। যারা বলে তারা নিজেরা এক বিন্দু টের পায় না যে তারা নিজেরা কতোটা ভাববাদী, কতোটা মরমী।

তবু অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার অপরিসীম গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নাই। বাংলার উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্তের বইটিতে ‘বাউল’ সম্পর্কে বলা হচ্ছে :

‘শুনিতে পাই, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংস ভোজন ও শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে— ইহারা নরবধ করে না, মনুষ্যের মৃতদেহ পাইলে ভক্ষণ করিয়া থাকে’ [দত্ত ৯৪]

দত্ত মশায় কী চোখে ‘বাউল’দের দেখতেন এটা তার উদাহরণ। তবুও ‘বাংলার উপাসক সম্প্রদায়’ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ভাবাদোলনের প্রতি নজর ফেরাতে কাজে এসেছিল। একই সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেনের বিক্ষিপ্ত আগ্রহের মূল্যও যথেষ্ট। তবে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বড়ো বই ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ বড়ো ধরণের একটি কাজ। এই কাজগুলোর পরে তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা খুব একটা এগিয়েছে বলা যাবে না? গবেষণা হয়নি যে তা নয়। হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো কথা নিজের ভাষায় লেখা আর কিছু বিক্ষিপ্ত সংযোজন ছাড়া মৌলিক কোন কাজ হয়নি। সম্প্রতি কালের কিছু গবেষণা হয়তো ব্যতিক্রম। কিন্তু ফকির লালনকে একদল গবেষক হিন্দু আর আরেক দল মুসলমান প্রমাণ করা নিয়ে বিস্তার সময় ব্যয় করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল, মুসলমান ফকিরদের মধ্য থেকেই কি বাউল ধর্মের উৎপত্তি নাকি তার শেকড় হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের মধ্যে ও হিন্দুর ইতিহাসে? উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশায় লিখছেন,

‘আমি এই গ্রন্থের মধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে মুসলমান ফকিররাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে হয় এবং বাউল সাধনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভব ফকিরদের নিকট হইতে আসিয়াছে।’ (ভট্টাচার্য ৭৮ : প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)।

এই সিদ্ধান্ত যখন উপেন্দ্রনাথ দিচ্ছিলেন তখন কথটা তাঁকে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই বলতে হয়েছে। বাউল ব্যাপারটা মুসলমান ফকিরদের প্রবর্তনা তার নিজের দেবার দরকারে তিনি উল্লেখ করছেন,

‘বাউল মহলে, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাউল-মহলে, একটা জনশ্রুতি প্রবল যে, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র, যাহাকে বাউলরা তাহাদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে করে, তিনি ‘মাধব বিবি’ নামে এক মুসলমান মহিলার নিকট এই মর্মে দীক্ষিত হন। আউলচাঁদ নামে এক মুসলমান ফকির পশ্চিমবঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচারিত। তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব-আউলচাঁদ রূপে নূতন ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের পুস্তকাদিতে প্রকাশ।’ [একই বই]

হিন্দু মুসলমানের কাছে দীক্ষিত হওয়ার সুবাদে মুসলমান ফকিররা বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক, এটা একটা বাহ্যিক দিক। কিন্তু মুসলমান ফকির তাদের এই সাধনার

ধারা কোথায় পেল? এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রশ্নটা সামনে চলে আসে সেটা হোল ইসলাম তাহলে বাংলার ভাবজগৎ তৈরির ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে? কি সেই ভূমিকা? কি তার ইতিহাস? কি তার সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি আর রাজনীতি? মুসলমান তো হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে বাংলায় নেমে পড়েনি। বঙ্গ ইসলামের ইতিহাস বিচারের সঙ্গে তাহলে বাউলদের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ছে। তাছাড়া বাউলদের মধ্যে জাতপাতের পার্থক্য আর ধর্ম ভেদ যদি না থাকে তাহলে মুসলমানের কাছ থেকে হিন্দু শিখল, কিংবা হিন্দুর কাছ থেকে মুসলমান নিল তাতে কী এসে যায়? অর্থাৎ এর তাৎপর্য নিশ্চয় সম্প্রদায়গত দীক্ষা, বিনিময় বা আদানপ্রদানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে এর ভাবের রূপ ও শক্তির মধ্যে যা বিদ্যমান সম্প্রদায়গত ভেদকে একাকার করে ফেলে। অর্থাৎ জাত, পাত ও নিপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িতের সংগ্রামের মধ্যে।

উপেন্দ্রনাথ তাঁর ‘বাংলার বাউল আর বাউল গান’ গ্রন্থে ভারতের সাধনার ধারা যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তেমন ইসলাম—বিশেষত সুফি ধারার একটা খতিয়ান নেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিককার মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ হিশাবে এর মধ্যে গবেষকরা বিস্তারিত ভুলত্রুটি ধরতে পারবেন, এর অসম্পূর্ণতা তো আছেই। উপেন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকেই ‘বাউল’ বলতে হিন্দু সমাজভুক্ত সাধক বা গায়কদের এবং ‘ফকির’ বলতে মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক-গায়কদের চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভেদটা পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূলসূত্রটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মূলসূত্র পরবর্তী গবেষণায় হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা একটা দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে সেটা হোল শুধু বাংলার নয়, ইসলাম ভারতের ভাব ও তার ভাবান্দোলনের ইতিহাসের ভেতরকার জিনিস, বাইরের নয়। আর্য ধর্মের মতো তার আগমনও বাইরে থেকে। কিন্তু এই ভূখণ্ডে ইসলাম কিভাবে মার্কসের ভাষায় ‘হিন্দুভূত’ হোল সেই প্রক্রিয়াটা বোঝা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়েও বঙ্গ এই প্রক্রিয়া আরো স্পষ্ট। ‘হিন্দুভূত’ হওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই নিছক লীন হয়ে যাওয়া নয়। ভারতবর্ষ কি করে ইসলামকে আত্মস্থ করে নিজে রূপান্তরিত হয়েছে—ভাব, ভাষা, জ্ঞানচর্চা, সামাজিক আন্দোলন, সংস্কার চেষ্টা, রাজনীতি এমনকি ধর্মও কিভাবে নানানভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তার একটা দিক যেমন আছে, তেমন আছে ইসলামের নিজের রূপান্তর, কিংবা ভারতবর্ষে তার বিশেষ ও বিচিত্র রূপ। মাঝখানে টানাপড়েন দ্বন্দ্বসংঘাত তো রয়েছেই। কথা হোল, এই দিকে খোলা চোখে না তাকালে ভারতবর্ষের ইতিহাস বোঝা অসম্ভব। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যখন বলেন, ‘ধর্মের ইতিহাসই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস’—তখন এই মন্তব্যের ভাববাদী মন্তব্য নিয়ে আমরা তর্ক করতে পারি, কিন্তু যখন দেখি তাঁর ধর্মের ইতিহাস ইসলামকে বাদ দিয়ে নয় তখন তাঁকে ভিন্নভাবে পাঠ করতে

আমরা আগ্রহ বোধ করি। ইসলামকে বাদ দেওয়া না-দেওয়ার কথাটা যখন তুলছি তখন এই কাজের গবেষক রিচার্ড এম ইটন সাহেবের বরাতে খানিক সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলে রাখা দরকার। তাঁর *The Rise of Islam and Bengal the 'rontier* (1204-1760) বইটি থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি ;

‘আসলেই, মাপজোখে সুনির্দিষ্ট আর কঠোর বেড়া দিয়ে ঘেরা বদ্ধ ইসলামের যে ধারণা সেটা উনিশ আর বিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনেরই ফল, অথচ প্রাক-আধুনিক যুগের গ্রামীণ বাঙালির কাছে ‘অনৈসলাম’ আর ‘ইসলাম’-এর ভেদরেখা ছিল অতি সূক্ষ্ম, বিস্তার ফুটোয় ভরা আর সবসময়ই পরিবর্তনশীল। বাস্তবিকই, এমন কোন পার্থক্যের আদৌ কোন অস্তিত্বই হয়তো ছিল না’। [ইটন ৯৭ : ৫-২৭৩]।

অর্থাৎ বাদ দেওয়া না দেওয়ার কথাটা এই কালেই কেবল তোলা সম্ভব। অর্থাৎ এই ‘আধুনিক’ কালে এই পার্থক্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শর্ত মৌলো আনা উপস্থিত। কারণ প্রাক-আধুনিক যুগের গ্রামীণ বাংলায় কি ইসলাম আর কি ইসলাম নয় তার ভেদরেখা নির্ণয় ছিল খুবই মুশকিলের। বাংলার ভাবাদোলনের ইতিহাস বিচার করার সময় সেই ভেদরেখা গড়ে ওঠার ইতিহাসটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ইটনই এই কথা প্রথম বলেছেন তা নয়। তাঁর গবেষণা সম্প্রতিকালের। পুরনো কথা বাতিল হয়ে যায় নি। বরং আরো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেই দিকটাই বোঝানোর জন্য এই উদ্ধৃতি। এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে ‘হিন্দু বাউল’-আর ‘মুসলমান বাউল’ এই ধরণের সাম্প্রদায়িক শ্রেণীকরণও এই অতি আধুনিক কালেরই ঘটনা। এই সাম্প্রদায়িকতা কতো গভীরে কাজ করে তার একটা উদাহরণ দেবার জন্য পণ্ডিত আহমদ শরীফের একটা উদ্ধৃতি দেব। তিনি লিখছেন,

‘সাধারণ বুদ্ধিতে মুসলমান বাউলেরা আধা-মুসলমান। এরাই বাঙলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সুফি-দরবেশরা তাদের এমনি আধা-মুসলমান করে না রাখলে, সরাসরি শরিয়তী ইসলাম প্রচারে এত লোককে দীক্ষিত করা যেত না হয় তো। আগে নামত মুসলমান সমাজভুক্ত ছিল বলেই উনিশ বিশ শতকে তাদের অধিকাংশকেই পুরো মুসলমান করা সম্ভব হয়েছে’। [শরীফ ৮৩ : ৫-১০২]

বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস এখনো খুবই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। সেই কাজ এখনো পড়ে আছে। সেই অস্পষ্টতার কারণে অনেক প্রসঙ্গে মতামত দেওয়া কঠিন। কিন্তু আহমদ শরীফ অতি হাল্কা চালে কোনো প্রকার অগ্রপশ্চাত না ভেবে যেভাবে ‘আধা-মুসলমান’, ‘পুরো মুসলমান’ প্রভৃতি পরিভাষা এই শতাব্দিরই আশির দশকে ব্যবহার করেছেন তাতে হোঁচট খেতে হয়। ‘আধা-মুসলমান’ কি জিনিস? আর ‘পুরো মুসলমান’ নামক বস্তুটাই বা কি? ইসলাম তো একাট্টা এক ধরণের এক প্রকারের মার্কামারা ছকে তৈরি জিনিস নয় যে দেখে বলা যায় এটা সিকি ইসলাম আর ওটা অর্ধেক ইসলাম ইত্যাদি। সুফি-দরবেশদের ইসলাম আধা-ইসলাম, এটা তাঁর কাছে শেখা

হোল। ওয়াহাবি-খেলাফত-ফারায়জি আন্দোলনের দৌলতে যে-ইসলাম এখন বঙ্গে দাঁড়িয়েছে এটা কি কারণে পুরো ইসলাম বলে আমাদের গণ্য করতে হবে? শিয়াদের ইসলাম বাদ দেব কোন যুক্তিতে? ইসলামের রয়েছে আরো হাজারো তরিকা হাজার মত। আধাপুরা হিশাবটা সেই ক্ষেত্রে কি কাজে লাগে? বলেছেন এই ভাগাভাগি নাকি ‘সাধারণ দৃষ্টি’-র ভাগাভাগি। কিন্তু এই সাধারণ দৃষ্টিটা আসলে কার? তিনি অবশ্য হিন্দু বাউলদের আধা হিন্দু আর পুরা হিন্দুতে ভাগ করেননি। ইটন যে ‘আধুনিক সংস্কার’ আন্দোলনের কথা বলেছেন তারই অন্তর্গত আধুনিকওয়ালাদেরই মর্মের ভেতরে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নানান সূত্রে, নানামুখী শেকড় ও অচেতন অভ্যাসে লতিয়ে-পেঁচিয়ে রয়েছে। একটু মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে পড়ে। বলে রাখি, আহমদ শরীফ নাস্তিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিশাবে খুবই মশহুর।

আহমদ শরীফের উদ্ধৃতিতে এই ধারণারও ইঙ্গিত রয়েছে যে বাউলেরা প্রথমে সুফি দরবেশদের কাছ থেকে ‘আধা-মুসলমান’ হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা শরিয়তি ইসলামের বদৌলতে পুরা মুসলমান হয়েছেন। এই অর্থেই তাঁরা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। শরীফ বলেছেন,

‘বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফারায়জী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ বিশ শতকে শরিয়তী ইসলামে ফিরে এসেছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে’ [একই বই : পৃ-১০২]

বলা হচ্ছে, বাউলদের শরিয়তী ইসলামে প্রত্যাবর্তনের কারণে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব আর হিন্দু বাউলদের ব্রাহ্মণ্য আচার গ্রহণ করার কারণ ইংরেজি শিক্ষা। তাহলে হিন্দু বাউলরা ইংরেজি শিক্ষার কারণে ব্রাহ্মণ্য আচার অর্জন করেছে। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে তাহলে ‘পুরো মুসলমান’ হওয়ার সবিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। এগুলো অবশ্য এতোই অসার ও হাল্কা মন্তব্য যে উপেক্ষা করাই শ্রেয়। কেন হিন্দু আর মুসলমান নামক দুটো সম্প্রদায় এই আধুনিক কালে পরস্পরের প্রতি মারমুখী হিংসা নিয়ে হাজির হোল তার হৃদিস খুঁজতে হলে ঔপনিবেশিকতা, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী বিভেদের তীব্রতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিগঠন ও বিকাশ, তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের খবর নেওয়া দরকার। একই সঙ্গে সমাজের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও শ্রেণী গঠনের ঝোঁজ নেওয়াও প্রয়োজন। এখানে তার সুযোগ নাই। কিন্তু ঝোঁজখবর নিলে আমরা দেখব যে একই সময়ে বাংলার ভাবান্দোলনও কিন্তু পিছিয়ে থাকে নি। অগ্রসর হয়েছে, বিকাশের একটা শীর্ষে পৌঁছাচ্ছে। ফকির লালন শাহ যার উদাহরণ। এমনকি এই বিকাশ আমরা পঞ্চাশ দশকে এসে জলাউদ্দীন খাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করি। এমনকি এই কালের বিজয় সরকার, খালেক দেওয়ান, আবদুল হালিম, রজ্জব আলী দেওয়ান ও আরো অনেকের মধ্যেও চিন্তার

নতুনত্ব এবং প্রশ্নের ধরণ অনেক সময়ই মৌলিক। বাংলার আনাচে কানাচে মোল্লামৌলবিদের ওয়াজ নসিহতের সভার চেয়েও আরো বেশি সংখ্যায় সারারাত ব্যাপী ঐদের তত্ত্বকথা সমৃদ্ধ গান হাজার হাজার মানুষ সারারাত বসে শোনে।

দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশের ভাবান্দোলনের মুসলমানীকরণের প্রয়াস হয়েছে। সেটা সফল হয় নি। এটা পরিষ্কার যে বাংলাদেশ ভাবান্দোলনের শক্তি এখনও অসামান্য। ধর্মতত্ত্ব ও মোল্লাতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস যেমন দেখা যায় তেমনি প্রাচীন দেহতাত্ত্বিক চিন্তাকেও এই কালের নতুন বয়্যতিরা যে ভাবুকতায় ও ভাষায় প্রকাশ করছেন তা রীতিমতো অসাধারণ। ধর্মতত্ত্ব ও মোল্লাতত্ত্বের বিরুদ্ধে জালাল উদ্দীন খাঁর যে গান গ্রামে গঞ্জের আনাচে-কানাচে হরদম গাওয়া হয় সেটি হচ্ছে, ‘মানুষ খুইয়া খোদা ভজ এই মস্ত্রণা কে দিয়াছে / মানুষ ভজ কোরানে খোজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।’ মানুষের ভজনা না করে বিমূর্ত সত্তার প্রতি প্রণতির মস্ত্রণা মানুষ কোথায় পেল? এই হোল জালালের সহজ সরল প্রশ্ন। জালাল দাবি করেননি যে কোরান শরিফে মানুষ ভজনার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষের ভজনা কেন করতে হবে? কারণ, জালাল বলছেন, কোরান খুঁজে দেখলে তার পাতায় পাতায় মানুষ ভজনার পক্ষে বিস্তারিত সাক্ষী পাওয়া যায়। তার মানে কোরানের ভাষা বা কালামের ব্যাখ্যা কেবল মোল্লার একচেটিয়া নয়। তার অর্থ নির্ণয়ের বা অর্থোৎপাদনের ক্ষমতা সবসময়েরই জন্যেই মানুষের মধ্যেই বিরাজ করে। কারণ,

‘সৃষ্টির আগে পরোয়ারে

মানুষেরই রূপ নেহারে

ফেরেশতা যথায় যাইতে নারে মানুষ তথায় গিয়েছে’

সৃষ্টির আগে পরওয়ারদিগার মানুষের রূপই ‘নেহার’ করেছিলেন বা দেখেছিলেন। এই দর্শন সৃষ্টির কারণও বটে। এই রূপকে মূর্ত করে তোলার জন্যেই কুলমখলুকাত সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফেরেশতা যেখানে ষ্ঠেতে ব্যর্থ হয়েছে মানুষ সেখানে যেতে সক্ষম।

এই কালের ভাবুক আলাউদ্দীনের একটি দেহতাত্ত্বিক গান খুবই জনপ্রিয়। গানটি হচ্ছে :

‘আমার এই দেহঘড়ি সন্ধান করি

কোন মিস্তিরি বানাইয়াছে

একদিন চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া

জনম ভইরা চলিতেছে

খাকের একটি কেইস বানাইয়া

মেশিন দিল তার ভিতর

রংবেরংয়ের বানিশ করা

দেখতে ঘড়ি কী সুন্দর ! !’

[আলাউদ্দীন ৯৫]

আমার দেহ এবং এই সেই দেহ যা একই সঙ্গে ঘড়ি, অর্থাৎ দেহঘড়ি। মানুষ। কিন্তু এই সেই মানুষ যে একই সঙ্গে কাল বা সময়ও বটে। এই ভাবের শেকড় প্রাচীন তাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে প্রোথিত কিন্তু তার প্রকাশ নিদারুণ সমসাময়িক। অন্যদিকে একই সঙ্গে হঠাৎ যেন জর্মন দার্শনিক মার্টিন হেইডেগারের পুরো দার্শনিক প্রকল্পটির কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে যায়। এই কালের দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে খাঁদের খানিকটা চেনা পরিচয় আছে তাঁরা একটা ঝাঁকুনি না খেয়ে পারেন না। ইঙ্গিতটা ধরিয়ে দেবার জন্যে এরিস্টটলের সময় সংক্রান্ত ধারণা প্রসঙ্গে হেইডেগারের একটা উক্তি এখানে উল্লেখ করবো।

‘এরিস্টটল যখন বলেন সময় হচ্ছে গতির সঙ্গে থাকে, আমরা গণনা করি—তখন আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুব একটা ভুল বলা যায় না। এর প্রমাণের জন্যে আধুনিক পকেট ঘড়ির মতো সূক্ষ্ম কোন জিনিশ আমাদের দরকার নাই। একজন মানুষ যখন প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন অস্তিত্বের অংশ হিসাবে সূর্যের গতিবিধি খেয়াল করে উচ্চারণ করে ‘এখন দুপুর’, ‘এখন রাত্রি’—তখন সে সময়ের কথাই বলে। সময় এই ক্ষেত্রে, অকস্মাৎ, সূর্যের মধ্যে, অথবা, আকাশে বিরাজ করে—আমার পকেটে নয়। না, আসলেই এই বিস্ময়ের শেষ কোথায়? কেন এটা ঘটে যে যেখানেই আমরা গতির অনুসরণ করি সেখানেই যেন সময়কে পেয়ে যাওয়া উচিত, সময় যেন গতির সঙ্গে যুক্ত, অথচ চলমান বস্তুটি ঠিক যেখানে সেখানে আমরা সময়কে হাজির দেখি না। কোন দিকে আমাদের নজর, কোন দিগন্তের দিকে আমরা তাকাই? একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে বলি, সূর্যাস্তের সময় আমরা বলি সন্ধ্যা আসছে, এভাবে আমরা দিনের একটা সময় নির্ধারণ করি। আমরা কি শুধুমাত্র একটি বিশেষ জায়গার সুনির্দিষ্ট একটা দিগন্তের দিকে তাকাই? পশ্চিম দিকে? নাকি চলমান বস্তুর সঙ্গে, এই ক্ষেত্রে আমাদের সূর্যের এই পরিদৃশ্যমান সচলতার মুখোমুখি হওয়া, বরং ভিন্ন এক দিগন্তের দিকে অবলোকন?’ [হেইডেগার ৮৮ : পৃ-২৪০;]।

বাইরের চলমান বস্তুর দিকে তাকানোর মধ্য দিয়ে ভিন্ন যে দিগন্তের দিকে তাকানোর কথা হেইডেগার বলছেন সেটা হচ্ছে তাঁর ভাষার Dasein। এর অনুবাদ কঠিন। আপাতত বলা যাক ‘আছেময়তা’ অর্থাৎ যে দিগন্তের বিপরীতে আমরা কোন কিছুকে ‘আছে’ বলে নির্ণয় করি সেই দিগন্তের খোঁজ করতে গেলে মানুষেরই খোঁজ পড়ে। কোন কিছু ‘আছে’ নির্ণয়ের বা তাদের অস্তিত্ব বিচারের যে মৌলিক বিজ্ঞান (fundamental ontology) বা দর্শন তার সন্ধান করতে গিয়ে হেইডেগার মানুষ আর সময়ের সম্পর্ক আবিষ্কারের পেছনে তাঁর প্রজ্ঞা ব্যয় করেছেন। তিনি বলছেন,

‘মানুষ কি? এই কংক্রিট প্রশ্নটি করবার পূর্ব শর্ত হিসাবে কিংবা কি উদ্দেশ্যে, কোন সীমাবদ্ধ অর্থে বা কিভাবে মানুষের মানে দাঁড় করানো সম্ভব তার সম্ভাবনাগুলো পরীক্ষার করবার জন্যে এই দিগন্তের দিকে আমাদের মুখ ফেরাতে হবে।’ (হেইডেগার ৯০ : পৃ-১)।

বলা বাহুল্য আলাউদ্দীন হেইডেগার পড়ে নিশ্চয়ই তার গান লেখেনি। গানটি খেয়াল না করলে দেহঘড়িকে চাবি দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার প্রতীক নিছকই মেশিন বা যান্ত্রিক প্রতীক হিসাবে ভুল করার সম্ভাবনা। অন্যদিকে যে দেহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে এই দেহ একই সঙ্গে মনও বটে। বাংলার জ্ঞান কাঠামোর যে-দিগন্তের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেখানে দেহ আর মনের ভেদ আগেই মেনে নেওয়া বা অনুমান করে নেওয়া রেওয়াজ নয়। মাটির একটি কাঠামো বানিয়ে তার মধ্যে সেই মিস্তিরি মেশিন ফিট করে দিয়েছে—যন্ত্রের অনুষ্ঙ্গ এখানে মনে না এসে পারে না। মাটির এই কেইসটা মেশিন ঠিকই কিন্তু মেশিনের রূপ বৃদ্ধির জন্যে রংবেরংয়ের বার্নিশ মারা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তো আর এক রংয়ের হয় না। মানুষ নানান রংয়েরই হয়।

ফলে এ এক নিদারুণ ঘড়ি! রংবেরংয়ের বার্নিশের কথা শুনলে বোঝা যায় এটা ঠিক ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি হওয়া ঘড়ি নয়। যে ‘দেহ’ নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা যান্ত্রিক দেহ নয়। আরো নিশ্চিত হওয়া যায় যখন বলা হয় :

‘তিন কাঁটা বার জুয়েলে,
মিনিট কাঁটা হইল দিলে
ঘন্টা কাঁটা হয় আক্কেলে,
মনটারে সেকেন্ড দিচ্ছে॥’

ঘড়ির বারো ঘন্টার বারো জুয়েল—বারোটি হীরার দাগে বৃত্তের জ্যামিতি নির্ধারিত। আর ঘড়িকে দেওয়া হয়েছে তিনটে কাঁটা। মিনিটের কাঁটা হোল দিল বা হৃদয়—অর্থাৎ দেহসম্পন্ন মানুষের সংবেদনার ক্ষমতা, তার ইন্ড্রিয়োপলব্ধির শক্তি, ইন্সেমনুয়েল কান্ট যে-সংবেদনাকে তাঁর Transcendental Aesthetic পর্বে আলোচনা করেছেন। এটা ইন্ড্রিয়োপলব্ধি অবশ্যই, কিন্তু শুধুই ইন্ড্রিয় নয়, এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কান্ট বুদ্ধির ভূমিকা মেনেছেন। হয়তো আলাউদ্দীন আরো অন্যান্য ভূমিকার ইঙ্গিতও এখানে দিতে চাইছে। কান্টের উল্লেখ করছি কারণ তুলনামূলক আলোচনায় ভাবগত চিন্তার ঐশ্বর্য ধরতে পারা সহজ। ঘন্টার কাঁটা হচ্ছে আক্কেল বা জ্ঞানের ক্ষমতা। জ্ঞান প্রক্রিয়ার স্তরভেদে সংবেদনার পর যাকে পাশ্চাত্য দর্শন বুদ্ধি (Faculty of Understanding) বলে গণ্য করে। সংবেদনা এবং বুদ্ধির পরে রয়েছে ‘মন’। সেটা হোল সেকেন্ডের কাঁটার ভূমিকা। আলাউদ্দীন কিভাবে তিনটি কাঁটার ভূমিকা ভাগ করেছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য দর্শন যে বৃত্তিকে প্রজ্ঞা (Faculty of Speculation) বলে আখ্যায়িত করে এবং সংবেদনা ও বুদ্ধির উর্দে স্থান দেয় আলাউদ্দীনের সেকেন্ডকে সেই প্রজ্ঞা হিসাবে গণ্য করার দরকার নাই। কিন্তু যে-মনকে সেকেন্ডের কাঁটা বলে ধরে নিচ্ছে তার ভূমিকা হচ্ছে পরিগঠনমূলক (constitutive) সেকেন্ড দিয়েই মিনিট আর সেকেন্ড দিয়েই ঘন্টা। ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট—এটা সত্যি। অতএব সেকেন্ড মিনিটের গঠন-উপাদান। কিন্তু ধরা যাক সকাল ছয়টা বাজার পর ছয়টা এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড করে যখন একসময় সাতটা বাজে তখন বলা যাবে না

সাতটা হচ্ছে সবগুলো সেকেন্ডের যোগফল। এখানে একটা দ্বন্দ্বিক স্ববিরোধিতা থেকেই যাচ্ছে। সাতটা মানে সাতটাই। তাহলে মন যখন বিশ্বজগতকে জ্ঞানের বিষয় হিসাবে গঠন করে তখন তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বিক স্ববিরোধিতা কাজ করে। এটাই বোধহয় মনের কাজ। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার স্ববিরোধিতার প্রতি সতর্ক নজর রাখা। বাংলার অতি দীনহীন ভাবুকের এই গানটিতে আমাদের তুলুল আমোদ হয়। গানটির সুবটিও মজার। আমি যেভাবে আলাউদ্দীনের গানের কথাগুলো পড়ছি সেটাই একমাত্র পাঠ সেই দাবি করা খুবই বোকামি। কথা হচ্ছে, যেভাবেই আমরা পাঠ করি না কেন এর মৌলিক ভাবুকতা স্বীকার করে নিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। আলাউদ্দীনের এই গানটি বিচার করতে গিয়ে হেইডেগার বা কান্টের প্রসঙ্গ আনাটাও অনেকের গাত্রদাহের কারণ হতে পারে। এই দুই দার্শনিকের প্রতি আমার বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। কিন্তু তুলনামূলক বিচারের সুবিধাটুকু নিয়ে বাংলার ভাবান্দোলনের মৌলিক বিচ্ছুরণের দীপ্তিগুলো চিনে নেওয়ার সুযোগ আমরা ছাড়ি কেন?

বাংলার ভাবান্দোলন যে গোড়ার দার্শনিক প্রশ্নগুলো ভোলেনি এবং বারবারই সেটা তুলেছে এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের পরিমণ্ডলের বাইরের তার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে সেটা তার আন্তরিক শক্তিরই লক্ষণ। এখন কাজ হচ্ছে এই সজীব ভাবের শক্তির জন্যে পথ ছেড়ে দেওয়া। তার বিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলো হঠিয়ে দেওয়া।

বাউল সম্পর্কে যে সকল ছককাটা ধারণা তৈরি হয়েছে সেগুলো এখন ঝেঁটিয়ে বিদায় না করলেই আর নয়। বাংলার অঞ্চলভেদে বাউল শব্দের নানা তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য। সকলকে এক বান্ডিলে বাউল বলা ভুল ও বিভ্রান্তিকর। এমনকি আজকাল একটা বিশেষ বেশভূষায় তাদের একটা ছকে হাজির করার ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির পর্যায়েই পৌছেছে। স্বামী বিবেকানন্দের নকল করে পাগড়ি, গেরুয়া আর গলায় মালা পরার ব্যাপারটা এখন বেশ সংক্রমিত হয়েছে। শুধু পাশ্চিম বাংলায় নয়, বাংলাদেশেও। খুশির কথা যে পশ্চিম বাংলার গবেষকরা এগুলো লক্ষ্য করছেন এবং সমালোচনা করছেন। শক্তিনাথ বা যথার্থই দেখিয়েছেন বাউলের বেশ বিচিত্র ও বহুরকম। এমনকি বাউল নামে যাদের আমরা এক বান্ডিলে ভাবে অভ্যস্ত তাদের অনেকেই নিজেদের বাউল পরিচয় দেয় না। শক্তিনাথ বা বলছেন, আমেরিকা প্রবাসী হিতব্রত রায় শান্তিনিকেতনেও থাকেন। তিনি বাচ্চু রায় নামে জনপ্রিয় একজন মানুষ। নিজে রজকীকান্ত সেনের বংশধর এবং সুগায়ক। পূর্ণদাস বাউল ইত্যাদিকে বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের সূত্রে তিনি আমেরিকায় নিয়ে যান। সেই দেশের লোকশিল্পীরা বাউলগানে তেমন আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু পূর্ণদাস ধরনের গায়কদের কিছু বিদেশী ‘ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রতিনিধি’ হিসাবে গ্রহণ করে। বাউল হওয়ার জন্য গেরুয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান এরপর থেকেই ফ্যাশন হয়ে ওঠে। শক্তিনাথ বলছেন,

‘ইতিপূর্বে বিবেকানন্দ যে-বেশ ধারণ করে বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছিলেন সে পোষাকে সজ্জিত করা হয় বিদেশে বাউল-গায়ককে। ক্রমশ বৈদেশিক স্বীকৃতির গুরুত্বে এবং

ঔপনিবেশিক মানসিকতায় এ বেশটিই বাউল-পোষাক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ... দেবেন ভট্টাচার্যের গ্রন্থে পূর্ণদাস বাউলের কিশোর বয়সের এক ফটোতে পাশ-কাটা লম্বা পাঞ্জাবি পরিধানে, মাথায় চূড়া বাঁধা চুল, দেখা যায়। বাঁকুড়ার সাঁই গোষ্ঠী এবং রাঢ়ের জাত-বৈষ্ণবরা ভেক নেয় এবং গেরুয়া বস্ত্র ব্যবহার করে। এ বেশটি বিবেকানন্দের পোষাকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রাঢ়ের 'বাউল' বেশ পরিকল্পিত হয়েছে। (কা ৯৫ : পৃ-১৫৬, ১৫০।

শক্তিনাথ বা আরো অনেক মজার কথা বলছেন, বাংলাদেশের পাঠকদের যা জানা দরকার।

'শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক বীরভূমে ভদ্রলোক এবং বিদেশীদের কাছে বাউল খুব আকর্ষণীয় ও সম্মানীয় বলে বিবেচিত হয়। তাই এ অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ, অধ্যাপক, শিক্ষক বহুব্যক্তি বাউল বলে পরিচয় দিয়ে বিদেশী এবং ভদ্রলোকদের কাছে পড়তে চায়। এখানে বাউল হিন্দু এবং বিশিষ্ট সাজে সজ্জিত। মুসলমান গায়কেরা এখানে ফকির। গোলাম শা ও সম্প্রদায় বা অন্য কোন মুসলমান গায়ক বিদেশী বা ভদ্রবাবুদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা বা বিদেশ যাবার সুযোগ পায় না। আর এ অঞ্চলের জাত-বৈষ্ণব গায়কদের ধারণা যে তারাই যথার্থ বাউল। অন্যরা অন্যায়ভাবে বাউল সাজছে। এ অঞ্চলে ফকির মুসলমান সমাজভুক্ত সাধক, ভিক্ষুক, গায়ক। আর বাউল হচ্ছে হিন্দু বেশধারী গায়ক।'

এই ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের ভূমিকাটাও জেনে রাখা দরকার। শক্তিনাথ বা থেকেই উদ্ধৃতি দেব।

'রবীন্দ্র-উত্তরকালে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় এই 'হিন্দু বাউল' এবং 'মুসলমান ফকিরগণ' স্বতন্ত্র দুই তাঁবুতে স্থান পায়। লালন, হাউড়ে, কুরীর, শরতের গান করে মুসলমান সমাজভুক্ত গায়ক ফকিরী গানের জন্য অভিজ্ঞানপত্র পায়; আর এ গানগুলি কোন হিন্দু সমাজভুক্ত গায়ক করলে হয়ে যায় 'বাউল' গান। স্বতন্ত্র তাদের অভিজ্ঞানপত্র। বাউল-বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত দধিয়া, অগ্রদ্বীপ, ঘোষপাড়া প্রভৃতি মেলায় এ ধরনের কোন বিভাগ গড়ে ওঠেনি। একথা সত্য যে পূর্ববঙ্গে মুশিদ্দী বা মুশিদ্দা গানের অংশবিশেষ ইসলামী তত্ত্বসম্মত পীর-মহিমা কীর্তন। অন্যত্র রক্ষণশীল পীরপন্থীদের মধ্যে ফকির এবং ফকিরী গান শব্দটি চলিত। চম্বিশ পরগণায় 'মুস্কিল আসান' প্রভৃতি গান ফকিরী গান নামে খ্যাত। বীরভূমের অংশবিশেষে অবাঙালি পীরপন্থী মুসলমান সমাজভুক্ত অনেকে ফকির বলে পরিচয় দেন। কিন্তু রামপ্রসাদ, লালন, নীলকণ্ঠ, বাঙাল হরিনাথ মজুমদার প্রভৃতি বহু সাধক 'ফকির' হিশাবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। তুর্কী ভাষা থেকে আগত এ শব্দ নিঃস্ব মানুষ অর্থে হিন্দু সমাজেও গৃহীত হয়েছে। এটি কোন সম্প্রদায়বাচক শব্দ নয়।' [একই বই: পৃ-১৪৫]

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলাও দরকারি হয়ে পড়েছে। এইসকল বিভ্রান্তি, ভেদবুদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে চলার জন্য 'বাউল'

নামচিহ্নটি পরিহার করতে চাইছি। এই নামচিহ্ন পরিহার বাংলার ভাবান্দোলনকে তার বহু, বিচিত্র এমনকি পরস্পরবিরোধী ধারা হিশাবে অনুধাবন করা এবং বাংলার ভাব যেসকল জীবন্ত প্রশ্ন আজো জারি রেখেছে সেই প্রশ্নগুলোর জের ধরে এই কালে ভাবচর্চার বিকাশ ঘটানোই আমাদের প্রধান কাজ।

বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা তাহলে স্পষ্ট করা দরকার সেটা হোল হিন্দু মুসলমান নামক সম্প্রদায়গত ভেদ বা পার্থক্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে একে বোঝার চেষ্টা বৃথা এবং সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। ভাবান্দোলনের গানে গৌরতত্ত্ব ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি নবীতত্ত্ব, কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হোল নাকি আল্লার নাম—ইত্যাদি দিয়ে এর ভাবুকতার মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব। অথচ, অন্যদিকে আবার, বিভিন্ন ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাহিনী জানা না থাকলে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তার ভাবগত তৎপরতার জায়গাগুলো বোঝাও দুঃসাধ্য। নইলে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, শাস্ত্র এবং তার বিধান ও ব্যাখ্যার সঙ্গে এর বিতর্ক ও বিরোধের জায়গাগুলো অনুধাবন করা যাবে না।

বাংলার ভাবান্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, কিন্তু এই আন্দোলন কোন পুরনো, প্রাচীন, অবলুপ্ত বা ক্ষয়িষ্ণু ধারা নয়। ইতিহাস বলতে এখানে আমরা যা বোঝাতে চাইছি তাকে যেন আবার ‘ঐতিহ্য’ বানিয়ে ফেলা না হয়। না, এই ভাবান্দোলন কোন স্থির বা একটানা বিষয় নয়। এর মধ্যে কোন ‘আবহমান’ ব্যাপার নাই। এটা কোন মৃত মিউজিয়মে রাখার মতো ‘ঐতিহ্য’ নয়। ইতিহাসের মধ্যে যা যা আমাদের পছন্দ সেগুলো জোগাড় করে এবং তার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা খাড়া করে তাকে ‘ঐতিহ্য’ বলে বৈধতা দান করার চেষ্টা এই ক্ষেত্রে আমাদের পরিহার করতে হবে। বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে বিস্তার স্ববিরোধিতা, নানামুখী বা বহুমুখী চিন্তা, নানান টানাপড়েন, উত্থানপতন, সোজাঝাঁক চলন ও চড়াই উৎরাই আছে।

সেই ইতিহাস আর-আর ইতিহাসের মতই, মসৃণ নয়। ওঠানামা আছে, টানাপড়েন-টেনশনও কম নাই। স্ববিরোধিতা? অবশ্যই। এই ভাবকে জানা ও আত্মদানের জন্য আমাদের আগ্রহের নানা কারণ আছে। পাশ্চাত্য অর্থে আমরা ‘দর্শন’ নামে যে-ব্যাপারটাকে বইপত্রে লেখালিখির মধ্যে এতকাল ধরে জানি, সেই কারণে ভাবি যে আমাদের কোন লিখিত ‘দর্শন’ নাই। ঠিকই। ‘দর্শন’, অর্থাৎ সত্যকে দেখা বা দেখানোর সঙ্গে বাংলার ‘ভাব’ কথাটার ফারাক অকাশ আর পাতাল। দর্শন বললেই সত্য দেখাদেখি ও প্রমাণ-প্রত্যয়ের যে ধারণা, সত্যকে আদৌ এই রকম চোখ দিয়ে দেখা যায় কিনা কিম্বা সত্য মাত্রই বা সত্যের প্রমাণ মাত্রই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হিশাবে ‘হাজির’ করা, প্রমাণিত করার বিষয় কিনা—ইত্যাদি তর্ক তো আছেই। পাশ্চাত্য অর্থে ‘দর্শন’ নামে এই দেশে কিছু ছিল না তা নয়, কারণ নানা শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, মীমাংসা তো ছিল, যাকে ‘ভারতীয় দর্শন’ বলা হয়। উচ্চবর্ণের মধ্যে ‘ধর্ম’, ‘শাস্ত্র’, ‘দর্শন’, ‘ন্যায়শাস্ত্র’ ইত্যাদির যে চর্চা তার বিপরীতে বেদ ও শাস্ত্রবিরোধী যে ‘ভাব’ তার মূলে আছে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে প্রবল রাজনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। যাকে

অনেক সময় ভক্তি আন্দোলন বলা হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকেও এই লড়াইয়ের আলোকে বিচার করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলন কোনো ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার ফেরে পড়বার বিপদ থেকে সবসময়ই সতর্কভাবে দূরে থেকেছে। অন্যদিকে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি গড়ে ওঠে ইসলামের গ্রন্থকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার বিপরীতে তার ভাবগত ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক—মানুষের ইহলৌকিক সমস্যা মীমাংসার প্রতি ইসলামকে রক্তমাংসের মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তোলার লড়াই। এদের আমরা সুফি বা মারফতি ধারা বলে সাধারণত শনাক্ত করে থাকি। ‘ভাব’ কথাটা যেন এইসকল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক লড়াইয়ের অনুষঙ্গে আমরা বুঝি, তার জন্য আমরা সবমিলিয়ে দর্শন বা ভাবচর্চার এই ধারাকে বলি ‘ভাবান্দোলন’।

বলা বাহুল্য এই লড়াইয়ের প্রকাশ কখনই বিধিবদ্ধ ‘দর্শন’ হিশাবে হাজির হয় নি। সাধকদের সুফিদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চর্চার মধ্যে, মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের জন্য কাজ করবার তৎপরতার মধ্যে ভাব আর কাজ অভিন্ন হয়ে বিরাজ করে। মুখে কী বলছি সেটা যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি কী করছি সেটাই ছিল আসল। কারণ সত্য তো বলার বিষয় নয়, কাজ করে মূর্ত করে তোলার বিষয়। ভাব মাত্রই কাজ আর কাজ তো ভাব ছাড়া হয় না।

তবু কথা তৈরি হয়। গানে পালায় কাহিনীকাব্যের মধ্যে বেদ, কোরান, শাস্ত্রকে ইহলৌকিক লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে তোলার একটা মতাদর্শিক সংগ্রামও গড়ে উঠেছিল, বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের অসাম্য, অন্যায ও অসঙ্গতির মীমাংসার জন্য যে সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতা দরকার তাকে ভাবগত ভাবে গ্রেপ্তার করার একটা চর্চা ছিল অবশ্যই। সেই চর্চার কারণে আমরা টের পাই আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় ও ভাবে সত্য আত্মদনের একটা আকুতি আছে, তার একটা ইতিহাসও আছে। বাংলায় ‘দর্শন’ বা সত্য আত্মদনের জন্য এই আকুতি, আকাঙ্ক্ষা ও চর্চা ‘ভাব’ বলে পরিচিত হয়ে ওঠার সঙ্গত কারণ আছে।

এখন প্রধান সমস্যা হোল, ‘বাউল’ সম্পর্কে এই ধারণাই বদ্ধমূল যে এরা হচ্ছে একধরনের গায়ক। ডুগডুগি একতারা দিয়ে গান করে বেড়ায়। গানগুলো ভাল। তবে পল্লীগীতি বা গ্রাম্য গীতের যে-মর্যাদা এদের মূল্য তার বেশি নয়। এরা আর যাই হোক সংস্কৃতির মূল ধারার কেউ নয়। কারণ রবীন্দ্র-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তসহ আধুনিক গানের যে মর্যাদা এদের মর্যাদা এক সমান নয়। এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিটা প্রথমেই বাতিল করতে হবে। বলাবাহুল্য সেটা খুব সোজা কাজ নয়।

বাংলার ভাবান্দোলনের অন্তর্গত যে গান সেগুলো নিছকই গান নয়, কিংবা নিছক কথাও নয়। এটা হচ্ছে ভাবচর্চা। অর্থাৎ গানের কথা ও সুর দুটো নিয়েই এই ভাবচর্চা। এটা বলা যাবে না কথা ও সুর এখানে ভাবের মাধ্যম। কথা ও সুরের বাইরে আলাদাভাবে ভাবের কোন অস্তিত্ব নাই। উভয়েই অর্থ ও রসোৎপাদক। কথা ও সুরকে মাধ্যম গণ্য করলে ভাবের তুলনায় তাদের আমরা গৌণ স্তরে ঠেলে দেই। আবার কথা

মুখ্য নাকি সুর মুখ্য সেই বিতর্কও অর্থহীন। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো যেকোন কথাসম্পন্ন গানকে আমরা এইভাবে বিচার করতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-আধুনিক গানের ক্ষেত্রে যে অর্থে ‘ভাব’ কথাটা প্রযোজ্য সেই অর্থে ‘ভাব’ কথাটা এখানে খাটে না। কোরান তেলাওয়াতের কথা ও সুর আছে, তার অর্থ এই নয় যে সেই সুর এবং কথার ‘ভাব’ যেকোন আরবী কবিতার ভাবের সমার্থক। ইমরুল কায়েসের কবিতারও কথা ও সুর আছে, কিন্তু কোরান শরিফ কবিতা নয়, গানও নয়। একই কথা উপনিষদ, বাইবেল বা যেকোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিছু কবিতা ও সুর সামাজিক আন্দোলন-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহণ করে, ধর্মের আকার নেয়। কেন সেটা ঘটে? সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও তার একটা ভাবগত কারণ নিশ্চয়ই আছে। ভাবের এই পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে।

এই সহজ উদাহরণে হয়তো-বা দুই প্রকার ‘ভাব’-কে আমরা আলাদাভাবে বোঝার ইঙ্গিত পাচ্ছি। তবে মনে রাখতে হবে বাংলার ভাবান্দোলনের আন্তরিক প্রবণতা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কিংবা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা নয়। অন্যদিকে এটাও মনে করার কোন কারণ নাই যে রবীন্দ্র-নজরুল-আধুনিক গানের মধ্যে কোন ‘ভাব’ নাই, কোন ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাসের অনুভূতি নাই, পরতত্ত্ব নাই, ইত্যাদি। নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কথাসম্পন্ন গানের একটা বিষয় থাকে। কথার মধ্য দিয়ে কিছু একটা বক্তব্য পেশ করা হয়। সেই অর্থে গান মাত্রেরই ভাব আছে। কথা থাক বা না থাক গান আমাদের মধ্যে দার্শনিকতা সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম। সেই ব্যাপক অর্থেও গানে ভাব থাকে। ইংরেজিতে mood কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ভাব পরিভাষাটি ব্যবহার করি। এই ভাব একটা মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ সেই হিসাবে শব্দটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা। গান মনের যে-ভাবান্তর ঘটায় বা গানের ভাষা ও সুর আমাদের ওপর যে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে সেই ক্ষমতাকেই আমরা ‘ভাব’ বলে ধরি। এই অর্থেই আমরা বলি, ‘গানটির ভাব খুব করুণ’। ইংরেজি মুড মারফিক ভাব কথাটির যে-ব্যবহার, এই ভাব তারই সমার্থক। বাংলার ভাবান্দোলনের যে ‘ভাব’ এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় তার সঙ্গে এই সকল ভাবালুতার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ এবং গৌণ। লালনের গান আমাদের মুড আনতে পারে সত্য কিন্তু লালনের গানের ভাবুকতা সেই মনস্তাত্ত্বিক মুড নয়। সেই মুড ভাবান্দোলনের বিষয় নয়, যাকে ‘ভাব’ শব্দটির অর্থ হিসাবে বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে ‘রসোৎপাদক চিত্তবিকার’ [হরিচরণ ৬৬]। এটা ইংরেজি মুড কথাটিরই অনুবাদ মাত্র। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিকারজনক বিভাবজনিত যে চিত্তবৃত্তি সেটাই ভাব। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্র রতি ও ভাব দুটোকেই এই অর্থে সমার্থক গণ্য করা হয়। তাহলে, বাংলার ভাবান্দোলনের ‘ভাব’ পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রের রতি কিংবা ভাব কোনোটাই নয়।

ভাব কথাটির একটা বৈষ্ণবীয় ভিত্তি আছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রসোৎপাদক চিন্তাবিকারের সঙ্গে তার বাহ্যিক মিল আছে তবে বৈষ্ণবীয় ভাব নিছকই মানসিক বিকার নয়। ভক্ত অনুরাগে যে-ইষ্টবস্তু ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন তখন চিত্তের একাগ্রতার কারণে ধ্যানের একটা অনুভাব খাড়া হয়। তাই সাধকমাত্রেরই চিত্তের ‘বিকার’ ঘটে। সেই ধ্যান শরীর ও মনের সকল বৃত্তিরই একাগ্রতা। রসোৎপাদক বিকারের সঙ্গে এখানেই তার মৌলিক পার্থক্য। সেই ‘বিকার’ শুধু মানসিক অনুভব নয়। চিত্তের এই ‘বিকার’ একই সঙ্গে ঈশ্বর প্রত্যক্ষেরও শর্ত। ঈশ্বরকে দেখা বা ঈশ্বরের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের মতো শুধু জ্ঞানগত হাজিরা নয়। যা প্রত্যক্ষ ভাবে হাজির নাই তাকে জ্ঞানগত নিশ্চয়তা দেবার জন্য দার্শনিক হাজিরা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। যাকে *Metaphysics of Presence* বলে আজকাল কথা চালাচালি চলছে। সকল বৃত্তির ঐক্যসাধন এবং ইষ্টবস্তুর সঙ্গে একাকার অবস্থা অর্জনের সঙ্গে এই জ্ঞানগত হাজিরার ফারাক আকাশ আর পাতাল।

নিশ্চয়-জ্ঞান লাভের তাগিদে সত্য ‘প্রত্যক্ষ’ করার দার্শনিক প্রকল্পকে ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা সত্যকে সামনে হাজির করার ‘অধিবিদ্যা’ (*metaphysics of the presence*) বলে সমালোচনা করেছেন। একে আমরা গরহাজিরকে হাজির প্রমাণের বৃথা চেষ্টা বলতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে যে সমালোচনা দেরিদা করেছেন বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে সেই সমালোচনা করা যায় কিনা বিচার করে দেখার ব্যাপার। বাংলার ভাবান্দোলন পাশ্চাত্যের মতো নিশ্চয়-জ্ঞান নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল বলে বিশেষ মনে হয় না। যাকে সপ্রাণ করছি তার অনুপস্থিতিকে কল্পনা করে যে বিকার বাংলার ভাবান্দোলনের কল্প ও সংকল্প নির্মাণে সেই বিকারের আমরা কি সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক দেখছি, নাকি দুটো আলাদা এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের আলাদা করে নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু পার্থক্য আছে বুঝতে পারছি। যা গরহাজির তার মধ্যে ডুবে যাওয়া, এককালীন হওয়ার চর্চা শুধু বৈষ্ণব, সুফিসহ প্রায় সকল ধারার মধ্যেই আমরা দেখি। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে ইসলামের প্রভাব এই ক্ষেত্রে বৈষ্ণব আন্দোলনের ওপর সরাসরিই পড়েছে।

বাংলার ভাবান্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন। অতএব এই ‘ভাববিকার’ বা দশাপ্রাপ্তির অনুষ্ণ থেকে আমরা যে-অর্থে ভাব কথাটা ব্যবহার করি তাকে পুরোপুরি আলাদা করা সম্ভব নয়। হয়তো দরকারও নাই। কিন্তু একটি দিক সম্পর্কে সতর্ক থাকার দরকার আছে, ভাবে বিকারগ্রস্ত হওয়া, মুছা যাওয়া, জ্ঞানহারা হওয়া ইত্যাদি ব্যাপার বাংলার ভাবান্দোলনের বাহ্যিক কিছু লক্ষণ মাত্র। এর ফলে ভাব মানেই বিকারগ্রস্ত হওয়া বা পাগলামি করা বোঝায় না। দুর্ভাগ্যবশত ‘ভাব’ কথাটি যেকোন কারণেই হোক তার মূল চ্যুত হয়ে এই এই ধরনের নেতিবাচক অর্থে পর্যবসিত হয়েছে। ভাব ইংরেজি মুড অর্থে চিন্তাবিকার নয়, এইটুকুন মনে রাখলে আমরা ভাবের পথে অনেক দূর হেঁটে যেতে পারব।

গৌরঙ্গ যখন শ্রীকৃষ্ণকে রাখা ভাবে উপাসনা করছেন, কিম্বা সুফি বয়াতির ধারা মনসুর হাল্লাজের মতো যখন আল্লাহ বা ঈশ্বরকে জিকির বা ধ্যান করে তখন সেই সত্তা (absolute) পাশ্চাত্য দর্শনের মতো নিছক ধর্মীয় বিশ্বাসের বা দার্শনিক জ্ঞানের বিষয় মাত্র নয়। বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে হলে এই সহজ দিকটির প্রতি শুরুতেই নজর রাখা দরকার। আলোচনার শুরুতে যে দিগন্তের কথা বলেছি এখানেই তার দিকগুলো চিহ্নিত হয়ে যায় এবং বাংলার ভাবান্দোলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়তে শুরু করে। পরমের সঙ্গে শুধু বিশ্বাস বা জ্ঞানের সম্পর্কে বাংলা সন্তুষ্ট নয়। পরম একই সঙ্গে শরীরের—ইন্ড্রিয়োপলব্ধির বিষয়। প্রেমের, এশেকের, আকাক্ষার বিষয়। বিষয়ের (object) সঙ্গে বিষয়ীর (subject) সম্পর্ক বিমূর্ত হলে চলবে না উভয়ের একটা সাক্ষাৎ বৈষয়িক যোগাযোগ ঘটতে হবে—ক্রিয়াবিক্রিয়ার রূপ থাকতে হবে। ফলে তার প্রত্যক্ষ ‘বিকার’ দৈহিক প্রকাশ ও মানসিক লক্ষণাদিতে থাকা চাই।

তাহলে যতোটুকু ওপরে বলা হোল তাতেই বোঝা যাচ্ছে ভাব কথাটার অর্থ নিছক আল্লাহ বা ঈশ্বরের ধ্যান নয়। জ্ঞানের পরিমণ্ডলে বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন মাত্র নয়—যেমন, পাশ্চাত্য দর্শনের প্রকল্প। হেগেলের দার্শনিক প্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া যাক। খ্রিস্টধর্ম যেভাবে যীশু বা ঈশ্বরের সত্য পরমকে বিশ্বাস বা স্বজ্ঞা (intuition) দিয়ে বোঝে, তাকে বুদ্ধি বা যুক্তির ব্যাকরণ দিয়েও প্রদর্শন করা সম্ভব—এটাই ছিল হেগেলের দার্শনিক প্রকল্প। হেগেল ধরে নিয়েছিলেন খ্রিস্ট ধর্মই পৃথিবীর একমাত্র ‘সভ্য’ ধর্ম। তাঁর দাবি ছিল সভ্যতার চরম নিদর্শন এই খ্রিস্ট ধর্মের গড় বা ‘পরম’ (absolute) বুদ্ধির অগম্য নয়। গড় বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যারও ‘বিষয়’ (object) এবং মানুষ (subject) যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সেই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। খ্রিস্ট ধর্মের ‘পরম’ ব্যাখ্যা করার মহৎ কাজটিই হেগেল হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর phenomenology of the Spirit কিংবা Logic শাস্ত্রের গোড়ার সংকল্পও তো এটাই। বাংলার ‘ভাব’ কখনোই ‘পরম’ কে শুধু বুদ্ধির ‘বিষয়’ বলে গণ্য করে নি। মানুষ বা সেই বিষয়ে ভাবিত ‘বিষয়ী’ (subject) কি করে তার নিজের রক্তমাংসের শরীর বা বৈষয়িক সত্তার বিচার না করে নির্ণয় করবে যে সে বুদ্ধি দিয়ে যা জানলো তা আসলেই সঠিক। ঘুরে ফিরে তো তাকে তার নিজের শরীরের দিকে, তার দেহের গঠন, বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর নিতেই হবে। কারণ এই শরীর আর ইন্ড্রিয়ের মধ্য দিয়েই তো সে জানছে। কিন্তু যখনই এই খবর আমরা নিতে যাব তখন শরীরই আবার হয়ে ওঠে আমাদের বিষয় এবং বুদ্ধি বা চিন্তা হয়ে ওঠে জ্ঞানের কর্তা বা ‘বিষয়ী’। কিন্তু কে এই বিষয়ী? সে কি একই সঙ্গে আমাদের রক্তমাংসের শরীর নয়? যে পরমকে ‘জানে’ সে শুধু বুদ্ধি নয়, শরীরও বটে। তাহলে একদিকে ‘বিষয়’ ও ‘বিষয়ী’-র ভেদ বা দ্বিধা ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়, অন্যদিকে এই ভেদ বা দ্বিধা একই সঙ্গে অবিদ্যা, মায়া, ভ্রান্তি বা

ক্রটিপূর্ণ। এই ভেদ বা দ্বিধা নিত্য সত্য নয়। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে সবসময়ের জন্য সত্য হতে পারে না। অথচ পাশ্চাত্য দর্শন বিষয় ও বিষয়ীর ভেদকে নিত্য সত্য ধরে নিয়ে শুরু করে, ফলে তার দার্শনিক প্রকল্পের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় বুদ্ধির জগতে আবার দুইয়ের একত্রীকরণ। তা কি কখনো সম্ভব? বাংলার ভাবান্দোলন ‘বিষয়’ আর ‘বিষয়ী’-র ভেদ বা দ্বিধাবস্থাকে নিত্য সত্য জ্ঞান করে না, এতোটুকু অন্তত পরিষ্কার। সেই কারণেই ‘দেহ’ বা ‘শরীর’ বাংলার ভাবান্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়। পাশ্চাত্য দর্শনের দার্শনিকতার মধ্যে ‘শরীর’ নাই। সেখানে জ্ঞানের কর্তা বা বিষয়ী (subject) হচ্ছে একটা বিমূর্ত ধারণা, যাকে আমরা চিন্তা বলি। অনেকটা ভূতের মতো হাওয়ায় ভর করেই যেন চিন্তার বিরাজ। এই বিমূর্ত সত্তাকে সে একবার ‘আছে’ বলে ধরে নেয়, পরক্ষণেই বুদ্ধি দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখন দেখছি মিশেল ফুকোসহ আরো অনেক দার্শনিক এই ‘কর্তা’, এই ‘বিষয়ী’, এই সাবজেক্ট নামক ভূতের বিলয় ঘোষণা করে বসেছেন। পাশ্চাত্যে দর্শনের গালগল্প হিশাবে ‘কর্তা’ মশায় এলেন এবং গেলেন। বাস্তবে অবশ্য পাশ্চাত্যই জগতের ‘কর্তা’। ও থেকে যদি বাংলার কিছু শিক্ষা হয়।

আশা করি বাংলা ‘ভাব’ কথাটি কেন পাশ্চাত্য দর্শনের সমার্থক নয় সেটা ওপরের আকার ইঙ্গিত থেকে হলেও আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। এই বিষয়ে অনেক বড়ো বড়ো কেতাব লেখা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য আপাতত এইটুকুতেই চলবে।

একইভাবে বাংলার ‘ভাব’ কোন ভাবেই বৈদিক বা আর্য সংস্কৃতির কিংবা ঔপনিষদিক ‘দর্শন’ নয়। মনসুর হাল্লাজ আল্লাহকে যেভাবে ‘প্রত্যক্ষ’ করেছিলেন কিংবা শ্রীচেতন্যের রাধা ভাবে উপাসনা, কিংবা রাধা ভাবে দশা প্রাপ্তি—কোনটির ক্ষেত্রেই ‘দর্শন’ কথাটি ষোল আনা প্রয়োগ করা যায় না। বুদ্ধি বা জ্ঞান কাণ্ড বা দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আল্লার ‘দীদার’ বা ঈশ্বর ‘দর্শন’ একটি উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে যুক্তির ভূমিকা আছে, যুক্তির বিকাশ ও পরিণতির পূর্ণ সুযোগ আছে – কিন্তু যুক্তি মাত্রই – অর্থাৎ ‘দার্শনিক’ মাত্রই ‘ভাবুক’ নয়। ঠিক এই কারণেই ভাবের চর্চাকে কোন ভাবেই, কোন অবস্থাতেই দেহতাত্ত্বিক চর্চা থেকে আলাদা করা যাবে না। কিংবা ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে ভাবচর্চা ও দেহতাত্ত্বিক চর্চা বঙ্গ সমার্থক। দেহ ছাড়া ভাব নাই, এবং ভাব ছাড়া দেহ নাই।

ভাব শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিচার করলে দেখা যায় ‘ভূ’ থেকে ভাব। ‘ভূ’ অর্থ হওয়া, হয়ে ওঠা। এই কারণেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে ভাব শব্দটির অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে এক নম্বরেই লিখেছেন ‘জন্ম’/ ‘উৎপত্তি’ দুই নম্বরে হোল ‘সৃষ্টি’ [দাস ৮৬]। ভাব কথাটির অর্থ তাহলে জন্ম লাভ করা, সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু কোথা থেকে

কেমন করে জন্ম লাভ? নিজের থেকে, নিজেরই উৎপত্তি, নিজেরই বিবর্তন, নিজেরই ‘বিকার’। জীব আর পরমে কোন পার্থক্য নাই—যে জীব বা মানুষ তার পক্ষেই কেবল পরমের রূপ ধারণ সম্ভব। পরম জীবেরই অন্তর্গত প্রকল্প। তাহলে ভাবান্দোলন হচ্ছে সেই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া, তারই ইতিহাস। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য দর্শন যে অর্থে being কথাটি ব্যবহার করে এবং তার দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানের বিষয় হিশাবে ধরে নেয়, বাংলার ‘ভাব’ কথাটির অভিমুখ যেন সেদিকেই, কিন্তু শরীর বাদ দিয়ে নয়। অন্যভাবে বলা যায়, ভাববাদী হয়ে নয়। বাংলার ভাব ভাববাদী পথে যায় না, তার অভিমুখ ইহলোকের দিকে।

তবুও সতর্ক থাকা দরকার বাংলার ভাব আর পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে যে ঐতিহাসিক পার্থক্য বা যাত্রা শুরুর ফারাক সেটা অনন্তকালীন কোন পার্থক্য নয়। এখানে ‘আমরা’ এবং ‘তারা’ এই ধরনের দ্বিবিভাগ আমরা প্রস্তাব করছি না। পার্থক্য বিচার আমাদের এখনকার আলোচনার জন্য জরুরি। কিন্তু দুই যাত্রার অমিল সন্ধান যতোটা জরুরি, মিল অনুসন্ধানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পার্থক্যটা ধরতে পারলে যেখান থেকে আমাদের আলাদা যাত্রা সেখান থেকেই শুরু করব আমরা। কিন্তু দুটো ধারাকে একই সদররাস্তায় তোলা আদৌ সম্ভব কিনা সেই বিচার মনে রেখে।

কিছু গবেষণা হয়েছে, কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলনের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা আরো স্পষ্টভাবে নজরে আনার কাজটি শুরু হয়নি। সেই ইতিহাস অনুসরণ করার কাজটা শুধু ইতিহাস হিশাবে রচনা করার কাজ হিশাবে পড়ে রয়েছে। তবে সেদিকে নয়, আমি নজরটা ফেরাতে চাই আরো ব্যবহারিক জায়গায়। নানান সাংস্কৃতিক ও ভাবগত আন্দোলন থেকে আমরা কিভাবে সেই ধারাগুলোকে বেছে নেব যেগুলো বাংলার ভাবান্দোলনের অন্তর্গত বা বৈশিষ্ট্যসূচক দিক? বা ‘ভাব’ বলতে এখানে যা বোঝাতে চাইছি সেই অর্থে ভাবান্দোলনের অংশ? ভাবান্দোলনের অন্তর্গত প্রশ্নগুলো কী ছিল? কিভাবে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে? তার সমাধান দেবার ধরন কি ছিল? কিংবা আদৌ কোন সমাধান দেওয়া হয়েছিল কি? অর্থাৎ আমরা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? এবং বাংলা যদি তার সজীব ভাবুকতার চর্চা ও তৎপরতাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে এখন কোথা থেকে শুরু করতে হবে?

আমার প্রথম এবং পরিষ্কার প্রস্তাব হচ্ছে, সেটা শুরু করতে হবে ‘দেহ’ থেকে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস যেভাবে জ্ঞানের বিষয় হিশাবে বিশুদ্ধ সত্তার ধারণা (being) দিয়ে শুরু করে, বাংলার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ আমাদের ভুল দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারটাই সম্ভবত সবচেয়ে ফলদায়ক হবে। কী এই জিনিস যাকে বঙ্গে আমরা বলি ‘দেহ’? যাকে আমরা বলি ‘শরীর’? দেহের প্রশ্ন একই সঙ্গে অনিবার্যভাবে আমাদের নিয়ে যাবে ভাষার প্রশ্নে। কারণ দেহ সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো ভাষায় মধ্যে তৈরি, ভাষা দিয়ে গঠিত। তাহলে প্রশ্ন উঠবে ভাষার আগে দেহ? নাকি দেহের আগে ভাষা? নাকি তাদের আলাদা করার ধারণাটাই

অবিদ্যাজনিত, বিভ্রান্তিকর? প্রশ্ন উঠবে ‘দেহ’ এবং ‘দেহের ধারণা’-র মধ্যে কী পার্থক্য? যে দেহে ‘আমি’ বাস করে দেহ সম্পর্কে ধারণা করছি, সেই দেহকে তো আমি কোনদিন জানতে পারবো না। ওকে খুলে দেখব কি করে? অন্যের শরীর দেখে আমি নিজের শরীর সম্পর্কে ধারণা করছি। তাহলে শরীরের এমন কিছু ‘করণ’ কি আছে যা দিয়ে আমি নিজের শরীরকে জানি, জানতে পারি এবং ‘আমি’ ও আমার শরীরের এই অপার পার্থক্যের বিলয় ঘটতে পারি? ভাষার প্রশ্নটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ও ভাষার সম্পর্ক বিচারও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে। দেহের বিচারই আমাদের তাহলে ভাবুকতার কেন্দ্রে সত্ত্ব স্থাপন করতে সক্ষম। মনে হয়, ওখানে দাঁড়িয়ে ‘যন্ত্র’, ‘মন্ত্র’ এবং ‘তন্ত্র’ নামক রহস্যে আবৃত জগতের নেকাবটা আমরা খুলে ধরে তার নাড়ির খবরটা নিতে পারব এবং এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচারিত নানান কেচ্ছাকাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আমরা সেই জগতের খবর নিতে পারবো যেখানে শরীর ও ভাষার সম্পর্ক বিচার বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল, পাশ্চাত্য এখন যা বোঝার চেষ্টা করছে। এটা তো অস্তুত অতি দূর থেকেও বোঝা যায় যে তান্ত্রিক সাধনা বা চর্চা – যার ওপর আমরা অপার রহস্য বর্ষণ করে থাকি – তা আদতে শরীর ও ভাষার ভূমিকা ও ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরই মামলা।

বাংলার ভাবান্দোলন শরীরকে বাদ নিয়ে নয়। তার মানে, বাংলা শুধু ভাবের কথায় খুশি নয়, কারণ শরীর ছাড়া ভাব নাই। তাহলে ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তাদেরই আগে খোঁজ পড়বে শরীর যাদের চিন্তা ও চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়, অর্থাৎ দেহতত্ত্ব এবং দেহতাত্ত্বিক করণ যাদের আন্দোলনের মূলে। সত্যি যে দেহতাত্ত্বিক চর্চার নামে বিস্তর ‘বিকৃতি’ বা ‘ব্যভিচার’ ঘটেছে, যেমন এই কালে ‘ভালবাসার’ নামে যথেষ্ট বিকৃতি ও ব্যভিচার আমরা দেখি। পুরোটাই নির্ভর করছে কি আমরা দেখছি, কি আমরা দেখি, আর সেই দেখাকে কোন্ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করি। কিন্তু দেহ বাদ দিয়ে বাংলার ভাবান্দোলনকে অন্য কোনভাবে ভাবার সুযোগ নাই।

ভাব, ভাষা ও দর্শন

‘জয়গুরু। তোমার মুখ ভাবিয়া আমার শুরু। তুমি দাসীকে কথা কইবার তৌফিক দিও। যেসকল কথা প্রকাশ্যে কওন নিষিদ্ধ আমাকে তা কইতে বাধা দিও। কিন্তু রসিকগণ যেন আমার বাক্যের অর্থ বোঝেন, কারণ তাঁহারা ই নৈঃশব্দ পাঠ করিতে সক্ষম। ভাষা মাত্রই বিরতি ও যতি চিহ্ন দ্বারা অর্থময়। তদুপরি অ-রসিকে আমাকে লইয়া যেন হাস্যমশকরাও করিতে সক্ষম হয়। আমাকে নিন্দা করিতে উৎসাহ বোধ করে। আমোদ লাভ করে। আনন্দিত হয়। কারণ অবিদ্যাবশত উহারা না জানিতে পারে, কিন্তু তাহারা তোমারই পদাশ্রিত। প্রভু, সকলই তোমার লীলা !

দর্শনের খুবই গোড়ার একটি প্রশ্ন সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দর্শনের বর্ণশিক্ষা ক্লাশের প্রথম দিনের পাঠ্যসূচী। নানান কিসিমের দর্শন আপনাপন ইস্কুল বা মতপার্থক্য মোতাবেক যে-প্রকারেই উত্তর দিক, ‘দর্শন’ নামখানার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন এই ধারণার মধ্যে সত্যের সহিত ‘দর্শন’ বা দেখাদেখির একটা ব্যাপার আছে; সত্য বুঝি যাহা দেখা যায় বা দেখানো যায়। ইন্দ্রিয়গত ভাবে দর্শন বা দেখাদেখির ব্যাপারের সঙ্গে চক্ষুর সম্পর্ক বরাবর। এই প্রত্যঙ্গটির সহিত তাহা হইলে দার্শনিক বিচারে ‘সত্য’ নির্ণয়ের সম্পর্কও পাওয়া যাইতেছে। এই অনুমান ‘দর্শন’ নামক আক্ষরিকতার মধ্যে উৎপন্ন অন্যান্য ধারণা সম্পর্কে খাটে। শুধু আক্ষরিক বিচারেই দেখা যায় যে বাংলায় ‘ভাব’ বোঝাইতে দেখাদেখি বা চক্ষু সংক্রান্ত কায়কারবার বোঝায় না। শরীরের একটি প্রত্যঙ্গের সহিত সত্যের স্থায়ী সম্পর্ক মানিয়া লইতে বাংলার ঘোর আপত্তি থাকিবেই থাকিবেই। এই খানেই ‘দর্শন’ ও ‘ভাব’—এই দুই আক্ষরিকতা, ধারণা ও সম্ভব্যব অপরাপর অর্থোৎপাদনের সম্ভাবনার মধ্যে দুই জগতের উপস্থিতি টের পাইতেছি। এই সংবাদ দিয়া আমার কথা শুরু করিলাম।

দুই

কোন কিছুর সহিত আমাদের মন সায় দিলে আমরা বলি, ‘ঠিক’। কিছু দেখা বা জানা আমাদের মনের ছবি, কল্পনা বা সংকল্পের সহিত যদি বরাবর হয় আমরা বলি ‘হ্যাঁ’, এই তো ‘ঠিক’। ঠিক-বেঠিকের বিচার নিয়াই তো সত্য। আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় দৈনন্দিন বাতচিতে ভাষাকে আমরা যে কায়দায় ব্যবহার করি সেই কায়দায় লিখি না। তথাপি কথাবার্তার মধ্যেই কিন্তু দর্শনের মালমশলা জমা হয়, যেভাবে আমরা চিন্তা করি কথাবার্তা বলি তার মধ্যে সহজ সরল ভাবে খোঁড়াখুঁজি খোঁড়াখুঁড়িতে আমরা দর্শনের অনেক মালমশলা পাইয়া যাই। কিন্তু বাংলায় আমরা ‘ঠিক’ কথাটিকে যে-অর্থে বলি, বুঝি, যেভাবে প্রয়োগ করি, কাজে খাটাই—‘সত্য’ বলিলে তো সেই রকম বুঝি না। ‘ঠিক’ বা ‘সত্য’-কে সেইরকম এপ্লাইও করি না। তাহলে দুইয়ের ফারাক বিচার করিবার মোজোজোও আসলে দর্শন চর্চাই। আলবৎ। তাহা হইলে দর্শনের ‘সত্য’ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে ইতিহাস ও সম্ভাবনা ধারণ করে বাংলায় দিনযাপনের কথাবার্তায় ‘ঠিক’ উচ্চারণ করিয়া আমরা যাহা বুঝাইয়া থাকি উভয়ের পার্থক্যও মনে রাখিতে হইবে। এই ভাবে পার্থক্য করিতে শিখিলে আমরা বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, পরস্পরের সহিত তুলনা এবং তাদের ব্যবহার বিচার দর্শন বা ভাবচর্চাকে কয়েক কদম আগাইয়া নিয়া যাইতে পারি।

তিন

ইন্টারেস্টিং। দেখেন, গৃহস্থ যদি নজরদারি ঠিক রাখে তাহলে চোর ঘরে ঢোকার আগেই ধরিয়া ফেলা সম্ভব। কীসের চুরি, কীসের চোর? ভাবের ঘরে চুরি। কথা শুরুই করি নাই, অথচ আমরা দেখি ‘সত্য’ আর ‘ঠিক’—এই দুইটা; শব্দের মাঝখানে বিস্তর ভাবের ফাঁক। দর্শনের ঘলিঘুপচি। ইত্যাদি। আমরা ভাবুক জাতি, অথচ ভাব চর্চা করি নাই বলিয়া এই ফাঁকগুলা এখন অনেক বৃহৎ। ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়া গোটা হিমালয় পর্বত বসানো যায়। তবুও ভাব নিয়া কথাবার্তায় সতর্ক থাকন দরকার। যদি সতর্ক না থাকি তা হইলে চোর ও চুরি নজরে পড়বে না। চোর ধরা পড়ন বাধ্য যদি দর্শন আর ভাষার সম্পর্ক আমরা না ভুলি। এই জন্য প্রথমই যেন বুঝি যে দর্শন মানে দর্শনও নয়, ভাষার বিচার। মুখের ভাষা, ঘরের ভাষা, বাজারের ভাষা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইয়ার্কি তামাশা সুখ দুঃখের ভাষা সবই দর্শন। সকলই দর্শনের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনযাপন চলনফেরনে ভাষার স্বাদ নেওয়া-দেওয়া লওন-দেওন ইত্যাদি দর্শনেরই কাজ। অতএব ভাবেরও কায়কারবার বটে। এই সবার মধ্যেই ভাব নিজেই নানান প্রকারে ভাবুকের জন্য হাজির হয়। যদি ভাবুক সেই স্বাদ গ্রহণে ওস্তাদ হইতে পারে তাহা হইলে ভাবও ধরা দেয় বা ভাবুকের চিন্তায়—অর্থাৎ ভাষার ফাঁদে ধরা পড়ে। ভাষার বা কোন না কোন চিহ্ন ব্যবস্থার বাইরে চিন্তা বলিয়া কিছু নাই—পাশ্চাত্যে আজকাল এই ধরণের একটি

সিদ্ধান্ত প্রবল হইয়াছে দেখিতে পাই। ভাষার মধ্যেই চিন্তা রূপ পরিগ্রহণ করে কি করে না এই তর্ক আছে, কিন্তু সত্য যে চিন্তা প্রকাশিত হইতে চালিলে বা চিন্তা প্রকাশ করিতে গেলে তাহা ভাষা হইয়া যায় বা ভাষার রূপ পরিগ্রহণ করে। গ্রহণ করে। তাহা হইলে ভাষার স্বাদ নেওয়া মানে ভাবের স্বাদ নেওয়া। যে পারে না তার মুখ দর্শনেই দেখা যায় ফিজিওলজি অন্যরকম। তার জিহ্বা নাই। যার জিহ্বা নাই তার গিলিয়া খাওয়াই অভ্যাস। অতএব ভাবের ‘আস্বাদন’ লইয়া বাংলা এতো পাগল হইয়া থাকে কেন সেইটাও বুঝন দরকার। যার যার জিহ্বা নাই তার তার আস্বাদনের শক্তিও নাই। বুঝিবার প্রত্যঙ্গও নাই। টিকটিকির লেজের মতো ইহাদের জিহ্বা খসিয়া গিয়াছে।

চার

দর্শন বা দেখাদেখির ধারণার পরে শাস্ত্র হিশাবে দর্শনকে ভাষার বিচার হইয়া উঠতে বিস্তর শতাব্দি পার হইয়া আসতে হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের বহু বছর—আহারে কতো বছর যে লাগল! দর্শন = দেখা = সত্য দেখানো, দেখাইয়া দেওয়া নজরে আনা, ইত্যাদি। এই সত্য যুগ থেকে ত্রেতা যুগে অর্থাৎ দর্শন = ভাষার বিচার = গল্প, কেছা, বয়ান, চরিত্র বানানো ও কাহিনীর বুনন ইত্যাদির মধ্য দিয়া নানাবিধ প্রতীক, প্রতিমা ও অর্থাৎপাদন—এই জায়গায় আসতে গিয়া পাশ্চাত্য দর্শনের সে কী কষ্ট, সে কী কঠিন তপস্যা কতো ঘোড়া কতো হাতি কতো পণ্ডিত কতো বিশ্ববিদ্যালয় কতো বস্তুবাদ কতো ভাববাদ কতো স্ট্রাকচারালিজম কতো পোস্টমডার্নিজম কাটল ইয়ত্তা নাই। বাংলা ততোদিনে পুরাণ, শিবপার্বতীর কেছা, মনসার ভাসান, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি পার হইয়া দ্বাপর যুগেরও পরে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও ইসলামী ভাবের মিশাল, স্ববিরোধিতা, ফাটাফাটি ও সংশ্লেষণ। এই ভাবেই দ্বাপর কাটাইয়া দিল বাংলাভাষা। ততোদিনে কলি যুগও সামনে। কলিযুগে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য আর অদ্বৈতাচার্যকে লইয়া নদীয়ায় নাইচা কাইন্দা অস্থির। নিত্যানন্দ। তাঁকেই বাংলার ভক্তি আন্দোলনের গুরু গণ্য করা জায়েজ কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নদীয়ায় থাকেন নাই, বৃন্দাবনে গিয়া ব্রাহ্মণদের খপ্পরে পড়লেন আর ফিরলেন না। ন্যায় ও নব্যন্যায়ও বাংলায় ইতিমধ্যে কুপোকাত। তারা এমন আছাড় খাইলো যে আর দণ্ডায়মান নাই। এখন বিমলকৃষ্ণ মতিলাল আমাদের নতুন কায়দায় ন্যায়-নব্যন্যায় ইত্যাদি শিখাইতে আছেন। এটার কিন্তু দরকার আছে। কারণ বাংলাভাষায় ইহাদের আছাড় খাইবার স্বরূপ বুঝন দরকার, আর কেনই বা বাংলায় শেষতক সাংখ্যের বিচার আর ভক্তির ধারা শুরু হইল সেটাও জানা জরুরি। সাংখ্য আর বোধহয় স্থানে স্থানে বৈশেষিক নতুন ভাবে ভক্তি আন্দোলনে জায়গা করে নিল, কিন্তু কীভাবে লইলো, কোথায় তারা আসন পাইলো সেইসব খবর—বিতাস্ত আমরা লই নাই। ততোদিনে সুফি ইসলামের সাম্য, প্রেম ও মানুষের ‘উম্মাহ’—অর্থাৎ সকল বর্ণ, শ্রেণী ও চিত্রবিচিত্র বিশ্বাসের মানুষদের একত্র

করণের খবর উপমহাদেশে রটে। ঘটনা ও রটনা মিলাইয়া চিশতিয়া কাদেরিয়া, সুহরাওয়ার্দি নকশাবন্দিয়া নানান ভাবে বাংলায় বাসা বাঁধনে কামিয়াব হয়। এখন কোনটা হিন্দুর কোনটা জৈনের, কোনটা বৌদ্ধের আর কোন জায়নামাজ মুসলমানরা বাংলার বাহিরের তুন পাতলেন এটা বুঝনের উপায় নাই। খ্রিস্টানেরও আছে, কিন্তু কোনটা এই কথা এখন তোলার মধ্যেও ফায়দা নাই। কারণ কলেনিয়ালিজম ও ইম্পেরিয়ালিজমের যুগে আমরা সকলেই খ্রিস্টান। সঙ্গে গ্রিক বা যবনদের মিশাল থাকতে পারে। ইতিহাসে নিজের বইলা কোন কিছু নাই, ঐতিহ্য নামক সোনার পাথরবাটিও নাই। অতএব বাংলার ইতিহাসই বাংলা। তার ভাষার মধ্যেই সে যা হইতে চাইছে সেটাই হইছে, আর যেটা আগামি দিনে হইবো সেটা এখন হইতে আছে। একদিকে জর্জবুশ, একদিকে লাল কৃষ্ণ আদভানি আর অন্যদিকে ওসামা বিন লাদেন—ইহাদের লড়াইয়ে যদি বাংলার বারোটা বাজে তাহলে তার দোষ আমাগো ওপরেই আসবো। এই সকল ইতিহাসের মধ্য দিয়ে “ভাব” ব্যাপারটা বাংলায় কী রূপ নিয়া দাঁড়াইল তার বয়ান যেমন আজও লেখা হয় নাই, তেমনি কী রূপ আমরা দিমু ব: দিতে চাই সেই কথাবার্তাও আমরা শুরু করি নাই।

পাঁচ

প্রথম বিপ্লবের খুন ভাষার তুন বাহির হইব। ষাট দশকে, আমার বয়স যখন কম, তখন এই ধরণের হুংকার ছিল। সেই কালে আমরা জাঁ পল সার্তের আর সিমঁ দ্য বুভায়েরের নাম শুনছিলাম। সেই সুবাদে হেইডেগারের কথাও একটু আধটু আসছিলো। কি বুঝছি না বুঝছি এখন অতো মনে নাই, তবে ভাব আর ভাষার সম্পর্ক যে জল আর পানির সম্পর্কের মতোন সেটা ধরতে পারছিলাম মনে হয়। সেই সময় বাংলাদেশ নামক একটা ব্যাপার তৈরি হইতে আছিল। য়ারা ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি এইসব ঝাড়াপোঁছা করেন তাঁরা একরকম বাংলাদেশ বুঝবেন, তাঁদের শাস্ত্রের নিয়মে। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি দিয়া। সেটা দরকার^৪। সেটাও হয় নাই। ঠিক আছে। কিন্তু

^৪ তার অভাবে আমাদের কি হাল সেটা বুঝন দরকার। বাংলাদেশ নামক ব্যাপারটাকে দ্বিজ্ঞাতিতত্ত্ব, ভাষা আন্দোলন, দুই অর্থনীতির তত্ত্ব, আর্থ-সামাজিক তত্ত্ব, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ, ঘাতকদালাল নির্মূল, বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমান ইত্যাদি নানান ভাগে ভাগ হইয়া গেল। মৌলবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা, আন্তিক নাস্তিক—এইরকম নানান দিক খেইকা বোঝানো হইছে। বোঝানো হইতেছে। ততোদিনে বোমাবাজি গ্রেনেডবাজি শুরু হইয়া গেছে। আমাদের প্রিয়জনেরা লাশ হইয়া যাইতেছে। মানুষ ছিন্নভিন্ন। আমাদের চোখের পানি আবার অঝোরে ঝরবার সময় উপস্থিত। লাশের কোন পক্ষ বিপক্ষ নাই—সকলের জন্যই বাংলার ভক্তির ধারা কাঁদে—এটাই নিয়ম। য়াহারা পঙ্গু হইবার অভিশাপ লইয়া বাকি জীবন কাটাইবেন, যেন তাঁদের কথা না ভুলি। সেই প্রেম যেন মনে জাগ্রত থাকে।

দর্শন, খুন্সু, ভাবের দিক দিয়াও বাংলাদেশ বুঝনের একটা ব্যাপার আছে। আমার ধারণা বাংলার ভাব ইতিহাসের মণ্ডকায় পড়নের কারণে গোলমালে আছে। নিজের চেহারা প্রদর্শন করতে গিয়া লাশে রক্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ফলে আমরা তারে বিশেষ বুঝতে পারি নাই। শটকাট রাজনীতি, হিংসা হানাহানির সঙ্গে তার ভাবের চেহারাটারে মিলাইয়া ফালানো হইছে। তবুও ভাব তো মরে না। সে আবার ভাষার মধ্যে ঠিকই হাজির হইয়া যায়। আমাদের ভাবটা এখনও দমে নাই। যখনকার কথা কইতেছি তখন ছয় দফা, এগারো দফা ও প্রথাগত অর্থে মার্কসবাদ লেনিনবাদ এবং মাও জে দং চিন্তাধারার জয় জয়কার। ওর মধ্যেও ভাবের জায়গায় দাঁড়াইয়া আমাদের শ্লোগান ছিল ‘প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে’। ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ ছিল, কিন্তু কথাখানা সত্যত বর্তমান থাকে।

ছয়

ভাবের এই রাজনীতি পরবর্তীতে মার খাইয়া যায়। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে বাংলার ভাবের ব্যাটে-বলে ঘটাইবার তৌফিক আমাদের ছিল না। আমরা তখনও কবি। তখনও ত্রিশের দশকের কবিতা মাথায় নিয়া নাচতে ছিলাম। রাত্তাকে সোনা ভাইবা আমাদের সময় অপচয় হইছে। তাছাড়া বাংলাদেশের ভাব বলতে যা বুঝাবার দরকার ছিল জনগণকে সেটা বুঝাইবার মতো দলবাজি, মান্তানি ইত্যাদিতে আমাদের প্রতিভা ছিল না। আমরা না ঘরকা না ঘাটকা হইয়া গেলাম। ততোদিনে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিজম এবং তার বিপরীতে সমরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের কন্ঠস্বর ও টুটি টিইপা ধরে। একদল আমাদের বাঙালি বানাইতে চায়, আরেকদল মুসলমান বানাইবার জন্য উন্মাদ ও হিংস্র। আমাদের গলা দিয়া আর বিশেষ আওয়াজ করা সম্ভব ছিল না। দুই পক্ষই আমাদের হত্যার জন্য কম চেষ্টা করে নাই। বন্ধুবান্ধবদের অনেককে হারাইলাম।

সাত

কিন্তু প্রথম বিপ্লবের খুন আগে ভাষার মইধ্যেই বাইর হইবো—এই ভাব আমরা কিন্তু বাদ দিই নাই। চাপা পইড়া ছিল এতো দিন। বাংলার ভাব নিয়া আমরা বিশ্বে সওদাগরি করবার বাসনা করছিলাম, কিন্তু দেখলাম কলকাতার ভাষাই বাংলাদেশের মাতৃভাষা বইলা চাপিয়ে দিবার ফলে বাংলাদেশের ‘মাতৃভাষা’-র বা যার যার ভাবের ভাষার কোন বিপ্লবী বিকাশ ঘটানো গেল না। পাশ্চাত্য দর্শনের বিপুল ভাবসম্পদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করবার তৌফিকও কারো আর হৈল না, কারণ বাংলাভাষায় লেখা কলকাতার বইপত্রই শহরের শিক্ষিত ছেলবুড়ার বুদ্ধিবিদ্যার একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠল। একবার একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করে প্রমাণ পাওয়া গেল যে বাংলাদেশের

কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী—এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শতকরা ৯৭ ভাগ বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় কিছু পড়তে পারে না, বা পড়তে পারলেও কিছু বোঝে না। দর্শনের বইপুস্তক বা নন্দনতন্ত্র ইত্যাদি ইংরেজিতে পইড়া বুঝতে সক্ষম এই রকম ৩২৭ জনের মধ্যে কাউকেই পাওয়া গেল না। তার মানে কলকাতার বাংলা বইয়ে যা লেখা হইছে বা হয় সেটাই তাদের ভাষা, ভাব, চিন্তাচেতনা তৈরির একমাত্র রসদ। স্বাধীনতার পরে কেন ঢাকার এতো কলকাতাপ্রীতি এটা বুঝনের জন্য এই গবেষণা খুবই মূল্যবান। গবেষণা আকারে এটা প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু কলকাতাকে যেন আমরা ক্ষমার চোখে দেখতে পারি সেই জন্যই এই কাজ আমরা করছিলাম। কারণ দোষ আমাগোর। সকলে সম্ভ্রানে কলকাতার পেছনে ঘোর কইলে অনেকের প্রতি অবিচার হয়। ওরা যাবে কই? তাছাড়া কলকাতার বহু ভাল জিনিস আছে যেটা ওগো কাছ থেকে আমাগো শিখন দরকার। এই জন্য আমি একবার লিখলাম:

বসে স্বরস্বতীয় গর্ভে একটি মেয়ে একটি ছেলে
নগদ কাব্য নগদ পাবো উভয়কে একসঙ্গে পেলে...
(কবিতার বোনের সঙ্গে আবার...)

এই বাক্য আমার মনের কথা।

আট

একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হইলো, কিন্তু স্বাধীন ভাবে বাংলা আর ভাবতে পারে না, ভাবতে শিখলও না। অতএব হেগেল, মার্কস, হেইডেগার এইসব নামও বেকার হইয়া গেল। খামাখা। একাত্তরের পরেও পোলাপান সার্তর, সিমন দ্য ব্যুভায়ের লইয়া পটপট করতো, দেখতাম। কিন্তু একটা সুন্দর মেয়ের কাছে নিজেকে সার্তর প্রমাণ করা বা একটি মেয়ে একটি পোলার কাছে সিমন দ্য ব্যুভায়ের হওনের চেষ্টা করন ছাড়া এই সবার আর কোন মূল্য ছিল না। কারণ এদের কাউকেই সমাজের অন্যান্য বাস্তব কাজে বা রাজনীতিতে পাওয়া যায় নাই। অন্যদিকে যারা এরশাদ বিরোধী লড়াইয়ে আছিল তারা শিল্পসাহিত্যের বা ভাবের সঙ্গে রাজনীতি—অর্থাৎ নতুন ধরণের ক্ষমতা তৈরির সম্পর্ক বুঝতো না। একাত্তরে আমার সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে—যেইসব পরিবর্তন আসলো—মানুষের সঙ্গে থাকনের, কাজ করনের যে অভিজ্ঞতা হইলো, শক্তি আসলো—সেটা তো ঘরে বইসা সম্ভব হয় নাই। সমাজের আন্দোলন সংগ্রামে না থাকলে, ভাবকে রাজনৈতিক ভাবে ফুটাইয়া তুলবার বিপ্লবী সাহস না থাকলে ভাবের বিকাশ হইবো ক্যামনে? শ্রীচৈতন্য নারী হইয়া বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চালাইছিলেন। নদীয়ায় সেটা ছিল বাংলা ভাবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্যারালাল—যদি কেউ পাশ্চাত্যের সঙ্গে গৌরাস্ত মহাপ্রভুর তাৎপর্য নিয়া ভাবতে চান তো সুন্দর হয়। একাত্তরে আমরা বুইঝা রাজনীতি কইরছি বললে টাউটবাজি হবে। ভাবের সঙ্গে

রাজনীতির সম্পর্ক অতো বুঝি নাই। কিন্তু পানিতে নামলে যেমন চুল ভেজে কিন্তু আবার পানির সম্পর্কে আগ্রহও হয়, আমাদের সেই হাল হয়েছিল। মানুষের সঙ্গে বাধ্য হইয়া রাজনৈতিক দরকারে মিশতে গিয়া মানুষের প্রতি আগ্রহ আরো বহুগুণে বেড়ে গেল। এখন ভাষা ও রাজনীতির সম্পর্ক বুঝি। প্রথম বিপ্লবের খুন ভাষা থেকেই বাইর হইবো—এই প্রকল্প বটবৃক্ষের বীজের মতো প্রায় অদৃশ্য হইয়া বাতাসে বাতাসে উড়তে থাকলো। উড়তে আছে। মাটি কিম্বা ভাঙা বাড়ি, কিম্বা পুরানা সভ্যতার দেয়ালেও যদি একবার পড়তে পারে তো ধুকুমার কাণ্ড হইবো—এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। মিনার্ভা সন্ধ্যা হইলে দুই ডানা মেলিয়া আকাশে উড়বার জন্য পক্ষবিস্তার করব সেটা জার্মান দার্শনিক হেগেলের Philosophy of Rights পড়ার পর সেই সাক্ষ্যক্ষণের জন্য খামাখা ইন্তেজার করে বহুত সময় অপচয় করে ফেলছি। এখন আবারও বলি: প্রথম বিপ্লবের খুন, গুরুর কপায়, ভাষা থেকেই বাইর হইবো।

নয়

‘আছে’ বা ‘আছি’ ইত্যাদি ভাবের বসবাস ভাষার মধ্যে, ভাষার ঘরেই মানুষের বসবাস। সুন্দর কথা। যারা ভাষায় ভাবেন—অর্থাৎ ভাষার বিচারকে ভাবের বিচার বলে গণেন এবং ভাষা দিয়া নানান জিনিস তৈয়ার করেন, বানান—অর্থাৎ যারা কবি তাঁরাই এই ‘ঘর’টির গাউয়ান। এই গাউয়ান ভাষা পাহারা দেয় নাকি এমন এক দারোয়ানি করে যে দারোয়ানিটা অন্যরকম পাহারাদারি—বুঝন অতো সহজ না। এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝবার পরে আমার মনে হইলো বাংলার গুরুবাদ এই গাউয়ান কথাটার ওপরেই হয়তো আসলে দাঁড়াইয়া আছে। গুরু ভাষার দারোয়ানি করেন। কিন্তু কলোনিয়াল শিক্ষা আসি যাইবার কারণে বাংলা শিক্ষিতদের গুরুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইতে পারে নাই। হেইডেগার কথাটা বিস্তার বই লেখালিখি করি আমাদের এখন খানিক বুঝাইছেন। এতে ‘শিক্ষিত’-দের আরাম হইছে। এখন গাউয়ান মানে কি? পাহারাদার? রক্ষাকর্তা? নাকি ভাবের আমানত রক্ষাকারী? এই ধরনের প্রশ্ন তুলন যায়। মার্টিন হেইডেগার ভাবের দারোয়ানি ‘দার্শনিক’ আর কবিদের হাতে কেন দিলেন সেটা এখন আমরা একটু আধটু বুঝি। ‘দর্শন’ আর ‘দার্শনিক’ কথাটার প্রতি বাংলার আপত্তি আছে, আগেই জানাইছি। আপাতত দার্শনিকদের জায়গায় আমরা ‘ভাবুক’ বসাইয়া কাজ চালাইতে পারি।

দশ

ভাবুক মানে কি? যিনি ভাবেন? সেটা তো দার্শনিক কথাটারই আরেকটা বাংলা পরিভাষা হইলো। কিন্তু কাব্য এবং ভাবুকতা কিম্বা ভাষা এবং ভাব যেখানে একই সঙ্গে সশরীরে উপস্থিত সেটা তো ভাষা নয়, ভাবও নয়। রক্তমাংসের মানুষ। ভাষা মানুষের মধ্য দিয়াই ভাষা। ভাব মানুষের মধ্য দিয়াই ভাব। অতএব বাংলা মার্টিন হেইডেগারের

পথ লয় নাই। এটা বুঝতে অনেক সময় ব্যয় হইছে। পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তার জায়গা থেকেই এই সমস্যার সমাধান করতে চায়, এই সমাধান চিন্তাকে কেন্দ্র কইরাই করে আসছে। চিন্তার বাইরে তারা যাইতে পারে নাই। ভাবখানা এইরকম যে চিন্তা বুঝি শরীর ছাড়া সম্ভব। বাংলা এটা মানে না। আমি তো আগেই কইছি যে বাংলায় বস্তুবাদ নাই ভাববাদ নাই, কিন্তু শরীর আছে। শরীর ভাষা বা ভাবেরও আগে, আছে। কিন্তু এই শরীরকে ভাষা বা ভাব কোনদিনই ভাষা বা ভাবের মধ্যে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নাই, হইবো না। ভাষার বাইরে ভাবের বাইরে শরীর আছে আর তারই মধ্যে ভাব আর ভাষা। যদি কই ‘শরীর’—তাহলে এই কওয়াটাতো কোনদিনও আসল শরীর না। ভাষায় তারে, শরীরেরে, দেশকালপাত্র ভেদে উচ্চারণ করল মাত্র। কিম্বা লিখল। এই উচ্চারণ শরীর দ্বারাই সম্ভব হইছে। ভাষার দ্বারাও না, ভাবের দ্বারাও না। তাহলে কীভাবে হেইডেগারের দারোয়ানগিরি দার্শনিক আর কবির করবো? কীভাবে? গুরুকে যখন এই প্রশ্ন ছেঁউড়িয়ায় গিয়া শুধলাম তিনি কইলেন:

রাজি হলে দারোয়ানি
দ্বার খুলিয়ে দেবেন তিনি
তারেও বা কই চিনি মানি
বেড়াই কুপথে।।

তিনি কইলেন কুটতর্কে যাইও না। তুমি ভক্ত যদি তবে ভক্তিকে বোঝ। ততোদিনে আমি দেখলাম আমার জিহ্বা বুঝি আবার গজাইতে শুরু করছে। এই আয়াতের স্বাদ কিছুটা পাইলাম। মার্টিন হেইডেগার আর গুরুবাক্যেরে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখনকার আমলে জার্মান ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষায় যেইসব কথাবার্তার চল হইছে যেমন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, পোস্টমডার্নিজম—ইত্যাদিরও খোঁজ লইলাম। হেইডেগারের কথা যদি একটুআধটুও মানি তাহলে নিজের সহজ সরল ভাষার মধ্যে নুনের মতো গলনের স্বভাব অর্জন দরকার, এটাও বুঝলাম। কেবল তখনই ভাষা আর ভাবের মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠার কায়কারবার আরম্ভ হইয়া যায়। যদি জিহ্বা গজাইয়া যায় বাংলা অন্য ভাষার পথ নিব না। ওগো পথে, সাহেবসুবার পেছন পেছন আর্দালির মতো তাদের মালসামান বহন করবে না বাংলার ভাব। তার নিজের আসন সম্পর্কে এবং সেই আসনের সীমা সম্পর্কেও তার একটা ধারণা আছে। এটা আমার টের হইয়া গেছে।

এগার

দর্শন আর অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে ফারাক কি? শরীর নিয়া কথা উইঠা গেছে, তার মানে কি এনাটমি বায়লজি পড়লে বাংলার ভাব বুঝন যাইবো? বাংলার ভাব মানে কি ‘দেহতত্ত্ব’? বাংলার ভাব মানে কি চারিচন্দ্র ভেদ? গু মূত রক্ত মাসিক ইত্যাদি খাওয়া? কিন্তু শিক্ষিতরা ওখাখিত গবেষকরা এইসব কথাই তো সবসময় বইলা বেড়াইছে। বইলা বেড়ায়। হয়তো

তারা বাড়িতে এইসবই করে। খায়। তাই বাংলার সাধনার ধারণাকে নানান আজগবি কাহিনী ও খার্ডকুশ কেছা দ্বারা নোত্রা করে রাখছে তারা। এরা নিজেরা যেমন অপরিষ্কার, অন্যদের সম্পর্কেও কথাবার্তা প্রচারপ্রপাগান্ডাও তাদের অপরিচ্ছন্ন। খারাপ কথাবার্তা প্রচারেই এদের আনন্দ। এদের কথা শুইনা যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই।

বার

বিজ্ঞান বললে আলাদা যেমন একটা শাস্ত্র থাকে বা আছে, দর্শন সেই অর্থে এমন কোন শাস্ত্র না যে বিষয়টা আমরা আগে থাকতে জানি, বা জানা দরকার। মানুষ মাত্রই দার্শনিক, যদি সে নিজের চিন্তার দিকে নিজে মনোযোগী হয় এবং চিন্তাকে সেই দিকে ধাবিত করবার তাগিদ দেয়। নিজের বিষয় নিজে ঠিক করে চিন্তা, নিজেকে নিজে বিষয় দান করে। পেটে বাচ্চা আসলে কীভাবে চলাফেরা খাওনদাওন লাগে সেটা পোয়াতি মেয়েরা জানে। সেই রকম মাথায় চিন্তা আসলে গর্ভবতী নারীর মতো আগলানো শিখন বড়ো একটা কাজ। সন্তান জন্ম না দিলে যেমন মা কী কইরা হইতে হয়, বোঝানো যায় না, চিন্তাও এইরকম জননীমূলক। বাংলা এই ব্যাপারটাকেই ‘প্রকৃতি’ বলে। প্রকৃতির মধ্যে লিঙ্গ নাই। অর্থাৎ মাইয়ালোক মাত্রই প্রকৃতি আর মর্দ মানে কর্তা – এই টাল্টিবাল্টি বাংলা মানে না। পৃথিবীতে পুরুষ একজন—তাঁর লিঙ্গ নাই আর সকলেই প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতিরও লিঙ্গ নাই। এই হোল বাংলার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করবার প্রাথমিক স্বরবর্ণ। ভাব আর বায়োলজির মধ্যে যাঁরা গোলমাল পাকাইয়া ফালান তাঁরা আজও নিজ নিজ বায়োলজি অতিক্রম করতে পারেন নাই। তাঁদের চলাফেরা কাপড়চোপড় দেখলেই চিনন যায়।

তের

কিন্তু আমরা ‘দর্শন’-কে দর্শন ধরে নিয়াই এখন কথা বলছি। দর্শনের কাজ সত্য লইয়া কারবার করা। তাহলে ‘দর্শন’ কথাটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন যে সত্য এমন একটা ব্যাপার যাকে ‘দর্শন’ করা যায়। দর্শন বা দেখার সঙ্গে সত্যের এই সম্পর্ক আগাম অনুমান কইরা লওন খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এমনকি আমরা যখন বলি, সত্য কি প্রমাণ কর। তখন প্রমাণ দাবি করার মানেও দাঁড়ায় এই রকম যে সত্যকে *প্রমাণ* কইরা *দেখাও*। প্রমাণ আর দেখা এইখানে কীভাবে একাকার হইয়া যাইতেছে খেয়াল করন দরকার। ভাষাতেও তো সেই ভাবেই বলি: দেখাও তুমি সত্য কইতেছ নাকি কইতেছ না। এই যে ‘দেখানোর’ জন্য দাবি, সত্য ‘দেখাইতে’ হয় বা ‘দেখানো’ যায়—এই অনুমানের—আগাম ধারণার—এবং সেই অনুমান মোতাবেক ভাবনাচিন্তার বিপরীতে, অথবা এই অনুমানের ওপর খাড়া থাকে এইপ্রকার সব ‘দর্শন’ শাস্ত্রের বিপরীতে—‘ভাব’ কথাটা আমাদের বুঝন দরকার। দর্শন আর ভাব এক কথা না।

চৌদ্দ

সত্যকে দেখাইয়া দেওন দরকার এই প্রকল্পটি বাংলার প্রধান প্রকল্প ছিল না। অতএব এখনও করবার আর দরকার নাই। এটাই আমার মিনতি।

পনের

কানে ধরে মানতে রাজি যে আমার বিসমিল্লাতেই গলদ হতে পারে, হয়তো আমি মোটেও ঠিক কইতেছি না। সত্য না জানলে রাজনীতি কী কইরা সম্ভব? জীবনযাপন চলে ক্যামনে? এই তর্ক আছে। যাদের জিহ্বা নাই এই রকম খামাখা কূটতর্ক তারা করতেই থাকব। আমি তো বলি নাই ‘সত্য’ বইলা কিছু নাই। খালি বলছি মানুষের বাইরে সত্য নামক একটা ব্যাপার আছে আর সেটা দেখাইয়া দেওন দরকার, বা দেখানো যায় এই ভুল পথে বাংলা যায় নাই। বাংলার ভাব যে পাশ্চাত্যের ‘দর্শন’ না, আর বাংলায় দর্শনচর্চা মানে যে ভাবচর্চা—এই দিকটা যদি আমরা খোলাসা করতে পারি তাহলে বাংলার এক বিশাল খনির আমরা সন্ধান পাব।। সেই খনিতে কী আছে আমি জানি না। অতএব আগাম তালিকা দিতে পারব না। আপাতত কেঁথায় আমাদের ভাবের খনি খুঁড়বার জন্য খাড়ান দরকার সেইখানে লালসালু টাঙাইয়া পত পত কইর উড়াইয়া দিতে পারলেই আমি খুশি। সেই খনিজ মানচিত্রে দেখাদেখির ব্যাপার নাই। সত্য মানে দর্শন নয়, অতএব ভাব কোন প্রকার দেখা বা দেখানো নিয়া উদ্ভিন্ন নয়। সেই দিক থেকে ‘ভাব’ আসলে সত্য নিয়াও উৎকর্ষিত নয়। বরং সম্পর্ক রচনার ব্যাপার...

ষোল

সত্য বললেই আমরা তাকে ইংরেজি Truth ধারণাটির অনুবাদ করে ব্যবহার করি। এর ফলে ‘সত্য’ কথাটি আমাদের ভাবে যে-ভাবে থাকবার কথা সেভাবে হয়তো আর নাই। আমরা তো এখন সত্য বললে টুথই বুঝি। ঠিক না? অথচ সৎ থেকে সত্য। তাহলে সৎ কি? এই প্রশ্ন করা দরকার। আমরা কি সেটা করি? করি না। তাহলে আবার নতুন করে পুরানা প্রশ্নও আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। সৎ, সত্য, ভাব ইত্যাদি। তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত? নাকি আলাদা ব্যাপার? এই কথারও উত্তর আমি এই প্রাথমিক পর্যায়ে দিতে পারুম না। আমার সঙ্গে পাঠকদের আরেকদিন বসতে হইব।

সতের

তবে দুই এক কথা কওন যায়। ফরাসি দার্শনিক রনে দেকার্তে (Rene Descarte) প্রশ্ন তুলছিলেন, নিশ্চয়জ্ঞান কী করে সম্ভব? খুবই গুরুতর প্রশ্ন। তাঁকে আধুনিক দর্শনের গুরু জ্ঞান করা হয়। অর্থাৎ আমি কী করে জানি যে আমি যা জানছি তা নিশ্চয় জ্ঞান,

যা জানছি তা নিশ্চিত ভাবেই জানছি। কী করে জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রমাণ করা যায়? তাঁর সম্পর্কে বিস্তর বইপত্র টীকাভাষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের কথা অন্যত্র।

বুঝি যে তিনি নিশ্চয়জ্ঞান লইয়া চিন্তিত। পাশ্চাত্য বা ‘আধুনিক’ অর্থে এই নিশ্চয় জ্ঞানই ‘সত্য’। এইটা তাঁর কাছে খেইকা আরম্ভ হইছে। আমি দেখছি যে আমার আশে পাশে গাছপালা পশুপাখি বনজঙ্গল আছে। নিশ্চিত ভাবেই তারা আছে, সেই উপলব্ধি আছে আমার। কিন্তু রনে দেকার্তের কাছে এটা নিশ্চয়-জ্ঞান নয়। আমার জানা সম্পর্কে আমি যদি নিশ্চিত হইতে না পারি তা হইলে যা আমি আশেপাশে দেখছি তা সত্য নাও হইতে পারে। দেখা যাইতেছে নিশ্চয়জ্ঞানের সঙ্গে সত্যের রিলেশান অঙ্গাঙ্গী। যদি প্রমাণ করন যায় নিশ্চয় জ্ঞান আছে, তাহলে সত্য আছে সেটাও প্রমাণিত হয়। নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভব অতএব সত্য বলে একটা ব্যাপার আছে সেই তাগিদ থেকেই রনে দেকার্তেকে নিশ্চিত হইয়া কইত হইছে যে তিনি আছেন। ‘আমি ভাবছি অতএব আমি আছি’—এই রকম কথা তিনি বলেছেন এই খবর আমরা কমবেশী জানি। কিন্তু ভেবে দেখি না যে নিজেই প্রমাণ তাঁর কাছে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশী মৌলিক হইতেছে নিশ্চয়জ্ঞান সম্ভব এই ফর্মুলা কায়ম করা। এটা জ্যামিতি, ভাব নয়।

আঠার

কী শেখা হইল? অন্য ভাষায়—যাকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য যাই বলি—বা তথাকথিত ‘আধুনিকতা’-র কাছে সত্যের সমস্যাটা জানার সংকট, জ্ঞানের মামলা। মানুষ যেভাবে ‘আছে’ সেই ভাব বোঝা তার বা মানুষ অন্য কোন ‘ভাব’ নিয়া কীভাবে থাকতে পারে তার সম্ভাবনা বিচারও নয়। মানুষ ‘আছে’ হবার কারণে তার সামনে যেটা নজরে আইল, সেটা সে নিশ্চিত ভাবে জানে কিনা সেই নিশ্চিত প্রমাণের মামলা হিশাবে দর্শন বাড়ল। দর্শন সেই কারণে দেকার্তের সময় থেকেই জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) ব্যাপার হইয়া আছে। খুবই প্রাথমিক অর্থে, সরলীকরণের দোষ মেনে বলা যায় যে বাংলা জানাজানি বা জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রমাণ নিয়া বিশেষ উদ্ভিগ্ন ছিল না। এপিস্টেমলজি বাংলার ভাবের জগতে ঢুকবার খিড়কি দ্বার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সেই প্রকার প্রমাণ তো দেখি না। তবে সদর দুয়ার না এটা পরিষ্কার। সংস্কৃত দর্শনের মধ্যেও নিশ্চয় জ্ঞানের জন্য উদ্ভিগ্নতা আছে, তবে বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার অমিলও আছে। কিন্তু ‘বাংলা’ ডাকনামে যে ভাবটাকে আমি ধরতে চাইছি সেখানে জ্ঞানের নিশ্চয়তার তাগিদ নাই এটাও কণ্ডন যাইব না। কথটা হইল নিশ্চয় জ্ঞান না হইলে ‘ভাবচর্চা’ হইব না, এটা বাংলা বলে না। অথচ পাশ্চাত্যে নিশ্চয় জ্ঞান লাভই দর্শনের মুখ্য বিষয়।

উনিশ

আহা রে, জীবনমাত্রই জীবন। প্রাণ যদি আছে হয় কেবল তার পরেই তো কোন না কোন নিশ্চয় উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধির প্রণোদনায় কাজকর্ম নড়নচড়ন ধর্ম কাব্য

রাজনীতি খাওয়া পরা আয় উপার্জন।। আমরা নিশ্চয়ই পদে পদে জিজ্ঞাসা করি না যে আমি কি আছি? নাকি নাই? দুনিয়া কি মায়া? নাকি বাস্তব? মানুষ তো আছেই, এই অনুমান ছাড়া তো জ্ঞান দূরের কথা কল্পনা স্বপ্ন, সংকল্প জগৎসংসার সবই মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব বাংলা আমি ভাবছি অতএব আমি আছি এই ঘোরপ্যাচ—অর্থাৎ নিছকই ‘যুক্তি’-র (rationality) ওপর নিশ্চয়জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করবার পথ গ্রহণ করে নাই। যুক্তি বুদ্ধি, কল্পনা, সংকল্প, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনাসহ সহ বৃত্তির সামগ্রিকতা লইয়া যে “মানুষ”, বাংলা সেই মানুষ ব্যাপারটা লইয়াই ব্যস্ত। মানুষ কি এটাই বিস্ময়। মানুষ কি এটা টের পাইলে নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভব কি অসম্ভব তার মীমাংসাও হইয়া যায়। কিন্তু নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই, কিম্বা যুক্তির দ্বারা কোন কিছু বুঝলেই মানুষ বোঝা যায় না। মানুষের যুক্তি আছে, এটা তার গুণ। কিন্তু কোন বস্তুর গুণ সম্পর্কে উপলব্ধি হইলে সেই বস্তু সম্পর্কে জানাটা নিশ্চয়-ভাবে হইল সেই দাবি করন যায় না। সেই কারণে হাজার বছর ধইরা বাংলার প্রশ্ন একটাই:

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে

আছে কেন মানুষের বসত কোন দলে

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে।

বিশ

কিন্তু ‘মানুষ’ কিন্তু ম্যান বা ম্যানকাইন্ড, কিম্বা Human Being নয়। মাতৃভাষা চর্চার অভাবে আমরা ইংরাজি Man-কেই বাংলায় ‘মানুষ’ বইলা শিখছি। কিন্তু সেই ম্যান যেমন আমার ভাষার মধ্যে নাই তেমনি আমাদের ভাবের মধ্যেও নাই। ফলে প্রায়ই আমাদের ভাবের ঘরে ঠোকাঠুকি লাগে। যারা বাংলায় কথা বলে কিন্তু মাতৃভাষা ভুলিলা বাংলায় ইংরাজি ভাব লইয়া কথা কয় তারা আর বাংলার ভাব ধইরতে পারে না। তারা মানুষ বললে ম্যান বোঝেন। ফকির লালন শাহ কিন্তু ম্যান অর্থে ‘মানুষ’ বলেন নাই। মানুষ অন্য জিনিস। সেই জন্যই কোন দলে সে বাস করে সেটা খুঁজিয়া লওন একটা আলাদা করণ কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই বিষয়েও, অর্থাৎ বাংলার ভাব ‘দল’ বলতে পাপড়ি, ফুল না পাতা বুঝাইছেন, কেন শরীরের কথা তাগো ভাষার মধ্যে, পুষ্পের বিচারের মধ্যে আইসা পড়ে সেটা আমি এখন বুঝাইবার চেষ্টা করুম না।

একুশ

কিন্তু ‘মানুষ’ লইয়া অন্য কথাও কওন যায় যাতে বাংলার ভাব বুঝতে সুবিধা। আচ্ছা, ‘মানুষ’ কেন? মানুষকে বুঝলে সত্য কি মিথ্যা, জগৎ বা মায়া, বস্তু কিম্বা অ-বস্তু ইত্যাদি সবই বোঝা সম্ভব। কিন্তু মানুষ থেকে নজর সরাইয়া ফেললে আর কিছুই বোঝা যায় না। তা হইলে বাংলার ‘ভাব’ যদি বুঝতে চাই তাহলে মানুষকে তার নানান বৃত্তিতে ভাগ কইরা বোঝার চেষ্টাটাই গোলমালের। একটা মাত্র বৃত্তি—অর্থাৎ বুদ্ধিকেই

অন্য সকল বৃত্তির উর্দ্ধে স্থাপন করা, মাথায় বসাইয়া দেওয়া বা সর্দার জ্ঞান করা বাংলা মানে নাই। মানে না। ‘মানুষ’ কইলে খালি যা মানুষ আকারে দেখতাহি এটা বোঝায় না, সে কী আছিল আর কী হইবো বা তার কী সম্ভাবনা সেই সকল অনাদি ও অনন্ত বিষয়ও সামনে হাজির হইয়া যায়। এই জন্যই ‘মানুষ’।

বাইশ

কিন্তু এই ‘মানুষ’-ই যদি কয়, আমি ভাবতেছি অতএব আমি আছি, সে তখন নিজেই দুই ভাগে ভাগ কইরা ফলাইলো। একদিকে হইল তার ভাবার দিক: যে দিকটাতে মানুষ ভাবে, চিন্তা করে, নিশ্চয়জ্ঞানের জন্য উদ্ভিগ্ন। আর অন্যদিকে অ-ভাবের জগত। কিন্তু যে ‘ভাব’-টাকে সে তার চিন্তার বাইরে রাইখা দিল সেটাই তো তার চিন্তার শর্ত। সেটাই আসল। সেই ‘ভাব’টাকে আমরা জগৎ কই কি শরীর কিম্বা ইহলোক বলি কী আসে যায়? শরীর না থাকলে মানুষ কি চিন্তা কইরতে পারত? পারত না। কিন্তু শরীরকে সে নিজের চিন্তা থেকে আলাদা কইরা ভাইবা কইল, আমি চিন্তা করি অতএব আছি। তারপর নিজের চিন্তাকে আছে প্রমাণ কইরা এবং তার মধ্য দিয়া নিশ্চয়জ্ঞান সম্ভব প্রমাণ কইরা যখন চিন্তার বাইরের শরীর বা জগত মানুষ বিচার করতে গেল ততক্ষণে দ্বিখণ্ডীভবনের কাজ কম্প্লিট। একদিকে যিনি ভাবছেন, তিনি: চিন্তার কর্তা (Subject) আর তাঁর অন্যদিকে তাঁর অপর: চিন্তা বা ভাবনার বিষয় (Object)। এই দুইভাগে ‘মানুষ’ ভাগ হইয়া গেল। এই দুই ভাগ তৈরী হোল। জগৎ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ল। আধুনিকতার জগৎ মাত্রই এই দ্বিখণ্ডিত জগৎ। একদিকে চিন্তাশীল মানুষ আর অন্য দিকে বিষয় হিশাবে বাকি জগৎ—মানুষ আর প্রকৃতি এই দুই প্রকার ভাবে দুনিয়া বিভাজিত। বিভক্ত। এই তো আধুনিকতার আরম্ভ !!

তেইশ

যদি নিশ্চয় জ্ঞান সম্ভব এটা প্রমাণ করা যায় তাহলে সত্যও সম্ভব। অর্থাৎ সত্য আর নিশ্চয় জ্ঞান সমার্থক হইয়া উঠল। তখন সত্য কি সেটা জ্যামিতি কইরা আইকা দেখানো সম্ভব বলে দাবিও করা হেল এবং দেখাবার কাজও শুরু হৈল। আসলেই তো তাহলে সত্য দেখন যায়, দেখানো যায়। সত্যের প্রমাণ তখন জ্যামিতির মতো দেখানোর ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলার জ্ঞানের ধারা এই প্রকার দেকাতীয় বা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পথ নেয় নাই। হয়তো সেই বাস্তবতা বা সেই মুরোদও ছিল না। তবে ‘আধুনিকতা’-র আধিপত্যের ফলে আগে আমি ভাবতাম, বাংলা বুঝি এই পথ না নেবার কারণে পিছাইয়া আছে। কিন্তু এখন ক্রমশ পরিষ্কার যে ‘আধুনিকতা’ নামক প্রকল্পটিই বরং নিজে গুরুতর দার্শনিক ঘাপলার মধ্যে খাবি খাইতেছে। এই কালের দার্শনিকরা নানান ভাবে সেই কথা কইতেছেনও। বাংলা কেন এই পথ গ্রহণ করে নাই সেই দিকটা তাহলে

আমাদের বুঝন দরকার। আমার দাবি যে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আধুনিকতার সংকটের চরিত্রটা আমরা ধইরা ফেলতে পারুম। একই সঙ্গে এই সংকট মীমাংসার জন্য বাংলা যেইসব প্রশ্নগুলো তুলছিলো তার তাৎপর্যও আমরা বুঝুম।

চবিশ

যদি এই অত্যন্ত প্রাথমিক কথাগুলোও আমরা বুঝি তাহলে দেখব জগৎ বিভক্ত — একদিকে চিন্তা আর অন্যদিকে বস্তু—কিন্ম একদিকে মানুষ আর অন্যদিকে প্রকৃতি— এই ধারণাটির সঙ্গে বাংলার ভাব ঠিক মেলে না। এই অসঙ্গতি বুঝলে বাংলার প্রধান দাবি যে যা আছে ভাঙে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে কথাটা ভাইঙা কইবার তৌফিক বাড়ে। ভাঙ হইতেছে মানুষ। এই কথাটার সরলার্থ হৈল ভাঙে বা শরীরে যা আছে ব্রহ্মার অণু বা ডিমে তাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডকে যদি বিশ্বজগত বুঝি তা হইলে আবার বাংলার টিকিও আমরা ধরতে পারব না। ব্রহ্মাণ্ডকে সপ্রাণ অণু, বীজ, কারণ উপাদান, কারণ বারী আকারে—অর্থাৎ অনন্ত সম্ভাবনা আকারে বুঝন দরকার। আসলে বলা হইতেছে সপ্রাণ বা চিন্তাশীল শরীরে যা আছে বাইরের জগতে তাতে আছেই এমনকি বস্তু ও চিন্তার অভেদ লইয়া মানুষ মানুষের শরীর রূপে হাজির তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা লইয়াই হাজির আছেন। তিনি সময়ের মধ্যে নাই, বরং তিনিই সময়। তিনিই তো হইয়া উঠতেছেন। নিজেই প্রকাশ করছেন, আর তাঁর প্রকাশই সত্য।

পঁচিশ

এবার বুঝন যে নিজেই হইয়া উঠতেছে তার আবার আলাদা কইরা নিশ্চয় জ্ঞানের কী দরকার? যা সে এখন হইছে তাতে হইয়াই আছে। অতএব এই আছে, আছি বা আছেময়তার প্রমাণ বাংলার ভাবান্দোলনের কোন সমস্যাই নয়। বাংলাকে বুঝতে হইল আমাদের গোড়াতেই একটু সতর্ক হইয়া থাকন দরকার। বাংলাদেশের আউল বাউল ফকির ফ্যাকড়া—অর্থাৎ বাংলার ভাবান্দোলনের ধারার মধ্যে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে ভাঙে, বা ভাঙই ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি খুবই গোড়ার কথা। কিন্তু এই গোড়ার কথা বুঝবার জন্য আমাদের পণ্ডিতদের কোন প্রস্তুতি আছে কিনা? তারা কোন প্রস্তুতি নেওয়া দরকার মনে করেন কিনা? না, করে না। যা আছে ভাঙে তাই ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ কী ভাবে তাঁরা করেন? তাঁরা কইয়া থাকেন: ইহারা দেহবাদী—ইহারা দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড আছে এই আজগুবি বিশ্বাসে নানাবিধ গুহ্য দৈহিক কর্মাদি সাধন করেন. ইহারা নরমাংস খায় চারি চন্দ্র ভেদ সাধনা করে। এইগুলো উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ শ্রেণীর ঘৃণামিশ্রিত কেচ্ছা। এই কেচ্ছা এখনও ‘গবেষণা’ বইলা সবসময়ই প্রচার করা হয়। চতুর্দিকে বিস্তার আবজ্ঞনা। সেইসব সাফ না করলে আমরা বাংলার ভাব ধরতে পারব বইলা মনে হয় না। অনেক কাজ।

ছাবিশ

এমনকি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসও উচ্চ বর্ণ ও অধিপতি শ্রেণী থেকে আসা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সকল আবর্জনা গায়ে মাখাইয়া আমাদের বড়োই বিপদে ফালাইয়া দিচ্ছেন। তিনি ভক্তির ধারার মানুষ। কিন্তু ঠাকুরও বলিলেন, ভগবানের কাছে সদর রাস্তা দিয়া না গিয়া পায়খানার পথ দিয়া কেন? তিনি কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পাল্লায় পইড়া বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে বিকৃত কেছাগুলোই সত্য বইলা ধরে নিয়েছিলেন। নিজে পরীক্ষা করবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আর সাধকের কাছে সদর রাস্তা কি, আর খিড়কি, পেছনের রাস্তাটাই বা কি? সাধু তো জননীর জরায়ুমণ্ডলে পুনর্বীর নাড়ির সংযোগ পূর্ণস্থাপন করত জননীর ডিমের মধ্যেই বাস করিতে বাঞ্ছা করে। সেই খানেই তার আহার ও ত্যাগ। যা সে ত্যাগ করে তাই তার আহারও বটে। চারিচন্দ্র ভেদকে সেই ‘সহজ’ অবস্থা, সেই সহজ জীবনের কল্পনা ও সংকল্প আকারে বুঝিতে হইবে। পুরুষ আর প্রকৃতি যেভাবে অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হইয়া একদা বিরাজ করিত, সেই সহজ, অখণ্ড ও সচ্চিদানন্দ মুহূর্ত অর্জন সম্ভব এই দাবি বাংলা করে। অস্বীকার করি না। মানুষ একসময় কমিউনে বাস করিত, কমিউনিষ্টরা বলিয়া থাকে। কীভাবে তারা কমিউনে বাস করিত তার বিস্তার কাহিনীও তারা বইলা থাকে। সেই ‘ভাব’ লইয়া তারা যখন বিপ্লবী হয় কেউ কি তাগোরে পুরানা কমিউনে কানে ধইরা ইতিহাসকে ধইরাখাইধা নিয়া যাইব বলে? বলে না? বাংলার ভাবও যখন চারিচন্দ্র ভেদের কথা বলে তখন তাকেও তার ভাব’গত ভাবে বুঝা জরুরি। সেই ভাব ও সেই ভাবের সংকল্প কী ধরণের নতুন জগত কামনা করে সেই কামনাকেও বুঝন দরকার। শিশু ও সহজ ভাব, জননীর সহিত অবিচ্ছিন্ন অবস্থা—এর রূপ আগামি দিনে কেমন—ইহাই বাংলার বিপ্লবী মন্ত্র।

সাতাশ

সত্যের প্রশ্নটা ‘আধুনিক পাশ্চাত্যে’ যেহেতু নিশ্চয়জ্ঞানের মামলা হিশাবে চিহ্নিত হইয়া আছে সেই কারণে পাশ্চাত্য দর্শন মানে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাপার (epistemology) হইয়া উঠেছে। যেহেতু বাংলার ভাবজগতের গোড়ায় বিষয় (Object) আর বিষয়ীর (Subject) দ্বিবিভাগ নাই, অতএব আমাদের জ্ঞানতত্ত্ব বইলাও কিছু নাই। এমন কিছু থাকার দরকার আছে কিনা সেটাই বরং প্রশ্ন হিশাবে আজকাল উঠতেছে। বাংলায় ধর্ম আছে কিন্তু আমাদের এপিষ্টেমলজি নাই। আমরা আবার রিলিজিয়নকে ধর্ম বলি না। ওটা আমাদের কাছে আচার, সংস্কার, নিয়মকানুনন, ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম মানে হইতেছে মানুষের স্বভাব। মানুষের স্বভাব কী? ইতিহাস হওয়া। মানুষের ইতিহাস হইয়া ওঠা। এইখানে আইসা বাংলা কার্ল মার্কসের সহিত মিলিল। সেই বিষয়েও আমি আর বিশেষ কিছু সময়ভাবে এখানে কইব না। বাংলার ভাবের সঙ্গে ইতিহাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়া মানুষের আসল ইতিহাস—অর্থাৎ মানুষের ধর্ম প্রতিষ্ঠার

বিপ্লবী প্রকল্পের সঙ্গে বাংলার ঝগড়া নাই, এই কথাটা বুঝাইবার জন্যই কথাটা কইয়া রাখতেছি এখন। মানুষ কি এবং সে কী হইতে পারে এবং কী করলে তার স্বপ্ন, কল্পনা, সংকল্প সাকার রূপ নিবে—বাংলার ভাব এই ব্যাপার নিয়াই চিন্তিত আছিল।

আটাশ

বাংলা কইতে চায় জ্ঞান অর্জন কইরলেই, বা কোন কিছু সম্পর্কে জানলেই, বা নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই মানুষের নীতি জ্ঞান হয় না, অথএব মানুষের ধর্ম কি তারও কোন সুহাল হয় না। কিন্তু নীতি বুঝলে বা মানুষের ধর্ম বুঝলে জ্ঞানও ধরা দেয়। বস্তুর সঙ্গে চেতনার পার্থক্য করলে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মেরও বিভাজন ঘইটা যায়। বাংলা এই পথে যায় নাই। গুরুর কৃপায় যেন ভবিষ্যতে না যায়।

উনত্রিশ

আমার কওনটা নিছকই জ্ঞানগত বা দার্শনিক বিতর্কের জন্য নয়। আমার কাছে এটা রাজনীতি। অর্থাৎ নতুন সংকল্প এবং প্রকল্প নির্মাণের জন্য ভেদরেখা তৈরি। যদি বাংলাভাষায় আমরা 'ভাব' কথাটার ভেদ বিচার করতে কামিয়াব হই, তাহলে অন্যান্য ভাষায়—বিশেষত যে সকল ভাষায় আমরা আধুনিকতা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ইত্যাদির ধ্যানধারণা লাভ করি, বানাই এবং সেই মোতাবেক চর্চা করি—সেই সকল ভাষার সঙ্গে একটা বাহাসের জায়গা তৈয়ার হয়। এটাই আমি চাই।

ত্রিশ

কিন্তু ভাষায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নামক বিভাজন আমি এড়াইয়া যাতে চাই। কঠিন কাজ। কীসের বিভাজন? সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ইত্যাদি। এমনকি ভৌগলিকও। কারণ ভূগোলও নাম খুঁজে পায় ভাষায়। বিভাজনের মুশকিলটা প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক কর্তব্যকর্ম নির্ধারণের দিক থেইকে পরিষ্কার। কিন্তু এর ফল শেষমেষ কী দাঁড়ায় পরিষ্কার নয়। যদিও পোস্টমডার্নিজম দ্বিকোটিক বা বাইনারি কায়দায় যেমন প্রাচ্য/পাশ্চাত্য গালগল্প বলবার মুশকিল সম্পর্কে আমাদের ভালই ইশিয়ার করছে তবু তার রাজনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে আমরা ভালমত খেয়াল কইরা উঠতে পারি নাই।

একত্রিশ

শব্দ বা বাক্যের মধ্যে অর্থ নিহিত বা খচিত থাকে না, আমরা সমাজে কে কোথায় আছি কী করতেছি কী করব বলে সংকল্প করি, ইত্যাদি নানান বৈষয়িক ও পরাতাত্ত্বিক

ব্যাপারস্যাপার আমাদের মধ্যে শব্দের বাক্যের নির্দেশের অর্থ যোগান দেয়। প্রাচ্য/পাশ্চাত্য এই রকম ভাগ না কইর ‘ভাষা’ শব্দটির পরিসীমা বাড়াইবার জন্যই আমি ওকালতি করছি। ‘ভাষা’ বলতে প্রথাগত অর্থে আমরা যা বুঝি তা নয়, বরং চিহ্নব্যবস্থা হিসাবে ভাষা কথটা আমাদের বুঝলে এক কদম আগুয়ান হওয়া যায়। কিন্তু আগের কথায় বোঝা যাইতেছে ‘মানুষ’ কথটা না বুঝলে ভাব বা ভাষা এটাও বুঝন মুশকিল হইতে পারে।

বত্রিশ

চিহ্নব্যবস্থা। শুধু কি বর্ণমালা বা আঁকিবুঁকিই চিহ্নব্যবস্থা? না। পোশাকআশাক, খাওয়াদাওয়া, জীবনাচরণ, ড্রইংরুম সাজানোর ভাষা, বাগান করবার বিন্যাস বা কৃষিকাজের ধরণও ভাষাই। ‘ভাষা’ নামক শব্দনামটির পরিধি অন্যদিক থেইকাও বাড়ান কমান যায়। যে-অর্থে ইংরেজিতে discourse কথটা চালু আছে তার জায়গায়ও ভাষা কথটা ব্যবহার কইরতে পারলে খারাপ কি? যদি দুইদিকেই ভাষার ডানা বিস্তার করা যায় তাহলে আমরা প্রাচ্য/পাশ্চাত্য বিভাজনের ফেরে না পইড়া আমাদের কথটা অন্যভাবে বলতে পারি। যেমন, আমাদের এখনকার ভাষায় ভাব নাই দর্শন আছে। কারণ কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পেরিয়ালিজমের কারণে আমরা ভাব হারাইয়া ফলাইছি, ভাষার খোসা লইয়া হতদরিদ্র হইয়া আছি।

তেত্রিশ

আমাদের এখনকার ভাষা? আমরা কারা? বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঢাকায়, নিউইয়র্কে, জেনেভায়, কলম্বো, সৌদি আরব, ভেনিজুয়েলা, কেনিয়া, উগাণ্ডা বা যে কোন দেশেই আমরা যারা বাস করছি আমাদের কাছে এখন = পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। সামনে যাওয়া ছাড়া, পুঁজির ইতিহাস অতিক্রম কইরা যাওন ছাড়া পুঁজির পেছনে ফিরে যাওয়া ‘এখন’ বিশ্বইতিহাসের দিক থেকে ইমপসিবল। সেই ‘এখন’, সেই ‘এখনকার’ ভাষা। এই এখনকার ভাষা সম্পর্কেই কইতেছি।

চৌত্রিশ

পুঁজি যে ভাষায় (মানে উৎপাদন সম্পর্ক, জীবনব্যবস্থা এবং তার মধ্যে বসবাস করার কারণে বিশেষ ভাবে চিন্তার ও চিন্তা প্রকাশের প্রকরণ ও ধরণ) আমাদের কথা বলায় সেই ভাবেই আমরা কথা বলি। এই দিকটার প্রতি নজর দিতাছি। মনে হইতে পারে বাংলার ভাবের সঙ্গে এইভাবে ভাবনা চিন্তার পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। আসলে নাই। বাংলা ‘শরীর’ বলতে যা বুঝাইছে, কার্ল মার্কস উৎপাদন সম্পর্ক বইলতে ওটাই বুঝাইছে। একটা হইল মানুষের নিজের বায়লজি। আর আরেকটা হইল মানুষের সামাজিক বায়োলজি—অর্থাৎ সামাজিক শরীর। শরীরের যেমন নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানান ভাবে

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ লয়া একটা ‘সমগ্র’ হয় একটা টোটালিটি ধারণ করে ঠিক সেই অর্থেই পুঁজিতাত্ত্বিক উৎপাদন ব্যবস্থাও আমাদের এখনকার শরীরের একটা হাল। একটা ভাব। শরীর যা কথাও সেই রকম। যদি আমরা অন্য কথা কইতে চাই তাহলে এই শরীরের বদল হইত হইব। শরীর ঠিক না হইরলে কথাও অসুস্থ শোনায়। শরীর যখনই নিজের অবস্থা টের পায় তখন এখনকার ভাষার বিপরীতে অন্য ভাষা ভাষা তৈরি হইতেছে। প্রতিরোধ কি হইতেছে না? নিশ্চয়ই হইতেছে। ত হইলে নতুন ভাষা কি তৈরি হইতেছে না? নিশ্চয়ই তৈরি হইতেছে। কিন্তু এই ভাষা এখন দুনিয়ার ভাষা হইতে বাধ্য। তার মানে পুঁজির ভাষার বিরুদ্ধে নতুন ভাব ও ভাষা পুঁজির মতোই বিশ্ব-ঐতিহাসিক হইতে বাধ্য। সেখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাই, থার্ড-ওয়ার্ল্ড ফাস্ট ওয়ার্ল্ড নাই—জগত একটাই, তার নাম ‘মানুষ’। সেই জগতের ভাষা মানুষের ভাষার মতোই হইব। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। সে ভাষায় কথা কইবার জন্য বাংলা ভাষাকে প্রস্তুত হইতে হইব।

পঁয়ত্রিশ

তাহলে এক কাজে দুই কাজ হইতেছে। বাংলার ভাবান্দোলন বা বাংলার ভাব ও ভাষা তৈরি ও চর্চা মানে পুঁজির আধিপত্য ও পরিধির বাইরে নতুন ভাষা তৈরি। সেটা আর বাংলার একার হইব না। যেমন এখন ইংরাজি পুঁজিতাত্ত্বিক বিশ্বব্যবস্থায় শুধু আর ইংরাজদের নাই। এই কাজ করন যে একটা বৈপ্লবিক কাজ সেই প্রকল্প তো আমরা গ্রহণ করি নাই। কিন্তু আজ আমার কানে ষাটের দশক অনুরণিত হইতেছে। ‘প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে’—তখন ‘কথাটা পুরাপুরি আমাদের হুঁশে আসে নাই। এখন আমি বুঝতে পারছি। কেন পোয়াতি মাইয়ার মতো এই স্বীজমন্ত্রটা আমাদের ভাবের মধ্যে ঢুকি গিয়া এতো বছর আমাদের গর্ভবতী কইরা রাখছে। এখন তাকে একটা সাকার রূপ দান কর্তব্য। কিন্তু সেটা আমার একার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এখন তরুণরা এই মন্ত্রের অর্থ আরো ভালো কইরা বুঝবেন এবং রসিকের ভাব লইয়াই যে বিপ্লব সম্ভব, বাংলার এই মর্ম ধরতে পারবেন।

ছত্রিশ

কার ভাষায় কথা বলি আমরা? বাংলার ভাবের ভাষায় না। বাংলার ভাবের ভাষা যদি তৈরি হইয়া উঠে তবে বিপ্লবী ভাষা হইতে বাধ্য। পুঁজির ভাষাতেই কথা বলি আমরা সবসময়। পুঁজির বিরুদ্ধে বললেও সেটা তো পুঁজিরই কথা হয়। নাকি? আবারও বলি: কার ভাষায় কথা বলি? পুঁজিরই ভাষায়। অর্থাৎ পুঁজিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা যে বিশেষ চিন্তার ধরণ ও প্রকাশের প্রকরণ তৈরি করে—এমনকি টেকনোলজি বা টেকনোলজি ছাড়া ইন্দ্রিয়াদি ব্যবহারের যে নিয়মাদি আরোপ করে—তার মধ্যে তৈরি হওয়া ভাষায় কথা বলি। অতএব বাংলায় বললাম নাকি ইংলিশে? ফরাসি কি জার্মানিতে? তাতে কী এসে যায়! পার্থক্য কেবল ততোটুই যতোটুকু একেকটা ভাষা কতোটা পুঁজিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা

রপ্ত করতে সক্ষম হইছে তার উপর। ফলে ভাষায় হোক কি বাস্তবে হোক লড়াইটা প্রাচ্য /পাশ্চাত্য এই ভৌগলিক জায়গায় না নিয়া আমি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার জায়গায় দাঁড়াইয়া—‘এখনকার আমরা’—এইরকম ‘মানুষ’ নামক দেশকালপাত্রের বিন্দু থেকেই বুঝতে চাই। এখনকার আমরা ভবিষ্যতে কী হতে চাইতেছে, কী হইয়া উঠতেছে—সেটা নির্ণয় করা ইচ্ছা। এই প্রকল্পটার জন্য বাংলার ভাবান্দোলন লইয়া আমি লেখালিখি করি। এই ভাবে ‘ভাষা’ শব্দটি বোঝার আরেকটি বাড়তি সুবিধা হইল কার্ল মার্কসের মতাদর্শ বা ইডিওলজি সংক্রান্ত তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা।

সাঁইত্রিশ

তাহলে দাঁড়ায় এই যে আমাদের ভাষায় বা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা যে—ভাষায় আমাদের কথা বলায় তার মধ্যে ‘ভাব’ নাই দর্শন আছে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা—এইরকম কটমটে ভাষা আমার পছন্দ না। দরকারও নাই। যদি কার্ল মার্কসকে আমরা সাক্ষী মানি তাহলে আসলে শুধু ‘পুঁজি’ বললেই চলে। পুঁজি মাত্রই বিশ্বে—ঐতিহাসিক। ঠিক যে পুঁজিই আবার একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তৈরি করে। ফলে দর্শন বা ভাবের বিচারেও প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ব্যাপার নাই। অর্থাৎ এমন নয় যে পাশ্চাত্যে ভাব আর পশ্চিমে দর্শন। না। আমাদের ভাবান্দোলনের ইতিহাসের মধ্যেও ভাব এবং দর্শনের লড়াই চলেতেছে। চলবে। তার মীমাংসা আমরা করতে পারি কিনা তার ওপর আগামী দিনের ‘মানুষ’ কখন কিভাবে কি কায়াদায় হাজির হবে সেটা আমরা বুঝুম।

আটত্রিশ

মার্কস দর্শনের মধ্যে ভাবের বিচার হয় না, এই গোমর ঘোষণা দিছিলেন দার্শনিকরা বিস্তর কথাবার্তা কয়। খালি কথা। পটর পটর। আর না। দুনিয়াদারির সঙ্গে কর্তাসত্তা হিশাবে নিজের সম্পর্ক বদলানোটাই হইল আসল কথা। তিনি সত্য আবিষ্কার করা তাঁরও প্রকল্প ছিল না। ফকির লালন শাহের মতো দুনিয়াদারির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বদলাইয়া সত্য হইয়া উঠতে চাইছিলেন। কিন্তু লালন আর তাঁর আগের ও সমসাময়িকদের মতো নিজেকেই সত্য কইরা তুলবার সাধনা কইরছেন, ইতিহাসকে সত্য কইরবার প্রকল্প তাঁর কাছে তখনও পরিষ্কার হয় নাই। তাঁর দেহকে তিনি সমাজ আকারে বোঝেন নাই। যাহা আছে ভাঙে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে কথাটা একাক মনুষ্য শরীর আকারে বুঝছেন—সকল মানুষের শরীর আকারে বোঝেন নাই। যদি বুঝতেন তাহলে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন এবং ভোগ, উৎপাদন ও বিনিময়ের সম্পর্কের মধ্য দিয়া যে ‘মানুষ’ পুঁজির নাম ধারণ কইরা নিজের ইতিহাসে প্রকাশ কইরতেছে তাকে তিনিও চিনতে পারতেন। দুই জনের মধ্যে একটা গ্যাপ—একটা ফাঁক আছে। সেটা কীভাবে কেমন কইরা ভরাট করন যায়, কিম্বা কোন ফাঁকটা ভরাটের সম্ভাবনা নাই সেইসব আমাগো পরিষ্কার বুঝন দরকার।

উনচল্লিশ

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়াও ‘মানুষ’ যে অন্য রকম সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অন্য রকম সম্পর্ক ও সমাজ গড়তে পারে তার প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা ঘোষণা করেছেন মার্কস। পার্থক্য হচ্ছে, ফকির লালনের করণকর্মের ক্ষেত্র ‘মানুষ’ বা আরো তান্ত্রিক ভাষায় ‘দেহ’। আর মার্কস দেহ কথাটাকে সামাজিক ‘দেহ’ আকারে বুঝছেন। তাঁর করণকর্মের ক্ষেত্র হইল ‘সমাজ’। ফকির লালনের হইল ‘দেহ’। কেন দুই জনের মধ্যে এই পার্থক্য সেটা ভাব আর ভাষার ভেদ বিচার করলে বুঝান সম্ভব। সেই বুঝ অর্জন দরকার। এটাই এখনকার বাংলার ভাবান্দোলনের প্রকল্প।

চল্লিশ

রসিক জানেন বাংলার ভাবান্দোলন বলিয়া আসলে কিছু নাই। সবই, কল্পনা, মনগড়া কথা। সবই বয়ান। কিন্তু সবই বর্তমানতার গুনে সত্য এবং সবই কর্তা সম্পন্নতার প্রতিভায় সংকল্প। এই কথার ভেদ যারা বুঝবেন তাঁরাই এই কালে সাধক কিম্বা বিপ্লবী। আগে বা পিছে আর কেউ নাই। কিছু নাই।

একচল্লিশ

প্রশ্ন হইতেছে দর্শন ও ভাবের এই ভেদ বিচারে কি সুবিধা?

এক. ‘সত্য’ সম্পর্কে আলোচনাটা জমে। ‘সত্য’ কথাটা কে কীভাবে কেমন করে ব্যবহার করেছে এবং তার যে কোন সার্বজনীন অর্থ নাই সেটা ধরতে সুবিধা হয়। সত্য কি দেখা যায়? নাকি প্রমাণ করা যায়? প্রমাণ মানে কি? দেখানো নয় কি? নাকি সত্য আপ্তবাক্য হইয়া বিরাজ করতেন? এইসকল প্রশ্নও আবার ভাল ভাবে তোলন যায়। কথাবার্তাতেও আরাম হয়।

দুই. মানুষের কর্তাসত্তা নিজেকে নিজের শরীর, পরিবেশ, সমাজ বা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাইকা, হইয়া এবং সম্পর্ক বদলাইয়া নিজে এক হইয়াও অনেক হইয়া উঠতে চায় সেই নতুন রাজনীতি—সেই হয়ে ওঠার ‘সত্য’-টা বুঝের মধ্যে আসলে বৈপ্লবিক রাজনীতির উদয় সম্ভব। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। কর্তার বিলয় ঘোষণা করে উত্তর আধুনিকরা যে রাজনৈতিক ফেরেবে পইড়া গেছে সেই গৈড়াকল থেকে দূরে থাকবার জন্য হুঁশিয়ার হওয়া সম্ভব হয়।

তিন. এখনকার দর্শনের প্রধান পুরুষদের সঙ্গে একটা বাহাস শুরু করা সম্ভব। যেমন, মার্টিন হেইডেগার। মার্টিন হেইডগার কাব্য আর দর্শনকে মাথায় তুলিয়া লইয়া আসলে দর্শনের যুগ ফুরাইছে এটাই ঘোষণা দিছিলেন। তাঁর ভাষায় অধিবিদ্যার (metaphysics) কাল ঘিরিয়া আসতেছে। তার বৃন্দ কমপ্লিট। অধিবিদ্যার পরিধি টানা হইয়া গেছে। এখন তাঁর কথা হইতেছে ভাষা বা কাব্যের কাছে গিয়া আমরা যেভাবে

‘আছি’ বা আমার জগৎ যেভাবে ‘আছে’ তাকে নতুন কইরা বুইঝা নিবার দরকার আছে। কিন্তু এই কাজ আমার ধারণা বাংলা ভাষাতেই সম্ভব—অর্থাৎ বাংলার ভাবের ভাষায়। দর্শন আর ভাবের বিচার জার্মান ভাষার দর্শনে তিনি শুরু করেন নাই, শুরু করার প্রয়োজনীয়তা খালি কায়ম কইরতে পাইরছেন। তাঁর লেখা পড়লে এই দর্শন ও ভাবের ভেদবিচার যে ‘এখন’ খুব জরুরী সেটা পরিষ্কার।

বিয়াল্লিশ

বাংলা ভাষার গুণে এই চর্চাটা বাংলাভাষায় আমরা শুরু করার ইচ্ছা। এটাই আমার সংকল্প। কিন্তু ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার। বামনও চাঁদ ধরতে চায়। তো কী করুম। আমার দাবি একতিল মাত্র যে বাংলা তার নানাবিধ ‘ভাষা’-য় (জীবনাচরণসহ ভক্তিশ্রীন্দোলন বা ভাবান্দোলনে) যে বেপ্তবিক ভাষা আজ অবধি জারী এগইখা দিতে সক্ষম হইছে—কিমা ব্যর্থ হইছে বা পথচ্যুত হইয়া আছাড় খাইছে—তার একটা হৃদিস লইতে পারলে আমরা পুঁজির দিগন্ত ভাইঙা নতুন দিগন্তরেখা আবিষ্কার করতে পারুম। কাজে কাজেই নতুন ‘করণকর্ম’ বা রাজনীতির সম্ভাবনাও তৈরি হইব। নিজের শরীরের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক রচনা যেমন হইব—তেমনি তা সমাজের শরীরের সঙ্গে নতুন সম্পর্কও বটে।

তেতাল্লিশ

এক ও অনেক—এক শরীর আর অনেক শরীরের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা গেলে মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে কইতে গিয়া মার্কস যা বুঝাইছেন সেটাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস হিসাবে বোঝার চেষ্টাটাই আমাদের এখনকার কাজ। সেই বুঝ যদি হয় তাহলে এটাও বোঝা যাইব যে মানুষের ইতিহাস বইলাও হয়ত কিছু নাই—আছে প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা—‘মানুষের ইতিহাস’ হইয়া যে লীলা আপনাকে প্রকাশ কইরবার জন্য এখন তৈরি হইয়া আছে, সেই লীলা বুঝবার সময় অইছে। মানুষের উদয়ের সময় হইছে কিনা আমি এখনও জানি না। একমাত্র পুঁজিতান্ত্রিক যুগের অবসান হইলেই এই প্রশ্নটার মোকাবিলা সম্ভব হইব, নইলে না। হয়তো মহাকালের বাইরে—সময়ের বাইরে যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, কিমা যে সম্পর্ক সময়েরও অতীত—তাকে ধইরবার জন্য সামাজিক জ্ঞান ও পরিস্থিতি তৈরি হইয়া গেছে। কিন্তু মানুষ কি সময়ের মধ্যে নাকি সময়েরও আগে এই সিদ্ধান্ত এখনও পরিষ্কার হয় নাই।

চুয়াল্লিশ

কিন্তু বাংলায় সেটা হইতে আছে। বাংলার ভাবে ও ভাষায় সেটা হইব। আমি জানি।

ভাবকথা ও তৎপরতা

বাংলার একটা ভাবের জগত আছে এবং তার একটা ইতিহাসও আছে। সেই ইতিহাস আর-আর ইতিহাসের মতই, মসৃণ নয়। ওঠানামা আছে, টানাপড়েন-টেনশনও কম নাই। স্ববিরোধিতা? অবশ্যই। এই ভাবকে জানা ও আত্মদনের জন্য আমাদের আগ্রহের নানা কারণ আছে। পাশ্চাত্য অর্থে আমরা ‘দর্শন’ নামে যে-ব্যাপারটাকে বইপত্রে লেখালিখির মধ্যে এতকাল ধরে জানি, সেই কারণে ভাবি যে আমাদের কোন লিখিত ‘দর্শন’ নাই। ঠিকই। ‘দর্শন’, অর্থাৎ সত্যকে দেখা বা দেখানোর সঙ্গে বাংলার ‘ভাব’ কথাটার ফারাক অকাশ আর পাতাল। দর্শন বললেই সত্য দেখাদেখি ও প্রমাণ-প্রত্যয়ের যে ধারণা, সত্যকে আদৌ এই রকম চোখ দিয়ে দেখা যায় কিনা কিম্বা সত্য মাত্রই বা সত্যের প্রমাণ মাত্রই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হিশাবে ‘হাজির’ করা, প্রমাণিত করার বিষয় কিনা—ইত্যাদি তর্ক তো আছেই। পাশ্চাত্য অর্থে ‘দর্শন’ নামে এই দেশে কিছু ছিল না তা নয়, কারণ নানা শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, মীমাংসা তো ছিল, যাকে ‘ভারতীয় দর্শন’ বলা হয়। উচ্চবর্ণের মধ্যে ‘ধর্ম’, ‘শাস্ত্র’, ‘দর্শন’, ‘ন্যায়শাস্ত্র’ ইত্যাদির যে চর্চা তার বিপরীতে বেদ ও শাস্ত্রবিরোধী যে ‘ভাব’ তার মূলে আছে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে প্রবল রাজনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। যাকে অনেক সময় ভক্তি আন্দোলন বলা হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকেও এই লড়াইয়ের আলোকে বিচার করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলন কোনো ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার ফেরে পড়বার বিপদ থেকে সবসময়ই সতর্কভাবে দূরে থেকেছে। অন্যদিকে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি গড়ে ওঠে ইসলামের গ্রন্থকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার বিপরীতে তার ভাবগত ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক—মানুষের ইহলৌকিক সমস্যা মীমাংসার প্রতি ইসলামকে রক্তমাংসের মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তোলার লড়াই। এদের আমরা সুফি বা মারফতি ধারা বলে-সাধারণত শনাক্ত করে থাকি। ‘ভাব’ কথাটা

যেন এইসকল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক লড়াইয়ের অনুষ্ণে আমরা বুঝি, তার জন্য আমরা সবমিলিয়ে দর্শন বা ভাবচর্চার এই ধারাকে বলি 'ভাবান্দোলন'।

বলা বাহুল্য এই লড়াইয়ের প্রকাশ কখনই বিধিবদ্ধ 'দর্শন' হিসাবে হাজির হয় নি। সাধকদের সুফিদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চর্চার মধ্যে, মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের জন্য কাজ করবার তৎপরতার মধ্যে ভাব আর কাজ অভিন্ন হয়ে বিরাজ করে। মুখে কী বলছি সেটা যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি কী করছি সেটাই ছিল আসল। কারণ সত্য তো বলার বিষয় নয়, কাজ করে মূর্ত করে তোলার বিষয়। ভাব মাত্রই কাজ আর কাজ তো ভাব ছাড়া হয় না।

তবু কথা তৈরি হয়। গানে পালায় কাহিনীকাব্যের মধ্যে বেদ, কোরান, শাস্ত্রকে ইহলৌকিক লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে তোলার একটা মতাদর্শিক সংগ্রামও গড়ে উঠেছিল, বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের অসাম্য, অন্যায় ও অসঙ্গতির মীমাংসার জন্য যে সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতা দরকার তাকে ভাবগত ভাবে গ্রেপ্তার করার একটা চর্চা ছিল অবশ্যই। সেই চর্চার কারণে আমরা টের পাই আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় ও ভাবে সত্য আত্মদনের একটা আকুতি আছে, তার একটা ইতিহাসও আছে। বাংলায় 'দর্শন' বা সত্য আত্মদনের জন্য এই আকুতি, আকাঙ্ক্ষা ও চর্চা 'ভাব' বলে পরিচিত হয়ে ওঠার সঙ্গত কারণ আছে। 'ভূ' থেকে ভাব—মানে হওয়া—হয়ে ওঠা।

সত্য দেখার ব্যাপার না, হয়ে ওঠার ব্যাপার। আমরা আপনাপন ভাষার মধ্যে বাস করি। কিন্তু যে ভাষায় বা গদ্যে আমরা এখন লিখছি ও পড়ছি তার একটা ঔপনিবেশিক ও উচ্চবর্ণীয় ইতিহাস আছে। এই উপলব্ধি ক্রমশ স্পষ্ট যে এই ভাষার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিনের ভাষার দূরত্ব অস্বাভাবিক। অর্থাৎ দিনানুদিনের যে ভাব তাকে আমরা এই ভাষায় ধরতে পারছি না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রথাগত অর্থে দর্শন চর্চা নাই বললেই চলে। অন্যদিকে, বাংলার ভাবের ভাষার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথচ আবার যুক্ত করা না গেলে ইহলৌকিক জীবনের অসঙ্গতি, স্ববিরোধিতা, অসাম্য, অন্যায় ইত্যাদি মীমাংসা আমরা করতে পারবো না। কিম্বা জীবের জীবন অতিক্রম করে পরমের জীবন যাপন করবার ভাব ও চর্চা কেমন তার হৃদিসও আমরা পাব না। এই মীমাংসা ও অতিক্রমণকে আমরা এই কালে 'বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করি। 'বিপ্লব' শব্দটি এখন নিছকই কতিপয় অক্ষরসমষ্টির অধিক কোনো ভাবগত আবেদন আমাদের মধ্যে আর তৈরি করে না। আমরা তো ভাবের ঘরে বাস করবার জীবন আর যাপন করি না। বাংলার ভাবান্দোলনের প্রতি আমাদের আগ্রহের একটা বড়ো কারণ নিয়মতান্ত্রিক বা ভাঙচুর যে পদ্ধতিতেই হোক বাংলা গদ্যকে ভাবের ভাষা হিসাবে গড়ে তোলা।

বাংলার ভাবুকরা ভাবের চর্চা প্রধানত করেছেন কাব্যে, গানে, পালায় ও আরো নানা শ্রুতি ও কণ্ঠনির্ভর মাধ্যমে : ভাবগান, পালাগান, ভাসান ইত্যাদির মধ্যে। কেউ

যদি এইসবকে ‘দর্শন’ বলে স্বীকার করতে না চান, খামাখা তর্ক করব না। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, সৈয়দ সুলতানের ‘জ্ঞানচৌতিশা’ কিম্বা ফকির লালন শাহের গান পাশ্চাত্য অর্থেই দর্শন। অন্তত জর্মন দার্শনিক হেগেলের বরাতে বলা যায়, এই নজিরগুলোতে চিন্তা আপন রাপেই—নিজের মাধ্যমের মধ্যেই নিজেকে জানছে, প্রকাশ করছে, নিজেকে নিজে প্রশ্ন দিচ্ছে, উত্তরও সন্ধান করছে। অর্থাৎ চিন্তার যা স্বভাব সেই স্বভাব পুরোমাত্রায় এই নজিরগুলোর মধ্যে আছে। সেই কারণে এদের নিছকই কাব্য বা গান বলা যাবে না। বাংলার মানুষ এই জন্য এদের নাম দিয়েছে, ‘ভাবগান’।

আমাদের এই আগ্রহকে আরো খানিক এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা একটু সাহসী হয়েছি। এই রকম ভাবছি যে কার্ল মার্কস, মার্টিন হেইডেগার, বা জাঁ পল সার্ত্রে, জাক দেরিদা বা এইরকম জঁদরেল পাশ্চাত্যের ভাবুকরা দর্শন নিয়ে যে-সকল প্রশ্ন তুলেছেন সেই সকল প্রশ্ন যতোটুকু আমরা ধরতে পারি বা বুঝি ততোটুকুর ওপর দাঁড়িয়ে বাংলার ভাবের একটা বিচার করা; অন্যদিকে বাংলার ভাবের জায়গায় দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য দর্শন কতোটা পাঠ করা সম্ভব তার একটা পরীক্ষা দেওয়া। উভয়ের মধ্যে একই প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা, কিম্বা উঠলেও কেন উঠল, বা না উঠলে কেন উঠল না—তার একটা খোঁজ নিলে কেমন হয়? কারণ শেষাবধি ইহলৌকিক জীবনের অসঙ্গতি, স্ববিরোধিতা, অসাম্য ও অন্যায়ের মীমাংসা দুনিয়াব্যাপী লড়াইয়েরই অংশ—ওর মধ্যে প্রাচ্য/পাশ্চাত্য ভেদ তোলা ও পার্থক্য করা বাতুলতা মাত্র। তাহলে বাংলার ভাবান্দোলন দুনিয়াব্যাপী চিন্তা ও তৎপরতার জীবন্ত বলয়ের মধ্যে স্থাপন ও বিচারের একটা কর্তব্য আমাদের আছে। পুঁজির বিনাশ সাধন করেই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আগে সে পুঁজিপতি, কিম্বা শ্রমিক বা পুঁজির দাস, কিম্বা জমির মালিক বা পুঁজির পরজীবী। অর্থাৎ পুঁজির ইতিহাস অতিক্রম করেই কেবল মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস শুরু হয় বলে মার্কস একটা প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন। সেই ইতিহাস সম্ভব করে তোলার কল্পনা, প্রকল্প ও সংকল্প তৈরির ক্ষেত্রে বাংলার ভাবুকতার কোনো ভূমিকা আছে কিনা সেটা আমরা বিচার করে দেখতে আগ্রহী। আমাদের সাধ্য না থাকুক, কাউকে তো কোথাও না কোথাও থেকে আরম্ভ করতে হবে।

প্রশ্নটা এইরকম : পুঁজির ইতিহাসের বিপরীতে মানুষের ইতিহাস সম্ভব করে তোলার ভাব ও তৎপরতা অর্থাৎ কর্তাসত্তা তৈরির ক্ষেত্রে বাংলার ভাবান্দোলনের কোনো প্রস্তাবনা আছে কিনা জানা দরকার। বাংলার ভাবান্দোলন জাতপাত লিঙ্গভেদবিরোধী লড়াই চালিয়ে গিয়েছে, আজো তা বহাল। বাংলার ভাবান্দোলন ধর্ম, ভাষা বা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে কোনো ‘জাতীয়তাবাদ’ করে না—কোনো প্রকার আত্মপরিচিতির রাজনীতি তাকে টলাতে পারে নি। সে শুধু ‘মানুষ’ ভজে। ধর্মের দোহাই দেয় না, শাস্ত্র মানে না, আল্লা, খোদা, রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর, ভগবান নামে যাকে ডাকে, পরিষ্কার যে সেই ‘অপর’ কোনো ধর্মগ্রন্থের বা শাস্ত্রের মহাশয় নন। বাংলার

ভাব নিজেকেই নিজে যেন ডাকে : ‘আল্লা কে বোঝে তোমার অপার লীলে, তুমি আপনি আল্লা ডাকো আল্লা বলে !!!’ ওর মধ্যে কিছু গোমর আছে নাকি? নিশ্চয়ই আছে। পরিষ্কার যে তার একটা বৈশ্বিক প্রকল্প আছে। এই ‘ভাব’ মোটেও ‘লোকায়ত’ ব্যাপার নয়। সেটা কী? তার নেকাব তুলে দেখা দরকার। কুয়ার ব্যাণ্ডের পক্ষে তো সমুদ্র ব্যাপারটা কী বোঝা সম্ভব নয়। যে কারণে বাংলার ভাবান্দোলনকে আমরা আজও ‘লোকায়ত সংস্কৃতি’ বলে চিনতে ভুল করি।

অনেক বড়ো বিষয়। তবে আপাতত আলোচনাটা শুবু করতে চাই। কথা জমাবার জন্য কোনো একটা সূত্র ধরে কথা বললে আরাম হয় বলে আমরা মার্টিন হেইডেগারের বিখ্যাত চিঠি (নাকি রচনা?) Letter on Humanism- সামনে রেখে কথা বলব।

দুই

ইউরোপের ব্রাসেলস শহর। ১৮৪৫। প্যারিস থেকে কার্ল* মার্কস বিতাড়িত হয়ে ব্রাসেলসে আছেন। এই সময় জার্মান দার্শনিক ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ সম্পর্কে নিজের বোঝার সুবিধার জন্য কার্ল মার্কস নিজের খসড়া খাতায় কিছু আপ্তকথা টুকে রাখেন। এই কথাগুলো কার্ল মার্কসের Thesis on ‘euerbach নামে পরিচিত। সেই ‘থিসিস’ বা আপ্তকথনের দুই নম্বরে মার্কস লিখেছিলেন :

‘মানুষের চিন্তা নৈর্ব্যক্তিক সত্য অর্জন করতে পারে কিনা সেটা তত্ত্বের মামলা নয়, বরং তৎপরতার প্রশ্ন... তৎপরতা নাই এমন চিন্তার কোনটা ঠিক আর কোনটা বৈঠক সেই সব তর্ক বিগুহ পণ্ডিত বিবাদ (scholastic question) মাত্র।’^৬

কার্ল মার্কস শুধু চিন্তা আর তৎপরতার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন না, বরং ‘সত্য’ বা ‘নৈর্ব্যক্তিক সত্য’ নিয়েও কথা তুলেছেন। ‘সত্য’ বা ‘নৈর্ব্যক্তিক সত্য’ নামক কাণ্ডজে কোনো ব্যাপার আদৌ আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিন্তা, তৎপরতা এবং সত্যের সম্পর্ক নিয়ে কথা তুলেছেন—তিনকে একই সঙ্গে।

মার্কসের এই আপ্তকথন জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকে চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্কের প্রশ্ন এক সময় দর্শন ও রাজনীতি উভয়েরই প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সত্য কোনো বইয়ের মধ্যে, দর্শনে বা তত্ত্বে নয়, একমাত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে। মার্কসের এই আপ্তকথন একই সঙ্গে প্রথাগত দর্শন থেকে প্রশ্ণান। এই

^৬ কার্ল মার্কসের লেখা সাধারণত আমরা ইংরেজিতেই পড়ে থাকি। এই উদ্ধৃতিতে যেসব শব্দ বা ধারণা নজরে আসে তাদের কয়েকটি ধরিয়ে দিচ্ছি।

যেমন, তৎপরতা = praxis

তৎপরতার ব্যবহারিক দিক বা ব্যবহারিক প্রশ্ন = practical question

নৈর্ব্যক্তিক সত্য = objective truth = যে সত্য এক বা অনেক ব্যক্তির সত্য্যসত্য উপলব্ধি বা ব্যক্তি মানুষের বিচারের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং ব্যক্তির বাইরে বা মানুষের বাইরে যে-সত্য নিজেই নিজের সত্যতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। ইত্যাদি।

প্রস্থানের মানে তত্ত্বচর্চা থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু বেহুদা পণ্ডিতি বিতর্ক বা তত্ত্ববাগীশতার ধারা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে যাওয়া।

তবে এই প্রস্থানের একটু স্থূল অর্থও মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও জে দং চিন্তাধারা নামে একসময় প্রকটভাবে চালু ছিল। এর দাবি ছিল ‘বিপ্লবী চর্চা’-ই সব কিছু ঠিক করে দেয়, তত্ত্বের কোনো দরকার নাই। বাংলাভাষী অঞ্চলে সীমান্তের দুই পাশে এই ধারা ঘাট থেকে আশির দশক অবধি বেশ প্রতাপের সঙ্গে টিকে ছিল এবং তার জের এখনও আছে। এই প্রবণতা বিপ্লবী ভাবুকতা ও চর্চা উভয়েরই প্রচণ্ড ক্ষতি করে। তত্ত্ব করব কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে থাকব না—এই ধরনের সুবিধাবাদী আঁতেলি ফন্দির বিরুদ্ধে চর্চার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সেই সময় দরকার ছিল। (যেমন, এখন আবার তার প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছে)। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় একদিকে গড়ে ওঠে নিষ্ফল তত্ত্ববাগীশতা, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবার ফন্দি ও সুবিধাবাদ। অন্যদিকে চিন্তাহীন নিষ্ফল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের নানান ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে এই ধারার ফল সীমান্তের দুই পাশের বাংলাভাষীদের জন্য সর্বসাকুল্যে ইতিবাচক হয় নি।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই, বিপ্লবী চিন্তার চর্চার মধ্য দিয়েই সত্য আর মিথ্যার ভেদ ঘটে যায়, এটা ঠিক। কিন্তু চিন্তা বা ভাবুকতাই যদি না থাকে তাহলে চর্চায় তার ভেদবিচার কীসের? চর্চার বাইরে কোনো পণ্ডিতি বিবাদ আকারে সত্য হাজির থাকে না। তার মানে সেটা থাকে চর্চারই অঙ্গাঙ্গী হয়ে। চর্চার মধ্যেই তত্ত্বকে থাকতে হবে, চর্চা থেকে আলাদা হয়ে নয়। মার্কসের বিখ্যাত প্রস্থানের অর্থ হচ্ছে তত্ত্ববাগীশতা বা বেহুদা পণ্ডিতি তর্ক থেকে বেরিয়ে তত্ত্বকে চর্চায় নিয়ে যাওয়া। তত্ত্বকে চর্চা থেকে বাদ দেওয়া বা তত্ত্ব থেকে নিষ্কাশন হবার কথা বলা হয় নি। অথচ তত্ত্ববাগীশ পণ্ডিতি পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে যাওয়ার মানে হয়ে উঠেছিল তত্ত্ববিরোধিতা। চিন্তার চর্চা বা ভাবের চর্চার বিপরীতে স্থূল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। ফলে দেখা গেছে মার্কসের বরাতে দিয়ে, বিশেষত ফয়েরবাখ সংক্রান্ত মার্কসের এই থিসিসের বরাতে দিয়ে অনেকে তত্ত্ববিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। বলাবাহুল্য তত্ত্বহীন রাজনৈতিক চর্চার সঙ্গে মার্কস, লেনিন বা মাও জে দংয়ের কোনো সম্পর্ক নাই।

মার্কসের বরাতে চিন্তা, তৎপরতা আর সত্যের এই ত্রিভুজ অবস্থান বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শর্ত হিসাবে আজ অবধি বিরাজ করছে। কাজ করে গিয়েছে। এই দিক থেকে এই কালে ‘সত্য’ নিয়ে নতুন যে সকল তর্কবিতর্ক পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট ও পোস্টমডার্নিস্টরা শুরু করেছেন, সেটা পুরানা বিষয়। অন্যদিকে, মার্কস, লেনিন বা মাও জে দং—কেউই শুধু তৎপরতা বা চর্চায় নিজেদের জীবন কাটিয়ে দেন নি। দর্শন, ভাবুকতা বা জ্ঞানের জগতে মার্কসের স্থান এখনো পাকাপাকিই রয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি লেনিন ও মাও জে দংও তাঁদের নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। একালের চিন্তা ও তৎপরতাকে তাঁদের চিন্তা ও তৎপরতা মোকাবিলা করেই সামনে এগুতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের দুর্দশা যাই হোক তাঁদের বিপ্লবী চিন্তা, তৎপরতা ও

অভিজ্ঞতার বিচার ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। মানবেতিহাসের সফলতা ব্যর্থতা সবকিছুরই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো নিহিত থাকে, নতুন বিপ্লবী চর্চার রসদ হয়ে। সেই অভিজ্ঞতার সারমর্ম টানা ও এখনকার কাজ ঠিক করার কর্তব্য বাকি পড়ে আছে।

চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্ক বিচার যতো সরল আর সিধা আমরা ভাবি ততো সরল আর সিধা নয়। আমরা সত্যের প্রশ্নকে উহ্য রাখি বলে প্রশ্নটা আমাদের কাছে সোজা মনে হয়। অথচ তর্কটা আদতে সত্য নিয়ে। যেহেতু বিপ্লবী চিন্তা ও তৎপরতা থেকে সত্যের প্রশ্ন উহ্য বা গোঁণ হয়ে গিয়েছে, ফলে সেই প্রশ্নই ফিরে আসছে পাশ্চাত্য দর্শনে ভিন্ন ভাবে। পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বা পোস্ট-মডার্নিজম নামে যেসকল ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি সেই সবেব মধ্যে। সেখানে তত্ত্বের মধ্যে বা আরো সাধারণ ভাবে ভাষার মধ্যে সত্য কোথায় কীভাবে বা আদৌ থাকে কিনা সেই সকল পুরানা প্রশ্ন নতুন ভাবে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে।

তবে মার্কস লেনিন বা মাও জে দংয়ের অনুসারীদের মধ্যে মানুষের জ্ঞানচর্চা ও জীবনযাপনের সামগ্রিকতার মধ্যে চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্ক বিচার যতোটা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চর্চার সম্পর্ক নিয়ে। সেখানে একটা বিশাল ফাঁকি ছিল। চিন্তার সঙ্গে তৎপরতার সম্পর্ক বিচার ভাবুকতার খুবই গোড়ার প্রশ্ন, শুধু রাজনীতির নয়। সাধারণ ভাবে চিন্তার সঙ্গে তৎপরতার সম্পর্ক বিচার অনেক আগেই বিপ্লবী রাজনীতির গোঁণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি তার বিশেষ দিক যেমন, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চর্চার সম্পর্কও। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, চীনের বর্তমান রূপ এবং পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রকটতার কারণে এই প্রশ্ন তোলা এখন আগের চেয়ে অনেকানেক কঠিন। অন্যদিকে ইউরোপীয় দর্শনের মধ্যে ভাষাকেন্দ্রিক দর্শন-ভাবনা—যেমন, পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বা পোস্ট-মডার্নিজম ইত্যাদির প্রাবল্য ও আধিপত্যের কারণে সত্যের বিচার চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্ক বিচারের জায়গা থেকে অধঃপতিত হয়ে ভাষার বিচার বা ভাষার মধ্যে সত্যাসত্য বিচারের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তা, তৎপরতা ও সত্যের ত্রিভুজ সম্পর্ক বিচারের যে ইঙ্গিত মার্কস দিয়েছিলেন, সেটা পাশ্চাত্যের এখনকার দার্শনিক ধারা আর মনে রাখে নি। সেই দিক থেকে পাশ্চাত্য দর্শনের এখনকার প্রধান ধারা বিপ্লবী চিন্তা ও তৎপরতার একটি ভুলে যাওয়া বা গোঁণ হয়ে যাওয়া প্রশ্নের ফটলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে। সেই ভুলে যাওয়া প্রশ্নটি হচ্ছে সত্য, চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্ক বিচার। নিদেনপক্ষে প্রশ্নটিকে ফিরিয়ে আনাই এখন বড় কাজ। এই লেখাটির মতলব মূলত সেই দিকেই।

তিন

এমন নয় যে এই প্রশ্নটা শুধু পাশ্চাত্যে ছিল, আমরা এই প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতাম না। এমনও নয় যে মহাপণ্ডিত না হলে এই প্রশ্নের গুরুত্ব বোঝা যাবে না। যেমন, কার্ল

মার্কস না বললে যেন আমরা এই প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতামই না। মোটেও না। কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক না থাকলে মানুষকে আমরা নিন্দা করি। বলি, ও মানুষটির কথার কোনো মূল্য নাই। কথা আর চিন্তা কি একই ব্যাপার? কথা মুখের হতে পারে, লিখিতও হতে পারে। কথা মানে শুধু নির্দেশ হতে পারে। ‘যাও, আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো’—এই ধরনের নির্দেশ, আদেশ, অনুরোধ, উপরোধের মধ্যেও চিন্তা থাকে। এই ধরনের নির্দেশ পেলে কেউ এক গ্লাস পানি নিয়ে আসলে সেটা চিন্তারই মূর্তায়ন হোল। নাকি? কারো চিন্তায় যদি থাকে যে কেউ তাকে এক গ্লাস পানি এনে দিক, আর যদি কেউ সেই আদেশ পালন করে, তাহলে আদেশমূলক সেই চিন্তাটা এই ক্ষেত্রে রূপায়িত হোল। অর্থাৎ চিন্তা কোনো পদ, বাক্য বা তত্ত্ব নাও হতে পারে। খেয়াল করতে হবে ‘চিন্তা’ কথাটাকে যেন তার নানান রূপে আমরা শনাক্ত করতে পারি। চিন্তারও রকমফের আছে। তার বিচার অন্যত্র।

মানুষের চিন্তা শুধু কথা বা ভাষায় নয়, অন্যান্য চিহ্নব্যবস্থার মধ্য দিয়েও ব্যক্ত হতে পারে। কারো পোশাক দেখে তার ভেতরের চিন্তাটা আমরা বুঝি, কারো বাড়িতে গেলে তাদের ঘর সাজানোর মধ্যে একটা চিন্তার ছাপ থাকে। তার মানে চিন্তা মাত্রই ভাষা বা কথা এই ব্যাপারে তর্ক আছে। কথার মধ্যে, সেটা মৌখিক বা লিখিত হোক—চিন্তার একমাত্র প্রকাশ। এরপর প্রশ্ন তাহলে কোন্ মাধ্যমে চিন্তা তার স্বাভাবিক বা আপন স্বভাব নিয়ে বিরাজ করতে পারে। মার্টিন হেইডেগার বলবেন ভাষা। মানুষ ভাষার মধ্যে বাস করে। চিন্তা মাত্রই কোনো না কোনো ভাবে ভাষার মামলা। কিন্তু কার্ল মার্কস বা বাংলার ফকির লালন শাহ এই ক্ষেত্রে হেইডেগারের সঙ্গে একমত হবেন না। অমতের কারণের মধ্যে এই শেষের দুই জনের মধ্যে মিল যেমন আছে, অমিলও আছে। হেইডেগার কেন ভাষাকে এবং কাজে কাজেই ভাষার কারিগর যেমন, কবি ও দার্শনিকদের এতো মূল্য দিয়েছেন, তার ব্যাখ্যাই করেছেন তাঁর দর্শনের বইগুলোতে। ভাববার কোনো কারণ নাই যে হেইডেগার এতোই বোকা ছিলেন যে তিনি জানতেন না যে ভাষা ছাড়াও আরো নানা ভাবে চিন্তার প্রকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু তাঁর ‘মানুষ’ অন্যান্য যে সকল বস্তু আছে বা থাকে তাদের মতোই ‘আছে বা থাকলেও’, ইহলৌকিকতার মধ্যে মানুষের এই ‘আছে হয়ে থাকার’ বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতাকে বাদ দিয়ে ‘মানুষ’ বললে আমরা যেভাবে আর দশটা অস্তিত্বমান সত্তা বুঝি হেইডেগার সেভাবে বোঝেন না। বরং অন্য সকল সত্তা মানুষের মধ্য দিয়েই অস্তিত্বমান হয়ে ওঠে এবং ভাষা পায়। ‘মানুষ’ সম্পর্কে হেইডেগারের ধারণার সঙ্গে ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক সরাসরি।

মার্কসের মধ্যে ‘মানুষ’ নামক কোনো সাধারণ, বিমূর্ত বা সার্বজনীন ধারণা নাই। তাঁর অন্বেষণ ‘মানুষ’ নামক কোনো অনুমান মান্য করে আরম্ভ হয় না। মানুষ কী? একেকটা ঐতিহাসিক সময়কালে দেশকালপাত্র ভেদে কী বিশেষ সম্পর্কে একদিকে পরস্পরের সঙ্গে এবং অন্যদিকে অ-বস্তুবাচক ভেতরের (বা ভাবের) জগত ও

বস্তুবাচক বাইরের (বা ইহলৌকিক) জগতের সঙ্গে মানুষ সম্পর্কিত হচ্ছে — সেই সম্পর্কের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। মানুষ সর্ববিধ সম্পর্কের সামগ্রিকতা। এই সম্পর্ককে মার্কস ‘উৎপাদন সম্পর্ক’ বলে দাগ টেনেছেন। মার্কসের কাছে উৎপাদন সম্পর্ক মানে নিছকই বস্তুগত অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়, চিন্তাসহ মানুষের সকল বৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একইসঙ্গে চিন্তার বাইরে বস্তুবাচক জগতের সম্পর্ক। তাহলে ‘মানুষ’ নামক ব্যাপারটাকে কার্ল মার্কস শেষাবধি ভাব ও বস্তু উভয়েরই অভেদ ও ভেদ বিচারের মামলা বা সোজা কথায় সম্পর্ক বিচারের প্রশ্ন হিসাবেই দেখেছেন। বলাবাহুল্য এই সম্পর্ক শাশ্বত কোনো সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্কের বিচার মানে একই সঙ্গে তার রূপান্তরের প্রশ্নও বটে। ‘পুঁজি’ গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য যে উপশিরোনাম মার্কস ব্যবহার করেছিলেন, সেটা ছিল Critique of Political Economy বা অর্থশাস্ত্রের বিচার বা পর্যালোচনা। আসলে এটাই বোধহয় তাঁর বইয়ের আসল নাম। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক ইহলৌকিক রূপ নিয়ে দৃষ্টব্য হয়ে ওঠার ব্যাপারটা ঘাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা কীভাবে এই সম্পর্ককে তাঁদের ভাষায় গ্রেফতার করেছেন, তার বিচার। অর্থাৎ ভাষার বিচারও বটে। যেমন ‘মূল্য’ কথাটিকে কে কীভাবে ব্যবহার করেছেন। কিম্বা ‘বিনিময়’ বা ‘পণ্য’ ইত্যাদি। সেই ব্যবহারের মধ্যে একটা ‘সম্পর্ক’-ও ব্যক্ত হচ্ছে। সেই ভাষার বিচার বা পর্যালোচনা যখন আমরা করি, তখন একই সঙ্গে নতুন ভাষার জন্ম দিয়ে থাকি। যিনি ভাষ্য দিচ্ছেন তিনি যে-সম্পর্কের ভেতরে বসে এই ভাষ্য তৈরি করেন, সেই সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর ভাষার একটা যোগসূত্র থাকে। যিনি বিদ্যমান সম্পর্ককে অতিক্রম করে যাবার কল্পনা, ইচ্ছা, সংকল্প করেন, তাঁর ভাষার মধ্যে নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হয়। ভাষা কাজেই কাজেই বিদ্যমান সম্পর্ককে যেমন বহাল রাখতে পারে, তেমনি নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনাও তৈরি করে।

সম্পর্ক। ভাষা। সম্ভাবনা। হেইডেগার বলেন যা আছে কেবল তাকে মূর্ত করে তোলা অর্থেই সম্ভাবনা কথাটা খাটে। কার্ল মার্কসও ভিন্ন কিছু বলেন না। বর্তমানের মধ্যেই আগামির সম্ভাবনা থাকে। হেইডেগার বর্তমানতা, বিদ্যমানতা বা ‘আছে’ কথাটার মানে কী করে বোঝা যায় তার পেছনেই সারা জীবন কাটিয়েছেন। বিপ্লব মানে নতুন কিছু ঘটানো নয়, যা ভাবগত ও বস্তুগত ভাবে আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে, তাকেই দৃশ্যমান করে তোলা। এই দিক থেকে মার্কস আর হেইডেগারের ফারাক নাই বললেই চলে।

সম্পর্ক, ভাষা ও সম্ভাবনা নিয়ে মার্কস ও হেইডেগারের দ্রুত তুলনা করলাম এই কারণে যে অনেক সময় এই বিভ্রম ঘটে যে মার্কসের পরে বা মার্কসের বিপরীতে হাজির করা দার্শনিকরা বুঝি নতুন কিছু বলছেন। তাঁদের ভাষ্য আপাত দৃষ্টিতে কার্ল মার্কসকে অতিক্রম করে গিয়েছে বলে আমাদের বিভ্রম হয়, সেটা সবসময় সত্য নয়। আবার মার্কস সব কথা বলে গিয়েছেন সেটাও ঠিক নয়। মার্কসের পরে অবশ্যই নতুন ভাবে চিন্তা করবার নতুন ভাবে ভাববার শক্তি বেড়েছে আমাদের। কিন্তু অধিকাংশ সময়

মার্কসের যে ইঙ্গিত ও ইশারাগুলো আমরা আগে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি, সেই দিকগুলোর দিকে নজর ফেরানোর কাজ সহজ হয়েছে মাত্র। দর্শনের দিক থেকে এইসব বড়ো অর্জন অবশ্যই। কীভাবে তারা পরস্পরকে নাকচ করেছে এবং একই সঙ্গে পুরানা কথাই নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যদি আমরা ভালোভাবে বুঝি, তাহলে চিন্তার বিকাশ আরো দ্রুত হয়।

এই ক্ষেত্রে ফকির লালন শাহের সঙ্গে সম্পর্ক-সম্বন্ধানী মার্কসের কোনো ফারাক আছে কি? মার্কস যাকে উৎপাদন সম্পর্ক বলছেন, ফকির লালনের ভাষায় সেটা দেহের সম্পর্ক। মানুষের দেহ আর সমাজের দেহের মধ্যে ফারাক সামান্যই—মার্কস আর লালন এই ক্ষেত্রে একই জায়গায় দাঁড়ানো। শরীর নামে মানুষের যা আভ্যন্তরীণ, জগত নামে সেটাই বাহ্যিক মাত্র। যা আছে ভাঙে বা দেহে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। কিম্বা যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহে। দেহের ধারণা বাংলার ভাবান্দোলন যেভাবে করে বা করে আসছে তার মধ্যে কোনো ভেতর আর বাহির নাই। লালনের অবস্থানে দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কসকে পাঠ করার একটা আরাম হচ্ছে, পাশ্চাত্য দর্শনের পরাবিদ্যামূলক ধারার বাইরে যাবার জন্য মার্কসের প্রাণপণ জ্ঞানগত লড়াইটা আরো সহজে ধরা পড়ে। অথচ এটা অতি সহজ ও সাবলীল ভাবে বাংলার ভাবের মধ্যে হাজির।

বলাবাহুল্য ‘দেহ’ কথাটা বাংলার ভাবান্দোলনের সব ইস্কুল বা ঘর একই ভাবে ব্যাখ্যা করে না। পার্থক্য আছে। কিন্তু মার্কসের সঙ্গে ফকির লালন শাহ এবং একই ধারার বাংলার ভাবান্দোলনের পার্থক্যের জায়গা প্রথমে তবু শুরু হয় দেহ সম্পর্কে ধারণার পার্থক্য থেকেই। মানুষের বিচার করতে গেলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের দেহটা কী জিনিস? ওর মাধ্যমেই তো মানুষের ভেতরের ‘আমি’ আর বাইরের ইহলৌকিক জগতের সম্পর্কটা ঘটে। প্রকৃতির সম্পর্কে কেন এই রূপান্তর বা বিবর্তন ঘটল, যে মানুষ নামক একটা ব্যাপার ঘটে গেলো প্রকৃতি জগতে? কেন এই ঘটনা? এই দেহ দিয়ে ‘আমি’ বা দেহের মালিক কী করবে? এর কী কোনো উদ্দেশ্য আছে? নাকি এটা নিছকই লীলা।

তাহলে দেহ কী? এই হচ্ছে বাংলার ভাবান্দোলনের গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন। কিন্তু ‘দেহ’ মার্কসের আলোচনার কেন্দ্রে নাই বা প্রাধান্য পায় নি। দেহের একটি মাত্র বৃত্তিকে ঐতিহাসিক কারণে প্রধান গণ্য করেছেন মার্কস। সেটা হোল দেহ হচ্ছে শ্রমের মাধ্যম বা শ্রমশক্তির উৎস। পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে যে শ্রমশক্তি বেচাবিক্রি হয়। এতে অবশ্য লালনের পক্ষ থেকে অপাস্তি করার বিশেষ কিছু নাই। কারণ কার্ল মার্কস প্রধানত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বা পুঁজির ‘দেহ’ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন, মানুষের একজীবনে এর চেয়ে বেশি কী আর করা সম্ভব? ফকির লালনও শুধু মনুষ্য শরীরের আর বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত ছিলেন—পুঁজিতান্ত্রিক শরীর নিয়ে ভাবেন নি—কারণ তাঁর আমলে বা তাঁর সামনে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তখনো মার্কসের মতো দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে নি।

যেহেতু দেহ সম্পর্কে ধারণার ‘অ-ভাব’ আছে কার্ল মার্কসের, সেই কারণে কার্ল মার্কস জগত বলতে শুধু আর্থ-সামাজিক ইতিহাস এবং বড়োজোর এই পৃথিবী ও তার আশপাশের সূর্য, তারা, গ্রহ-নক্ষত্র বুঝিয়েছেন। কার্ল মার্কস যদি আসলেই বস্তুবাদী হতেন তাহলে জগৎ মানে যে সবকিছু নিয়েই জগত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষ বা মানুষের দেহ কিনা এই প্রশ্ন তাঁর মনে আসত। মানুষ যদি সকল বস্তুগত সম্পর্কের সামগ্রিকতা হয়, তাহলে শুধু উৎপাদন সম্পর্ক বিচার করলে মানুষকে বোঝা যাবে না। তবে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা দৃশ্যমান হয়ে ওঠার পর উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু দেহ সম্পর্কে ভাবনার ‘অ-ভাব’ মার্কসের মধ্যে থেকেই গেলো—এটাই হবে লালনের পক্ষে দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কসের সমালোচনা। যদি মার্কসের সম্পর্ক বিচারের পরিমণ্ডল বড়ো হোত তখন তাঁর সম্পর্ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও আরো প্রসারিত হোত।

দ্বিতীয় পার্থক্য জীব ও পরমের লড়াইয়ের দিক থেকে। মার্কস বা লেনিন যাকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম বলেছেন, অর্থাৎ এক জীবের অন্য জীবের প্রতিপক্ষ হয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাকে ফকির লালন শাহ বলবেন, জীবের সঙ্গে জীবের লড়াই—জীব এখনো জানে না সে আসলে ‘অনেক’ নয়, বরং ‘এক’। এই একের উপলব্ধি বা তৌহিদ যখন জীবের জীবনে ঘটে, তখন সে পরমের স্বাদ পায়; তখন তার স্বপ্ন, কল্পনা আর আকাঙ্ক্ষা আর জীবের আকাঙ্ক্ষা মাত্র থাকে না। মানুষ তার জীবের জীবন অতিক্রম করে সকলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের—মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবার তাগিদ অনুভব করে।

শ্রেণী সংগ্রাম তার একটা প্রধান ঐতিহাসিক রূপ মাত্র। কিন্তু একমাত্র রূপ নয়। তাহলে পরম কী? তাকে জীব কী করে ধরবে? বা কী করে জীব তার আবির্ভাব ঘটাবে? অধরাকে ধরব কী করে? এই প্রশ্ন যদি তোলা হোত তাহলে দেহের রূপান্তরের প্রশ্ন প্রথাগত অর্থে উৎপাদন সম্পর্ক রূপান্তরের রাজনৈতিক প্রশ্ন না হয়ে আরো গূঢ় অন্ত্বেষণের দিকে যেত। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিকাশের কথা উঠত। শুধু বুদ্ধি, কিম্বা চোখ নয়। ঘ্রাণের, স্পর্শের, শ্রুতির তো বটেই এমনকি কামেরও। কাম। বাংলার ভাবান্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই কাম বা কামনার মধ্যে অপরকে আত্মদানের যে তীব্র দৈহিক আকুতি আছে, সেই শক্তিকে পারমার্থিক প্রেমে কী করে রূপান্তর করা যায়, সেই প্রশ্নও বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হোত। মার্কসের মধ্যে কংকোশল অর্থে টেকনলজির প্রতি যে দুর্বলতা লক্ষ করা যায়, সেই দুর্বলতা থাকতনা। একদিকে মার্কস টেকনলজির অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দিত, অন্যদিকে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নতুন সম্পর্কের কথা বলছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না যে টেকনলজি মাত্রই একটা সম্পর্কও বটে। তাহলে কোন সম্পর্ক মানুষের মুক্তির জন্য —বা লালনের ভাষায় পরমের আত্মদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর কোন টেকনলজি মানুষকে পুঁজির দাসে পরিণত করে, সেই ফারাক তিনি আরো পরিষ্কার ভাবে করতে পারতেন।

ঠিক যে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ এবং বর্তমানের ভেতরে তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভাবনাকে দৃশ্যমান করে তোলা—যাকে ‘সমাজতন্ত্র’, ‘কৌম সমাজ’—যাই বলি না কেন—পরমের আবির্ভাবের শর্ত। মানুষের ইতিহাস—যে মানুষকে আর নিছক ‘জীব’ বলা যাবে না—সেই মানুষের ইতিহাস তো এর পরেই শুরু হতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কোনো আকার নাই, কিন্তু এই বর্তমানের মধ্যেই এখন যে নিরাকার রূপে বা আগামি সমাজের কল্পনা রূপে হাজির তাকে মূর্ত করে তুলবে মানুষ। যার কোনো আকার নাই, যে এখনো নিরাকার, তাকে সাকার করে তোলা মানুষের কাজ। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জীব ও পরম উভয়েরই রূপান্তর ঘটে বস্তুগত ও ভাবগত উভয় ভাবে, উভয় প্রকার সম্পর্কের দিক থেকে। পাশ্চাত্য দর্শনের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন বলে জীব আর পরমের সম্পর্কের প্রশ্ন যে একটি গুরুতর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সেটা কার্ল মার্কসের মধ্যে আমরা পাই না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চিন্তা ফকির লালন শাহের কাছে দেহ থেকে আলাদা কিছু নয়। মানুষ দেহই চিন্তা করে। কিম্বা দেহকে মানুষ চিন্তা করে ভাষার মধ্য দিয়ে। কিন্তু হেইডেগার যখন বলেন মানুষ ভাষায় বাস করে, ফকির লালন শাহ অমত করবেন। লালন বলবেন এ কোন ‘মানুষ’ যে দেহে বাস করে না, শুধু ভাষায় করে? পরম জীবে আছেন; সেই দিক থেকে পরম ভাষাতে যেমন আছেন, দেহেও আছেন। কিন্তু ভাষা অতিক্রম করে দেহের মধ্যে যখন পরমের আশ্রয় হয় তখন, ‘অনামক অচিনায় বচন বাগেন্দ্রিয় না সম্ভবে’। সেই পরম যার কোনো ‘নাম’ নাই, চিহ্ন নাই, তার আশ্রয় হল মানুষ আর কথা বলে না, বাগযন্ত্র তখন আর কাজ করে না। ফলে দেহ সম্বন্ধে অবস্থানের কারণে হেইডেগারের সঙ্গেও বাংলার ভাবান্দোলনের মতে মিলবে না।

চার

চিন্তা বলতে আমরা আপাতত এখানে চিন্তার জীবন্ত প্রক্রিয়া বা তার ফলাফল বুঝছি। তত্ত্ব হচ্ছে চিন্তা-প্রক্রিয়ার ফল। চিন্তার প্রক্রিয়া যেমন চিন্তা, ঠিক তেমনি, চিন্তার ফলাফল বা চিন্তা থেকে জাত কোন সিদ্ধান্তও চিন্তাই বটে। কিন্তু যে তত্ত্ব শুধু বইয়ে থাকে জীবন্ত চিন্তার অংশ হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে চিন্তা বলতে আমরা যা বোঝাচ্ছি তার তফাৎ খেয়ালে রাখতে হবে। সাধারণ ভাবে যাকে আমরা প্রায়ই জ্ঞান, দর্শন, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বলি তাকেও তার জীবন্ত রূপে বোঝার দরকার। কার্ল মার্কস এসে তাঁর পুঁজি বই এখন আর কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যান না। যেতে পারেন না। জীবন্ত ও চিন্তাশীল মানুষ হিশাবে হয় সেটা আমাকে বুঝতে হবে কিম্বা ফকির লালন শাহের মতে কোন জীবন্ত ‘গুরু’-কে খুঁজতে হবে, যাঁরা মার্কসের তত্ত্বকে জীবন্ত চিন্তায়—কাজে কাজেই জীবন্ত চর্চায় রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। এই ভাবে যখন আমরা ফকির লালনের গুরুতত্ত্ব বুঝি, যা ‘গুরু’ সম্পর্কে আমাদের প্রথাগত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত—তখন তার সঙ্গে

কমিউনিস্ট পার্টির ‘পলিট ব্যুরো’ এবং পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণার সঙ্গে বিশেষ কোনো হেরফের হয় না।

‘চাল সেদ্ধ করলে ভাত হয়’। এটা তত্ত্ব। এখন চাল সেদ্ধ করলে ভাত হয় কিনা সেটা সেদ্ধ করে দেখলেই বোঝা যাবার কথা, যদি বাক্যটি সত্য হয়। এইভাবে চিন্তা ও চর্চাকে ভাগ করে ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, এই বিভক্তিকে মার্টিন হেইডেগার চিন্তা সম্পর্কে টেকনিকাল বা যান্ত্রিক ধারণার কুফল বলে গণ্য করেছেন। চিন্তা, চর্চা ও সত্যের সম্পর্ক বিচারের ব্যাপারটা যে এতো খেলো জায়গায় নয়, তিনি সেই দিকে আমাদের নজর ফিরিয়েছেন। কার্ল মার্কসের আপ্তকথনের সঙ্গে তাঁর পর্যালোচনা কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ সেটা এখনো বিচার করে কেউ দেখে নি। যদিও এটা পরিষ্কার যে কার্ল মার্কস চিন্তা বলতে যা বুঝিয়েছেন মার্টিন হেইডেগার চিন্তা বলতে একই কথা বোঝান নি। কিন্তু হেইডেগারের বিচারে মার্কসের চিন্তা সম্পর্কে ধারণাও কি টেকনিকাল বা যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট? কিম্বা কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে হেইডেগার কি নিছকই একজন তত্ত্ববাগীশ? এই তর্কগুলো করা দরকার। এই তর্কের মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : একজন বলছেন চিন্তা থেকে চর্চা আলাদা কিছু নয়, চিন্তা মাত্রই চর্চা (মার্টিন হেইডেগার)। ঠিকই তো চিন্তার সক্রিয়তা ছাড়া তো চিন্তা হয় না। অন্যজন বলছেন : চর্চাই আসলে চিন্তা, আসলে মানুষ কী চিন্তা করছে বা করে সেটা তার চর্চার মধ্যেই বুঝতে হবে; তার চিন্তায় কথাবার্তায় তত্ত্ব বাক্যবাগীশতায় সে কী বলল না বলল সেটা গোণ ব্যাপার। দুই জনের কেউই আসলে চিন্তাকে চর্চা থেকে আলাদা করে দেখেন নি। মার্টিন হেইডেগারের আদালতে যদি কার্ল মার্কসকে দাঁড় করাই তাহলে অন্তত এই অভিযোগ তোলা যাবে না যে চিন্তা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যান্ত্রিক বা টেকনিকাল।

চিন্তা ও চর্চাকে ভাগ করে ভাবলে কী অসুবিধা তার প্রভূত ব্যাখ্যা মার্টিন হেইডেগার আমাদের দিয়েছেন। সেই বিষয়ে আমরা পরে আসছি। যদি ভাগ করে ভাবি তখনও প্রশ্ন ওঠে : যে কেউই চাল সেদ্ধ করলেই কি ভাত হয়? ভাত রান্না করতে গিয়েও তো অনেকে ভাত পুড়িয়ে ফেলে। তাহলে চিন্তার চর্চা করলেই একটি বাক্য বা তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় হয় কিনা সেটা আরেক তর্ক। চিন্তা ও চর্চার বিভাজন থেকে তোলা এই তর্ক নিজের তোলা প্রশ্ন নিজে মীমাংসা করতে পারে না, প্রশ্নকে আরও জটিল করে তোলে। যেমন, সঠিক চিন্তার সঠিক চর্চা নির্ণয় হবে কী ভাবে? মাও জে দং বলতেন, ‘বিড়াল ইঁদুর ধরে’ তত্ত্ব হিশাবে এটা ঠিক, অর্থাৎ সত্য—কিন্তু বিশেষ ইঁদুরের ক্ষেত্রে যদি খাটাই, তাহলে দেখতে হবে বিড়ালটি আসলেই ইঁদুর ধরে কিনা। বিশেষ ইঁদুরের ক্ষেত্রে তত্ত্বটি না খাটলে সেই ইঁদুর সম্পর্কে আমাদের নতুন জ্ঞান হয়, তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না। অর্থাৎ সত্য নিজেকে ঠিকই সামান্য ও বিশেষ ভেদে ব্যক্ত করে।

চিন্তার চর্চা করলেই একটি বাক্য বা তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় হয় কিনা তর্ক করতে গিয়ে কোনো বিশেষ মানুষ চাল সেদ্ধ করলে সেটা পুড়ে গিয়েছে নজির দেখিয়ে প্রমাণ করা

যায় না যে তত্বটা বেঠিক। এই কাণ্ডজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। যিনি ভাত পুড়িয়ে ফেলেন তিনি ঝাঁধুনি নন, এটাই আমরা দাবি করি। তখন তত্ত্বের তাত্ত্বিকতা রক্ষার জন্য আমরা তাকে নতুন করে সাজাই। যেমন, সেদ্ধ করতে হবে সেই ভাবেই যেভাবে চাল থেকে ভাত হয়। ভুল ঝাঁধুনিকে তত্ব থেকে খারিজ করে দেবার জন্য তত্বকে ঠিক করি। কিন্তু ঠিক করতে গিয়ে কূটতাত্ত্বিক ভাবে যা দাঁড়ায় তা হোল : ‘চাল যেভাবে সেদ্ধ করলে ভাত হয় সেই ভাবে চাল সেদ্ধ করলে ভাত হয়’। ঠিক না? তত্ব এখন আর তত্ব রইল না। ইনিযে বিনিযে ফাঁপা বুলির অর্থহীনতায় খাবি খাওয়া শুরু করল। বহু বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা এই ভাবে খাবি খেয়ে বুদ্ধবুদ্ধের মতো বিপ্লবী চর্চার খাদে মিলিয়ে গিয়েছে।

কথাটা অনেকের হাস্যকর বা হালকা মনে হতে পারে। যদি বলি : “যেভাবে চিন্তা চর্চা করলে বিপ্লব হয় সেই ভাবে চিন্তা চর্চা করলে বিপ্লব হবে”। ইনিযে বিনিযে অর্থহীন প্রলাপের নমুনা এইসব। ফাঁপাবুলি। কিন্তু চিন্তা ও তৎপরতার সম্পর্ক বিচারের গুরুতর মুশকিল এড়িয়ে এই ধরনের অর্থহীন ফাঁপাবুলির অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে বহু রক্তপাত হয়েছে। বহু প্রাণ অকাতরে বলি হয়েছে।

পাঁচ

১০ নভেম্বর ১৯৪৬। ১৮৪৫ সালের বসন্তে প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রাসেলসে বসে মার্কসের থিসিস অন ফয়েবাখ লেখবার ১০০ বছর পরের ঘটনা। মার্টিন হেইডেগার ফ্রান্সে জঁ বাউফ্রে (Jean Beaufret) লেখা একটি চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে মার্কসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন হিউমেনিজম বা মানবতাবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে। এই চিঠিটি হেইডেগারের লেটার অন হিউমেনিজম বা ‘মানবতাবাদ নিয়ে লেখা চিঠি’ নামে প্রখ্যাত। হেইডেগার আসলে চিঠিটি আর চিঠি আকারে রাখেন নি। পরের বছরেই ১৯৪৭ সালে একে আরো ঘষামাজা করে ছাপতে দিয়েছিলেন। ফলে লেখাটি তাঁর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক রচনা হিসাবে বিবেচিত।

হেইডেগার জঁ পল সার্ত্রের Existentialism is a Humanism (Paris, Nagel, 1946) নামক বইটির প্রসঙ্গে তোলা জঁ বাউফ্রে কথার উত্তর দিচ্ছিলেন। বিশেষত সার্ত্রের কথা হচ্ছে : That existence precedes essence, or... that one must take subjectivity as one's point of departure (p.17)। অস্তিত্ববাদী সার্ত্রে তার অস্তিত্ববাদী বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। সার্ত্রে বলতে চাইছিলেন, ‘সত্তার আগে আসে অস্তিত্ব ...কর্তাসত্তা আগে মেনে নিয়েই অন্য প্রসঙ্গে যেতে হবে’। সার্ত্রের কথা অনুসারে মানুষের স্ব-ভাব (বা মানব প্রকৃতি) নামে কোন মানবীয় সত্তাকে আগে থাকতেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করবার উপায় নাই। এরকম কোন সত্তা বা স্ব-ভাব (essence) থাকতে পারে—সার্ত্রে তাকে নাকচ করে দিচ্ছেন, কারণ তার আগেই তো এই ধরনের স্ব-ভাব বা সত্তা নির্ণয়কারী একজন কর্তা (subjectivity) হাজির হয়েই থাকে। কারণ এই ধরনের কর্তা না থাকলে কে মানুষের সত্তা নির্ণয় করছে? বলা

বাহ্য্য, সার্ভের এই সহজ ও সরল কর্তাবাদ শিল্প-সাহিত্যের জগতে প্রবল তুফান তুলেছিল। যদিও দর্শনে ততটা নয়।

আসলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় দানা বেঁধে ওঠা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা কর্তাকেন্দ্রিক চিন্তার পক্ষেই দাঁড়ালেন সার্ভে। তিনি মাওবাদ, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে থাকার মানুষ। তা সত্ত্বেও ভুতের মুখে রামনাম শোনার মতো সার্ভের এই অবস্থানে তুমুল উৎসাহিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়। নিজের দর্শনের সঙ্গে কাজের দার্শনিক বিরোধ সার্ভে টের পেয়েছেন বলে তাঁর লেখায় প্রমাণ নেই; কিন্তু তাঁর কাজে প্রমাণ আছে। তিনি এই নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে সার্বভৌম কর্তাসত্তা, সকল সত্তার আগে যিনি বিরাজ করেন, যার ভজনা তিনি তাঁর অস্তিত্ববাদে করেছেন—তার রাজনৈতিক রূপটি আসলে কী রকম হয় বা হতে পারে তার নজির তিনি রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য। অর্থাৎ দেখিয়েছেন যে তাঁর মধ্যে ‘কর্তা’ রূপে যে ব্যক্তি বিরাজ করেন, তিনি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোলাম নন। বুর্জোয়া শ্রেণীর দাসত্ব এই কর্তাসত্তা করে না। পরিষ্কার যে সার্ভে সার্বভৌম কর্তাসত্তার পক্ষে ছিলেন বটে, কিন্তু বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী ছিলেন না। ফলে ‘অস্তিত্ব’ (existence) বলতে তিনি আসলে কী বুঝিয়েছেন সেটা তাঁর লেখা থেকে শুধু নয়, তাঁর জীবন থেকে, তাঁর কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের বুঝতে হবে। সতর্কভাবে। সাহিত্যিক মূল্য বাদ দিলে তাঁর দর্শন এখন আমাদের অতো কাজে লাগে না।

বাংলাদেশে অস্তিত্ববাদ কথাটা মাট-সত্তর-আশির দশকে খুব সস্তা শিল্প-সাহিত্য কবিতাওয়ালাদের হাত হয়ে এসেছে, প্রগতিশীল রাজনীতির পথ ধরে আসে নি। বরং প্রগতিশীল ও বিপ্লবী রাজনীতি বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রপাগান্ডা হিসেবেই এসেছে। যখন সংঘবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মানুষ জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, অস্তিত্ববাদ সেই সংঘবদ্ধতার বিপরীতে বিচ্ছিন্ন কর্তাবাদের প্রচার করেছে। অথচ সার্ভে বলছিলেন মানুষের ‘অস্তিত্ব’ মানেই অস্তিত্ববাদ নয়, বরং মানুষ কী করে এবং কি কীভাবে করে—অর্থাৎ সক্রিয় মানুষটির কর্মকাণ্ডের মধ্যেই শুধু মানুষটির সার্বভৌম কর্তাসত্তাটি বিরাজ করেন, ওখানেই তাঁকে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, ওটাই তাঁর অস্তিত্ব। ঐ কামকাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিকে ধরা যায়। চেনা যায়। যেমন, বিরাজমান সত্তা বা সত্তাসমূহের পরিবর্তন বা রূপান্তর তিনি চান কিনা। তিনি কি প্রতিক্রিয়াশীল, নাকি জগত বদলাতে চান? অর্থাৎ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্ব-ভাব চেনা যাবে, সার্ভের এই কথা আমাদের খুব একটা কানে ঢোকে নি। সার্ভের সার্বভৌম কর্তাসত্তার উদযাপন ছিল বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক জায়গা থেকে মানুষের কর্তাসত্তাকে (subjectivity) বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দিকে প্রধাবিত করা। কর্তা যেন তার সার্বভৌম শক্তির মর্যাদা বোঝে। মানুষকে, মানুষের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এগিয়ে নেবার জন্য সার্ভের অঙ্গীকার পরিষ্কার। তাঁর কর্তাসত্তার উদযাপন ছিল সার্বভৌম ব্যক্তির জায়গা থেকে—অর্থাৎ বুর্জোয়াদের জায়গা থেকেই বিপ্লবের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা। একই

সঙ্গে মানুষের কাজ, চর্চা বা তৎপরতাকে প্রধান গণ্য করে তিনি কার্ল মার্কসের ‘থিসিস অন ফায়েরবাখের’ মধ্যেই—মার্কসের পরিমণ্ডলের মধ্যেই থাকতে চেয়েছেন।

কেন এই কর্তাকে সার্বে সবকিছুর আগে বসাতে চেয়েছেন? এর কারণ হচ্ছে ইহলৌকিক জগতের বাইরের সকল পারলৌকিক সম্পর্ক থেকে তিনি মানুষকে আলাদা করতে চাইছিলেন। ঈশ্বরশূন্য ও পরজগত লুপ্ত ইহলোকের দিকে মানুষের কর্তাসত্তার নজর ফেরাতে চেয়েছিলেন তিনি। এই ইহলোকেই মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত নিজে যেন নিতে পারে। নিজেকে বদলাতে পারে, নিজেরাই বদলাতে পারে নিজেদের জগত। সার্বে বলতে চেয়েছেন মানুষ তার নিজের কর্তাসত্তার প্রেরণা ও তাগিদে ইহজগতে কাজ করবে। কোন দৈবী বা ঐশ্বরিক বরাতে নয়। শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ বা বেদবিধান মেনে যেমন নয়, তেমনি তথাকথিত কোন ‘মানবীয় স্বভাব’ (human nature) অনুমান করেও নয়। মানুষের বাইরের বা নিজের কর্তাসত্তার বাইরের কোনো বরাত যেন মানুষের না থাকে, কারো দোহাই যেন মানুষকে দিতে না হয়। ধর্মও যেমন নয়, তথাকথিত বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা মানুষের বিশেষ স্বভাব (essence) বা তার সহজাত ধর্ম সম্পর্কে অনুমান করে মানুষের আচার-আচরণ কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করে দেবার আগাম নেতিকতা দিয়েও নয়। মানুষ কী করবে, কিভাবে করবে ইত্যাদি বিচার ও বাছাই, কিংবা কর্মকাণ্ডের সফলতা ও বিফলতার বিচার আগে থাকতেই অনুমান করে নেওয়া কোনো মানবীয় স্বভাব, ধর্ম বা সত্তা দিয়ে হবে না। সার্বে জোর দিয়ে বলছেন, ‘একমাত্র কাজই ইহলোক’ (পৃ. ৫৫); বলছেন, অস্তিত্ববাদ ‘মানুষকে তার কাজ দিয়েই ব্যাখ্যা করে’ (পৃ. ৬২)। তার মানে সার্ভের অস্তিত্ববাদ মানুষকে বিচার করে ‘তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বারা’ (পৃ. ৭৮)। মানুষের এই সার্বভৌম কর্তাসত্তার স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতার শক্তিতে মানুষ কাজ করে, তার ইহলৌকিকতা একমাত্র এই কর্মপ্রবণ কর্তারূপের মধ্যেই থাকে। একমাত্র এই রূপই মানুষকে মর্যাদা দেয়। সে কারণে সার্বে বলছেন, একমাত্র দেকার্তের ‘আমি আছি’ কথাটাই শেষাবধি অস্তিত্ববাদের আরম্ভবিন্দু (point de depart)। এই বিন্দুতেই তিনি নিজেকে স্থাপন করেছেন—এটাই তাঁর ‘মানবতাবাদের’ একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি।

বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবাদ থেকে সার্ভের আলাদা অবস্থান পরিষ্কার। কিন্তু দেকার্তের ‘আমি ভাবি তাই আমি আছি’—ভাবনা ও অস্তিত্বের এই সমীকরণকে তিনি তাঁর কর্মতৎপর কর্তাসত্তার ‘অস্তিত্ব’ প্রমাণের সম্ভাব্য আরম্ভবিন্দু রেখেছেন, এইখানেই মার্টিন হেইডেগারের প্রবল আপত্তি। Letter on Humanism—এর শুরু এই প্রসঙ্গেরই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে।

ছয়

হেইডেগার সার্ভের এই অবস্থানের উত্তর কীভাবে দিচ্ছেন বা কতোটুকু দিচ্ছেন আমাদের তা বোঝা দরকার। কাজ, কর্মকাণ্ড কিংবা কর্তারূপ সম্পন্ন কর্মতৎপর

মানুষের প্রসঙ্গটিকে হেইডেগার খোলা রেখেছেন, অর্থাৎ চর্চা বা তৎপরতার মধ্য দিয়ে কর্তাসত্তার ইহলৌকিকতা বিষয়ে আরো কথাবার্তা চলতে পারে এবং মনে হয় আজ অবধি প্রশ্নটির দার্শনিক মীমাংসা হয় নি। তার মানে কার্ল মার্কসের ফয়েরবাখ সংক্রান্ত থিসিস নিয়ে কাজ কিছুই হয় নি বলা চলে। আমাদের আরো কথাবার্তা বলতে হবে। এই কালের দর্শন এখনো মার্কসের তোলা প্রশ্নটির মোকাবিলা করে নি।

কিন্তু পাশ্চাত্যে কর্তাসত্তার ধারণা উদ্ভবের নিজস্ব ইতিহাস আছে, যার কেন্দ্রে আছে ‘আমি ভাবি তাই আমি আছি’। পাশ্চাত্যের এই অনতিক্রম্য মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার ফাঁদে সার্ত্রে আটকা পড়ে আছেন বলে তাঁর সমালোচনা করেছেন মার্টিন হেইডেগার। ‘আমি ভাবি তাই আমি আছি’—এখানে দাঁড়িয়ে যে কর্তাকে ভাবা হয়েছে সেই ভাষ্যকে মানুষের মুক্তির ভাষ্য মেনে নেওয়ার ঘোর বিরোধী তিনি। তাঁর চিঠির বড় একটা অংশ এই ক্ষেত্রে সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য দেখানো। যখন সার্ত্রে তাঁর ‘অস্তিত্ববাদ’ মার্টিন হেইডেগার দ্বারা অনুপ্রাণিত দাবি করেন তখন সেটা হেইডেগারের জন্য একটা দায় হয়ে পড়ে। অতএব হেইডেগার এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যাকে তিনি *da sein* বা ‘ঐ-আছে’ বলে গণ্য করেন সেই আছেময়তা দেকার্তের কর্তাবাদের বাইরে থেকে যায়^১। দেকার্তের শুরু ‘আমি’ থেকে, ‘আছে’ থেকে নয়। কারণ আমি নিজেকে ‘আছি’ প্রমাণের আগেই তো আমি নামক ব্যাপারটা ‘আছে’। ফলে ‘আমি ভাবি অতএব আমি আছি’ বললে সেই আছে বা আছেময়তার কিছু ইশারা বা ইঙ্গিত মিলতে পারে হয়তো, কিন্তু দেকার্তীয় আমি দিয়ে ‘আছি’ বা ‘আছে’-কে আর বোঝা যায় না। দেকার্তের আমি আছেময়তার মানে বোঝে না। বুঝতেও পারে না। যে অধিবিদ্যার ফাঁদ থেকে ‘আমি ভাবি তাই আমি আছি’ নামক নিশ্চয়জ্ঞান শুরু হয় সেখান থেকে আছেময়তাকে (*da sein*) বোঝার উপায় নেই। ‘আমি’ কী, এটা বোঝার চেয়ে ‘আছে’ কী বা ‘আছে’ কী করে হয় সেটা বোঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হেইডেগার জার্মান ভাষায় *Existenz* কে বানান করতেন ভিন্ন ভাবে : *Ek-sistenz*। এটা বোঝাবার জন্যে যে দেকার্তে বা সার্ত্রে যেভাবে অস্তিত্বকে বুঝেছেন, তিনি সেভাবে বোঝেন না। তাঁর কাছে অস্তিত্ব হচ্ছে আছেময়তার সত্যের সামনে (*Truth of Being*) দাঁড়িয়ে থাকা (*standing out*)। ‘আমি’ আর ‘আছে’-র সম্পর্ক বিচার না করলে ‘অস্তিত্ব’ কথাটার কোনো অর্থ হয় না। আছে থাকার মধ্য দিয়ে আছেকে, আছেময়তাকে বা ঐহিকতাকে মানুষ যেভাবে রূপ দেয় বা পরিচ্ছন্ন করে, হেইডেগার তাকে বলছেন *clearing of Being* (*Lichtung des Seins*)। সার্ত্রের মানবতাবাদসহ সকল মানবতাবাদই এই আছেময়তার অবমূল্যায়ন করে। এইখানেই হেইডেগারের আপত্তি। হেইডেগার মানুষ ভজনা করেন ঠিকই, কিন্তু ‘আমি’-কে,

^১ *da sein*-এর সবচেয়ে সহজ সরল মানে হতে পারে ‘তথ্যগত’ = তৎ আগত = যে নিজের কাছ থেকে নিজে এসেছে = বুদ্ধ, কিন্তু এই অর্থে আমরা এতো তাড়াহড়ায় পৌছাতে পারব না, অনেক ধীরে, আন্তে আন্তে যেতে হবে।

‘আছে’ থেকে আলাদা করে নয়। আছেময়তার পাহারাদার হয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। Standing Out। পরমের সত্য বা তাঁর Truth of Being-এর পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। এই মানুষকে মানবতাবাদ চেনে না, চিনতে পারে না। ধরতে পারে না, ফাঁদে পড়ে থাকে—‘আমিই সত্য’ নামক অধিবিদ্যার গহ্বরে। কথাগুলো সংক্ষেপে আপাতত বলা হোল।

সাত

Truth of Being = পরমের সত্য। বাংলার ভাবান্দোলনের ‘পরম’ কথাটি নোক্তা দিয়ে রাখা যাক। হেইডেগার Truth of Being-কে যেভাবে বোঝাতে চেয়েছেন বাংলার ভাবান্দোলন একই ইশারা দেয় কিনা সেটা অন্যত্র বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। কিন্তু দুয়ের সাযুজ্য অসামান্য। আমরা হেইডেগারের ‘লেটার অন হিউমেনিজম’ নিয়ে বাংলাদেশে কথা তুলছি। কিছু ধারণা যেমন ‘সত্য’, ‘পরম’, ‘পরমের সত্য’—এগুলো এখন কিছু ধনিময় ব্যঞ্জনার বেশি অর্থোৎপাদন করবে না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু দেখা যাক শেষ অবধি কী দাঁড়ায়। আরো ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠার জন্য বাংলার ভাবান্দোলনের চরম উৎকর্ষ ফকির লালন শাহের একটি গানের প্রসঙ্গ টানছি। গানটি হচ্ছে :

আপনারে আপনি চিনি নে
দিন দোনের পর যার নাম অধর
তারে চিনবো কেমনে।।

কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারে কি হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্ব পায় শতধন
সহজ সাধক জনে।

দিব্যজ্ঞানী যেজন হোল
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
সিরাজ সাঁই কয় লালন র'লো
জন্মঅঙ্ক মন গুনে।

ফকির লালন বলছেন, আমি তো আমাকেই চিনি না তাহলে এই ‘দিন দোনে’ বা দীনদুনিয়ায় যিনি আছেন, ইহলৌকিকভাবে যিনি অধর হয়ে বিরাজ করেন, খেলা করেন, লীলা করেন—তাকে কীভাবে চিনব? ‘আমি’ কী? বা ‘আত্মা’ কী তা কী করে নিরূপণ করব? যাকে আমরা ‘আমি’ বলি তার কর্তারূপেরই যদি সন্ধান করা না হয়, তাহলে ‘আমি’ বা আত্মার নিরূপণ হবে কী ভাবে? কীভাবে জানব যে ‘আমি’-র আদৌ ‘আত্মা’ আছে নাকি নাই। অর্থাৎ ‘আমি’-র কর্তার রূপের অন্বেষণ না নিলে তার আত্মারূপ নিরূপণ করা যাবে না। যতোক্ষণ না ‘আমি’-র কর্তারূপ কেমন তা আমরা

জানছি বা দেখাতে পারছি, ততক্ষণ ‘আমি’ বলে কাকে চিনব? কী চিনব, কী দেখব? অর্থাৎ আমি বা আত্মা কর্তারূপে কী হয় বা কী হয়েছে সেই ‘আমি’-র কর্মতৎপার রূপ দেখেই ‘আমি’-কে আমরা চিনবো। একজন ব্যক্তি বা মানুষকে আমরা তো তার কাজ দেখেই, কর্মকাণ্ড বিচার করেই চিনবো, জানবো, বুঝবো। তার কাজ বা কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে রূপ সেটাই তার কর্তারূপ (Subjectivity)। ‘আমি’-র কর্তারূপের বাইরে ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বলে কোন সত্তা আছে লালন তা মানতেন না।

দেখা যাচ্ছে, বাংলার ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের সূচনা ঘটে গেছে এখানে। কর্মতৎপার আমির বাইরে আত্মার অবিনশ্বর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ফকির লালন শাহের বেদ ও শাস্ত্রবিরোধী অবস্থানের দিক থেকে নতুন কিছু নয়। কিন্তু কর্তারূপের অন্ত্রেষণ ছাড়া যে আত্মার নিরূপণ হয় না, এটা বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে নতুন কথা। লালনের আগের সকল ‘আমি’ বা সকল সাধক, মহাজন, গুরুগোস্বামীরা আত্মারূপেই ‘আমি’-কে সন্ধান করেছে, কর্তারূপে নয়। ‘আমি’ কী এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা খুঁজেছেন ‘আমি’-কে বস্তুর মতো অস্তিত্বমান সত্তা জ্ঞান করে, অর্থাৎ আমিকে ‘আত্মা’ জ্ঞান করে। আমির বস্তুময় রূপই হচ্ছে আত্মা। কিম্বা তাঁরা বলেছেন ‘আমি’-ই পরম। আমি এবং পরমাত্মা একই কথা। লালন অন্য কথা বলছেন।

‘আমি’ বা আত্মা, আর শরীরকে ভিন্ন ভাবে ভাবার কারণে প্রশ্ন উঠেছে আত্মা নামক বস্তু শরীরের সঙ্গে যুক্ত নাকি যুক্ত নয়? শরীর নশ্বর, সেটা পরিষ্কার। কিন্তু আত্মা কি অমর নাকি অমর নয়, মানুষ মারা গেলে আত্মা শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে কি না, ইত্যাদি তর্কবিতর্ক হয়েছে। এই ভাবে আত্মা সংক্রান্ত কথাবার্তা বিচারবিশ্লেষণ ধর্মকথায়, তত্ত্বকথায়, বেদে, বিধানে, পুরাণে, লোকচিন্তায়, মানুষের প্রথাগত ধ্যান ধারণায় ভুরি ভুরি আছে। জীব-পরম নিয়ে বিস্তারিত পালা গান, কবি গান, কবির লড়াই হয়েছে। এইসব লালনের আগেও ছিল, লালনের পরেও আছে। যেটা আমাদের জন্য অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হোল আত্মাকে এইভাবে নিরূপণের অধিবিদ্যা ফকির লালন শাহ নাকচ করে দিয়েছেন। কার্ল মার্কস তত্ত্ববাগীশতাকে যেভাবে নাকচ করে দিয়েছেন, সেই ভাবেই। ‘আমি’-র আত্মারূপ নিরূপণের তত্ত্ববাগীশতা থেকে প্রশ্ন করে কর্তারূপের অন্ত্রেষণের ওপরই তিনি জোর দিচ্ছেন, কারণ আমি-কে কর্তারূপেই নিরূপণ সম্ভব, আত্মারূপে নয়। সার্বে যেভাবে কর্তাকে বুঝেছেন ফকির লালন যেন সেই কর্তাকেই অন্ত্রেষণ করছেন। একজন মানুষকে চেনা যাবে তার কাজ দিয়ে। কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ মূর্ত হয়ে ওঠে। কাজের বাইরে ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বলে কিছু নাই। যদি না থাকে তাহলে আত্মার অমরতা বা ইত্যাদি তর্কও লালনের কাছে ফালতু তর্ক।

কিন্তু এই মিলটুকু থাকার পরেও সার্ভের সঙ্গে ফকির লালন শাহের পার্থক্য আকাশপাতাল। সেটা সহজে আমরা বুঝব যদি আমরা খেয়াল করি যে গানের শুরু হচ্ছে, অধরকে কি করে ধরা যায়, সেই ধরবার প্রশ্ন তুলে। জাঁ পল সার্ভে পাশ্চাত্যের

যে-অধিবিদ্যার ফাঁদে আটকা থেকে কর্তারূপকে একটা স্বাধীন ও সর্বভৌম অস্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, লালন সেই অধিবিদ্যার শরিক নন। ওর বিরুদ্ধে হেইডেগার আপত্তি তুলেছেন, লালনও আপত্তি তুলেন। কারণ যে কর্তারূপের অন্বেষণের কথা তিনি বলছেন, সেই রূপকে স্বাধীন ও সর্বভৌম কোনো একক সত্তা হিসাবে লালন কখনই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন না। বাংলার ভাবান্দোলনের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলছিলেন বলে সার্কে যে ফাঁদে আটকা পড়েছেন, লালন সেই ফাটলে পা দেন নি। এই ক্ষেত্রে সার্কে ও লালনের পার্থক্যসূচক ধারণাটি হচ্ছে ‘অধর’—যাকে ধরা যায় না। অধরকে ধরবার আকুতি বাংলার ভাবান্দোলনের গোড়ার জিনিস, আমদানি করা জিনিস নয়।

লালনের প্রশ্ন হচ্ছে, অধর ধরি কী করে? যাকে ধরা যায় না তাকে ধরবো কী করে? মার্টিন হেইডেগারের প্রশ্নও একই দিকে ধাবিত, যদিও পার্থক্য আছে। হেইডেগারের প্রশ্ন হচ্ছে ইংরেজি ছোট হাতে ‘বি’ দিয়ে লেখা ‘being’ আর বড়ো হাতে লেখা ‘Being’-এর মধ্যে সম্পর্ক কী? কোনো জিনিসের ‘সত্তা’ (being) আর তার আছে হয়ে থাকার মধ্যে কী সম্পর্ক? এই ‘আছে হয়ে থাকা’ ব্যাপারটা যদি আমরা না বুঝি এবং সেই আছে হয়ে থাকার সঙ্গে বিদ্যমান সত্তার সম্পর্ক আমাদের কাছে যদি ধরা না দেয়, যদি ধরা পড়বার রহস্য আমরা বিচার না করি, তাহলে হবে না। সার্কে ঠিক এই ভুলটাই করেছেন।

হেইডেগারের বড়ো রোমান হরফে ‘B’ দিয়ে লেখা ‘Being’ বা আছে হয়ে থাকাকে আমরা আপাতত ‘পরম’ বলে বুঝব। এই আছে হয়ে থাকা বা কোনো অস্তিত্বমান সত্তার অস্তিত্বমান হয়ে থাকার শর্ত বা পরম নিজে থেকে dis-close করে বা ধরা দেয় মানুষের মধ্যেই, কী করে সেই ধরাধরি চলে তারই দার্শনিক হেইডেগার। অথচ এই প্রশ্নই বাংলার ভাবান্দোলনকে যুগে যুগে কাতর করে রেখেছে। লালন বলছেন, এ যাবতকাল যারাই অধরকে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, বেদ, শাস্ত্র বা যে কোনো চিহ্ন ব্যবস্থার মধ্যে চিহ্নিত করতে গিয়েছেন বা দাগ দিয়ে সীমানা টানতে চেষ্টা করেছেন, তারা সকলেই ভুল পথে গিয়েছেন। কাজে কাজেই ব্যর্থ হয়েছে সেই সব চেষ্টা। কারণ তাঁরা সকলেই সত্তার বিদ্যমানতার শর্ত এই আছে-হয়ে-থাকা ব্যাপারটাকে বিদ্যমান বস্তুর মতোই বিবেচনা করেছেন। অথচ অধর সব সময়ই অধর। আমি আছি, জানি। কিন্তু আমার এই আছেময়তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি আমাকে দেখছি আছি কিন্তু ‘আছে’ বা ‘আছি’ কথাটার মানে কী? ‘আছি’-কে যখন বুঝতে চেষ্টা করি তখন তো শুধু আমাকেই দেখি; এই আছেময়তা যেন ‘আমি’-র আয়নার মধ্যে বা আরশির ওপারে আছে হয়ে থাকার মতো। অধর। ‘আমার ঘরের পাশে আরশিনগর, সেথায় এক পড়শি বসত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে’। অথচ, ‘সে আর লালন এক সাথে রয় তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে’। ‘আমি’ এবং ‘আছি’ এক সঙ্গেই থাকে, কিন্তু ‘আমি’ কখনই এই আছেময়তার পর্দা ভেদ করতে পারে না।

এটা রহস্য নয়, বা মিস্টিকাল বা মরমী ব্যাপারস্যাপার নয়। যে অর্থে আয়নায় নিজের চেহারা দেখার মধ্যে মরমী কিছু নাই। অধর অধরই থাকে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে। মানুষ আয়নায় যখন নিজেকে দেখে তখন ‘অধর’-কে দেখে ঠিকই, কিন্তু সে ‘অধর’ আয়নার ওপাশে, আরশিনগরে তার বাড়ি। মানুষের সঙ্গেই সে বাস করে, কিন্তু মাঝখানে ‘লক্ষ যোজন ফাঁক’। ‘অধর’ ছাড়া ‘আমি’ নাই। ‘আমি’ বা মানুষ সে অধরকে ধরবার তাগিদে যে-কর্তারূপের বিকাশ ঘটিয়ে কর্মতৎপর ‘আমি’-র জানান দিয়ে যায় তার মধ্যেই অধর নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। এখনকার ‘আছে’ ভবিষ্যতের ‘আছে’ হয়। কারণ আছেময়তা স্থিরনিদিষ্ট কোন ব্যাপার নয়। খেয়াল করতে হবে আমরা দেশ, দৈশিকতা, বা কোনো জায়গা বা স্থান অর্থে ‘আছে’ বা ‘আছি’ কথাটা ব্যবহার করছি না। কিন্তু আছেময়তা এমন যে একমাত্র মানুষের মধ্য দিয়েই আছেময়তা নিজেকে ধরা দিতে পারে, অতএব মানুষেরই ইতিহাস হয়। হেইডেগার যাকে বলেছেন Clearing of Being। লালন তাকে কর্তারূপের অন্ত্রেষণ হিশাবে দেখেছেন। অধর যেখানে ধরা পড়ে, সেই ধরবার স্থানকালপাত্র—অর্থাৎ কর্মতৎপর ‘আমি’ বা মানুষকে অধরের সঙ্গে যুক্ত ভেবেই অন্ত্রেষণ করতে হবে। সার্ত্রের মতো বিযুক্ত সর্বময় ‘আমি’-কে একাকী ও নিঃসঙ্গ করে দিয়ে নয়।

পরিষ্কার যে ফকির লালন শাহ আমি-মার্কী মানবতাবাদী ছিলেন না, সার্ত্রের সঙ্গে এখানে তাঁর ঘোর পার্থক্য। হেইডেগার যে কারণে এই ধরনের মানবতাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, লালনও একই কারণে তথাকথিত ‘মানবতাবাদ’ বিরোধী। সার্ত্রের সঙ্গে এখানে ফকির লালন শাহের বিশাল ফারাক। মানুষের কর্তারূপের ভালমন্দ সার্ত্রে যেভাবে নিরূপণ করতেন, লালনের বিচার সেই দিকেও যাবে না। সেই সকল বিষয় নিয়ে আমরা এখানে কথা তুলবো না। এখন এতোটুকু জানাই যথেষ্ট যে লালনের মানুষ, অধরের সঙ্গে যুক্ত, বিযুক্ত নয়। সার্বভৌম কর্তাসত্তা নামক কোনো মানুষের ধারণা ফকির লালন শাহে নাই। যুগলের সম্পর্ক বিচারের মধ্যেই ধরা ও অধরার (কিংবা জীব ও পরম, মানুষ ও আল্লাহ ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতি) ভেদ বোঝা সম্ভব, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

দেখা যাচ্ছে ফকির লালন মার্টিন হেইডেগারের বেশ কাছের মানুষ। হেইডেগার ‘আমি’ এবং ‘আছে’-র মধ্যে পার্থক্য টানতেন। মানুষ ‘আমি’ হবার আগেই ‘আছে’। ‘আমি’ ও ‘আছে’ উভয়ের সম্পর্ক বিচারের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষ আছেময়তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা আমাদের বুঝিয়ে বলে মার্টিন হেইডেগার এই কালের দার্শনিকদের সর্দার হয়েছেন। তাঁকে ফকির লালন শাহের জায়গা থেকে বুঝতে পারলে আমাদের সুবিধা। হেইডেগার শুধু বুঝিয়ে ক্ষান্ত না, বুঝিয়ে বলার মধ্য দিয়ে পাম্চাত্য অধিবিদ্যার যুগ যে শেষ হয়ে গিয়েছে সেই ঘোষণাও দিয়েছেন। সেই ঘোষণা আমাদের কানে আসতে শুরু করেছে। ফকির লালন শাহও কি কর্তারূপের অন্ত্রেষণের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজে নিরূপণ করবার তরিকা বাংলায়ে তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা ও

অধিবিদ্যার মণ্ডত ঘোষণা করছেন না? যদি দুটো ডাক আমরা একসঙ্গে শুনি তাহলে আমাদের জন্য সেটা সুবর্ণ সুযোগের মতো কাজ করবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভেদ রেখা কমছে কি? হয়তো। অন্তত কথাবার্তা আদান-প্রদানের সুযোগ বেড়েছে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি আমরা বলতে শিখি। কিন্তু ভেদ রেখা কমছে কিনা সে উত্তর দেবার সময় এখন আসে নি। আমরা কথা শুরু করেছি মাত্র। হেইডেগারের *লেটার অন হিউমিনিজম* নিয়েই না হয় আরো কথা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

আট

হেইডগার প্রশ্ন তুলেছেন, কাজ, চর্চা বা তৎপরতার (action) মানে কী, সেই বিষয় নিয়ে কি দর্শন খুব একটা ভেবেছে? মোটেও না। আসলেই। কাজ, চর্চা বা তৎপরতাকে আমরা কীভাবে দেখি? যা করলে কোনো একটা ফল আমরা পাই, সেটাই হলো চর্চা বা তৎপরতা। কাজ মানে যার কারণে কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। কাজ, চর্চা বা তৎপরতার ফল কীভাবে বিচার করি আমরা? করি কাজটা কতোটা আমাদের কাজে লাগল সেই ব্যবহারিক জায়গা থেকে। কিন্তু কাজ, চর্চা বা তৎপরতার মানে হচ্ছে কোনো কিছু সম্পন্ন করা। কিন্তু সম্পন্ন করার মানে কী? তার মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে তার পূর্ণ রূপে বিকশিত করে তোলা। তার সম্ভাব্য পরিপূর্ণ করে তোলা, উৎপন্ন করা। তাহলে আগে থাকতেই যে আছে তাকেই আমরা উৎপন্ন করি, তাকেই বিকশিত করি, পরিপূর্ণতা দান করি। আগে থাকতে কে থাকে? আগে থাকতেই থাকে ‘আছে’ বা আছেময়তা, যাকে হেইডেগার বলছেন Being। আমরা বাংলার ভাবান্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে আপাতত, কিন্তু অতিশয় সাবধানে বলছি ‘পরম’। সাবধানে কেন? যেন একে ইংরেজি absolute কথাটির অনুবাদ হিশাবে না ভেবে এর আদ্যর্থ মনে রেখে ব্যবহার করি। আসলে লেখা উচিত ‘পর-ম’। যে ‘আমি’ নই, আমার আগেই আছে, অতএব এই ‘আছে’ আমার ‘পর’। কিন্তু ‘পর’ অর্থে পর নয়, বরং ‘অ-পর’। এই ‘অ-পর’ আগে থাকতেই আছে, থাকে, থাকবেই, কিন্তু এই ‘অ-পর-ই ‘পর-ম’।

হেইডেগার বলছেন, যা আছে তা হচ্ছে Being বা পর-ম।। Thinking accomplishes the relation of Being to the essence of man (প-২১৭)। চিন্তা মানুষের সঙ্গে এই পর-মের সম্পর্কই সম্পন্ন করে। কিন্তু চিন্তা এই সম্পর্ক তৈরি করে না, বা চিন্তা এই সম্পর্ক রচনার কারণও নয়। পর-মের সঙ্গে চিন্তা এই সম্পর্কে যুক্ত হবার ভাব একটাই, পর-ম যেন চিন্তাকে কিছু একটা দিচ্ছে, সেই রকমই ভাব চিন্তার সঙ্গে পর-মের। এই দেওয়া-নেওয়া ধরাধরির ভাবটা ঘটে কীভাবে? হেইডেগার বলছেন, ‘চিন্তার মধ্যে পর-ম ভাষা হয়ে ধরা দেয়। ভাষা হচ্ছে পর-মের ঘরবাড়ি, সেই ঘরে মানুষ বাস করে। যারা চিন্তা করে আর যারা কথা বানায় তারা এই ঘরের

পাহারাদার। এই পাহারাদারি পর-মের এই প্রকাশকে ততোটুকুই সম্পন্ন করতে পারে, যতোটুকু ভাষায় তার প্রকাশ ঘটাতে তারা সক্ষম হয়, এবং তাদের কথাবার্তার মধ্যে ভাষায় তা ধারণ করে রাখতে পারে।'

Thinking accomplishes the relation of Being to the essence of Man. It does not make or cause the relation. Thinking brings this relation to Being solely as somethin handed over to it `rom Being. Such offering consists in the `act that in thinking Being comes to language. Language is the house of Being. In its home man dwells. Those who think and those who create with words are the guardian of this home. Then guardianship accomplishes the manifestation of Being insofar as they bring the manifestation to language and maintain it in language through their speech.

তাহলে চিন্তার সঙ্গে কাজ, চর্চা বা তৎপরতার সম্পর্ক কোথায়? চিন্তার সঙ্গে পর-মের সম্পর্ক ঘটছে ভাষায়, যে-সম্পর্ক চিন্তার তৈরি না, কিন্তু সেই সম্পর্ককে চিন্তা সম্পন্ন করে তোলে এমনভাবে যে, ভাষায় পর-ম তাকে কিছু একটা দিচ্ছে। ভাষাই হচ্ছে পর-মের ঘরবাড়ি এবং কবি ও দার্শনিকরা এই বাড়ির পাহারাদার। তাহলে চিন্তা প্রয়োগ করে আমরা দৃশ্যমান কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটাই বা চিন্তার ব্যবহারে কোনো ফল লাভ করি, চিন্তা সেই অর্থে চিন্তা চর্চা, তৎপরতা বা কাজ হয়ে ওঠেনা। চিন্তার চিন্তা করাই হচ্ছে তার কাজ, চর্চা বা তৎপরতা। (Thinking acts insofar it thinks)।

তাহলে চিন্তার কাজ, চর্চা বা তৎপরতা বলতে হেইডেগার যা বোঝাচ্ছেন তা প্রথাগত অর্থে আমরা চিন্তার সঙ্গে কাজের যে সম্পর্ক রাখবার ইঙ্গিত করি সেই সম্পর্ক নয়। চিন্তার কাজ মানে পর-মের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে পর-ম চিন্তাকে যা দিতে চাইছে তা ভাষায় গ্রহণ করা, সম্পন্ন করা, প্রকাশিত করা। নতুন কথা। সেই কারণেই হেইডেগারের কাছে কবি, ভাবুক বা দার্শনিকদের মূল্য অপরিসীম।

এই কাজটা সহজ। কিন্তু সরল নয়। বাংলায় 'সহজ' কথাটা যে অর্থে এখন আমরা ব্যবহার করি তাকে খানিক পাশে রেখে যদি বলি 'সহজ' মানে সহ-জ বা একই সম্পর্কে থেকে সম্পন্ন হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, জন্ম লাভ করা—তাহলে বাংলার ভাবান্দোলনের সহজিয়া ধারায় পর-মের সঙ্গে চিন্তার অর্থাৎ মানুষের 'সহজ' সম্পর্কের ধারণার কিনারে এসে পড়ি। সেই ধারারই ধারাবাহিকতায় ফকির লালন শাহকে বোঝাও আমাদের জন্য সহজ হয়। কাজে কাজেই মার্টিন হেইডেগারকেও বাংলার ভাবান্দোলনের ভেতর থেকে দেখার আমোদ ঘটে।

চিন্তার সঙ্গে পর-মের সম্পর্ক 'সহজ', এই কারণে যে চিন্তা এই সম্পর্কের কারণ নয়, চিন্তা এই সম্পর্কটা ঘটায় না, সম্পর্কটা হয়েই আছে, চিন্তা শুধু সম্পর্কটাকে

সম্পন্ন করে তোলে, দেখায়, দেখিয়ে দেয়। ভাষার মধ্যে, ভাষায়। যা কিছু ঘটতে থাকে তার শর্ত হচ্ছে পর-ম। আর, ইহলৌকিকতার দিকে (directed towards beings) পরমে-র কাজ ধাবিত। চিন্তা পর-মের বিপরীতে নিজেকে পর-মের হাতে সঁপে দেয়, পর-ম যখন চিন্তাকে দাবি করে চিন্তা তা ঘটতে দেয়, যেন পর-মের সত্য চিন্তা বলে, বলতে পারে, প্রকাশ করতে পারে। চিন্তা তাহলে পরমে-র দ্বারা পর-মের জন্যই তৎপরতা (l'engagement par l'Etre pour l'Etre)। ফরাসি ভাষায় একই সঙ্গে par (by বা দ্বারা) এবং pour (for বা জন্য) বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন হেইডেগার। চিন্তা হচ্ছে পর-মেরই কাজ। কিন্তু চিন্তা পরমে-র কাজ বলে আমরা যখন 'র' যুক্ত করে চিন্তাকে পরমের অধীন করে ফেলি তখন খেয়াল করতে হবে পর-মের এই কাজের মধ্যে (engagement) আলাদা ভাবে বিষয় (Subject) আর বিষয়ী (Object) নাই। 'বিষয়' আর 'বিষয়ী'-র ধারণা অধিবিদ্যা থেকে আসা। এই সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য তারা খুবই অনুযোগী ধারণা। যে ধারণাগুলো পাশ্চাত্যের লজিক এবং ব্যাকরণ (Occidental 'logic' and 'grammar') বহু আগে থাকতেই ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যার ফলে পর-মের এই সহজাবস্থা, এই সহজিয়া ভাবে—অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ীর সম্পর্কে প্রবেশ না করে সম্পর্কিত থাকার তৎপরতা এখন বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে গিয়েছে। এখন টের পাওয়া যাচ্ছে পাশ্চাত্যের অধিবিদ্যার এই দাপটে পর-মের প্রকাশ কতোটা ব্যাহত হয়েছে পাশ্চাত্য চিন্তায় কী আর ধরা পড়ছে না, তা এখন কেবল খানিক বোঝা যাচ্ছে। অধিবিদ্যার এই দাপট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাকরণ থেকে আরও সহজ সম্পর্কে বেরিয়ে এসে ভাষাকে আরো মৌলিক (original) বা বাংলার ভাবান্বেষণের ভাষায় বলা যায় আরো 'সহজ' সম্পর্ক রচনার শক্তি অর্জন করতে হবে। 'The liberation of language from grammar into a more original essential framework is reserved for thought and poetic creation' (পৃ.-২১৮)। ভাবুকতা ও কাব্যের জন্য সেই সহজ সম্পর্ক রচনার জায়গাটা হেইডেগার সেই কারণেই বরাদ্দ করে রেখেছেন।

সেই সহজ সম্পর্ক ভুলে যাবার কারণে আমরা মনে করি চিন্তা মানে হচ্ছে অস্তিত্বমান বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক। কিন্তু আমরা যাই ভাবি না কেন চিন্তা তো আসলে পরমের সত্য (truth of Being) ধরবার সহজাবস্থা। তাহলে চিন্তা যেনভাবে যতোটুকু ধরেছে, যতোটুকু ধরতে পেরেছে তারই ইতিহাস চলছে আজ অবধি। পাশ্চাত্যের ইতিহাস তাহলে এই সম্পর্কেরই ইতিহাস।

নয়

বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তা করবার এই ধরন বা পর-মের সঙ্গে চিন্তার এই সহজ সম্পর্কের অভিজ্ঞতা (essence of thinking purely) কী করে চিন্তা এখন অর্জন করবে?

অর্জন করবার পর তাকে সামনে কী করে এগিয়ে নিয়ে যাবে? হেইডেগার বলছেন, তার জন্য দরকার চিন্তা সম্পর্কে আমাদের মনে যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (technical interpretation of thinking) বদ্ধমূল হয়ে আছে সেই ধারণা থেকে মুক্তি। এই ব্যাখ্যার গোড়া প্লাটো ও এরিস্টটলে। তাঁরা চিন্তাকে ভেবেছেন কোনো একটা কাজ বা কিছু একটা তৈয়ার করবার আগে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া। তাঁদের ভাষায় techne হিসাবে। এই ভাবনার মধ্যে চিন্তা যা করবে, যা কিছু তৈয়ার করবে সেই কাজ, চর্চা বা তৎপরতার অধীনস্থ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যখন বলি : চিন্তা নিজেকে মূর্ত করে তুলবে কাজে, উৎপাদনে, তৎপরতায় তখন আমরা চিন্তার এই কারিগরি বা technical ব্যাখ্যার মধ্যেই খাবি খাই। ধরে নিই যে কাজ, তৈয়ার বা তৎপরতা চিন্তা থেকে আলাদা একটা ব্যাপার এবং চিন্তা সেই সেই তৎপরতা (praxis) বা তৈয়ারির (poesis) অধীন একটা মুহূর্ত মাত্র। যেহেতু চিন্তাকে আগে থাকতেই praxis বা poesis থেকে আলাদা করে ফেলা। চিন্তা আর চর্চাকে আলাদা আলাদা করে ভাববার যান্ত্রিক ফাঁপরে আমরা পড়ে আছি। সেই কারণে চিন্তাকে আমরা মৌলিক বা আসল ঘটনা বলে আর শনাক্ত করতে পারি না। চিন্তাকে আমরা praxis বা poesis-এর বিপরীতে বলি theoria। কোনো কিছু জানা, বোঝা ইত্যাদিকে আমরা তখন বলি theoretical জ্ঞান। তাত্ত্বিক জ্ঞান। তত্ত্ব। চর্চা, তৎপরতা, কাজ ইত্যাদি তখন থিওরির বাইরের ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই বিভাজনকেই হেইডেগার বলছেন চিন্তা সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা, বা technical interpretation of thinking। এর উৎপত্তি প্লাটো আর এরিস্টটলের হাতে—পাশ্চাত্য চিন্তায় যার আধিপত্য ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দশ

বাংলার ভাবান্দোলনের কথা মনে রেখেই আমরা মার্কস, হেইডেগার বা সার্ত্তের কথা তুলছি। ওপরের আলোচনা থেকেই এই ধারণাও আশা করি আমরা দিতে পেরেছি বাংলার ভাবান্দোলনকে আমরা নিছকই ‘ভাববাদ’ বা ‘মরমীবাদ’ মনে করি না। যেমন ফকির লালন শাহ আর যাই হোক ‘মরমীবাদী’ ছিলেন না। এই ক্ষেত্রে এতো বেশি ভুয়া কথা ও আবর্জনা তৈরি হয়েছে যে তার জঞ্জাল সাফ করতে অনেক দিন লেগে যাবে।

ওপরে হেইডেগারের চিন্তাকে বাংলা ভাষায় ধরতে গিয়ে আমরা দেখছি যে ভাষা নিয়ে আমাদের মুশকিল হচ্ছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। এই মুশকিল অবধারিত এবং আসলে অনিবার্য। এই মুশকিল কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই বাংলা ভাষাকে আমরা ভাব বহনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারব। সেটা নিশ্চয়ই একজনের কাজ হবে না। কিন্তু ভাব বা চিন্তা দিয়ে কী করব আমরা? চিন্তা চর্চা না করে বা চর্চায় না নিয়ে গিয়ে নিছক দর্শনচর্চার তাগিদ থেকে আমরা পাশ্চাত্য কিম্বা প্রাচ্যের দর্শনে আগ্রহী হবো কি? কিন্তু চিন্তার চর্চা মানে কী? চিন্তার চর্চা মানে, হেইডেগারের কাছে, চিন্তা করা। চিন্তা করতে শেখা। চিন্তা তার সহজ সরল বিশুদ্ধ রূপে তার ইহলৌকিক ‘আছেময়তার’

মধ্যে যেভাবে প্রথম চিন্তা করে—প্রথম প্রত্যয়ের সেই ফর্শা সুবেহসাদেকের মধ্যে চিন্তাকে জাগ্রত করবার তাগিদ আছে হেইডেগারের। এই ভাবে কবি ও দার্শনিকরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত। হেইগোর বলছেন, আমরা যেন কবি বা ভাবুক হই। কেন সেটা হতে হবে? এই কারণে যে একেকটা জ্ঞানের পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তাদের মূর্তায়ন ঘটে, তারা দ্রষ্টব্য হয়, ইত্যাদি। সেই জ্ঞানের স্তরবিন্যাস (hierarchy) আছে, বিধিবিধান আছে। চিন্তার কাজ হচ্ছে কীভাবে সেইসব গড়ে উঠল তার পথগুলো আবিষ্কার করা এবং চিন্তা যে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড়ানো সেই ভঙ্গিটা চেনা ও বোঝা। চিন্তার এই সত্য অনুসন্ধানের ফলে বিদ্যমান বিশ্বাস বা সত্য বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে—নতুন ইচ্ছা, সংকল্প, স্বপ্ন ও সত্য তৈরি হয়^৭।

হেইডেগার দাবি করছেন, চিন্তা শুরুতে যে চিন্তা করেছে সেই চিন্তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সেই চিন্তার ফলাফলের তাৎপর্য আমরা এখন আর বুঝি না, ধরতে পারি না। 'Being' কথাটাই ধরা যাক। এর মানে কী? আমরা বাংলায় 'আছে', 'আছি' ইত্যাদি বলে কাজ চালিয়ে দিচ্ছি। সুবিধা করতে না পেরে হেইডেগারের Being-কে পরম বা পর-ম বলেও চালাচ্ছি। আসলে ব্যাপারটা কী?

আমরা চিন্তাকে চর্চায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলি কেন? চিন্তা বুঝি 'তত্ত্ব' হয়ে 'চর্চা' থেকে আগেই আলাদা হয়ে আছে। কিন্তু হেইডেগারের কাছে আমরা শিখছি যে চিন্তা আর চর্চাকে এই ভাবে ভাগ করার যান্ত্রিক ধারণার অধিপত্য থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। কিন্তু এই মুক্তির দরকার কী? যখনই আমরা মুক্ত হবো তখনই টের পাবো চিন্তা যে ভাবে এখন আছে, পরমের সঙ্গে তার এখনকার যে-সম্পর্ক, সেটাই আমাদের একমাত্র ঐতিহাসিক নিয়তি নয়। ভাব, দর্শন বা চিন্তার কাজ তাহলে নতুন ঐতিহাসিক সম্ভাবনা তৈরি করা।

চিন্তার কাজ হচ্ছে প্রথাগত বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে সাধারণত যা ভাবি তার বাইরে অসাধারণের অনুসন্ধান। অসাধারণের অনুসন্ধান মানে অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করতে শেখা। অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করা মানে কী? প্রশ্নটাকেই অসাধারণ করে তোলা। এমন নয় যে প্রশ্ন কোথাও আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে, আর আমরা হঠাৎ তা পেয়ে গেলাম, প্রশ্নের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। এই প্রশ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশও নয়। এমন কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে আমরা নাই যে প্রশ্নটা আমাদের করতেই হবে, কিম্বা প্রশ্ন অনিবার্য ভাবেই উঠবে। না। মোটেও না। প্রশ্ন করাটা একেবারেই কোনো ধারাবাহিকতা বা শৃঙ্খলার মধ্যে নয়। আওট অফ অর্ডার—

⁷ 'What philosophy essentially can and must be this : a thinking that breaks the paths and opens the perspectives of the knowledge that sets the norms and hierarchies, of the knowledge in which and by which a people fulfills itself historically and culturally, the knowledge that kindles and necessitates all inquiries and thereby threatens all values. (An Introduction to Metaphysics, p.10)

নিয়মের বাইরে। প্রশ্ন করার ব্যাপারটা একেবারেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। ‘ওর একটাই মাত্র ভিত্তি—স্বাধীন ইচ্ছার রহস্যের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম, যাকে আমরা বলেছি লাফ দিয়ে ওঠা’ (An Introduction to Metaphysics, p.12)।

বাংলার ভাবান্দোলন এখানে একমত হবে। হেইডেগারের সঙ্গে এখানে মিলও রীতিমতো বিস্ময়কর, কারণ বাংলার ভাবান্দোলনে কাব্য আর দর্শনের মধ্যে সীমারেখা নাই বললেই চলে। ফকির লালন শাহ তো বটেই যে কোনো মহাজনের গানের কথাই এখানে নজির হিশাবে পেশ করা যেতে পারে।

তাহলে চিন্তাকে লাফ দিতে হলে তার গোড়ার দিকে তাকানো শিখতে হবে। যেমন Being কথাটার আদি মানে কী ছিল? এখন আমরা কী ভাবে বা কোন অর্থে তাকে ব্যবহার করি? নাকি এর কোনো অর্থই নাই। একটা ফাঁপা অর্থহীন শব্দ কেবল।

এগার

Being-এর কতো রকম মানে হতে পারে সেই বিষয়ে এরিস্টটল থেকে শুরু করে মার্টিন হেইডেগার অবধি বিপুল লেখালিখি আছে। হেইডেগারের সারা জীবনের কাজ তো এই Being কথাটার অর্থ ধরবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত। আমরা বাংলায় Being কথাটার অনুবাদ করি ‘সত্তা’। বলাবাহুল্য, এটা চলে না। অনুবাদ করে আর পরিভাষা বানিয়ে তো আর দর্শনচর্চা হয় না। আমরা আমাদের ভাষার মধ্যে ভাব কীভাবে হাজির আছে সেই প্রাথমিক কাজ না করে পরিভাষা—যা প্রায় অবধারিত ভাবেই অবোধ্য—ব্যবহার করে ভেবেছি বাংলায় দর্শন চর্চা সম্ভব। না, হয় না, অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে হেইডেগার ঠিকই বলতেন এবং বারবারই বলেছেন যে ভাষার মধ্যে—দৈনন্দিনের ভাষার মধ্যে ভাব পুরোদস্তুর হাজির থাকে, মানুষকে কষ্ট করে দার্শনিক হওয়ার দরকার নাই। হেগেলের কথা ছিল আরো মজার। বলেছেন: ভাত হজম করবার জন্য কাউকে তো এনাটমি আর ফিজিওলজি পড়ে ভাত খেতে দেখি নি। ঠিক তেমনি দর্শন চর্চার জন্য বা চিন্তা করবার জন্য কাউকে চিন্তা কী করে করতে হয় সেই বিষয়ে পড়াশুনা করে চিন্তা করতে হবে সেটাও অবাস্তব। যা দরকার তা হোল চিন্তাকে কাজে খাটানো—অর্থাৎ চিন্তা করা। তবে দুই জনেই এটা মানতেন যে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করলেই সেটা দর্শন বা ভাবচর্চা হয় না। অতএব চিন্তাকে যেটা শিখতে হবে তা হোল কীভাবে সে চিন্তা করছে তার প্রক্রিয়াটা নিজে অনুধাবন করতে পারছে কিনা এবং চিন্তার ফলাফল বা একেকটা মুহূর্ত কীভাবে শক্ত ভাবে চিন্তার মধ্যে ধরা ও ধারণ করা যায়, ইত্যাদি। অর্থাৎ শেষাবধি সেটা চিন্তার চর্চার বিষয়।

আমাদের দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে চিন্তা সবসময়ই হাজির আছে। আমরা তো হরদমই ভাষা তৈরি করছি। তাহলে চিন্তাকে মনোযোগী হতে হবে কীভাবে সেটা তৈরি হচ্ছে, তার ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে তার দিকে। সেই দিকে যতো বেশি আমরা মনোযোগ দেব বাংলাদেশে দর্শন বা ভাবচর্চার ভাষাও তৈরি হবে দ্রুত। পরম

(Being) নিজেকে ততোটুকুই যার যার ভাষায় ধরা দেয়, যতোটুকু মনুষ্যরূপী সত্তা (being) চিন্তায় পরমের সঙ্গে তার সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্কটাকে ভাষায় তুলে আনতে পারছে। এই জন্যই মার্টিন হেইডেগারের কাছে কবি আর কথার কারিগরদের এতো কদর।

ইংরেজি ছোট হাতের ‘বি’ দিয়ে লেখা being আর ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা Being-এর মধ্যে পার্থক্য টানেন হেইডেগার। এই পার্থক্য অনুধাবন তাঁর কথাবার্তা বোঝার প্রথম স্তরবর্ণের মতো। ছোট বীং-কে সত্তা বলে আপাতত কাজ চালিয়ে দিতে পারি, এই অর্থে যে একটি কিছু হয়ে বা বিষয় হয়ে আমাদের সামনে যা রয়েছে। এই ‘বিষয়’ মানে ‘বস্তু’ হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। ‘আত্মা’, ‘আল্লা’ ইত্যাদি ও সত্তা। বিষয়। আর দশটা সত্তার মতোই আমরা আত্মা, আল্লা ইত্যাদি বিষয়কে ভাষায় ব্যবহার করি। যেমন বলি, ‘আল্লা আছেন’। কিন্তু আল্লা কী করে আছেন? আর দশটা সাকার বস্তুর মতো? গাছপালা, বাড়িঘর, টেবিল-চেয়ার যেমন আছে তেমনি কি আছেন তিনি? তাহলে এই যে ‘আছে’ কথাটা আল্লার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হোল, এই ব্যবহার বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহারের মতো নয়। অন্যরকম। তাহলে ‘আছে’ ব্যাপারটা কী? ঠিক তেমনি কোনো জিনিস আমাদের সামনে থাকলে আমরা বলি ‘আছে’, কিন্তু যদি সামনে না থাকে তাহলে বলি ‘নাই’। কিন্তু যে অবস্থাকে ‘নাই’ বললাম সে তো একটা অবস্থা। এই অবস্থা তো ‘আছে’। নইলে ‘নাই’ কী করে বলি? কাকে নাই বলি? কোন্ অর্থে ‘নাই’ বলি? দেখা যাচ্ছে ‘নাই’-ও ‘আছে’ হতে পারে। এতোটুকু অন্তত পরিষ্কার যে being অর্থে ‘সত্তা’ আর being অর্থে ‘আছে’—এই দুইয়ের ফারাক বিশাল। এই কারণেই বীং একবার ছোট বি দিয়ে আর আরেকবার ক্যাপিটাল বি দিয়ে লেখা হয়। তাদের এই ফারাককে বলা হয় Ontic and ontological difference।

পরাবিদ্যা (Metaphysics) সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ভূমিকা দিতে গিয়ে হেইডেগার শুরুতেই প্রশ্ন তুলছেন: ‘বরং কিছুই না থেকে বস্তু কেন আছে?’ জগত তো শূন্য থাকতে পারত, ‘আছে’ কেন? আছে কথাটার এই ভাবগত মুর্ছনা এই ছোট প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত। বাংলায় আমরা ‘আছে’, ‘আছি’, ‘ভাব’ ‘বস্তু’ ইত্যাদিকে দার্শনিক বিচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি না। প্রাচ্য আর প্রাচ্য দর্শনে কী লেখা আছে বা কী তত্ত্ব চলছে সেই কথা বলছি না, যদিও সেই অর্থেও কথাটা সত্য। আমাদের ভাষার মধ্যে এই ভাবগুলো কীভাবে আছে? আদিতো কীভাবে ছিল? প্রথম যখন শব্দগুলো তৈরি হয়েছে তখন যে যে অভিজ্ঞতার ভাব প্রকাশের জন্য শব্দগুলো তৈরি হয়েছে সেইসব কি আমাদের এখন মনে আছে? আমরা কি সেই আদি অভিজ্ঞতা থেকে সরে গিয়েছি? যদি সরে গিয়ে থাকি কোথায় আছি আমরা এখন? কীভাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করি এবং এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কী ভাব আমরা প্রকাশ করি?

এই যে এখন ‘ভাব’ কথাটা ব্যবহার করলাম, এর মজা ইংরেজি, জার্মান বা ফরাসি ভাষায় নাই। আধুনিক দর্শনের ভাষা এইসব। ভাবকে ইংরেজি অনুবাদ করলে সেটা হয়

mood। কিন্তু আমরা তো mood বা কোন সাইকোলজিকাল অবস্থা হিশাবে ‘ভাব’-কে বুঝি না। যে কারণে ‘ভাব’ কথাটিকে তার অধঃপতন থেকে উদ্ধারের জন্য আমরা বাংলায় দর্শনচর্চার পদ্ধতি ও লড়াই-সংগ্রামকে বলি ‘ভাবান্দোলন’।

বার

শব্দগুলো নিয়ে আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করি নি। ভাবাভাবি তো দূরের ব্যাপার। ‘আছে’ বা ‘আছি’ কথাটাই ধরা যাক, কারণ এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করেছি এবং করব। ‘আছে’ বা ‘আছি’ কথাটা আমরা এতো সাধারণভাবে ব্যবহার করি যে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে এর অর্থ আমরা জানি। এর ভাবটা বুঝি পরিষ্কার। সত্যি যে কথায় বা বাক্যে ‘আছে’ থাকলে আমাদের তার অর্থ বুঝতে দেয়ী হয় না। কিন্তু ‘আছে’ বা ‘আছি’-কে আমরা আরো গভীর ভাবে বুঝতে চাই বা ভাবতে চাই তাহলে তার হৃদিস নেওয়া কর্তব্য হয়ে ওঠে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষে* অকর্মক সংস্কৃত ধাতু ‘অস্’-কে তাঁর অভিধানে আলাদা করে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর থেকে সংস্কৃত ‘অস্যাতি’, ‘আসীৎ’ ইত্যাদি। ‘অস্তি’ বা ‘অস্তিত্ব’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই ধাতু থেকে। একই ভাবে ‘সস্তা’। এর ফারসি রূপ হচ্ছে ‘হস্’। গ্রিক ‘esti’ ল্যাটিন ‘es-t’, জার্মান ‘ist’ এবং ইংরেজি ‘is’। এই অকর্মক সংস্কৃত ধাতুর অন্যান্য মানের মধ্যে আছে; (১) আদান, গ্রহণ এবং (২) দীপ্তি।

‘আছ’-কে হরিচরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন অকর্মক বাংলা ধাতু হিশাবে। ‘অস্’ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সংস্কৃত ‘আচ্ছ’। প্রাকৃতে ‘অচ্ছ’, ‘অচ্ছই’, ‘আচ্ছ’ এবং এখন থেকে এখনকার বাংলায় ‘আছ’, ‘আছে’, ‘আছি’ ইত্যাদি। কিম্বা আগের বা নানান লৌকিক ব্যবহারে অছলি, অছইত, অছিত, আছইল, আছিল, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য ‘আছে’ বা ‘আছি’-র নানান ব্যবহারের নমুনা দেখাতে গিয়ে তিনি অবশ্যই লিখতে ভুলেননি যে এর অর্থ হচ্ছে ‘বিদ্যমান’ বা উপস্থিত থাকা কিম্বা স্বেচ্ছা ‘থাকা’।

আশ্চর্য যে ‘আচ্ছা’ শব্দটি তাঁর অভিধানে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ইতিবাচক ‘ই্যা’ বোঝাতে আমরা ‘আচ্ছা’ ব্যবহার করি। ‘আচ্ছা’ মানে কী? এর অর্থ ঠিক ‘ই্যা’ নয়, বরং যার সঙ্গে কথা হচ্ছে সেই কথকের সামনে আমি এখনো আছি সেই হাজিরা জানান দেবার জন্য আমরা কথার পিঠে বলি, ‘আচ্ছা’। এরও ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ‘অস্’ বা বাংলা অকর্মক ধাতু ‘আছ’ থেকে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস হরিচরণের মতো ‘অস্’-কে আলাদা করে স্থান দেননি। কিন্তু ‘অস্তি’-র ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে ‘অস্’ উল্লেখ করার পাশাপাশি প্রথম বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে অর্থ করে দিয়েছেন, ‘হওয়া’। অস্তি জরাসন্ধের কন্যা এবং কংসের পত্নী।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ‘অস্ত’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে ‘অস্’ উল্লেখ করে তার পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে অর্থ লিখেছেন ‘ক্ষেপণ’ করা। অর্থাৎ নিক্ষেপ করা। অস্ত মানে ‘গ্রহাদির অস্ত বা অদর্শন হয় যেখানে’।

জ্ঞানেন্দ্র সংস্কৃত শব্দ ‘অস্ত’-কেও তাঁর অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ‘অস্’ থেকে ‘হওয়া’-র অনুজ্ঞাসূচক অর্থে ‘অস্ত’ মানে হউক বা হোক। যেমন অনুদামঙ্গলে ‘তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলা বর দান’।

‘আছ’ এবং ‘আছা’ দুটোই জ্ঞানেন্দ্রমোহন অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে একই ভাবে ‘অস্’ (হওয়া, থাকা) উল্লেখ করেছেন। তারপর লিখেছেন, “প্রাচীন হিন্দু ভাষায় হয়, আছ অর্থে অবিকল ‘অস্’ প্রয়োগ। যেমন, ‘অসে’, ‘অসতো’। এরপর লিখছেন, “পৃথিবীর প্রায় সকল আর্য ভাষাতেই অস্ ধাতুজ হওয়া বা থাকা অর্থক শব্দ পাওয়া যায়। তুলনা : সং = অস্তি; জেন্দ = অশতি osti; গ্রিক = esti; ল্যাটিন = est, জার্মান = ist; ফারসি = অস্ত; ইংরেজি = is। অস্ এর স স্থানে চ, ছ, জ, হ, ও, অ, আ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক উচ্চারণের সৃষ্টি করিয়াছে”।

সংস্কৃত ‘অস্’ ধাতু থেকে ‘সৎ’ বিশেষণটির উৎপত্তি। অর্থাৎ কোনো কিছুর পরিচ্ছন্ন বিদ্যমানতা বা স্বচ্ছভাবে আমাদের সামনে আছে বা হাজির অর্থে ‘সৎ’। জ্ঞানেন্দ্রমোহন সৎ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হিশাবে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই বাক্যটি : ‘যার সত্তা আছে’। ‘সত্তা’ শব্দটিও সৎ থেকে তৈরি। জ্ঞানেন্দ্র এর আভিধানিক অর্থ হিশাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ‘অস্তিত্ব’, ‘বিদ্যমানতা’, ‘নিত্যতা’, ‘শ্রেষ্ঠতা’, ‘উৎকর্ষ’, ‘সাদুতা’, এবং ‘উৎপত্তি’।

এখানে ধাতুচিহ্ন শনাক্ত কিম্বা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ নয়। আমরা ভাষায় আমাদের বিদ্যমানতার স্বভাব পর্যালোচনা করবার প্রাথমিক কাজগুলোর প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছি মাত্র। বাংলায় ইংরেজি Metaphysics শব্দটি অনুবাদ করে যে শাস্ত্রকে আমরা ‘পরাবিদ্যা’, ‘অধিবিদ্যা’ ইত্যাদি বলে অভিহিত করি, সেই পরাবিদ্যা-ব্যাপার বুঝবার জন্যও এই কাজগুলো আমাদের দরকার।

‘থাক’ হচ্ছে অকর্মক বাংলা ধাতু। এ থেকে ‘থাকা’, ‘থাকি’ প্রভৃতি। সংস্কৃত ‘স্থা’ ধাতুর সঙ্গে এর সাযুজ্য, যে ধাতু থেকে ‘স্থান’। প্রাকৃতে ‘থক্’।

অকর্মক সংস্কৃত ধাতু ‘বস্’ থেকে ‘বস্ত’। ‘বস্ত’ অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে হরিচরণ প্রথমে বলেছেন ‘যাহা বাস্তবিক, কল্পিত বা ভ্রমাত্মক নহে’। ‘বস্’ ধাতুর অর্থ হিশাবে লিখেছেন, ‘বাস করা’। এখান থেকেই বসত, বসতি, বসবাস, বসা, বসন, বসন্ত ইত্যাদি। তাহলে ‘বস্ত’ – যেখানে বাস করা হয়। আবাস। কে বাস করে? যাকে আমরা বস্ত জ্ঞানে শনাক্ত করি তারা। দেখা যাচ্ছে বস্ত বললে আমরা এখন যা বুঝি তার আদি মানে অন্যরকম।

সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দ ‘ভূ’ থেকে ‘ভাব’, ‘ভাবুক’। ভাব কথাটির অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথমেই হরিচরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন সত্তা, বিদ্যমানতা। জ্ঞানেন্দ্র লিখেছেন, ‘ভূ’ বা হওয়া থেকে ‘ভাব’। ভাবের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে প্রথমে আছে জন্ম, উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে ‘সৃষ্টি’। অর্থাৎ ভাব মানে জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি। তিন

নম্বরে 'ভাব'কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'সদভাব' হিসাবে, কিন্তু আবার তাকে 'অভাবের বিপরীত' এই অর্থে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন 'সত্তা'। অর্থাৎ ভাব = সদভাব = সত্তা। চার নম্বরে 'ভাব' শব্দটির অর্থ হিসাবে যা অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। 'ভাব' মানে, 'পদার্থ' ও 'বস্তু'। অনেক পরে এগারো নম্বরে অন্তর্ভুক্তিতে এসে ভাব মানে 'চিন্তা', 'কল্পনা' প্রভৃতি ঢুকিয়েছেন। পনেরোতে এসে ভাবের অর্থ করেছেন 'জ্ঞানজ্ঞ অনুভূতি', 'সংস্কার', 'প্রত্যয়' প্রভৃতি। যেহেতু 'ভাব' অর্থ হওয়া, সত্তা, বিদ্যমানতা এবং সেই সূত্রে পদার্থ ও বস্তু, অতএব ভাবকে যখন জ্ঞানজ্ঞ অনুভূতি, সংস্কার বা প্রত্যয় হিসাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যাখ্যা করছেন, তখন তিনি বলতে ভোলেন নি যে 'ভাব' শব্দটির এই অর্থ 'ইংরেজি idea শব্দটির বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। একশ নম্বরে অন্তর্ভুক্তিতে এসে 'ভাব'-কে বলছেন, 'মনেবিকার বিশেষ'। ছবিশে 'মনোগত আবেগ বা আবেশ; চিন্তাবিকার; হৃদয়োচ্ছ্বাস emotion [এই আবেগ অধিকতর তীব্র হইলে জ্ঞানত্রাদিতে প্রকাশ পায়, তখন ইহাকে হাব বা শৃঙ্গার বলে]'। তৃতীয় বন্ধনী জ্ঞানেন্দ্র নিজেই ব্যবহার করেছেন।

অকর্মক বাংলা ধাতু 'হ' থেকে 'হয়'। এর ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে সংস্কৃতে 'ভূ' এবং প্রাকৃতের 'হাই' উল্লেখ করেছেন হরিচরণ। অর্থনির্দেশ করতে গিয়ে প্রথমে লিখেছেন, 'স্থিতি করা'। 'হয়' শব্দটির ব্যবহার দেখাতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'সকল বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মে হয়'। দ্বিতীয় অর্থনির্দেশ হচ্ছে 'উদ্ভূত হওয়া', 'জন্মগ্রহণ করা'। এরপর 'সংঘটিত করা', 'সাধিত হওয়া' প্রভৃতি।

ভের

বীং নিয়ে ভাবচর্চা করতে গিয়ে হেইডেগার শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি নজর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ হোল ইংরেজি being কথাটার মানে কী আসলে? মনে হয় শব্দটির গভীর বা দরকারি কোনো মানে নাই। শূন্যই প্রায়। কেন শব্দটির তাৎপর্য এই কালে এই নিরর্থক শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে? এর কারণ কি পাশ্চাত্য সভ্যতার চরিত্রের মধ্যে নিহিত? নাকি 'আছে' বা 'আছি' নামক অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন সেটা ভুলে গিয়েছে বলেই পাশ্চাত্যের আজ এই দশা। হেইডেগার বলছেন: আছেময়তার অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুতির মধ্যেই আজকের টেকনলজিকাল, প্রভুত্বকামী, হানাদার পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা ভাবান্দোলনের দিক থেকে এই কথাটা দাঁড়াতে এইরকম যে, আছেময়তার আশ্বাদন থেকে বিচ্যুতি কিম্বা তা আশ্বাদনের ক্ষমতা হারিয়েছে বলে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে আমরা ধ্বংসাত্মক, হানাদার ও সৃষ্টিবিধ্বংসী চরিত্র লক্ষ্য করছি। তবুও এই Being শব্দটির তাৎপর্য আজো খানিক অবশিষ্ট আছে কিনা তার জন্য তিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণ ঘাঁটতে আগ্রহী। আমরাও। এই প্রসঙ্গে হেইডেগার দুটো প্রশ্ন তুলেছেন :

১. রূপের দিক থেকে being শব্দটি কেমন?
২. শব্দটির আদি মানে সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ব আমাদের কী বলে?

হেইডেগারের এই প্রশ্নগুলো ভালো ব্যাকরণ লিখবার তাগিদে নয়। Our aim, rather, is an essential clarification of the essence of being to its essential involvement with the essence of language। অর্থাৎ দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে এই আছেময়তার ভাব কিভাবে লিপ্ত হয় সেটা পরিচ্ছন্ন করাই হেইডেগারের উদ্দেশ্য।

Being (জার্মান ভাষায় sein) শব্দটির রূপ বিচার করতে গিয়ে হেইডেগার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এর রূপ হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ, ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় modus infinitivus। এই সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে substantive বা কোনো নামশব্দ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া—নামশব্দ, এই তিন মুহূর্ত অতিক্রম করে শব্দটির যে বিবর্তন তার দীর্ঘ বিচার করেছেন হেইডেগার। বলছেন:

For the question as to whether the original form of the word was the noun (substantive) or the verb coincides with the question regarding the original character of discourse and speech in general. And this question contains within it the question of the origin of language.

Being-এর মূল ক্রিয়ারূপ নাকি নামরূপ—এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঙ্গে মানুষের ভাষার আদি রূপ কেমন ছিল সেই প্রশ্ন জড়িত, কাজে কাজেই ভাষার উৎপত্তির প্রশ্নও।

হেইডেগার যে কারণে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণ ঘেঁটেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম সন্দেহ নাই। কিন্তু Being বা sein সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বাংলা ‘আছে’ সম্পর্কে একই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাব কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ে কোনো গবেষণাই হয় নি। বাংলা ভাষাতত্ত্ব এখনও অতিশয় শৈশবাবস্থায়। কিন্তু কিছু ব্যাপার সহজেই বোঝা যায়।

ইংরেজি ‘to be’ থেকে ‘being’ এটা পরিষ্কার। এর পাশাপাশি কতোটুকু আমরা দাবি করতে পারি যে ‘আছে’ থেকে ‘অস্তিত্ব’ বা ‘সত্তা’? বলাবাহুল্য সংস্কৃত ‘অস্’ ধাতুর মধ্যে তিনটি শব্দেরই ইঙ্গিত আমরা পাই। কিন্তু আমাদের ভাষায় ‘আছে’ বা ‘আছি’ কথাটির অবস্থান ও তাৎপর্য ইংরেজি to be ক্রিয়াপদের মতো কি? কিম্বা ইংরেজি ‘is’-এর মতো? ইংরেজিতে আমরা বলি, Tree is green, কিন্তু বাংলায় বলি গাছ সবুজ। বাংলায় আমরা কোনো copula ব্যবহার করি না অর্থাৎ ‘ইস’-এর ব্যবহার নাই। এভাবে বলি না যে গাছ (আছে বা হয়) সবুজ। বাংলায় বলি, ঐতো সে ওখানে; ইংরেজিতে বলি There she is। কিন্তু বলা যায়: ঐতো সে ওখানে আছে। দেখা যাচ্ছে ‘আছে’ ব্যবহারে গুরুতর ভেদ আছে অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার। হেইডেগার কোন্দিকে আমাদের গবেষণা বা চিন্তাকে ধাবিত করতে হবে তার একটা নিশানা

দিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন বা ভাবের মুশকিল তিনি যেখানে ধরেছেন, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা নাও খাটতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা অধিক যাবো না, কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণার জায়গাগুলো অতিশয় দুর্বল। তাছাড়া বাংলার ভাবান্দোলনের দিক থেকে এই প্রশ্নগুলোকে ভিন্ন ভাবে তুলতে হবে, এতোটুকু আমরা যদি এখন বুঝি তাহলে আমাদের এখনকার কাজগুলো কী সেই সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলার কাজ কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের খানিক ধারণা হবে।

চৌদ্দ

হেইডেগারের Letter on Humanism-এর সূত্র ধরে আমরা ভাব ও তৎপরতা নামক ব্যাপারগুলো বুঝতে চাইছি। এই বোঝা উভয়কে আলাদা করে হয় না, বা হবে না, এই ইঙ্গিতটুকু আমরা পেয়েছি। অন্তত তাদের সম্পর্কের প্রশ্ন যে গুরুতর বিষয়, যার মীমাংসা এখনো দর্শন করে নি, সেই দাবিও আমরা করেছি। অথচ এই প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া বৈপ্লবিক তৎপরতা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কেও আমরা কোনো ধারণা করতে পারব না। হেইডেগার বলছেন, চিন্তা শুরুতে যে অভিজ্ঞতার স্মৃতি পেয়েছিল এবং ভাষার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছিল একদা, সেখান থেকে পাশ্চাত্য দর্শন বিচ্যুত হয়েছে। ফলে Being কথাটার অর্থ বা 'আছে' হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন, চিন্তা করার মানে আসলে কী—পাশ্চাত্য সেটা ভুলে গিয়েছে। তার ঐতিহাসিক নিয়তি এখন নির্ণিত হচ্ছে আদি আশ্বাদন থেকে তার এই বিচ্যুতি এবং সেই বিচ্যুতি থেকে জ্ঞাত চিন্তাশূন্য ভাষা দ্বারা। তার মানে কী পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে চিন্তা নাই? প্রথাগত অর্থে আমরা যাকে 'চিন্তা' বলি, অবশ্যই তা আছে। কিন্তু চিন্তা আসলে কি করে, তার স্বভাবটা আসলে কেমন এখনকার চিন্তা তা আর জানে না। অর্থাৎ চিন্তা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছে। এই হচ্ছে হেইডেগারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তাহলে মানবতিহাসের জন্য যদি নতুন কোন পথ আমরা খুঁজতে চাই তাহলে চিন্তাকে চিন্তা করতে শেখাতে হবে। কীভাবে চিন্তা Being আর being এর সম্পর্ক ক্রমাগত উদঘাটন করে, ও তার মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিয়তি ঠিক করে দেয় সেই দিকে নজর ফেরাতে হবে। চিন্তা এই সম্পর্কের কারণ নয়, চিন্তা এই সম্পর্ক ঘটায় না। এই সম্পর্ক সে যখন উদঘাপন করে Being (বা বাংলার ভাবান্দোলনের দিক থেকে পরম) তাকে যতোটুকু দান করে ততোটুকুই সে পায়, গ্রহণ করে—যদি গ্রহণের ক্ষমতা চিন্তার থাকে।

হেইডেগার বলছেন, এই সম্পর্কের মধ্যে কেউই কর্তা নয়, বিষয়ও নয়। আর ঠিক এখানেই আমরা আবার বাংলার ভাবান্দোলনের কেন্দ্রে এসে পড়ি। জীবের সঙ্গে পরমের সম্পর্ক বিষয়ী (Subject) আর বিষয় (Object)-এর সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো কর্তা নাই। এই সম্পর্ককে সেই কারণে বাংলার ভাবান্দোলন বলে 'প্রেম'। এই

প্রেমের সম্পর্ক নিজেকে যেভাবে ব্যক্ত করে তাকে বলা হয় ‘লীলা’। এই প্রেমের লীলাটা কেমন? প্রকৃতিস্বরূপা রাধিকা (being) যে ‘ঘাটে’ পার হবেন, এই ‘পার’ থেকে ঐ ‘পারে’ যাবেন, সেই ঘাটে কানাই (Being) হচ্ছেন ‘মাঝি’।

দোকান খুল দেখি পসরা সাজাও দেখি

যে ঘাটে রাধিকা হবে পার কানাই সে ঘাটের মাঝি॥

বাংলার ভাবান্দোলনে তাহলে ‘তৎপরতা’ হিশাবে ‘ভাব’ থেকে আলাদা কিছু নাই। অর্থাৎ চিন্তা একদিকে আর চিন্তার তৎপরতা বা কাজ হচ্ছে তার বাস্তবায়ন— এইরকম টেকনিকাল অর্থে ‘ভাব’ কথাটার ব্যবহার নাই। ভাব কথাটির সঙ্গে ‘লীলা’-র সম্পর্ক অঙ্গঙ্গী। ভাব মাত্রই লীলাময়। অর্থাৎ তার নানাবিধ প্রকাশ আছে। নানা ভাবে ভাব নিজেকে অভিযুক্ত করছে।

এই ব্যাপারগুলো বোঝার কাজ আছে আমাদের তাহলে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলো তোলার আগে আমাদের আরো কিছু বিষয় আলোচনা করে আসতে হবে। যেমন, হেইডেগার কেন ‘হিউম্যানিজম’ বা তথাকথিত ‘মানবতাবাদ’-কে নাকচ করলেন? একই ভাবে মার্কসও কেন মানবতাবাদী নন। আবার বাংলার ভাবান্দোলনও কেন ‘মানবতাবাদী’ নয়। কোন্ অর্থে এই প্রত্যাখ্যান? অথচ ‘সহজ মানুষের আবির্ভাব ঘটানোই কী তাঁদের লক্ষ্য নয়? এই তিন দিক থেকে কিভাবে একই প্রশ্নের মোকাবিলা করা হয়েছে, যদিও পথ ও পদ্ধতির মধ্যে তুমুল ফারাক আছে।

দেহ ও ভাষা

আমি দেখি না। দেখা বলিলে আর দশজন চক্ষুসম্পন্ন লোক দেখে বলিয়া যাহা দাবি করে সেই রূপ দেখিবার সম্ভাবনা আমি বহুকাল হইল হারাইয়াছি। আমার চক্ষু একটা। আগে আমার এই ভাব জাগিত যে আমার বুঝি কিছু একটার অভাব আছে। এই অভাব বুঝিবার জন্য আমি মনুষ্যকুলের ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের ইতিহাস পাঠ করি। সহজেই বুঝিলাম মনুষ্যসকল তাহাদের ইন্দ্রিয়ের সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে বিচেষ্টন। অজ্ঞান। আজ যে-মানুষ আমরা দেখিতেছি তাহারা প্রায় সকলেই বিকলাঙ্গ। তাহারা তাহাদের কান বা শ্রুতির ব্যবহার ভুলিয়াছে। ঘ্রাণশক্তি হারাইয়া তীব্র সেন্ট মাখিতেছে, মাখাইয়া অন্যের ঘ্রাণান্দ্రిয়ের ক্ষতি করিতেছে। তাহারা জিহ্বার স্বাদ হারাইয়াছে। শ্রী গৌরান্ধ মহাপ্রভু ‘আত্মদান’ বলিয়া যে ভাবসূত্রের অবতারণা করিয়া বঙ্গকে প্রেমে মাতাইয়াছিলেন সেই ‘আত্মদান’ ইন্দ্রিয়াদির প্রতিভা হিশাবে কিম্বা ভাবগত ভাবে ও জীবনচর্যয় বুঝিবার মতো কাহাকেও আমি আর এখন খুঁজিয়া পাই না। বুঝিলাম, মানুষ শরীর ভুলিয়াছে। যে শরীরের সুবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনে ‘মানুষ’ নামক ব্যাপার এখনও টিকিয়া আছে সেই শরীরের যত্ন করিতে এই কালের জীব শিখে নাই। নিজের শরীরের মধ্যে বর্তমান মানুষ এখন আর প্রকৃতির আর আপনকার ইতিহাস আবিষ্কার করিতে অক্ষম। মনুষ্যকুল নিজের শরীর নিজে আর পাঠ করিতে জানে না। নিজের লক্ষণাদিকে ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণাদি আকারে সে আর শনাক্ত করিতে পারে না। সভ্যতা বলিতে এই কালের বিকলাঙ্গ মানুষ শরীরের বিকাশ বোঝে নাই, ইন্দ্রিয়াদির চর্চা বা অঙ্গের স্ফূর্তি বোঝে নাই। ‘যাহা ভাণ্ড তাহাই ব্রহ্মাণ্ড’, কিম্বা ‘ব্রহ্মাণ্ডই ভাণ্ড’ বা ‘বিশুব্রহ্মাণ্ড আর মনুষ্য শরীর আসলে একই কথা’ —এই সকল আপ্তবাক্যের অর্থ বোঝে নাই। ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ জ্ঞানের সূত্র মানিয়া যে ভাব, চর্চা ও জীবনব্যবস্থার ইঙ্গিত আমরা অতীতে পাই তাহার মর্ম এই কালের মানুষেরা আর জানে না। মানুষ নিজেকে হারাইয়াছে।

দুই

এই নিশ্চয়জ্ঞান আমার মধ্যে তীব্র হওয়ার পর আমি আমার চোখের জন্য বেদনা ভুলিলাম। চতুর্দিকে বিকলাঙ্গ মানুষ ঘুরিতে ফিরিতেছে, আমি আমার একটি চক্ষুর জন্য বিকলাঙ্গ হইব কেন? অন্তত আমি আমার ভাবের ইতিহাসের আদি প্রশ্ন এখনও ভুলি নাই। নিজের ঘর আমি আজও হারাইয়া ফেলি নাই। নিজেকে 'আমি' ডাকিয়া যে অদ্বৈত জগত হইতে নিজেকে আলাহিদা ভাবিতেছি সেই অবিদ্যার মুশকিল আমি টের পাইতেছি। অন্যদিকে লক্ষ করিলাম সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা চক্ষু নির্ভর। একদিকে আমরা চক্ষুকে অতি ব্যবহারে বিশালাক্ষী করিয়াছি অন্যদিকে ব্যবহারহীনতার কারণে আমাদের অপরাপর ইন্দ্রিয় ক্ষয় পাইয়াছে। মানুষের একটি মাত্র ইন্দ্রিয় স্বাস্থ্যবান হইলে তাহাকে সুস্বাস্থ্য বলে না। অতএব চোখের অতিব্যবহার সভ্যতার ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সব কিছুই আমরা চোখ দিয়া বুঝি, চোখে না দেখিলে কিছুই আর বিশ্বাস করি না। প্রমাণ বলিতে বুঝি যাহা চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান আছে বা বর্তমান করা যায়। অর্থাৎ কোন কিছু চোখের সম্মুখে হাজির করা না গেলে তাহাকে 'সত্য' বলিয়া স্বীকার করি না। জ্ঞান বা দর্শনও একই প্রকারে সত্যকে চোখের সামনে হাজির করার মামলা হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা নিজেদের গোলমাল খানিক টের পাইয়া এই অভ্যাসকে সমালোচনা করিতেছেন। বলিতেছেন, যাহা প্রত্যক্ষ নাই তাহাকে ভাষায় প্রকাশ বা হাজির করার অধিবিদ্যাকেই (metaphysics of presence) পাশ্চাত্য সত্য বলিয়া দাবি করিতেছে। ভুলিয়া যাইতেছে যাহা সে ভাষায় প্রকাশ বা হাজির করিতেছে তাহার অর্থ পাঠ ভেদে বিবিধ হইতে পারে। কিন্তু অনুমান এই যে সত্য ভাষার বাইরে আগে থাকিতেই আছে, ভাষার কাজ শুধু তাকে পাঠকের সামনে হাজির করিয়া দেওয়া। এই অনুমান এখন বাতিল হইবার উপক্রম হইয়াছে, জানা যায়।

তিন

কিন্তু এই অধিবিদ্যার সহিত মানুষের বিকলাঙ্গ হইবার সম্পর্ক বা চক্ষুনির্ভরতার দোষ এই কালের দার্শনিকেরা ধরিতে পারেন নাই। চোখে দেখার সহিত সত্যের ধারণা, সত্যের বিচার এবং কাজে কাজেই জ্ঞান বা দর্শন চর্চার সম্পর্ক আছে ইহা আমি টের পাইয়া গিয়াছি। টের পাইয়া কেন আমাদের পূর্বপুরুষ 'সহজ' চর্চা করিয়াছিলেন সেটা একটু আধটু বুঝিতে শিখিতেছি। সহ-জ বা সকল ইন্দ্রিয়ের একসঙ্গে জন্ম ও এক সঙ্গে বিকাশ ঘটানো গেলেই যে জগত আমাদের কাছে সহজ বোধ্য হইয়া ধরা দেয় এই সত্য বুঝিতেছি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চর্চা আর ভাবচর্চাকে তাহারা কেন সমার্থক গণ্য করিয়াছিলেন তাহা খানিক বুঝিতেছি।

চার

আমার ভাব আমার শরীরের গুণ। কিম্বা শরীর আছে বলিয়াই আমার ভাব আছে। শরীর আর দেহের বাহিরে কোন ভাব, ভাষা, অর্থ, কথাবার্তা, কমিউনিকেশন নাই।

আর, দেহ মাত্রই জগত, শরীর মাত্রই ব্রহ্মাণ্ড—এই সূত্র ধরিয়া দেহতত্ত্বই ভাবতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিম্বা, ভাবতত্ত্বই দেহতত্ত্ব—এই কথাও নিশ্পন্ন হয়।

পাঁচ

যুদ্ধবিগ্রহ হত্যা-বিবাদ হিংসা খুনাখুনি ইত্যাদি পেছনে এই চক্ষু নির্ভর সভ্যতার কারণ কতোখানি সেই বিষয়েও আমি সবসময়ই চিন্তা করি। একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যের কারণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষয়ের অর্থ হইল মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিকার ঘটিয়াছে। চিকিৎসা না করিলে মানুষ দুনিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে।

ছয়

আমার মনে হইল মিল্টন অন্ধ ছিলেন এই বাক্য कहিয়া আমি অতীতে আমার সমবয়সী কবিদের মতো নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিশেষ সমর্থ হই নাই। কারণ আমার দুই চোখ না থাকিতে পারে, চক্ষু তো আছে। একটা। আমি তো অন্ধ না। এক চোখে দেখি। সেই হেতু মিল্টনের মতো আমাকে অন্ধ করিয়া দাও—ষাট দশকে (অ)কবিদের এই হাহাকারে আমার মন ভিজিল না। শুষ্কই থাকিল। অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের সহিত চক্ষু নিজের কর্তব্যও পালন করিয়া থাকে। সেই বাস্তবতা আমি অস্বীকার করি কী করিয়া? মিল্টন কবি বলিয়া অন্ধ, নাকি অন্ধ বলিয়া কবি—এই বিতর্কে আমার কয়ক বছর নষ্ট হইল।

কিন্তু অন্য চোখে যেহেতু দেখিনা সেই হেতু আমি দেখার ব্যাপারেও সন্দিহান হইয়া পড়ি। আমার জীবনশরীরে অভাব হেতু, অর্থাৎ আমি একচোখা বলিয়া এই ভাব জাগিল নাকি আমার ভাবের মধ্যেই দৃষ্টির প্রতি সন্দেহ বদ্ধমূল এই বিচার করিবার শক্তি আমি এখন হারাইয়াছি। ‘আমি দেখি না’। কথাটিকে আমার অভাব ও ভাব দুই দিক হইতেই পাঠকগণ যেন বোঝেন সেই মিনতি করি। ভাবের ঘর যে জীবদেহের ভেতরে এই সত্য আবার প্রচার করিতে চাহিতেছি। পরমের অধিষ্ঠান, পরম যেখানে থাকেন—সেই স্থান যে জীবের অন্তর্গত সেই কেচ্ছা আমি বঙ্গের সাধকগণ মারফত বহু কাল ধরিয়াই জানি। যদি এই অনুমান সঠিক হয় তাহা হইলে আমার জীবদেহের অভাবহেতু আমার ভাবের স্বভাবও খানিক প্রভাবিত হইয়াছে সেই কথা সঠিক হইলেও হইতে পারে। তবে নিজের বিচার নিজে না করাই ভাবুকের কর্তব্য।

সাত

ভাব ও অ-ভাবের কথা তুলিলাম ভাষার প্রসঙ্গে আসিবার তাগিদে। যখন আমরা ভাব বলি তখন বুঝি ইহার সহিত ভাষার – অর্থাৎ যে রূপে ভাব নিজেকে প্রকাশ করেন সেই রূপটি অভিন্ন। ভাব ও ভাষা আলাদা কি? না। ভাব হাজির থাকে ভাষায়। ভাষায়

প্রকাশিত না হইতে পারিলে ভাব বলিয়া কি কিছু আছে? আবার, ভাষা তৈরি হয় শরীরে, কিম্বা শরীরই তো আসলে কথা বলে। শরীরেরই ভাষা আছে। যে কোন চিহ্নব্যবস্থাকে ভাষা হিসাবে পাঠ ও সেই ভাষার অর্থও তৈরি করে রক্তমাংসের শরীর। কোন না কোন শারিরীক প্রক্রিয়ায়। তাহা হইলে ইহাও নিশ্চিত যে ভাষার সহিত শরীরের সম্পর্ক ডাইরেক্ট – ইহাকে অবিদ্যা বলিয়া প্রমাণ কঠিন। শরীর ও ভাষা। ভাষা ও শরীর। বড়ো মধুর ও লীলাকারী তাহাদের সম্পর্ক। বঙ্গের ভাবান্দোলনের ইহা একটি অতি প্রাথমিক অনুমান যে ভাষাসম্পন্ন মানুষ মাত্রই শরীরী। দেহের বাইরে ভাষা নাই। ‘ভাষার’ মধ্যে মানুষ বাস করেন মার্টিন হেইডেগার কথাখানি যখন এই কালে তুলিলেন তখন আমি তাঁহার ‘ভুল’ সহজেই ধরিতে পারিলাম। আসলে উল্টা দিক থেকে কথাটি তোলা হইল। পাদ্র্য দার্শনক হইবার কারণে তিনি ভাষাকে দেহ হইতে আলাদা করিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহা বস্তু হইতে চিন্তাকে আলাদা করিয়া ভাবিবার পরিণতি হইতে পারে। কিন্তু ‘দেহ’ কথাটা তো আমরা ভাষাতেই বলিয়া থাকি। নয় কি? হয়তো দর্শন যেহেতু একমাত্র ভাষাতেই সম্ভব অতএব ভাষার বাহিরে ভাষার শর্ত হিসাবে হাজির ‘দেহ’, আর কথাবার্তায় আমরা যে ‘দেহ’ নিয়া কথা বলি উভয়ে একই বিষয় নহে। বাংলার ভাবান্দোলন আমাকে এই ফারাকটুকু বুঝাইয়াছে। সেই কারণে আমি প্রশ্ন করি, ভাষা মানুষের মধ্যে না কেন? এমনও হইতে পারে যে ‘মানুষ’ নামক যে নিক্ষিপ্ত বিন্দু প্রকৃতি জগতে নিজের শরীর লইয়া অন্য সকল শরীরের সঙ্গে নানান সম্পর্কে যে অখণ্ড ও অনন্য জগত হইয়া আছে সেই জগতই ভাষার কারণ। বাংলার ভাবুক বলিয়া ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আকারে বুদ্ধিতে মোটেও মুশকিল হইল না। ইহার জন্য আমাকে পোস্টমর্ডানিজম করিতে হয় নাই। আমি বাঙাল, বাঙালই আছি।

আট

আমরা মার্টিন হেইডেগারকে কোটেশান মার্কের মধ্যে ‘ভুল’ লিখিলাম এই কারণে যে তাঁহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য চিন্তার ইতিহাসের মধ্যে বিবেচ্য। তদুপরি আমরা ভাব, ভাষা ও শরীরের মধ্যে নিরন্তর এক লীলাকাতর সম্পর্ক দেখিতে পাইতেছি। কখনও তাহার এক আবার পরক্ষণের তাহারা ভিন্ন। মানুষ ভাষার মধ্যে বাস করে, একই ভাবে ভাষা মানুষের মধ্যে থাকিয়াই ভাষা হয়। শরীর আর ভাষাকে আমরা আলাদা করিয়া চিনি, উভয়ের এই লীলাকারী সম্পর্ক বুদ্ধিবার জন্যই। তাহারা আলাদা বলিয়া নহে। এই লীলা নহিলে সর্বত্রই নৈশব্দ। মার্টিন হেইডেগার যেখানে কহিলেন, ভাষার মধ্যে মানুষের বাস, বঙ্গে ফকির লালন শাহ বলিলেন মানুষ যেখানে বাস করে সেখানে, ‘চন্দ্র সূর্য্যের বারাম নাই’। কারণ সেখানে কেবলই নৈশব্দ। কেবলই অন্ধকার। তাঁর এই বয়ানের একটা কারণ হইতে পারে যে ভাষায় যাকে আমরা ‘মানুষ’ বলিয়া ডাকি ও চিনি তিনি সেই রকম ভাষার অন্তর্গত কোন সত্তাকে বা ভাষায় প্রকাশিত করা যায় বা প্রকাশিত হইয়াছে এই একম কোন কিছুকে ‘মানুষ’ বলিতেছেন না। কিন্তু এই বিষয়ে ইহার অধিক আপাতত

আর কিছুই বলা অনাবশ্যক। কারণ আমরা বিষয়ের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছি মাত্র। বিষয়ের অন্দর মহলে প্রবেশের চাবি আমরা এখনো যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই।

নয়

ভাষা শরীরে বাস করেন আর শরীর ভাষার মধ্যেই শারীরিক হইয়া ওঠেন। ইহাই বঙ্গের ভাবুক হিশাবে আমার সিদ্ধান্ত। ইহার কারণেই আমি কবি। এই ভাবের রসিক বলিয়াই আমি শরীর বলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝি, এই অর্থেই শরীরচর্চা বা তন্ত্র বলিতে আমি শারীরিক সম্পর্ক বুঝি।

দশ

কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক কি? মনুষ্য শরীরের সঙ্গে মনুষ্য দেহের সম্পর্ক? আমি কি তাহা হইলে যৌনতা বিষয়ক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিতেছি? মোটেও না। শরীরের সঙ্গে শরীরের সম্পর্কের অর্থ হইতেছে আমি যে শরীরকে 'আমি' বলিলাম সেই শরীরের সহিত বস্তুময় বাহিরের সম্পর্ক। একদিকে 'আমি' আর অন্যদিকে যা 'আমি' নয়, 'আমি'-র যাহা অপর বা 'প্রকৃতি'। আমার সহিত প্রকৃতির এই সম্পর্ক বা আমার শরীরের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ককেই কার্ল মার্কস মহাশয় 'প্রাকৃতিক সম্পর্ক' বলিয়া পরক্ষণেই আবার 'সামাজিক ভাবে নির্ণিত' বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই প্রাকৃতিক সম্পর্ক অনেক 'আমি'-র সমাজ দিয়া নির্ণয় হয় এই ইঙ্গিতই তিনি দিয়াছেন। কিন্তু সমাজ আর প্রকৃতির কোথায় অভিন্ন আর কোথায় আলাদা তাহা বিশেষ খোলাসা করেন নাই। প্রাকৃতিক সম্পর্ক কি তাহলে তাহাই যাহা মানুষ নিজে নির্ণয় করে নাই, কিন্তু মানুষ নিজেকে যে-সম্পর্কের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছে? অন্যদিকে, মানুষ যখন প্রকৃতির দ্বারা নির্ণিত না হইয়া নিজেই নিজের শরীর উৎপাদন করিতে সক্ষম হইল, তখন প্রাকৃতিক সম্পর্কই হইয়া উঠিল উৎপাদন সম্পর্ক। যে সকল সম্পর্কসমূহের মধ্য দিয়া রক্তমাংসের মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যুক্ত এবং যুক্ত থাকিয়াই মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং 'মানুষ' বিষয়ে কথাবার্তা বলে, তাহাকেই আপাতত 'শরীর' বলিয়া রাখিলাম। বাংলার ভাবচর্চা বিকশিত হইলে এই সবেরও সুরাহা হইবে।

এগার

শরীর যেমন আমার, একই সঙ্গে তাহা ব্রহ্মাণ্ডও বটে। কোথায় আমি ব্রহ্মাণ্ড হইতে আলাদা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোখে আলাদা দেখি বলিয়া আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহি। আমার নিঃশ্বাস প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্কযুক্ত। দম আসিতেছে, যাইতেছে। তেমনি সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রসহ কতো দেখা অদেখা জ্যোতির্মণ্ডলের সঙ্গে আমি যুক্ত বলিয়াই বাঁচিয়া থাকি। আহার বা খাদ্য গ্রহণের মধ্য দিয়া আমি কতো লতাপাতা শস্য

প্রাণী ইত্যাদির সহিত যুক্ত তাহা গণিতে গেলে বেষ্টমার হইবে। ঠিক তেমনি অন্যের উৎপাদিত খাদ্য খাইয়া ভোগ্য সামগ্রী পরিধান করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। আমার ‘আমি-র বেঁচে থাকার শর্ত হইতেছে অন্যের সঙ্গে, অন্য সকল মানুষ এবং ‘না-মানুষ’-এর সঙ্গে সম্পর্ক। ‘না-মানুষ’ বলিলাম, কারণ যাহা কিছু মানুষ নয় তাহাকে মানুষের মানদণ্ড দিয়া বুঝাইতে আরম্ভ হইতে পারে এই জন্য। প্রকৃতি এই দিক থেকে ‘না-মানুষ’ (অ-মানুষ নয়, সেটা অন্য ধারণা)।

বার

কার্ল মার্কস মহাশয় উৎপাদন সম্পর্ক মাত্রই ‘সামাজিক’ বলিয়াছেন—কারণ একদিকে প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধমূল ভেদচিন্তা যেমন তাঁহার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নাই, অন্য দিকে মানুষের ‘সমাজ’ নামক প্রকৃতির বাহিরে স্বাধীন একটি সম্ভার কল্পনা ছাড়া ইতিহাসের ধারণা অসম্ভব। যদিও এই ইতিহাসের কর্তা ‘মানুষ’—প্রকৃতি মানুষের ইতিহাসের উপায় কিম্বা কাঁচামাল মাত্র। আমরা এখনও এই গ্যাঁড়াকলে পড়িয়া আছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিচার পাশ্চাত্য দর্শন কমপ্লিট করিতে পারিয়াছে এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু বাংলা ভাবের মধ্যে ‘তত্ত্ব’ বুঝিতে গিয়া আমি মার্কসেরও শরণাপন্ন হইয়াছি। যে ‘শরীর’ নিয়া তত্ত্ব নিজের কথাবার্তা কেছা বয়ান শুরু করিয়াছিল মার্কসের কাছে আসিয়া সেই শরীরকেই আমি ‘সমাজ দেহ’ বুঝিলাম। তফাৎ হইল তত্ত্ব এই শরীরকে মনুষ্য প্রজাতির পুনরুৎপাদন ও ইন্দ্রিয়াদির যোগসাধন হিসাবে বুঝিয়াছে। মার্কস তাঁর আমলের অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছ হইতে শিক্ষা নিয়া বুঝিলেন যে মানুষ প্রকৃতি মাত্র নয়। যে ‘দেহ’ বা ‘শরীর’ নিয়া আমরা কথা বলি সেই ‘দেহ’ বা ‘শরীর’ আসলে সমাজ দেহ—যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই সহজির উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য দিয়া এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে এই সামাজিক শরীরের সম্পর্কাদি এমন জগৎ হইয়া উঠিতেছে যে অনুমানের ব্রহ্মাণ্ডই যেন ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহণ করিল। যে শরীর ভাবের মধ্যে এক, অখণ্ড ও অনন্য ছিল ক্রমশ তাহাই যেন দৃশ্যমান এক শরীর হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বসমাজ দেহ। তত্ত্ব প্রাকৃতিক শরীর নিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত হইয়া নিজেকে বদলাইতে, নিজের ‘আমি’-কে বিকশিত করিতে চাহিয়াছে। এখন এই বিশাল নিখিল শরীর বা ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের সম্পর্কের রূপান্তর না ঘটাইয়া ‘আমি’ নিজের বিকাশ আর নিজে ঘটাইতে পারিবে না। এই কালে শরীর চর্চা বা দেহতত্ত্ব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে বাধ্য। অন্যথা হইবে না।

তের

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি বুঝিলাম কৃষিকাজ করাও তত্ত্ব। যে শক্তি সূর্যের আলো হইয়া গাছপালার সবুজে পরিণত হয় এবং সেই সবুজের শক্তি যখন প্রাণ হয়,

প্রাণের বেচিত্র হইয়া ওঠে, প্রাণের লীলায়মাধুর্য্যে দুনিয়া মাতাইয়া তোলে সেই প্রাণজগতের মধ্যে ধরা শক্তির কুলকুণ্ডলিনী বিস্তৃতির কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশকেই আমি কৃষি বুঝিলাম। প্রকৃতির কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চর্চাই আমার কৃষিকাজের আরাধ্য হইয়া উঠিল। কৃষককুল ইহার নাম দিলেন নয়াকৃষি। আমি তন্ত্র বলিতে শুধু মানুষের শরীর বুঝি নাই। জীবের প্রাকৃতিক প্রজননের পরিমণ্ডলে করণ বা চর্চা তাহা তন্ত্রের অবিকশিত রূপ। ফলে ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ সাধনের আদত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া ইহাতে ব্যভিচার, বিকৃতি ও বিকার ঘটিয়াছে। তন্ত্র তখনও জগৎ-শরীরের মহিমা ধরিতে পারে নাই। আমি এই মহিমা টের পাইয়া মনুষ্য শরীরকেও প্রকৃতি শরীর বুঝিতেছি। কাজে কাজেই তন্ত্রের অনুপ্রাণনায় আমি প্রকৃতিকে সামাজিক করিয়া তুলিবার জন্য ‘নয়াকৃষি’ নামক যে সম্পর্ক চর্চা করিতেছে তাহার সহিত সূর্য, সবুজ প্রকৃতি ও প্রাণের সহযোগে সচ্চিদানন্দ বা পূর্ণ ব্রহ্ম হওয়ার আকুতি আছে। দ্বিগ্নদিকে প্রভাসিত সূর্যের নূর ধরিতে হইবে, ইহাই প্রাণের শর্ত—এই কালের এনভায়রনমেন্ট ও ইকোলজির ভাষাও আমি খানিক বুঝিলাম।

চৌদ্দ

এই সকল সত্য প্রচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু আপাতত নোস্ত্রা আকারে খোদাই করিয়া রাখিতে দোষ নাই। কারণ আমরা একটি বিকলাঙ্গ যুগে প্রবেশ করিয়াছি। হয়তো এই ভাব ও ভাষা নুলা ল্যাংড়া ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত জীবের বোঝা এখনও অসাধ্য। কারণ আমরা সহজ দেহের চর্চা করি নাই। আমাদের একটি মাত্র ইন্দ্রিয়—চোখ—একদেশদর্শী হইয়া আমাদের শাসন করিতেছে। দর্শন বলিলে আমরা এখনো দেখা, দেখানো, প্রমাণ ইত্যাদি বুঝি। সকল ইন্দ্রিয়ের স-হজ চর্চায় যে ‘ভাব’ তাহা আমরা ভুলিয়াছি। একটি ইন্দ্রিয়কে সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া জীবের ‘দর্শন’ চর্চায় যে জ্ঞান তাহাতে জীবের মোক্ষ নাই। দেহ চর্চা—অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়া জগত শরীরকে পরমের ভাব ও কল্পনার সহিত সঙ্গতি পূর্ণ করিয়া চর্চার কর্তব্য কই?—এই কর্তব্যকে যাহারা ‘বিপ্লব’ বলিয়া জানিবে তাহারা আসিতেছে। তাহারাই দুনিয়ায় ওলোট পালট অদলবদল ঘটাইয়া দিবে। এখন আপনাপন ঘরে প্রত্যাবর্তন করিবার কাজ, যাতে বুঝি যে দুনিয়ার ঘর একটাই এবং ঘরামিও একজন। এই কালে একমাত্র এই ভাবই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঘটাইতে পারে। আশা করি যে একদা প্রভুর কৃপা হইবে—ইহা চরাচরে বিদিত হইতেছে।

আপন ঘরের খবর নে না

অন্যাসে দেখতে পাবি কোন খানে সাঁইর বারাম খানা

আপন ঘরের খবর নে না।

আমি সাঁইজীর এই নির্দেশের ওপর দাঁড়াইয়া আছি। তিনি পথ দেখাইবেন।

পনের

বাংলার ভাবান্দোলনে পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত এক কদমে যায় নাই। যায় না। পাশ্চাত্য দর্শন মানুষকেই ‘কর্তা’ জ্ঞান করে। প্রকৃতির ইতিহাস নাই, ‘বিবর্তন’ আছে। ‘ইতিহাস’ প্রকৃতির কায়কারবারের মধ্যে পড়ে না, কারণ প্রকৃতি কর্তাসম্পন্ন নহে। অতএব যে জগৎ-দেহকে মার্কস মহাশয়ের কথা ধার করিয়া আমরা ‘উৎপাদন সম্পর্ক’ কহিতেছি সেই খানে মুশকিল আছে। উৎপাদন সম্পর্ক রচনার কর্তা মানুষ, প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি এই ক্ষেত্রে শুধু উপায় অথবা কাঁচামাল—পাশ্চাত্য দর্শনের এই অনুমান এবং এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করিয়া যে ফ্রপদি অর্থশাস্ত্র (Classical Political Economy) গড়িয়া উঠিয়াছে বাংলার ভাবান্দোলন উহার সহিত সায় দিবে না। প্রকৃতি ভোগের বা কর্তাসম্পন্ন মানুষ দ্বারা আত্মস্থ হইবার জন্য অস্তিত্বমান আটে—এই ধারণা বাংলার ভাবান্দোলনের সহিত মেলে না। বাংলার ভাবান্দোলনে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক কর্তা সম্পন্ন মানুষ ও কর্তাগুণ রহিত প্রকৃতির সম্পর্ক নহে। যে সম্পর্কের মধ্যে মানুষ মাত্রই কর্তাসম্পন্ন এবং প্রকৃতি মাত্রই তাহার অধীনস্থ বিষয়। যাহা দখল করা যায়, ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনে বর্জ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করাও যায়। বাংলার ভাবান্দোলন প্রকৃতি ও পুরুষকে এক ও অখণ্ড গণ্য করে করা যায়। বাংলার ভাবান্দোলনে কর্তাসম্পন্নতা প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারও মধ্যে একক ভাবে নিহিত নাই। কারণ দুনিয়ায় পুরুষ একজনই। তিনিই একদিকে প্রকৃতি ও অন্যদিকে মানুষ রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে নিজে আশ্বাদন করিতেছেন। অতএব কর্তার এই ইতিহাস একই সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের লীলা—উভয়ের লীলারই ইতিহাস। কখনও প্রকৃতি ইতিহাসের কর্তা বা নির্ণায়ক, কখনো মানুষ। লীলাকে দ্বন্দ্বমূলক ভাবিবারও উপায় নাই। লীলা লীলাই। অতএব বাংলার ভাবান্দোলনের দিক হইতে এই ‘লীলা’ ও পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বন্দ্বমূলক ‘ইতিহাস’ দুই মেরুর ধারণা। এই দিকটা আরো পরিচ্ছন্ন করিবার কর্তব্য এখন হাজির হইয়াছে।

ষোল

কিন্তু দেহের সহিত ভাষার সম্পর্ক বুঝাইতে আমাকে আরো বহু দূর পথ হাঁটিতে হইবে। এখানে সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দেবার জন্য আমার মেথডলজি খানিক ব্যাখ্যা করিলে পাঠক হয়তো উপকৃত হইতে পারেন। একদা মনে হইল যদি আমি পাগলের ভাষা বুঝিতে পারি তাহা হইলে ভাষা ও শরীরের সম্বন্ধ বোঝা আমার জন্য সহজ হইবে। আমি পাগল মাস্তান ফকির ফ্যাকড়া উন্মাদ সিজোফ্রেনিক—সমাজচ্যুত ও সমাজ বহির্ভূত যতো জীব পরমের ধ্যানে ঘরছাড়া হইয়াছে তাহাদের পিছু লইলাম। সমাজ যাহাদিগকে ঘৃণা করে যেমন বেশ্যা, সমকামী, লেসবিয়ান, বিচিত্রভাবে জীবনযাপনকারী, সমাজের তোয়াক্কা না করিয়া যাহারা নিজেদের সমাজ বানাইয়া

তুলকালাম জলজ্যাস্ত বাঁচিয়া আছে তাহাদের সঙ্গে আমি সঙ্গ করিলাম। তাহাদের আন্তরিকভাবে হজরত ঈসা আলাইহে ওয়াসাল্লামের মতো বুঝিবার পথ গ্রহণ করিলাম। কেহ যদি আমার অন্ত্রেষণকে ভুল ব্যাখ্যা করিতে চাহেন তাহা হইলে হজরত ঈসা মেরি মেগডালিনের কাছে কী জন্য গিয়াছিলেন সেই কাহিনী স্মরণ করিবেন। (শুধু স্মরণ রাখিতে হইবে মহাপ্রভু হজরত ঈসার জননীর নাম মরিয়ম, তিনি যাহার কাছে পরমের সন্ধান প্রকৃতি শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন তাঁর নামও 'মরিয়ম' যদিও তিনি মেরী নামে ঈসায়ী অনুসারীদের কাছে পরিচিত।)

পরমের সন্ধান আমার অন্ত্রেষণে প্রভূত উপকার হইল, বহু ভুল ভাঙিয়া গেল। সমাজের কপটতা ভগ্নামি ও বদমায়েশিগুলা আমার কাছে আরো পরিষ্কার হইয়া উঠিল। তবে বিনয়ের সঙ্গে কহিতে চাই একটি মাত্র ধারা পরিহার করিলাম, যাহারা নেশাখোর। আমি ভাবের পথের পাগলদের বুঝিতে চাই, নেশা করা পাগলে আমার বিশেষ লাভ নাই। আমি তাঁহাদের ভালবাসিতে ও সেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার ভাবের দিক হইতে তাঁহারা আমার কাজে আসিবেন না। আমি সুস্থ ও সবল শরীরের সঙ্গে ভাব ও ভাষার সম্পর্ক বুঝিতে আগ্রহী। যাহারা নেশা করেন এবং যে কারণে করেন তাহার জন্য আমার মন খুবই বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া থাকে। তাঁহারা হয়তো সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান লাভে সহায়ক হইতে পারেন, কিন্তু ভাবের ঘরে ঢুকিবার ক্ষেত্রে আমার কোন আজে আসিবেন না। এটা আমি অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিয়া গিয়াছি।

সতের

পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। পাগলদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে ওঠবস শুরু করিবার আগে আমি ভাবিলাম ছাগলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে ওঠবস করিয়া তাহার খাদ্যাভ্যাস বুঝিতে পারিলে এই কথার ন্যায্যতা আদৌ আছে কিনা তাহা আমি বুঝিব। এই কারণে আমি ছাগল পালা শুরু করিলাম। নানান কায়দায় ছাগল পালা সম্পর্কে আমি শিক্ষা নিলাম। এমনকি আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়ায় গিয়া আমি 'জিরো গ্রেজিং' নামক একটি কায়দাও শিখিলাম। এই কায়দা মোতাবেক ছাগলকে না ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বাঁধিয়া পালন করা সম্ভব। ছাগলকে ছাগলের মতো চরিতে না দিয়া একটি খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখা খুবই অমানবিক। কিন্তু আমি পশুর মানবাধিকার বিযয়ে উৎসাহী ছিলাম না। ছাগলে কী না খায় কথাটি আদৌ সত্য কিনা ইহা বুঝিবার জন্যই আমার এই প্রাণান্ত পরিশ্রম।

প্রথম শিক্ষা লাভ করিলাম যে ছাগলকে যাহা খাইতে শিক্ষা দেওয়া হয় একটা সীমার মধ্যে ছাগল তাহা রপ্ত করে। আগে আমার ধারণা ছিল সরাসরি গাছ হইতে ছাগল দাঁতে পাতা কুটিয়া খাইতে পছন্দ করে। যে ডালে বা পাতায় ছাগল মুখ দেয় সেই ডাল আর পাতা কিছুতে আর গজাইতে চাহে না। কিন্তু কেনিয়ায় দেখিলাম ডালপাতা কাটিয়া আনিয়া দিলেও মহানন্দে ছাগল তাহা খায়। তবে ছাগল সবকিছু খায় না। ছাগলে কী না খায় কথাটা ঠিক না।

বাংলাদেশের সব ধরনের ছাগলকেই আমি পরীক্ষা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ছাগল সবকিছু খায় না। কোন প্রাণীই সবকিছু খাইবার জন্য শারীরিকভাবে নির্মিত নয়। ছাগলে কী না খায় এই কথা অতএব কথার কথা। সত্য নয়। প্রবাদের একাংশ যদি বেঠিক হয়, তাহলে পাগলে কী না বলে এই কথাও সত্য না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এই সন্দেহ দৃঢ়মূল হইবার কারণে আমি পাগল মাস্তান ফকির ফ্যাকড়া সাধু পুরুষদের সহিত আরো অধিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে ওঠবস শুরু করিলাম।

আঠারো

ইহাতে আমার নামে কলংক রটিল। যাহারা আমার ভাব ধরিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা আমোদিত হইলেন। নতুন কোন ভাব দেখিলেই আমাদের দেশের মানুষ ভক্তি দান, প্রেম প্রকাশে অতিশয় আগ্রহী হইয়া ওঠে। ইহাতে আমার সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই হইতে লাগিল। আমি সরল সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা পাইলাম। মানুষের টানে শহর ছাড়িয়া আমি পুরাপুরি গ্রামে থাকিতে পারিলে আমার ভাবচর্চা আরো দৃঢ়মূল হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আমার চলাফেরা বেশভূষা ইত্যাদির সহিত গ্রামের মানুষের চেয়েও শহরের মানুষের সঙ্গেই মিল বেশি। বাহ্যিক দিক ত্যাগ করিতে আমার খুবই বেগই পাইতে হইল। তাছাড়া কর্মোপলক্ষে শহরে আমাকে আসিতেই হয়। অতএব শহরের সঙ্গ পুরাপুরি পরিহার করিতে আমি ব্যর্থ হইলাম। ইহাতে আমার অসুবিধার ভারই বেশী হইল। আমার বন্ধুবান্ধব ইয়ার-কমরেডরাও আমাকে সন্দেহের চোখে দেখিতে শুরু করিলেন—তাঁহারা আমার পিছু লইলেন। হেন কোন নিন্দা নাই যাহা তাঁহারা রটাইলেন না। শিক্ষিত শ্রেণী আমার বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এইসময় আমি ভাব ও ভাষা লইয়া পরীক্ষানিরীক্ষা করিতে আরম্ভ করি। উহা ‘এবাদতনামা’ নামক পদ্যপুস্তিকার রূপ নিল। একই সময়ে গাছপালা চাষাবাদ লইয়া আমার কাজও খুব বেগবান হইয়া উঠিল। কৃষকগণ সার ও কীটনাশক লাগে না এমন চাষাবাদের তৎপর হইয়া উঠিলেন। নয়াকৃষি কৃষক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করিল। পাশাপাশি বাংলার সাধকদের গান সংগ্রহ ও তা গাইবার জন্য আমি কাতর হইয়া উঠিলাম—ইহাই নবপ্রাণ আন্দোলন নামে সুখ্যাতি অর্জন করিল।

উনিশ

শত কলংক ও অপবাদেও আমি দমি নাই। কারণ আমার নিরিখ মজবুত ছিল। আমাকে ভাষা সহিত দেহের সম্পর্ক বুঝিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই। ভুলি না।

বিশ

অনুমান করিতে পারিলাম যে ভাষার বাহিরে দেহ নাই, কিম্বা দেহের বাহিরে ভাষা অনুপস্থিত। সূত্রাকারে এই প্রকার বাক্য রচনা সহজ। কিন্তু স্থানকালপাত্র ভেদে তাহার অর্থোৎপাদন কঠিন। আমাকে সেই কঠিন কাজটিই করিতে হইবে। এই কাজটি শুধু ভাষা বলিতে আমরা যা বুঝি সেই জায়গায় থাকিয়া বুঝিলে চলিবে না। ভাষা কমিনউনিকেশানের মাধ্যম, নিছকই বার্তাবাহক বা কাউকে কিছু করিতে নির্দেশ দেবার উপায় ইত্যাদি কেছা আমরা হামেশাই শুনি। এইগুলি যে ভাষা সম্বন্ধে পুরানা ও সংকীর্ণ ধারণা সেটা আমি বহু আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মার্শাল মাকলুহানের মিডিয়া ইজ দ্য ম্যাসেজ এক দিক হইতে এই ধরনের ধারণার সমালোচনা। যে মাধ্যম বা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ভাষা অর্থোৎপাদন করে সেই মাধ্যমই স্বয়ং বার্তা হইয়া ওঠে। আমার মামলা ভাষার সহিত তাহার অর্থের সম্পর্ক বিচার নয়। কিম্বা মিডিয়া ও ম্যাসেজের—মাধ্যম ও তার মর্মের সম্পর্ক লইয়াও নয়। আমি ভাষার সহিত শরীরের সম্পর্ক বুঝিবার জন্যই কাতর। পাণিনী, অভিনবগুপ্ত, নব্যন্যায় ইত্যাদির প্রভাবে বঙ্গে ভাষা, ব্যাকরণ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর তত্ত্ব ও তর্কবিতর্ক হইয়াছে। তার রেশ বাংলার ভাবান্দোলনে আছে। গৌরাঙ্গ কূটতর্ক বাদ দিয়া যখন নামাশ্রয়ই মোক্ষ বলিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের নির্দেশানুযায়ী বঙ্গে নানাবিধ লীলা করিলেন তখন যুক্তির সীমা আছে, সেই ঘোষণা আমি পরিস্কার শুনিতে পারিয়াছি। তবে সকলকে এখনও বুঝাইতে পারি নাই।

একুশ

ভাষা ও শরীরের অভেদ জ্ঞান নিত্যানন্দের প্রস্তাব—যে অনুমান থেকে বঙ্গের ভাবান্দোলনের স্ফূর্তি। নিত্যানন্দ এই ক্ষেত্রে আমার গুরু। আমি ভাষার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বিচারে আগ্রহী হওয়ার নিত্যানন্দের প্রতি আগ্রহও তীব্র হইল। ইহাই আমার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিল। ভাষার মধ্যে যে অর্থ নিহিত থাকে না বাংলার ভাব সেটা বহু কাল থেকেই জানিত। পোস্টমর্ডানিজমের মুখে ইহা আরো যুক্তি বুদ্ধি মেধা দ্বারা বুঝিয়া আমার বুদ্ধি বাড়িল বটে তবে জ্ঞান বাড়িল না। মিশেল ফুকো, কি জাক দেরিদা বা জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার—সকলেই ভাষা আর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক কি এই মূল প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। কিম্বা এই প্রশ্নের গুরুত্ব ধরিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহারা পাশ্চাত্যের দার্শনিক, আমি বাংলার ভাবুক। কিন্তু পাশ্চাত্যের দর্শন পাশ্চাত্য বলিয়া আমি খারিজ করি না। উভয়ের প্রশ্ন ও অন্বেষণের ধারা আলাদা, অভিমুখও দুই দিকে।

বাইশ

ভাষার সহিত অর্থের সম্পর্ক বিচার আর ভাষার সহিত দেহের সম্পর্ক বিচার—দুই ধরনের প্রশ্ন, দুই ধরনের অনুমানের মধ্যে পার্থক্য ও মিল থাকিলেও থাকিতে পারে।

তবে প্রতিটি সভ্যতায় প্রশ্নের ধরণ বিচার করলে তাদের পরিণতি সম্পর্কেও অনুমান করা সম্ভব। দুই প্রশ্নের পরিণতিও ভিন্ন হতে বাধ্য। ইহাই আমার এখনকার সিদ্ধান্ত।

তেইশ

ভাষা আর শরীরের সম্পর্ক বুঝিবার উপায় কি? কিন্তু যাহারা মাস্তান বা পাগল হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের মানদণ্ড অনুযায়ী উল্টাপাল্টা বলিয়া থাকেন। পাগলে উল্টাপাল্টা কেন বলে? আসলেই কি উল্টাপাল্টা বলে? কীসের তুলনায় উল্টাপাল্টা? সমাজ, রাজনীতি, প্রচলিত ও প্রমিত ভাষা, শিক্ষিতদের অভ্যাস আচরণ ইত্যাদির তুলনায় উল্টাপাল্টা। পাগলের ভাষা লজ্জিকাল না। পাগল ব্যাকরণ ভাঙে। পাগল এক কথা শুরু করিয়া শেষ করে না, অন্য কথায় চলিয়া যায়।

আগেই বলিয়াছি, আমি অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে পাগলদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার সিদ্ধান্ত অন্য অনেক মহতের সিদ্ধান্তের মতোই হইল। পাগলের ভাষায় গোলমাল কারণ পাগলামির অর্থ আসলে নিজের উপলব্ধি ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থতা। কিন্তু এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহাও মান্য করিতে হয় যে পাগল তাহার দেহ ব্যবহার করিয়া যে বেলায়েত অর্জন করিয়াছে সেইভাবে দেহ ব্যবহার করা আমরা শিখি নাই। আমাদের সমাজ, শিক্ষাদীক্ষা ও ভাষার অভ্যাস আমাদের সেই শাসনেরই গোলাম করে যাহাতে আমরা কারখানায় তৈরি কোকাকোলার মতো একই বোতলে একই রঙে একই কোম্পানির লোগো লইয়া বাজারে আসি। সকলেরই দেহ একপ্রকার। একই ভাবে আমরা দেহ ব্যবহারে অভ্যস্ত। অন্য রকম বোতল আর বোতলে অন্য প্রকার পানি দেখিলে তাহাকে আমরা পানের যোগ্য মনে করি না। ঠিক তেমনি জীবনযাপনে ভিন্ন মানুষকে আমরা পাগলমাস্তান ফকিরফ্যাকাড়া বাউল ইত্যাদি कहিয়া সমাজ হইতে বাতিল করিয়া দিয়া থাকি।

চব্বিশ

আমি বুঝি বাতিল করিবার ব্যাপারটা রাজনীতি। ইহার বিরুদ্ধে লম্বা লড়াই করিতে হইবে। একসময় সমস্ত কিছু পরিত্যাগ ও পরিহার করিয়া বাংলার ভাবুকদের জীবন গ্রহণ করিবার জন্য আমি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এক সজ্জন মুহূর্তে বুঝিলাম যে বাংলার ভাবান্দোলনের এখন যে হাল তাহাতে পুরানা কায়দায় আমাকে আরো অনেক কাজ সারিয়া আসিতে হইবে। এক পা শহরে আর এক পা বাংলার ভাবের জায়গায়—এই দুই দিকের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া আমাকে আরো কয়েকবছর চলিতে হইবে। নইলে আমাকে ও অন্য পাগলমাস্তানদের সারিতে ফেলিয়া দিয়া আমার বিরুদ্ধে খেঁটু তৈরি হইবে। অজ্ঞানীদের এই সুযোগ দেওয়া খুবই বোকামির কাজ হইবে। বিরুদ্ধ পক্ষের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইর জন্য আমি অতি কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করি।

পঁচিশ

ভাষা ও দেহের সম্পর্কের মামলা লইয়া আমার মনে আরো অনেক প্রশ্ন উদ্ভিত হইল। যেমন, ভাষার বাহিরে দেহ নাই, কিম্বা দেহের বাহিরে ভাষা অনুপস্থিত। এই প্রকার সূত্র সামান্য জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান নয়। স্থানকালপাত্রভেদে তাহার অর্থোৎপাদন মানে বাংলার ভাবান্দোলনের পরিমণ্ডলে ব্যাপারটা বোঝা। এই বিশাল কাজটি এখনও শুরুই হয় নাই বলা চলে। এই কাজই করিব সেই প্রতিজ্ঞা জাগিল।

ছাব্বিশ

ভাষা বাহিরে ‘দেহ’ নাই কথাটার অর্থ কি? ‘দেহ’ কথাটি তো আমরা ভাষার মধ্যেই বলিলাম। নয় কি? তাহা হইলে ভাষা বাদ দিয়া কি দেহ নামক কিছু আছে? খুবই গোড়ার প্রশ্ন। এখন এই কথা পাশ্চাত্যে এক রকম তোলা হইতেছে বটে, কিন্তু বাংলার তত্ত্বের ধারায় ইহাই ছিল গোড়ার কথা। একখানা নজির দেওয়া যাক।

সাতাশ

তন্ত্র কহিল শরীরের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামক নাড়ি আছে বা শরীরে গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতীর প্রবাহ বিদ্যমান। এখন ইহার অর্থ কি? শরীর কাটিয়াই কি বাংলার তন্ত্র এই নাড়িগুলিন আবিষ্কার করিয়াছে, নাকি ভাবে ও ভাষায় শরীরের যে কল্পনা করিয়াছে নিজের শরীরে সেই ভাবেই এই সকল নাড়ির গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াছে? এমনই হইতে পারে শরীরের চর্চা বা শরীরের বিশেষ ব্যবহারই এই ধরণের ভাষা ও ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিপরীতে দেহের বাইরে ভাষা নাই—কথাটা বোঝা তুলনামূলক ভাবে সহজ। ইহার ন্যায্যতা প্রমাণ কঠিন না। কারণ রক্তমাংসের মানুষেরই ভাষা আছে। দেহময় মনুষ্যরূপের মধ্য দিয়াই কেবল প্রকৃতি কথা কহিতে পারেন। অন্য রূপ – যেমন প্রকৃতি যদি কুকুর রূপ গ্রহণ করেন তাহা হইলে কুকুরের খেউ কেউ তিনি করেন, সন্দেহ নাই। পাখি হইলে কিচিরমিচির হয়, গরু হইলে হাম্মা। কিন্তু মনুষ্যরূপের মধ্যে যাহাকে আমরা ভাষা বলি তাহা অন্য প্রাণীশরীরের চেয়ে আলাদা। অর্থাৎ মনুষ্যশরীরের ভাষার এক বিশেষ রূপ আছে। আমাদের এই রূপটিকেই বুঝিতে হইবে – এই ইঙ্গিত আমি বাংলার তন্ত্র অর্থাৎ শরীর ও ভাষার অভেদ জ্ঞান হইতে যে ভাবচর্চা সেই দৈহিকতার ধারা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি।

আটাশ

যদি মনুষ্যভাষা বুঝি তাহা হইলে মনুষ্যরূপ বুঝিব, যদি মনুষ্যরূপ বুঝি তাহা হইলে ভাষা কি সেই জ্ঞানও আমার হইবে—এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইল।

উনত্রিশ

আশা করি বুঝাইতে পারিয়াছি যে পাগলে কী না বলে এই কথা অন্যায়। কিন্তু পাগল আপন শরীর দ্বারা যাহা উপলব্ধি করে তাহা প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হয়। ইহা অতীব কষ্টের। আমি পাগলের কষ্ট নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিবার সাধনা করিলাম। আমাদের প্রচলিত ভাষায় পরিচিত কথোপকথনের নিয়মে পাগলের কথার অর্থোদয় হয় না। ইহা আমাকে ভাবায়। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে শরীরের উপলব্ধিজাত ভাব আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি এই দাবিও বা আমরা কীসের ভিত্তিতে করি? এই সন্দেহ যখন আরো ঘনীভূত হইল তখন ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার ভাষ্য আমি বাংলার ভাবের জায়গা হইতে বুঝিতে শিখিলাম। ভাষার মধ্যে আগে থাকিতে তৈরি কোন অর্থ নাই, বা আমাদের উপলব্ধি আমরা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম এই অনুমানগুলির মুশকিল ধরাইয়া দিয়া তিনি উপকারই করিয়াছেন। তিনি এবং আরো অনেক ফরাসি দার্শনিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ভাষা যে ‘বাস্তবতা’-কে প্রকাশ করিবার দাবি করে সেই দাবি অর্থহীন। কারণ যাকে আমরা বাস্তবতা বলিয়া বুঝি তাহাকে ভাষার মধ্যে কখনই ধরা যায় না। আবার তাহা নাই এই কথা বলাও অবিদ্যা। এই ভাবে তাঁহারা ভাষা ও ভাষার বিষয় বা বস্তুর মধ্যে সম্পর্কের মুশকিলগুলি ধরাইয়া দিলেন—সেই মুশকিল ধরাইতে গিয়া তাঁহারা বাংলার পুরানা ভাবগত প্রশ্নটাই আসলে তুলিলেন। ‘দেহ’ বা ‘শরীর’ প্রসঙ্গক্রমে আসিল। কিন্তু প্রশ্নগুলো বাংলার ভাবান্দোলনের মতো পরিচ্ছন্ন ভাবে তুলিতে পারিলেন না।

ত্রিশ

আমি বাংলার ভাবের ওপর খাড়া থাকিতে চাই আন্তর্জাতিক হইবার জন্য। মানুষের প্রশ্ন মীমাংসার তাগিদে, বাঙালি হইবার জন্য নহে। দর্শন যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে নাই তা নিরসনের জন্য শরীর কথাটির অর্থ আরো গভীর জায়গা হইতে বুঝিবার প্রয়াস চালাইলাম। মানুষের শরীরকে প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের মধ্যেই বুঝিতে হইবে। ‘শরীর’—অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃতির জৈব বা অজৈব উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইয়া যে রূপে মূর্ত হয় সেই রূপটিকে বোঝা আমার জন্য জরুরী হইয়া উঠিল সেই শরীর যদি বুঝিতে পারি তাহা হইলে শরীরসহ ভাষাকে বোঝা আমার জন্য সহজ হইবে এই ইঙ্গিত আমার মধ্যে ক্রমে জ্যোতির্ময় রূপ পরিগ্রহণ করিতে লাগিল।

একত্রিশ

শরীরকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও নানান উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মূর্ত মূহূর্ত আকারে বিচার করিতে গিয়া আমি কার্ল মার্কসকে নুতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। তিনি কহিলেন ইতিহাসের শর্ত তিনটি। এক, প্রজাতি পুনরুৎপাদন—নারীপুরুষ

সম্পর্ক। দুই ভোগ্য জিনিস উৎপাদন অর্থাৎ শরীরের উৎপাদন; শরীরের বিষয়টিকে তিনি বৈষয়িক—বিশেষত অর্থনৈতিক সম্পর্কের জায়গা হইতে দেখিতে শিখাইলেন। ইহার ফলে শরীরকে আমি ব্যক্তির শরীর মাত্র না বুঝিয়া সমাজ দেহ হিসাবে বুঝিতে শিখিলাম। তিন শরীরের মধ্যে নুতন আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি। সেই আকাঙ্ক্ষা বস্তুগত ভোগীর আকাঙ্ক্ষা নাও হইতে পারে। অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন বা জীবের আকাঙ্ক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে তিনি পার্থক্য করিলেন। বাঘের খাদ্য প্রয়োজন, অতএব বাঘ মাংস খাইবে, হরিণ শিকার করিবে। পাখির দরকার শস্য দানা বা কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি। এই সকল প্রয়োজন প্রাকৃতিকতার মধ্যেই উদ্ভূত ও তার বিলয়ও প্রাকৃতিকতার মধ্যে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন একই সঙ্গে তাহার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়া জড়ি করিয়া থাকে। মার্কস প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মনুষ্যজনিত ‘নতুন’ আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাহার অর্থ অন্বেষণ করিলেন না, বাংলা সম্ভবত ইহাকেই পরমের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিতে চাহিয়াছে। যাহা নাই, দিব্যমানতার মধ্যে যাহাকে দেখা যায় না সেই ‘নতুন’ কোথা হইতে আসিল? ঠিক যে মানুষ যদি শুধু কাঁচা মাংস খাইত বা প্রকৃতির মধ্যে তৈরি প্রয়োজন মিটাইয়া প্রাকৃতিক থাকিত তাহা হইলে মানুষ আর প্রাণী জগতের মধ্যে কোন ফারাক থাকিত না। অতএব ‘মানুষের ইতিহাস’ নামে কোন ইতিহাসও তৈরি হইত না। মার্কস ‘মানুষ’ ব্যাপারটা আসলে কী সেটা জীবের জৈবিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা হিসাবে বুঝিতে চান। যেমন, মানুষ খায়, কিন্তু কাঁটা চামচ দিয়া মানুষকে খাইতে হইবে কেন? এই ‘নতুন’ আকাঙ্ক্ষার দরকার কি? বাসনপত্র কী দরকার? জীবের মতো প্রকৃতি হইতে সরাসরি প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটিলেও তো পারে। গেলাসে সুন্দর আকার ও ফুলকারি তোলা নকশা থাকা দরকার কেন? প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই আকাঙ্ক্ষাকে ইতিহাসের শর্ত হিসাবে স্বীকার করিয়া মার্কস বৈপ্লবিক কাজ করিয়াছেন। মানুষের আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো আমাদের বিচার করিতে শিক্ষা দিয়া ভাবজগতে বিপ্লব সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই কারণেই বাংলার ভাবান্দোলনের তিনি আরাধ্য পুরুষ হইতে বাধ্য। একমাত্র মানুষই ‘নতুন’ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, মানুষের মধ্যেই ‘নতুন’ কামনা তৈরি হয়। কাজে কাজেই একমাত্র মানুষের পক্ষেই ইতিহাস তৈরি করা—অর্থাৎ নতুন আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার তাগিদে বিদ্যমান অবস্থার ক্রমাগত রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। তাহা হইলে ‘নতুন’ আকাঙ্ক্ষাই কি পরমের জন্য আকাঙ্ক্ষা? পরমের জন্য কামনা? তাহা হইলে বাংলার ভাবান্দোলনে পরমের জন্য যে আকুতি তাহা মানুষকে ঐতিহাসিক করিয়া তুলিবার জন্যই নয় কি? এই ধরনের প্রশ্নের মধ্য দিয়া বাংলার তত্ত্বের ধারার ভুল ও সীমাবদ্ধ দিকগুলি যেমন আমার কাছে পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, একই সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের গোড়ার মুশকিল কার্ল মার্কসে আসিয়া কীভাবে ঠেকিল সেই সম্পর্কেও আন্দাজ জাগিল। বাংলার ভাবান্দোলনের শক্তির জায়গাগুলিও আরো সহজে দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম আমি কয়েক কদম আগাইতে পারিয়াছি।

বত্রিশ

বাংলার ভাবান্দোলনের সমান্তরালে মার্কসের মধ্যে ‘পরম’ বোধ নাই। ঠিক। মানুষের মুক্তির অর্থ তাঁহার মধ্যে কেবলি বৈষয়িকতায় পর্যবসিত হয়, মানুষ ‘মানুষ’ না হইয়া বারংবার ‘প্রাকৃতিক’ ব্যাপার বা বৈষয়িক গতিপ্রক্রিয়ার কর্তাগুণ হীন নাটবল্টুতে অধঃপতিত হয়। অন্যদিকে বাংলার ভাবান্দোলন পরমের আন্বাদনের অবস্থান হইতে ‘ইতিহাস’ ব্যাপারটি যেন তুলিয়াও অনুক্ত রাখিয়া দিল। জীব দেহের মধ্যে পরমের আন্বাদন কামনা আসলে মানুষের বস্তুময় ইতিহাস তৈরির শর্তই উত্থাপন। কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলন আজ অবধি তাহা পরিচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বাংলার ভাবান্দোলন পরমের আকাঙ্ক্ষাকে মার্কসের মতো শুধু বৈষয়িক শৃঙ্খল/বন্ধন হইতে মুক্তি বোঝে নাই। আরো অতিরিক্ত বুঝিয়াছে। মার্কস বৈষয়িক অর্থে ‘মুক্তি’ ছাড়া অন্য কোন পরমার্থ মানুষের আছে বলিয়া মানিতেন না। ভাবান্দোলনের ‘মানুষ’ মার্কসের সঙ্গে একশ এক ভাগ জীবের বৈষয়িক ‘মুক্তি’ চায় অবশ্যই, কিন্তু তাহাকেই মানুষের ‘মুক্তি’ বলিয়া মানিতে নারাজ। মানুষের ‘মুক্তি’-র প্রশ্ন পরমের আন্বাদনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এই সকল তাৎপর্য পূর্ণ পার্থক্য মনে রাখা দরকার। আসলে পরমকে আন্বাদন বা রূহের মুক্তি মার্কসের প্রকল্প ছিল না। মুক্তির প্রশ্নটা কোন প্রশ্ন নয় বা তা একটা নিছকই বৈষয়িক মুক্তির প্রশ্ন—বাংলার ভাবান্দোলন ইহা কোন মতেই মানিবে না। পরম সংক্রান্ত তত্ত্বীয় সমস্যার অনুভব মার্কসে নাই।

তেতত্রিশ

আমি আরো বুঝিলাম শরীর ব্যবস্থ্য—অর্থাৎ বিভিন্ন শরীরের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের বৈষয়িক দিকগুলোকে কার্ল মার্কস অর্থশাস্ত্র আখ্যা দিয়াছেন এবং বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের ভাব ও ভাষার সঙ্গে শরীরের সম্পর্কের কথাই বলিতেছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত বাংলার ভাবান্দোলনের এক আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই হুঁশ হওয়ায় আমি ইডিওলজি বা শরীরের সঙ্গে ভাব ও ভাষার সম্পর্ক সংক্রান্ত তাঁহার বিচারকে আরো বিকশিত করিবার প্রয়োজনীতা বুঝিলাম। আসলে যাহাকে বাংলার ভাব আন্দোলন ‘শরীর’ বা ‘দেহ’ বলিয়া বিচার করে তাহাই কার্ল মার্কস মহাশয় উৎপাদন সম্পর্ক বা রিলেশানস অব প্রডাকশান বলিয়া অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত তাঁর বিচারমূলক গ্রন্থ ‘পুঁজি’ লিখিয়াছেন—এই সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হইলে আমরা জোর কদমে অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস। তনে এই সিদ্ধান্তসমূহ আরো পরিচ্ছন্নভাবে প্রচারের প্রয়োজন পড়িবে।

চৌত্রিশ

কার্ল মার্কস ছাড়া বাংলার ভাবান্দোলনের সঙ্গে যাহার আশ্চর্য মিল তিনি হইলেন কবি পল ভালেরি। তাঁহার Simple Reflection on the Body পড়িয়া আমি আমোদ বোধ

করি। দেখিলাম ভাষার মধ্যে কীভাবে আমরা আমাদের শরীর বানাই সেই দিকে তাঁর লক্ষ সাড়ে ষোল আনা। আমি ওপরে যেসব কথা বলিলাম যদি কেহ তাহার বিরোধিতা করেন তাহা হইলে বিপদে পড়িলে আমি তাঁহাকে সাক্ষী মানিতে পারিব—ইহা ভবিষ্য আমি নিরাপদ বোধ করিতেছি।

পঁয়ত্রিশ

বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে শরীর ও ভাষার সম্পর্কটাই মুখ্য বিষয়। ভাষা ও অর্থের সম্পর্ক বিচারের ধারাটা বিমলকৃষ্ণ মতিলাল যাকে ‘ভারতীয়’ বলেন তাদের মামলা এবং বলাবাহুল্য পাশ্চাত্যেরও। সেইসব আমাদের জানা দরকার। তবে আমি বাংলার ভাবান্দোলনকে ‘ভারতীয় দর্শন’ থেকে—অর্থাৎ ভারত থেকে আলাদা করিয়া বিচার করি। বাংলাদেশে এই ভাবের বিশেষ প্রাচুর্য আছে বলিয়াই এই ভাবের ধোঁয়ায় সঞ্জীবিত জনগোষ্ঠীর একাংশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়ম করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে বাংলার ভাবান্দোলন বলিলে আমি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামসহ বিস্তৃর্ণ পরিমণ্ডল বুঝি। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস আর ভাবের ইতিহাস হাত ধরাধরি করিয়া চলে না। তবে বিশ্বাস করি যদি বাংলার ভাবান্দোলন ভাবের জায়গাটা পরিষ্কার করিতে পারে তাহা হইলে দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গের উত্থান ঘটিলেও ঘটতে পারে।

ছত্রিশ

ভবিষ্যতে আমাদের শরীর কী রূপ পরিগ্রহণ করিবে এবং আমাদের অন্যরা কী নামে ডাকিবে সেই কথা কহিবার সময় এখনও আসে নাই। অতএব এই স্থানেই আজিকার মতো বিরাম নিলাম।

সত্য কাজে কেউ নয় রাজী

‘পথ’ আর ‘কাজ’ এই দুটো শব্দের মধ্যে ফারাক এতো বিশাল যে তার মীমাংসা এই কালের অলি আউলিয়ারা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। এই দুইয়ের ফারাক নিয়ে দুই এক কথা বলব।

কিছু কাল আগে এক সিম্পোজিয়াম বা সাধুসংঘের তর্কবিতর্ক পড়ছিলাম। পাশ্চাত্যের দুই পথের সঙ্গে ঝগড়া। একদিকে আছেন ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা (Jacques Derrida), আর অন্যদিকে মার্কিন ভাবুক রিচার্ড রটি (Richard Rorty)। দেরিদার খুবই নামডাক। তাঁর কথাবার্তা ডিকনস্ট্রাকশান নামে দারুণ মশহুর। যারা ডিকশনারি খুলে ভাবের কথা অনুবাদ করার কোশেশ করেন, তাঁরা বাংলায় এর তর্জমা করেছেন ‘বিনির্মাণ’। তবে বাংলার মেয়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, যিনি আসলে প্রথমে আপনকার জ্ঞান ও বিদ্যার গুণে এবং পরে লোকমুখে জাক দেরিদার Of grammatology ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি বিনির্মাণের সামনে আরেকটি না-বাচক অক্ষর বসিয়ে দিয়েছেন। বানিয়েছেন, ‘অবিনির্মাণ’। ‘বি’ এবং ‘অ’—এই দুই প্রকার না-বাচক কথায় এক কিসিমের ‘হ্যাঁ’ সৃষ্টি হোল। ডিকনস্ট্রাকশান মানে যে আগাগোড়া ভাঙাভাঙির ব্যাপার নয়, সবটাই যে ‘না’ নয়—সেই সংবাদ জানানোর দরকার ছিল।

এতে অবশ্য একধরনের শাসানোর কাজও হয়েছে। কারণ বিদেশে সাহেবরা কোন কিছু নিয়ে মাতলে আমরা তড়িঘড়ি ডিকশনারি দেখে তার বাংলা বের করে এই দেশেও বাংলায় সাহেবিয়ানা করি, সাহেব হওয়ার চর্চা করি। ভাবের সঙ্গে ভাবের মোকাবিলা করার তৌফিক আমরা প্রায় খুইয়েছি বলা চলে। নিজের ভাষার সঙ্গে আপনকার রুহের সান্নিধ্য আমরা এখন অনুভব করি কিনা সন্দেহ। ইংরেজের গোলামি আমাদের মাথাটা খেয়েছে। তিরিশের দশক থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এমন একটা শ্রেণীর বেগার

খাটছে যারা না ঘর কা না ঘাট কা। বাইরে থেকে আমদানি করা কোন কিছু আমরা ভোগ করলেও জিনিসটা তৈরি হয় কীভাবে তা আমরা জানি না। ঠিক তেমনি কোন নতুন ধারণা যদি ভোগ করি, তার তৈয়ারির কায়কারবার বা তৈয়ার করবার চিন্তা-প্রক্রিয়াটা আমাদের জ্ঞানা থাকে না। ফলে অনুবাদটা অভিধান খেঁটে শব্দ বসানো হয়। যে-প্রক্রিয়ায় ধারণাটি তৈরি হয়েছে তাকে নিরিখে রেখে বাংলাভাষায় নতুন শব্দ বানানো আমাদের তৌফিকে কুলায় না। যাকে দার্শনিকরা বলেন এনলাইটমেন্ট বা দীপ্তি—পাশ্চাত্যের সেই জ্ঞানের নূর বা আলোর সঙ্গে আমাদের কখনো সাক্ষাৎ মোলাকাত হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার প্রভাব তো দেরিদা কি রটির মধ্যে রয়েছে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, সমাজ গঠনের ভাবনায়, রাষ্ট্রচিন্তায়, অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনাসহ আর আর ক্ষেত্রে এনলাইটমেন্টের প্রভাব প্রবল। তাকে স্বীকার কি অস্বীকার, মান্য কি অমান্য, আলোচনা কি সমালোচনা—যে দিক থেকেই দেখি বা করি—এনলাইটমেন্ট আছে। গায়ত্রী deconstruction-কে অবিনির্মাণ অনুবাদ করে ডিকশনারি খেঁটে আক্ষরিক অনুবাদের কোশেশকে শাসালেন। অন্যদিকে অবিনির্মাণের ইয়া-বাচক দিকটা মনে করিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে দেরিদা এনলাইটমেন্ট বিরোধী কেউ নন—অবিনির্মাণ বা পোস্টমডার্নিজম আধুনিকতার প্রতিপক্ষ বগেল যে কুকথা রটে গিয়েছে তার সবটা যে ঠিক না তার ইঙ্গিতও এই অনুবাদে আছে। আমরা গায়ত্রী স্পিডাকের অনুবাদ এই সকল কারণে সায় দিয়ে থাকি। ডিকনস্ট্রাকশন বাংলায় অবিনির্মাণ।

জ্ঞানীদের যে কাজিয়ার কথা বলছিলাম দেরিদার অপর পক্ষ রিচার্ড রটি আমাদের দেশে অতো নাম হাঁকাতো পারেন নি। একটা কারণ হতে পারে যে তাঁর কথাবার্তা কোন নতুন সীলছাপড় পায় নি। তিনি ভাবনাচিন্তায় এক হিশাবে বেজায় মার্কিন। যখন যে কথা কাজে লাগে সেটা খাটাবার উপস্থিত বিবেচনা মার্কিন দেশে দর্শনের ইজ্জত লাভ করেছে। এর একটা দার্শনিক নাম আছে: Pragmatism। অনুবাদ কি? বলা যায়, অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থার দর্শন। ডিকনস্ট্রাকশন যতোটা শরিফ প্রচার পেয়েছে প্রেগমেটিজম ততোটা নয়। অবশ্য দর্শনের এই স্কুল রিচার্ড রটির নামের সঙ্গে নয়, বরং তাঁর গুরু জন ডিউই-র নামের সঙ্গেই বেশি যুক্ত।

দেরিদা আর রটির বিবাদ নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাতাম না। হঠাৎ ফকির লালন শাহের একটি অতি চেনা ও বহুবার গাওয়া গান ক্যাসেটে সম্পূর্ণ ভুলভাবে শুনে আমি আতংকিত হয়ে উঠেছি।

কিরণচন্দ্র রায়ের গান আমরা অনেকেই শুনেছি। খুব দরাজ ও ভারী সুন্দর গলা। গাইবার ভঙ্গিটাও সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দ বাড়লদের গায়ে হলদে-লাল স্যাকফরন রঙের কাপড় পরিয়ে একটা পেটেন্ট তৈরি করেছিলেন বহু আগে। কিরণ সেই রকম পোশাক পরে নেচে হেঁকে গান করেন। তাঁর গলায় ভুলভাবে লালন শুনে তো আমার মূর্ছা যাবার জোগাড়।

বাউল গান নামে এক ধরনের বিচিত্র জিনিস সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। এতে মুশকিল যে ভাবুক আর সাধকের গান যে নেহায়েতই বাউলিয়াপনা নয়, সেই ঝঁশ সকলেই হারিয়ে ফেলছে। কিরণকে শুধু শুধু দোষ দিয়ে লাভ কি? বাংলার সাধক আর ভাবুকদের গান প্রায় সবসময়ই গাওয়া হোত পল্লীসঙ্গীত হিসাবে। মাত্র কয়েক দশক ধরে মাঝে মধ্যে ‘বাউল গান’ নামে গাওয়া হয়। যার যেমন খুশি শব্দ বাক্য বদলিয়ে। ওপরের অন্তরা পরে, নিচের অন্তরা আগে—এইভাবে যা ইচ্ছা ওলোট পালট করে। তাছাড়া সুরের ভুল তো আছেই। কিন্তু সুর নিয়ে আমরা এখানে কথা বলব না।

ক্যাসেটে রেকর্ড করা লালনের গান। ভুল। কী আসে যায়? লালন গেয়েছিলেন ‘সত্য কাজে কেউ নয় রাজী সবই দেখি তা না না না/জাত গেল জাত গেল বলে একী আজব কারখানা’। কিরণচন্দ্র রায় ক্যাসেট করেছেন, ‘সত্য পথে কেউ নয় রাজী সবই দেখি তা না না না...’। অন্য কিছু বাদ দিলেও শুধু কাব্যস্বাদের কথা বিবেচনা করলেও বোঝা যায় ‘কাজে’ আর ‘রাজী’-র মধ্যে জ-মূলক অনুপ্রাস গানের মধ্য দিয়ে দেবার একটা ইচ্ছা হয়তো ফকির লালনের ছিল। ফলে যেখানে ‘কাজ’ শব্দটি ছিল, সেখানে ‘পথ’ নামক ভিন্ন ধ্বনির সুযোগ নাই। তাহলে ‘সত্য পথ’ কোথায় পেলেন কিরণ? পুরা গানটাই যে ‘পথ’ আর ‘কাজের’ ভেদ বিচার—সেই জ্ঞান ও ভাবগত প্রস্তাবনা অনুধাবনের মুশকিল কারো থাকতেই পারে। আমাদের ভাবের ঘরে না হয় তালা পড়েছে, কিন্তু কানের মাথা নিশ্চয়ই আমরা খেয়ে বসি নি।

কিন্তু আমি কান নিয়েও কথা বলতে বসি নি, ভাব নিয়েই এখন এখানে দোকান খুলব বলে খানিক পণ করেছি। ‘ভাব’ সম্পর্কে আমাদের যে ভাব সেই ভাব খানিক খণ্ডন করার ইচ্ছেও আছে। তাই ভাব থেকে প্রসঙ্গ তুলব রাজনীতির। দেখব ভাবের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতো অঙ্গঙ্গী। যদি সেটা দেখানো যায় তাহলে বোঝা যাবে ফকির-ফাকড়া আউল-বাউলদের জ্ঞানের কথাকে আমরা নেহায়েতই গান ভেবে নেচেকুঁদে গেয়ে বেড়ালেও ওগুলো ঠিক গান নয়। ফকিররা বলেন, এগুলো ‘আয়াত’। এগুলো তাঁদের ‘কালাম’। এবং সে কারণেই একটি শব্দ বা ধ্বনি থেকে ভাবোৎপাদন বা অর্থ তৈয়ার করতে তাঁরা দেহ-মন ক্ষয় করতে খুবই রাজি।

সত্য কাজে কেউ রাজি না, সকলেই তা না না না করে বেড়ায়। আর খালি খালি সকলেরই ‘জাত’ গেল ‘জাত’ গেল বলে হাহাকার। ভারি আজব এই কারখানা যেখানে ‘জাত’ তৈরি হয়। কেউ বর্ণকে তার জাতি পরিচয়ের চিহ্ন বলে মনে করে। বর্ণভেদে তারা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ করে। কারো কাছে তাদের ধর্ম তাদের জাতি পরিচয়ের মানদণ্ড। তারা ধর্ম ভেদে জাতির ভেদ করে: হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি। কেউ মনে করে তাদের ভাষা আর সংস্কৃতি তাদের জাতি পরিচয়ের লক্ষণ, সেই ভাবে জাতিতে জাতিতে মানুষ বিভক্ত। কেউ বাঙালি, কেউ পাঞ্জাবি, কেউ তামিল ইত্যাদি। কেউ তাদের ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে তাদের জাতি পরিচয়ের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন, বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইত্যাদি। জাত তৈরির এই ‘কারখানা’

আজব। জাতপাতের রাজনীতিকে শুধু হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা হিশাবে বুঝলে ফকির লালন শাহকে আংশিক বোঝা হবে। মানুষে মানুষে ভেদ তৈরি হয় এমন যে কোন পরিচয়েরই মুশকিল আছে। মানুষ অন্যের বিপরীতে নিজের একটা পরিচয় খাড়া করে, অন্যান্য মানুষকে তার ‘অপর’ বা প্রতিপক্ষ হিশাবে সাব্যস্ত করবার সংকট শুধু ভাবগত বা আত্মপরিচয়মূলক নয়। এর রাজনীতি আছে।

তবে পরিচয় নির্মাণের ইহলৌকিকতাকে লালন অস্বীকার করেন নি। সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সেটা উৎপাদিত হচ্ছে। জাতপাত তো সমাজের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে, তার বিনাশও সমাজের মধ্যেই ঘটবে। অতএব লালন জানেন তিনি চাইলেই মানুষের আত্ম পরিচয়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাগিদ ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারবেন না। মুশকিল যে সকলেই দাবি করে তার পরিচয়টাই সত্য পরিচয়, তার পথটাই নির্ভুল পথ, অন্যের পথটা মিথ্যা। অপরের পথটা স্লেচ্ছ, যবন বা কাফেরের পথ। ধর্মের ক্ষেত্রে সকলেই মনে করে তাদের পথটাই ঠাঁটি পথ। অন্য সকলকে অতএব তাদের পথেই চলতে হবে। বামপন্থীদের একদল মনে করে তাদের পথটাই সাদ্ধা বিপ্লবীর পথ। তেমনি ভাষা ও সংস্কৃতির আত্মপরিচয়টাই একমাত্র ঠাঁটি পথ—এর পক্ষেও যুক্তির অভাব নাই। ধর্মের পথ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুনিয়ায় রক্তক্ষয় কম হয় নি। ভাষা ও সংস্কৃতির দাপট প্রতিষ্ঠার জন্যও কম হয় নি। সত্য ও ঠাঁটি জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হিটলার কম কাণ্ড করেন নি। বাঙালি জাতি কিম্বা বাংলাদেশী জাতীয়তার ‘সত্য’ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কম রক্ত ঝরে নি। পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলো এখন তাঁদের সত্য পরিচয় আর সত্য পথ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইছেন। তাঁরা বলছেন তাঁরা ‘জুম্ম জাতি’। জুম্ম জাতির সত্য পথ হচ্ছে জুম্ম ল্যাণ্ড—জুম্ম জাতির একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ‘জাত’ সম্পর্কে ফকির লালন শাহের ধ্যানধারণার রাজনৈতিক তাৎপর্য বহুদূর বিস্তৃত। তাঁর মৌলিক প্রস্তাব থেকে এটা পরিষ্কার যে তিনি সকল প্রকার জাতীয়তাবাদ বা আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে বাতিল করেছেন। সকল পরিচয়ই তৈরি করা পরিচয়, নির্মিত জিনিস। ‘আবহমান বাঙালি জাতি’—যেমন একটি ধারণা, তৈরি জিনিস—ঠিক তেমনি ‘জুম্ম জাতি’-র ধারণাও একটি তৈরি জিনিস।

গানটি স্পষ্টতই তাহলে আমরা দেখছি জাতবিচার ও জাতিভেদের বিরোধী। মানুষকে যদি এই জাতিভেদ থেকে বের করে আনতে হয় তাহলে তাকে বিভিন্ন মত ও পথের ধাঁধা থেকে বের করে আনা জরুরি। সেই কারণে ‘পথ’ নয়, সত্য ‘কাজ’ বিষয়ে গান। বিভিন্ন মত ও পথের তর্ক বাদ দিয়ে দেশকালপাত্র নির্দিষ্ট মূহূর্তে সুনির্দিষ্ট ‘কাজ’ নিয়ে লালনের গান। ‘কাজ’ মাত্রই বিশেষ (particular)—দেশকালপাত্রের সুনির্দিষ্ট ভাবে নিজের কর্তারূপের আবির্ভাব ঘটানো। একক হওয়া বা নিজেকে বিশেষ মূহূর্তে অনন্য (singular) করে তোলা, নিজেকে ‘মানুষ’ জ্ঞানে সামান্য (universal) করে রাখা নয়। কিন্তু যখনই কোন কিছুকে জ্ঞানের বিষয় হিশাবে ‘সত্য’ বলে আমরা দাবি করি আমরা তাকে সামান্য বা সার্বজনীন সত্য বলেও দাবি করি। ‘কাজ’ জ্ঞানের বিষয় নয়, করার বিষয়।

যদি আত্মপরিচয়ের রাজনীতিটা আমরা বুঝি তাহলে আমাদের বিভক্ত সমাজের সংকটের সাধারণ চরিত্রও আমরা ধরতে পারব। অনেকের ধারণা বাঙালি আর বাংলাদেশী জাতিতত্ত্বের সঙ্গে বুঝি ঘোর কোন বিবাদ আছে। আসলে মোটেও নাই। আত্ম পরিচয়ের রাজনীতির দিক থেকে মৌলিক কোন ফারাক তো অবশ্যই নাই। প্রথম দল ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নামে ঊনবিংশ শতাব্দির প্রবল সাম্প্রদায়িক হিন্দু বাঙালির ভাষা 'ও সংস্কৃতিকেই এই দেশের মানুষের পরিচয় বলে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর, অপর দল প্রকট মুসলমানি সাম্প্রদায়িকতাকেই তার আত্ম পরিচয়ের সত্য বলে হাজির করে। ফলে এই উপহাদেশের বাস্তবতার মধ্যে ইসলামের যে একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, তেমনি ইতিহাস আছে ধর্ম, ভাষা, ভাব, আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনীতির—ইত্যাদিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করবার কাজ উভয়েই বাদ দেয়। আত্মপরিচয়ের সত্য তৈরি করতে গিয়ে মুসলমানিত্বকে হিন্দুত্বের বিপরীতে খাড়া করে—নিজেদের এই উপহাদেশেরই ঐতিহাসিক অতএব সাময়িক মুহূর্ত হিসাবে দেখতে আর সক্ষম হয় না—যার যার সত্যকে শাস্ত্র ও চিরায়ত সত্য বলে গণ্য করে। এই মুহূর্তকে অনুধাবন এবং আত্মপরিচয়ের এই মায়া ও অবিদ্যা থেকে মুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের জায়গাগুলো তৈরির আগামি সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য মানুষের কাজটা কি—সেই 'কাজ' কোন পক্ষই আর শনাক্ত করতে পারে না। দুই সত্যের মীমাংসা তো দুই পক্ষের সত্যের দাবির জায়গায় দাঁড়িয়ে মীমাংসা হবে না। আত্মপরিচয়ের বিভেদ দিয়ে নিরসন হবে না।

কেউ যদি ধর্মের সঙ্গে নিজের আত্মপরিচয়কে যুক্ত করে তবে তাকে আমরা সাম্প্রদায়িক বলি, কিন্তু ভাষা আর সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মপরিচয় যুক্ত হলে সেটা সাম্প্রদায়িক হয় না। আত্মপরিচয়ের এই দুই মানদণ্ডে দুই রকম সম্প্রদায় তৈরি হয়। ধর্মের ভিত্তিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়, আর ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভাষাভিত্তিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পরিচিত সম্প্রদায়। কিন্তু ঠিকই তো সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক হওয়া যদি গুনাহ হয় তবে ভাষার ভিত্তিতে সম্প্রদায় অপরাধ হবে না কেন? প্রশ্ন হোল, ইতিহাসের এক একটি সময়ে আত্মপরিচয়ের নানান ধারণা কেন তৈরি হয়? এক একটি জনগোষ্ঠী কেন বিশেষ ধারণাকে তাদের আত্ম পরিচয়ের সত্য 'সত্য' জ্ঞান করে এবং রক্তপাত, সংগ্রাম, গণহত্যা এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে মাতো? এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল এই পরিচয়ের বিভেদ অতিক্রম করে যাবার সত্য কাজটা কি?

ধর্মীয় আত্মপরিচয় আর ভাষা আর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভালমন্দ বিচারও এখানে আমরা করব না। দুটোই রক্তাক্ত কায়দায় বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎপাদনে সক্ষম। পাকিস্তান আমলের ধর্মীয় পরিচয়ের নামে গণহত্যা আর বাংলাদেশ আমলে ভাষা আর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হত্যার প্রক্রিয়া এই ক্ষেত্রে তুলনীয়। আত্মপরিচয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থসহ আরো নানান ফিকির কাজ

করে। আত্মপরিচয়ের চেতনা তো নেহায়েত চেতনার ব্যাপার নয়, তার বৈষয়িক দিক তো অবশ্যই আছে। এ যাবতকাল আমরা বর্ণ, ধর্ম, গায়ের চামড়া, চুল ও চোখের রঙ এবং ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে জাতি পরিচয় নির্ণয় দেখেছি। জুম্ম জাতি তাঁদের পরিচয় বিশেষ ধরনের চাষের পদ্ধতি দিয়ে নির্ণয় করতে চাইছে। আত্মপরিচয়ের এ এক নতুন মানদণ্ড। বিশেষ সময়ে এবং ইতিহাসে কেন আত্ম পরিচয়ের বিশেষ বিশেষ ধরন তৈরি হয় তাকে ঐতিহাসিক ভাবেই বিচার করার দরকার আছে। আমাদের প্রসঙ্গ সেটা নয়। ‘সত্য পথ’, ‘সত্য পরিচয়’ প্রভৃতির বিপদের দিকে নজর ফেরানো আমাদের উদ্দেশ্য। নানান পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত ও চর্চিত রাজনীতির সাধারণ দিকগুলো বোঝার চেষ্টা অবশ্যই দরকার। কিন্তু ফকির লালন শাহ বোঝাবুঝির জায়গায় থাকতে চাইছেন না। বোঝাবুঝিও হয়তো তাঁর কাছে তা না না না। তাঁর কাছে ‘কাজ’-টা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বোঝাবুঝিও হতে হবে বিশেষ কাজের কথা মনে রেখে। কী করে জাতপাত আত্মপরিচয়ের বিভেদ, হিংসা হানাহানি অতিক্রম করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবো আমরা? আমরা কী হয়ে আছি সেটা সত্য নয় ফকির লালন শাহের কাছে, আমরা কী হতে চাই এবং সেই হয়ে ওঠার জন্য আমাদের ‘কাজ’-টাই সত্য। কেন তাপস ও সাধক, অলি আউলিয়া, ফকির-ফ্যাকড়া বা আউল-বাউল সকল প্রকার জাতীয়তাবাদের রাজনীতি বাতিল করে দিয়েছিলেন তার ইঙ্গিত এখানে আমরা পাই। সত্যের সার্বজনীনতার বিপরীতে ‘সত্য কাজে’-র বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের দিকে তাঁরা আমাদের নজর ফেরাতে চেয়েছেন। সত্যের দাবিকে অবিদ্যা বলে পরিহার করেছেন।

এটা পরিষ্কার যে ‘সত্য’ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা ভাবগত ধারণার সঙ্গেই সাধারণ ভাবে রাজনীতির এবং বিশেষ ভাবে আত্মপরিচয়ের রাজনীতির বরাবর সম্পর্ক। সরাসরি। আত্ম পরিচয়ের সত্য শুধু জ্ঞানগত ভাবে নির্ণয় হয় না। আমরা নিজেদের যে বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি আমাদের আত্ম পরিচয়ও আগে থাকতে হাজির এই ধরণের সামাজিক বা ধর্মীয় বাস্তবতা থেকে তৈরি হতে পারে। কেউ ‘হিন্দু’ হয় হিন্দু পরিবারে বা কেউ ‘মুসলমান’ হয়েছে মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছে বলেই। আত্মপরিচয়ের সত্য এখানে দৃশ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে তৈরি। ঠিক তেমনি কেউ বাঙালি হয়েছে বাঙালি হিশাবে। কিম্বা ভারতীয় হয়েছে জন্মসূত্রে ভারতের নাগরিক বলে। তাহলে লালনের জাতপাত বিরোধী তত্ত্বের আরেকটি মানে হচ্ছে আমরা যা দেখছি বা যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদের বিশেষ দেশ কালে পাই সেটা আমাদের সত্য পরিচয় নয়। বর্তমান আমাদের শেষ বা একমাত্র পরিচয় নয়। মানুষ গতকাল যা ছিল আজ আর তা নাই এবং আগামী দিনেও সে এখনকার মতো থাকবে না। তাহলে জ্ঞানগত ভাবে সত্য নির্ণয়ের বিচার বাংলার ভাবান্দোলনের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক তেমনি বর্তমানকেই সত্য বলে মেনে নিতে তার আপত্তি। যদি বর্তমানকে মেনে নিতে হয় তাহলে জাতপাত, শোষণ বঞ্চনা

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, নিপীড়ন, যুদ্ধ বিগ্রহ সহিংসতা সব কিছুকেই ‘সত্য’ বলে মনে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে থেকে মানুষ ভবিষ্যতে কী হয়ে উঠতে চায় সেই ভাব, কল্পনা বা সংকল্পই সত্য নির্মাণ করে আর সেটা শুধু ভাব, কল্পনা বা সংকল্প থাকলেই সত্য হয়ে উঠছে না, তাকে কর্তারূপে বা কাজ হিশাবে আমাদের হাজির করতে হবে। জাতপাত বলে কিছু নাই এই জ্ঞানগত সিদ্ধান্তের মধ্যে সত্য নাই, জাতপাতকে অসম্ভব করে তোলার কাজের মধ্যেই সত্য নিহিত। কাজের দিক থেকে ভাবচর্চা এই গুরুত্ব অপরিসীম।

ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করার একটা শক্ত ধারা আছে আমাদের দেশে। ধর্ম বলতে আমরা নিজেরা যা বুঝি, আর আশে পাশে যা দেখি তাকে আমরা জ্ঞানের সত্য বলে আমল করি না, বরং নেহায়েতই বিশ্বাস বলে নাকচ করে থাকি। ধরে নিয়ে থাকি যে ধর্মকর্ম করা নেহায়েতই বিশ্বাসের ব্যাপার, ওর মধ্যে বুঝি মানুষের চেতনা বা জ্ঞানের কোন ভূমিকা নাই। বলা হয়ে থাকে ধর্ম তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা মানুষের জ্ঞান-প্রক্রিয়া থেকে নয়, বাইরে থেকে আমদানি করে। যাকে ইনটুইশান বা স্বজ্ঞা বলে বুঝতে চান দার্শনিকেরা। স্বজ্ঞা অসত্য নয়, কিন্তু তার সত্য জ্ঞানবিচার দ্বারা নির্ণয় করা হয় নি—অতোটুকুই তার ধর্মের সত্যের সঙ্গে জ্ঞানবিচারি সত্যের ফারাক। ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণাকে আলাদা করে বোঝার জন্য একে ধর্ম না বলে অনেকে ধর্মতত্ত্ব (theology) বলে থাকেন। অন্য দিকে ধর্মবিরোধীরা আবার ঘোরতর ভাবে ধরে নেয় যে তাদের জ্ঞান চর্চার মধ্যে কোন আগাম বিশ্বাস বা আগেই ধরে নেওয়া কোন পরিকাঠামো কাজ করে না। তারা তাদের জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি—অর্থাৎ বাইরে থেকে আমদানি করা অনুমান বা গোড়ার সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে হয় অসচেতন থাকে অথবা মিথ্যা বলে। তাছাড়া তর্ক তো করাই যায় যে আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রক্রিয়া আদৌ আমাদের সত্য ধারণা তৈরিতে বা সত্য বাক্য উৎপাদনে সক্ষম কিনা। যুক্তি বুদ্ধি ইত্যাদি সত্য নির্ণয়ের একমাত্র পথ এই চিন্তা তো এক ধরনের বিশ্বাস। ধর্মতত্ত্বের মতোই বুদ্ধির সার্বভৌমত্বে ইমান রাখার মতো ব্যাপার। যুক্তি তর্ক বুদ্ধিই শুধু সত্য নির্ণয় করতে সক্ষম এই ‘বিশ্বাস তাহলে ধর্ম বিশ্বাস থেকে কীভাবে আলাদা? এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। সেই তর্কে আমরা যাচ্ছি না। বিশ্বাস সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে, আত্ম পরিচয়ের হানাহানির বিভেদের রাজনীতির গোড়ায় এই বিশ্বাস থাকতে পারে। এতোটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে আল্লায় বিশ্বাস করা আর নিজের বুদ্ধির ওপর নিরংকুশ বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে যতোই পার্থক্য থাকুক, উভয়ের প্রধান মিল ঐ বিশ্বাসেই। বুদ্ধির জায়গায় আল্লাকে বসানো আর আল্লার জায়গায় বুদ্ধিকে বসানো। এই গভীর মিলটা যেন আমাদের নজর থেকে আড়াল না হয়। ফকির লালন শাহ যখন ‘সত্য’-কে জ্ঞানের বুদ্ধির বা যুক্তির সত্য না বলে কাজের সত্যের দিকে আমাদের নজর ফেরাচ্ছেন তখন বুঝতে হবে একই সঙ্গে বিশ্বাসের সত্যের ওপরও তিনি দাঁড়ান নি। তিনি যাকে ‘আল্লা’ বলে ডেকেছেন তাঁকে আহ্বান করেছেন বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে

অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও সংকল্পের নিরাকার নিরিখ আকারে। ভাবুকতা বা দর্শনের জগতে এই আত্মান একদমই নতুন। তাঁর নামাশ্রয় বা জিকিরের তাৎপর্য এই ‘সত্য কাজ’ থেকে বোঝার একটা কর্তব্য রয়ে গেছে আমাদের।

আত্মা আছেন—ধর্মের এই সত্য যদি আমরা নেহায়েত বিশ্বাস বলে বাদ দেই তবুও সত্য সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে সত্য আছে, এবং মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার বিবেচনা সেই সত্যকে নির্ণয় ও ধারণ করতে সক্ষম। এই অনুমান থেকেই আত্মপরিচয়ের সত্যও নির্ণীত হয়। সেই সত্য সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়ভাব তৈরি হয়। ওর জন্যে আমরা নিজের রক্ত দিতে ও অন্যের রক্ত নিতে প্রস্তুত হয়ে যাই। প্রত্যেকের আত্মপরিচয়ের সত্যই তার সত্য পথ হয়ে ওঠে। সেই কারণেই বলেছি সত্যের ধারণার সঙ্গে আত্ম পরিচয়ের রাজনীতির বরাবর সম্পর্ক আছে।

ফকির লালন শাহের জ্ঞান, ভাবুকতা বা শিক্ষার প্রথম কলেমা হচ্ছে এই যে ‘সত্য’ বলে আগেই হাজির থাকা কিছু নাই। ফলে ধর্ম, সংস্কৃতি, তত্ত্ব, মতবাদ কিংবা দর্শনের নামে কোন প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, হানাহানি ও রক্তক্ষয় নেহায়েতই সাম্প্রদায়িকতা চর্চার অধিক কিছু হতে পারে না। অতএব সত্য পথ বলেও কিছু নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ভাবুকের জীবন যাপন, সমাজে আর আর সকলের সঙ্গে সম্পর্ক, ভাবের যিনি কাঙাল তাঁর ভ্রমণ, বিচরণ, অনুভব, দেখা, শোনা, উপলব্ধির ও চিন্তার ক্ষমতা, চলাফেরা আচার আচরণ, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি এক একটি কালের উপযোগী ভাব তৈরি করে। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যাবার—লালনের ভাষায় ‘পার’ হয়ে যাবার, অতিক্রম করে যাবার ভাব। ভাবের সঙ্গে বৈষয়িক জীবন ও আচার আচরণের সম্পর্ক সরাসরি। ‘ভাব’ মানে সত্য নয়। নিশ্চয়-জ্ঞান নয়। কিন্তু ভাব মানে আবার মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক কোন অবস্থাও নয়, যে অর্থে আমরা সাধারণত শব্দটিকে ব্যবহার করি। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, আবেগ, ভালবাসা, নিজের ভেতরে বাইরে ‘অপর’ যে-সত্তাকে আমরা টের পাই তার নামে আশ্রয়, জিকির ও তার ডাক—ইত্যাদি নানান বস্তির সামগ্রিক একটা অবস্থা। তিনি প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বর্তমান রূপকে যেমন পরিত্যাগ ও পরিহার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার সত্যের রাজনীতির দাফনও একই সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। ঠিক এই কারণেই তাঁর নিজের কালাম বা আয়াতকে তিনি কখনো তত্ত্ব, মতাদর্শ, কোন বিশেষ বাউল পন্থা বা ঘর আকারে প্রতিষ্ঠা করেন নি। বিদ্যমান ধর্ম বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন নি, কারণ ভবিষ্যতের জন্য নতুন ভাব, নতুন ধর্ম, বা নতুন প্রতিষ্ঠান আবির্ভাবের সম্ভাবনার জন্য কাজ করে যাওয়ায় ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভয়ও করতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যরা তাঁর ভাবনাকে কবীর বা নানকের মতো ধর্মসম্প্রদায়ের রূপ দেবার চেষ্টা করতে পারে। সম্ভবত এই বিবেচনা থেকে নিরঙ্কর শিষ্যশাবকদের বাইরে শিক্ষিতদের তিনি তাঁর ধারে কাছে আসতে দেন নি। রামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দের মতো শিক্ষিতের গুণে এখন ধর্ম সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন,

তেমনি শিক্ষিতদের পরিহার করে লালন তাঁর ভাবকে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতার হাত থেকে রক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন।

আগে থেকেই হাজির কোন সত্য নাই, অতএব কোন সত্য পথও নাই। কেউই দাবি করতে পারে না তার পথই সত্য পথ। কোন ধর্ম, কোন তত্ত্ব, কোন বিজ্ঞান বা মতাদর্শ নিশ্চয় ভাবে বলার ক্ষমতা রাখে না যে তার পথটাই নিশ্চিত ভাবে সত্য পথ। সত্যের রাজনীতি নাকচ করার তাৎপর্য অনেক অনেক দূর বিস্তৃত। অথচ লালনের এই মৌলিক প্রস্তাবকে কী ভাবে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিয়েছেন কিরণ চন্দ্র রায়। ‘সত্য ক্যাজে কেউ নয় রাজী’ কথাটিকে গেয়েছেন ‘সত্য পথে কেউ নয় রাজী...’

কোন প্রকার সত্য পথে কাউকে রাজি করানোর বাসনা দূরে থাক, কোনটা ভাল আর মন্দ, কাকে পাপ বলে আর পুণ্য কী জিনিস, এইসব ভেদ নিয়েও লালন মশকরা করেছেন। ‘পাপ পুণ্যের কথা আমি কাহারে শুধাই/এক দেশে যা পাপ গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তাই’। তিব্বতে এক মেয়ের বহু পতি। যদি এই বাংলাদেশে এক মেয়ের বহু স্বামী থাকত তাহলে তাকে ব্যভিচারী হিসাবে দণ্ড পেতে হতো। যেখান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বা ইতিহাসের বাইরে পাপ পুণ্যেরই ভেদ নির্ণয় অসম্ভব সেখানে আবার বিদ্যমান বাস্তবতার বাইরে শাস্ত ‘সত্য পথ’ কিসের? এক দেশে এক মেয়ের অনেক পতি, আর অন্য দেশে এক মেয়ের এক স্বামী—তাহলে সামাজিক বিধান, আইন, সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্ক কীভাবে ঠিক হবে? লালন বলছেন :

‘দেশ সমস্যা অনুসারে
ভিন্ন বিধান হতে পারে
লালন বলে এই ভেদ জানলে
পাপ পুণ্যের আর নাই বলাই॥’

সমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন বিধান হতে পারে। ভিন্ন নিয়ম, ভিন্ন আইন হতে পারে। পাপ আর পুণ্য বলে কিছু নাই এই কথা তিনি বলছেন না। তিনি বলছেন, ‘পাপ পুণ্যের কথা আমি কাহারে শুধাই?’ কাকে তিনি প্রশ্ন করবেন? প্রত্যেক সমাজেই কোন কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে সেই বিশেষ সত্যের রাজনীতি কায়ম রয়েছে। পাপ আর পুণ্য সম্পর্কে এক এক সমাজের এক এক সত্য। তাহলে কার কাছ থেকে তিনি খাঁটি সত্যটা জানবেন। এটা সম্ভব নয়। তিনি বলছেন যদি পাপ পুণ্যের সত্য মানদণ্ড থেকে থাকে এক দেশে যা পাপ অন্য দেশে তা পুণ্য হয় কি করে? বলছেন, এই ভেদটা জানলে পাপ পুণ্যের কোন ‘বলাই’ থাকে না। জ্ঞান বা ভাবের জগতে ‘বলাই’ না থাকা আর সমাজ থেকে পাপ পুণ্যের ভেদ তুলে দেওয়া এক কথা নয়। সেই কারণে সমাজ ভেদে ভিন্ন বিধান হতে পারে। কিন্তু এই হোল পাপ আর অই হোল পুণ্য, এই হোল সত্য আর অই হোল মিথ্যা—এই প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান বা সত্যের রাজনীতির তিনি বিরোধী ছিলেন। পাপ আর পুণ্যের ভেদ সাফ সাফ নির্ণয় হয়ে গিয়েছে এমন কোন সত্য সমাজ নাই। অতএব সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সত্য পথও নাই। অতএব

কখনোই, কোন অবস্থাতেও, কোনভাবেই লালন কাউকে ‘সত্য পথের’ ডাক দেবেন না। অসম্ভব। তিনি কক্ষণেই বলবেন না, ‘সত্য পথে কেউ নয় রাজী...’। কিসের সত্য পথ? সে কারণেই কিরণচন্দ্র রায়ের ভয়াবহ ভুলভাবে গাওয়া লালনের গান শুনে আতংকিত হয়েছি।

সত্য পথ যদি না থাকে, তাহলে কি লালনের চিন্তার কোন রাজনৈতিক চর্চা অসম্ভব? ঠিক এখানেই আমি তাঁর সঙ্গে দেরিদা আর রটি’র বিতর্কের সূত্রটা বোঝার চেষ্টা করছি। সত্যের রাজনীতি লালন নাকচ করছেন, কিন্তু ‘দেশ সমস্যা অনুসারে’ বিধান যদি হয়, তাহলে তাঁর আপত্তি নাই। কিন্তু সবচেয়ে মৌলিক যে প্রশ্নাব তিনি করছেন তা হোল সত্য থাকুক আর না থাকুক, ‘সত্য কাজ’ বলে একটা ব্যাপার আছে, যাকে শুধু ধর্ম কথা বলে, তত্ত্ব কথার কচকচি দিয়ে আর ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধন করা যায় না। সেটা লালনের ভাষায় ‘করণ’ বা করার ব্যাপার। কিম্বা গানে যেমন আছে—‘সত্য কাজ’ করার জন্য রাজী হওয়ার ব্যাপার। তা না না না করে কাজ হবে না। সত্য নাই, নিশ্চয় জ্ঞান বলে কিছু নাই, সবকিছুই ভাব আর ভাষার খেলা এই কথা বলে কেউ তো খাওয়া বন্ধ করে দেয় নি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও কেউ বন্ধ করে নি। লালন শুধু সত্যের রাজনীতিকে নাকচ করছেন না, সত্যের রাজনীতির পাল্টা করণ বা কাজের রাজনীতির প্রস্তাব করছেন। সত্য পথ না থাকুক, কিন্তু ব্যক্তির যেমন দৈনন্দিন জীবন যাপনের কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ আছে, তেমনি প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি কালে এক একটি সত্য, করণ, কাজ বা কর্তব্য থাকে। সেই কাজটা করতে রাজি থাকতে হবে। কী সেই কাজ? কে সেই কাজ ধরিয়ে দেবে? গুরুবাদী ধারার মানুষ হিশাবে লালনের কাছে তিনি হলেন রক্তমাংসে হাজির গুরু। সেই কাল ও হাল বুঝে যে—কাজটি করা দরকার তার জন্য শরীর আর মন নিযুক্ত করার কর্তব্য নিয়ে তা না না না করার ঘোর বিরোধী ছিলেন লালন। ফকির ছিলেন বটে, তবে ঘোর কর্মবাদী ছিলেন এটা অবশ্যই মানতে হবে।

অন্যান্য পার্থক্য ছাড়াও জাক দেরিদা বা রিচার্ড রটি’র সঙ্গে ফকির লালনের পার্থক্য হচ্ছে এই গুরু ভাবনায়। বাক্য নানান অর্থ তৈরি করে অতএব বাক্যে সত্য নিহিত নাই। সত্য যদি অনন্য হয় তাহলে বাক্যে আমরা একটি অনন্য অর্থ যেহেতু পাই না অতএব ‘সত্য’ সংক্রান্ত ধারণা এই কালের ভাষা দর্শনের কাছে প্রশ্ন বিদ্ধ। ফকির লালন শাহ জগতকে টেন্সটমাত্র দেখেন না—জগতকে গুরুময় দেখেন এবং গুরুবাক্য মান্য করা ও গুরু নির্দেশ মতো কাজ করা শিরোধার্য গণ্য করেন। তাহলে তাঁর ‘কাজ’ একই সঙ্গে গুরু নির্দেশও বটে। দেরিদা বা রটি যেখানে ডিকনস্ট্রাকশন বা প্রাগমেটিজম রাজনীতির কোন ভিত্তি বা দিকনির্দেশনা দিতে পারে কিনা তর্ক করছেন, ফকির লাকন শাহের কাছে সেটা কোন সমস্যা নয়। কারণ রাজনীতির বা কাজের ভিত্তি বা নির্দেশনা রক্তমাংসের শরীর নিয়ে হাজির আছেন ভক্তের সামনে। এখানে গুরুবাদী রাজনীতি সম্ভব। গুরু নির্দেশিত কর্মের বাস্তবায়ন সম্ভব—সত্য বা কাজ নির্ণয় তখন নিছকই ভাষার দর্শনের ব্যাপার হয়ে আর থাকে না।

সত্য কাজে কেউ নয় রাজী...। এখানে সত্য কাজ কথাটা তাহলে অসাধারণ দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যে ভরপুর। এখানে তার সকল দিক আলোচনা সম্ভব নয়। অগেই বলেছি, কাজ সবসময়েই কোন না কোন বিশেষ সময়ের কাজ। যখন কাজটি করার কথা ঠিক তখনই সেটা শেষ করা দরকার। ফলে কাজের রূপ সবসময়ই ‘বিশেষ’ (particular) রূপ। ‘সামান্য’ বা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি universal—সেই ধর্ম, তত্ত্ব, আত্মপরিচয় সবসময়ই ‘সামান্য’ বা ইউনিভার্সালের রূপ পরিগ্রহণ করে। কিন্তু কাজ সবসময়ই বিশেষ। সত্য কাজে লালন আমাদের রাজী করাতে চাইছেন এই কারণে যে ধর্ম, তত্ত্ব, আত্মপরিচয় বা যে কোন সত্যের রাজনীতি আমাদের বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে নেয়, আমাদের বিচ্যুত করে। আমাদের বিশ্বাসের বা চিন্তার বিমূর্ত সিদ্ধান্তগুলো শাস্ত সত্য বলে আমাদের ওপর চেপে বসে, অবিদ্যার অন্ধকারে আমরা ঘুরপাক খেতে থাকি। কিন্তু কাজ আমাদের উল্টো দিকে নেয়। কাজ আমাদের নেয় সামান্য থেকে বিশেষের দিকে, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে যে বিশেষ কাজটি করা দরকার সেই কাজটি করতে যেন আমরা রাজী থাকি, ফকির সেই দিকটার ওপর জোর দিচ্ছেন।

কাজ করতে গিয়ে আমরা কোন চিন্তা করি না তা হয় না, কিম্বা চিন্তা করা কোন কাজ নয়—এই কথাই লালন বলছেন না। সত্য চিন্তা, দর্শন, পথ বা আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতি লালন নাকচ করেন ঠিকই, কিন্তু ভাব, চিন্তা, কল্পনাসহ মানুষের কোন সচেতন বা সজ্ঞান বৃত্তিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। মানুষের এই স্বভাব বা বৃত্তিকে তিনি কাজ থেকে আলাদা করে বিচার করেন নি। রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে নিজের প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক পরিচয় অনুসন্ধানের তাগিদও কক্ষণে অস্বীকার করেন নি। নিজের প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক পরিচয় অন্বেষণ শুধু ইতিহাসের মধ্যে নয়, প্রকৃতি অবধি প্রসারিত। সেখানে মনুষ্য প্রজাতির কীভাবে উদয় ঘটল, সেই প্রশ্নকে আরো গোড়া থেকে তোলাই তাঁর রীতি। প্রশ্ন হোল, ‘আমি’ নামক ব্যাপারটার কীভাবে উদয় ঘটল? কারণ এই ‘আমি’-র উদয়ের সঙ্গেই মানুষ ও প্রকৃতির ভেদের শুরু। মানুষ কোথা থেকে আসল এই প্রশ্নটাও তো এই ‘আমি’-ই করে। তাহলে ‘আমি’-র উদয় না জানলে মানুষ কোথা থেকে আসল এই প্রশ্নের কোন সুবাহা হয় না। মানেও হয় না। এই ভাষা সম্পন্নতা—কথা, প্রশ্ন করা ও নির্দেশ বা বিধান দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন ‘আমি’ এলো কোথেকে? কী করে তার উদয় হয়? তাঁর আরেকটি গান:

একে বহে অনন্ত ধারা

তুমি আমি নাম বেওয়ার, ভবের পরে

লালন বলে, আমার আমি জানলে বাধা যেত দূরে

সাঁইর নীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন করে ! !

একের মধ্যে—রক্তমাংসের প্রতিটি বিশেষ মানুষের মধ্য দিয়েই ‘অনন্ত ধারা’ বইছে। একান্তের মধ্যেই অনন্ত। প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক ধারা—যেভাবেই আমরা

অনন্তকে ব্যাখ্যা করি না কেন—তার প্রকাশ বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে। আর মানুষগুলো ‘তুমি’, ‘আমি’ নাম নিয়ে পরস্পরের ‘বেওয়ারা’ বা অপরিচিত হয়ে থাকছে। লালন বলছেন, যদি ‘আমি’ আমার এই ‘আমি’-কে জানতেই পারতাম তাহলে তো সকল বাধা দূরেই চলে যেত। এই ‘বাধা’ বা যাকে এখন দার্শনিকরা বলছেন *aporia* তাকে কি অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব? এটা প্রশ্ন। দেরিদা আর রিচার্ড রটি দুজনের কাছেও প্রশ্নটা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। ফকির লালন প্রশ্নটা ধরেছেন, উত্তর তিনি পুরোটা দিয়েছেন সেই দাবি করবো না। পাশ্চাত্যে প্রশ্নটি এখন যে কায়দায় তোলা হচ্ছে তার সঙ্গে লালনের মিলের দিকটা শুধু উল্লেখ করছি।

জাতি, ধর্ম, আত্মপরিচয়ের রাজনীতি যদি নাকচ হয়ে যায় তার মানে কি এই যে আমরা জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াবো না? অন্যায়, বঞ্চনা, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো না? অবশ্যই। এই লড়াইটা হচ্ছে সত্য কাজ। এক একটা মুহূর্তে এক একটি কাজ কর্তব্য হিসাবে হাজির হয়। সেই কাজ করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমরা এড়াতে পারি না। সেই কাজ আগেই নির্ণীত কোন সত্য বা পথ প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়। যদি সত্য কাজ এবং সত্য পথের ফারাক করতে না পারি তাহলে প্রতিটি কাজকেই মনে হবে পূর্ব নির্ধারিত কোন তত্ত্ব বা পথ প্রতিষ্ঠার লড়াই। জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখন হয়ে দাঁড়ায় কোন না কোন জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াই। যার রূপ শেষাবধি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। যা ঐক্যের দিকে নয়, কেবলি মানুষকে বিভেদের দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে সত্য কাজে রাজী থাকা ও সেই কাজ সাধন মানুষের অপার সম্ভাবনাকেই কেবল বিকশিত করে তোলে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখি, জাতীয়তাবাদ আর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি জনগোষ্ঠীর মুক্তি সংগ্রাম এক জিনিস নয়। প্রথমটি পূর্ব নির্ধারিত পথ প্রতিষ্ঠার দাবি, দ্বিতীয়টি সংগ্রাম বা কাজ।

ব্যক্তি হোক বা কোন জনগোষ্ঠী হোক—কারো ওপর নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাকে আমরা বিচলিত হই ও সাড়া দেই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, কিম্বা জাতীয়তাবাদের সত্য কায়েমের জন্যেও নয়। ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়তাবাদ দুটোই বুদ্ধির ঘরে তৈরি হওয়া জিনিস। ডাকে সাড়া দেই কারণ এই ডাক হচ্ছে এক ‘অপর’ আমির প্রতি আমার সাড়া যে অপরকে লালন কখনো সাঁই, কখনো এলাহি আলামিন, কখনো গৌর—এই নানান নামে সম্বোধন করেছেন। এই ‘অপর’ বাইরের কোন ব্যক্তি নয়, তাহলে তো সাড়া না দিয়েও থাকা যেত। এই ‘অপর’ আমার আমির ভেতরকারই অপর। এই ‘অপর’-কে লালন যদি চিনতে পারতেন তাহলে তো তাঁর সকল জ্ঞানই হয়ে যেত। সেই সাড়াকে আমরা নৈতিক কারণে সাড়াও বলতে পারি না, যে অর্থে আমরা নীতি বা *ethics* ব্যাপারটিকে সাধারণত বুঝে থাকি, অর্থাৎ যাকে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা-জ্ঞানের কোন পরিচিত কাঠামো দ্বারা নির্ণয় করা হয় এবং যার ভিত্তিতে সংবিধান, আইন ও সামাজিক অনুশাসন তৈরি হয়। অপরের ডাকে সাড়া দেওয়ার ভিত্তি জ্ঞানকাণ্ডে নয়—ফলে কোন

তৈরি করা নীতিবাদে, আইন বা সংবিধানে সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই ডাক যখন আসে তখন আমার নিজের ‘আমি’ সম্পর্কে আমি নিজেই ঘোরতর সন্দিহান হয়ে পড়ি। যে ‘আমি’ ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আমার স্বাধীনতা, নিজের সার্বভৌম সত্তা সম্পর্কে সচেতন বা অচেতন ভাবে আমার একটা নিশ্চিত্ত ভাব থাকে সেটা অপরের ডাকে টলমল করে ওঠে। আমার সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিচ্যুত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়। ফকির লালন শাহের দিক থেকে যদি সত্য কাজের কোন ভিত্তি আমরা স্বাক্ষর করি তবে তাকে সজ্ঞান বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, তাকে বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করাও চলে না। তার অভিমুখ কোন সত্য পথের দিকে নয়। এই ডাক বুদ্ধি, সচেতনতা বা জ্ঞানেরও আগের আহ্বান। সকল প্রকার জাতীয়তা বা আত্মপরিচয়ের রাজনীতির ঘোর বিরোধিতার সবচেয়ে বড়ো কারণ হোল নিজের ‘আমি’-কে যখন কোন একটা তৈরি করা পরিচয়ের পোশাক আমরা পরাই তখন তার কানেও আমরা তুলা দেই। তখন অন্য পোশাক পরা সকলেই আমার অপরিচিত হয়ে যায়, মনে হয় তারা অন্য সত্তায় তৈরি, তাদের ভাষাও ভিন্ন। সেই পোশাক পরে অপরের ডাক আর আমরা শুনতে পাই না। যে ডাক আমাকে সত্য কাজ চর্চার ডাক দেয় সেই ডাক কোন পথের ডাক নয়। সে আমার নিজেরই ডাক। তাকে কোন জ্ঞান, কোন মানব মুক্তির দর্শন, কোন বুদ্ধি, কোন সংবিধান, কোন আইন ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ সবসময়ই সেই ডাক জারি থাকা সমাজ, সংবিধান, রাষ্ট্র ও প্রচলিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে ও নতুন ভাব সমাজে তৈরি করে।

কেন? কারণ ‘অপর’ যে কখনোই পুরোপুরি আমার জ্ঞানের বিষয় ছিল না এবং হয় না সেই সংশয়টা আবার সেই ডাকে ফিরে আসে। এক একটি কালে ‘অপর’-কে যতোটুকু আমরা জানি তার পরেও তার একটা দাগ বা তলানি ঠিকই থেকে যায়। এই ডাকে সেই দাগ নতুন চিহ্ন ধারণ করে, নতুন ভাষা হয়ে ওঠে, ও তলানি থেকে উঠে এসে নতুন অর্থোৎপাদন করতে থাকে। কিন্তু আগের মতো আবারো তার দাগ আর তলানি থেকে যায়। এই প্রক্রিয়ায় এক একটি কালে নতুন করে সত্য, সমাজ, সংবিধান, রাষ্ট্র, আইন ও প্রচলিত নীতিবোধ ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমাদের ভাবনা শুরু হয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যে কাজ সেটাই সত্য কাজ। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পথের বা ব্যবস্থার যে কর্মকাণ্ড সেই কাজ নয়। সত্য নাই, সত্য পথ বলে নিশ্চিত কোন পথ নাই এই ঘোষণাটার রাজনৈতিক তাৎপর্য অতএব অনেক গভীর। সত্যের রাজনীতি থেকে মুক্তি আমাকে অপরের ডাক শোনার জন্য প্রস্তুত করে। প্রচলিত চিন্তা, ধ্যানধারণা, আইন, সংবিধানের বাইরে ভিন্ন ভাবে ভাবনার শর্ত তৈরি করে। অন্যের নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার প্রতি যে ডাক আমি বোধ করি তার ফলে তার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। একদিকে সেটা স্বীকৃতির আর অন্যদিকে সেটা শ্রদ্ধার। স্বীকৃতি এই কারণে যে প্রচলিত ব্যবস্থার সীমা আমার চোখে ধরা পড়তে শুরু করে। শ্রদ্ধা, কারণ যাকে স্বীকার করে নিচ্ছি তার অস্তিত্ব আমাকে আমার নিজের

অবস্থানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে বাধ্য করে। যতোই চেষ্টা করি, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমি এড়িয়ে যেতে পারি না।

দুই

এই ডাকের প্রতি সাড়া দেওয়ার রাজনীতি, যাকে আমরা কাজের রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করছি, তার প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে তার একা দ্রুত উদাহরণ পার্বত্য শান্তিচুক্তি থেকে দেবার চেষ্টা করব। ‘সত্যের রাজনীতি’ কথাটির অর্থও হয়তো এই উদাহরণে আরো স্পষ্ট করা যাবে। সত্য সম্পর্কে যখন আমরা একটা নিশ্চয় অবস্থানে পৌঁছে যাই তখন অপরের ডাক আর আমরা শুনতে পাই না। এর পরিণাম কী হতে পারে তার অভিজ্ঞতা আমরা একান্তর সালে দেখেছি। পাকিস্তান আমলে জাতি হিসাবে আমাদের সত্য কায়ম করার চেষ্টা হয়েছিল ধর্ম দিয়ে। ধর্ম, রাষ্ট্র আর সংস্কৃতির যে বিভাগ আমরা এখন দেখি তা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। পশ্চাত্য রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতে পেরেছে অল্প কয়েকদিন হোল, শ’ কয়েক বছর আগে। সংস্কৃতি আর ধর্ম আলাদা করতে পেরেছে সেটা হলফ করে বলা যাবে না। পাকিস্তান আমলে ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র আর সংস্কৃতি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল এমন একটা কালে যখন দুনিয়ার ভাবে বদল ঘটেছে। ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র গড়ার দিন শেষ হয়েছে, বরং সংবিধান ও আইন তৈরির যে সার্বভৌম ক্ষমতা ধর্ম আগে ভোগ করত সেই ঐশ্বরিক উৎস থেকে মানুষের জ্ঞানকাণ্ড মুক্ত হয়ে সংবিধান ও আইনের ভিত্তি হিসাবে নিজেকে চিনতে শুরু করেছে। সংস্কৃতিও ধর্ম দিয়ে তৈরির চেষ্টা চলেছে, তবে নানান ঐতিহাসিক কারণে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ আমলে সত্যের রাজনীতি আমাদের জাতিগত পরমার্থ হিসাবে ভাষা আর সংস্কৃতির পতাকা তুলে ধরেছে। বলা হয়েছে আমরা বাঙালি, আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সেই রত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সংবিধানে। কীভাবে আদি সংবিধানে সেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা অনেকে ভুলে গিয়েছেন। বর্তমান সংবিধান সংশোধনের কারণে সেটা আর সংবিধানে নাই। সত্যের রাজনীতি কিভাবে চরম বর্ণবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করে তার উদাহরণ দেবার জন্যে সংবিধানের সেই অনুচ্ছেদ আবার পাঠ করে দেখা দরকার।

ভাষা ও সংস্কৃতির সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ধারা তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন তাঁরা দেখছি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে এখন লেখালিখির সময় আদি সংবিধানের ৯ (নয়) ধারা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন। যে সত্যের ওপর বাংলাদেশে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তার বর্ণবাদী ভিত্তিটা সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটিতে খুবই নগ্ন ভাবে লিখিত হয়েছিল। ধারাটি ছিল সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতির অংশ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে চারটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। সেটা ৮(১) অনুচ্ছেদে সংবিধানে

লিখিত হয়েছিল। তারপর জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায় তারই সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে ৯ অনুচ্ছেদে। পুরো প্রক্রিয়াটা এতোটাই অগণতান্ত্রিক ও রচিত সংবিধান এতোটাই তৈরি করা ব্যাপার ছিল যে সংবিধান ভেঙে পড়তে দেরি হোল না। ভাঙল নেহায়েতই সেনাপতিদের বেয়নেটের খোঁচায়। অর্থাৎ ‘জাতি’ বলে সত্যকে আমরা নিশ্চয় জ্ঞান করে যুদ্ধ হয়েছে সেই জাতির মনের হৃদিস কেউই কখনোই রাখে নি। ফলে দ্রুতই দেখা গেলো বাংলাদেশে ‘জাতি’ দুই রকম। এক. বাঙালি, আর দুই. ‘বাংলাদেশী’। বলা হয়, সংবিধান জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি। অথচ জনগণের ইচ্ছা থেকে নয় বরং আর দশটা সংবিধানের বই থেকে অনুচ্ছেদগুলো টুকে টুকে বসানো হয়েছে। জনগণের ইচ্ছার খবর নেবার প্রয়োজন কেউই বোধ করে নি। সংবিধান বিষয়ে জনগণের মধ্যে কোন আলোচনাই হয় নি। আর যেখানে যেখানে অনুচ্ছেদগুলো সংবিধান রচয়িতাদের নিজেদের রচনা সেখানে অনেক বর্ণবাদী নোংরামি উদ্যম বেরিয়ে এসেছে। যেহেতু সংবিধান কখনোই জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি ছিল না, ফলে পরবর্তীতে সেনাপতিরা বেয়নেট দিয়ে সংবিধান ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছিড়েছে অনায়াসে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের অনুচ্ছেদ ১৯৭৮ সালের ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর-৪ এর ২য় তফশিল প্রয়োগ করে বাদ দিয়েছে এবং ৮(১) এবং ৮(১ক) নতুন অনুচ্ছেদ সংবিধানে ঢুকিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রবার দিয়ে মুছে ফেলার মতো ক্রিন করে দিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা আবার ‘সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার’ নামে এগুলো মেনেও নিয়েছে। তেমনি ১৯৭৮ সালে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ বলে সংবিধানের ৯ এবং ১০ অনুচ্ছেদ বদলিয়ে নতুন ৯ ও ১০ অনুচ্ছেদ ঢোকানো হয়।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বা জাতীয়তাবাদী সত্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লড়াইটা যে বাংলাদেশে দুই ভাগে বিভক্ত সেটা আমরা জানি। তবে সংবিধানে এই বদলটা ঘটানোর কারণে বর্তমান সংবিধানে আর আদি ৮(১) ও ৯ অনুচ্ছেদ নাই। আদি ৮(১) ধারায় রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে যে জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা হয়েছিল তাকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৯ অনুচ্ছেদে। যোর বর্ণবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাষাটা এইরকম :

৯. ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক একক সত্তা বিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

এই অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে (ক) বাঙালি জাতি ভাষাগত কারণে একক সত্তা বিশিষ্ট, (খ) সংস্কৃতির বিচারে ও ভাবেও একক সত্তা বিশিষ্ট, (গ) ভাষা ও সংস্কৃতির কারণে একক সত্তাবিশিষ্ট এই বাঙালি জাতিই শুধু মুক্তিযুদ্ধ করেছে, (ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শুধু এই বাঙালি জাতিই অর্জন করেছে, অতএব (ঙ) এই ভাষা ও সাংস্কৃতিক গৌরবে গরিমান একক সত্তা বিশিষ্ট বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। অন্য সকল জাতি সত্তার অস্তিত্ব পরিপূর্ণ

ভাবে অস্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির এক নম্বর নীতি হিসাবে এই জাতীয়তাবাদটিকেই সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে 'একক সত্তা বিশিষ্ট জাতি' তত্ত্বটা একটা তৈরি করা জিনিস। ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা ভাষা ও সংস্কৃতির জায়গায় ধর্মকে প্রধান করে আরেকটি সত্য তৈরি করতে পেরেছে অনায়াসেই। ইসলাম এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম। আদি ঘোষণার বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দিকটা হোল এই যে জাতির সংজ্ঞা ও রাষ্ট্রের মূলনীতির মধ্যে কোথাও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রশ্নটি নাই। শুধু অনুপস্থিতিই নয়, বরং প্রবল বাঙালি অহমিকা এবং উগ্রতাকে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং অ-বাঙালিদের নাগরিক অধিকারটুকুকে হরণ করে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যারা সাংবিধান অনুযায়ী ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে বাঙালি নন, তাঁরা তো তাহলে বাংলাদেশের নাগরিকও নন। জাতীয়তাবাদী সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার একনম্বর মূলনীতি হয়ে উঠেছে অন্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় ও নাগরিক অধিকার অস্বীকার করা। প্রবল জাতিগত অহমিকা এবং বাঙালি সাম্প্রদায়িকতা কেবল এই অনুচ্ছেদেই সীমাবদ্ধ নাই। একদিকে সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যদিকে অন্য ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর যে অন্তত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারটুকু আছে তারও কোন স্বীকৃতি নাই। এমনকি কোন ইঙ্গিত ও ইশারাও নাই।

রাষ্ট্রের বর্ণবাদী ভিত্তির আরেকটি দৃশ্যমান অভিব্যক্তি হোল ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ। এখানে রাষ্ট্র সাংবিধানিক ভাবে উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালী সমূহের মালিকানা-ব্যবস্থার নানান রূপের স্বীকৃতি দিচ্ছে। সংবিধান প্রণেতারা লিখছেন :

'মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা...

(খ) সমবায়ী মালিকানা...

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা...', ইত্যাদি।

সত্যের রাজনীতি যে বাঙালি বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে, সেখানে এই সত্য ধরা পড়ে নি যে আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মালিকানা-ব্যবস্থার রূপ স্বতন্ত্র। সেখানে গোষ্ঠী মালিকানা সম্পত্তির ধরনের প্রধান রূপ। অর্থাৎ সম্পত্তির ধরন সেখানে রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী বা ব্যক্তিগত মালিকানার রূপ হিসাবে হাজির নাই, হাজির রয়েছে গোষ্ঠীর সম্পত্তি হিসাবে। সেই সম্পত্তি ভোগ দখলের স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। অথচ সাংবিধানিকভাবে শুধু তিন ধরনের মালিকানাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আরেকটি অনুচ্ছেদে, অর্থাৎ ৪২ অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকেই কেবল স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বা দখল করা যাবে না।

এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তি এবং শাস্তিচুক্তি’ শিরোনামে আলাদাভাবে অন্য একটি পত্রিকায় আলোচনা করেছি। এখানে শুধু সত্যের রাজনীতির উদাহরণ দেওয়াটার দরকার ছিল, কেন ফকির লালন শাহ সত্যের রাজনীতি নাকচ করেছেন এই উদাহরণে তার মর্মটাও খানিক খোলাসা হবে। যেটা পরিষ্কার সেটা হোল, যে-কারণে জাতীয়তাবাদী সত্য প্রতিষ্ঠার নামে বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নাকচ হয়ে যায়, ঠিক সেই একই কারণে ‘জুম্ম জাতীয়তাবাদ’ ও নাকচ হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে পরিমাণ বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক, জুম্ম জাতীয়তাবাদ ঠিক সেই অর্থেই সমান বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের সময় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ লড়াই সংগঠিত করা ও জনগণকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তার কারণে তার সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী রূপটা ধরা পড়ে না। পাহাড়ি জাতিসত্তা বা আদিবাসীদের সংগ্রামকে নিরংকুশ সমর্থনের জন্যে এবং তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে হত্যা, যুদ্ধ, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইর জন্য কোন জাতীয়তাবাদী সত্য প্রতিষ্ঠার দরকার পড়ে না। যে ডাকের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি, সেই ডাকের প্রতি সাড়া দেওয়ার কর্তব্যটাই এখানে আরো জোরালোভাবে উঠে আসে। সম্ভবত এই ডাকের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনীতির একটা আন্তরিক মিল আছে। এই ডাককে বিপ্লবী ভাষায় বলা হয়: ‘নিপীড়িত জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’। ফকির লালন শাহের কাজের রাজনীতির দিক থেকে দেখলে এর সঙ্গে অমিল নাই। কিন্তু এই ‘অধিকার’-কে যখন জ্ঞানগত তত্ত্ব আকারে বা বৈপ্লবিক জ্ঞানকাণ্ডের অংশ আকারে হাজির করা হয় তখন তা সত্যের রাজনীতির অংশ হয়ে পড়ে। তখন তা আবার কোন না কোন ‘পথ’ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেটা তখন হয়ে ওঠে ক্যাসেটে ভুল ভাবে লালনের গান রেকর্ড করার মতো। ফকির লালন শাহের কাজের রাজনীতির জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তার বৈপ্লবিকতা সত্ত্বেও হয়ে দাঁড়ায় অপরের প্রতি আন্তরিক ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজ বা কর্তব্য পূর্বনির্মিত জ্ঞানকাণ্ডের মানদণ্ড দিয়ে তৈরি পূর্বসত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে নিরংকুশ সমর্থন হয়ে দাঁড়ায় একটা তদুপাত সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই—জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় কায়েমে সংগ্রাম। মানুষকে একত্র করার পরিবর্তে মানুষকে এই ধরনের সত্য কায়েমের রাজনীতি বিভক্ত করে। মার্কস আর লেনিনের অনুসারীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ফকির লালন শাহের একটা মৌলিক মিল হচ্ছে, উভয়েই জাতীয়তাবাদকে পরিহার করে চলে।

এই ‘চুক্তি’ নিয়ে যে সকল বিতর্ক চলছে সেগুলো আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। চুক্তির পরিষ্কার পক্ষবিপক্ষের কথা বাদ দিলেও, আমরা দেখব ‘চুক্তি’ সম্পর্কে একটা অস্বস্তি পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর সপক্ষে দৃঢ়ভাবে থাকার পরেও ত্যাগ করা যাচ্ছে না। প্রথমত, যে দুই পক্ষের সঙ্গে ‘চুক্তি’ হয়েছে তার এক

পক্ষের বর্ণবাদিতা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আমরা জানি। এই পক্ষ নিপীড়ক। কিন্তু নিপীড়িত যে ‘পক্ষ’ চুক্তি করছে তার রাজনীতির ভিত্তিটা কী? সেটাও কি কোন জাতীয়তাবাদী সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য? কিন্তু অপরের ডাকে সাড়া দেওয়ার যে তাগিদ আমরা অনুভব করছি তার কারণে নিপীড়িতের রাজনীতি সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের গত্যন্তর নাই। এই নিশ্চুপতা এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি করেছে। অস্বস্তি হয়ে দাঁড়াতে না যদি আমরা জানতাম সকল প্রকার বর্ণবাদিতা এবং সাম্প্রদায়িকতা উৎখাত করে আমরা একটি নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়বার অঙ্গীকার করছি। আমরা কিন্তু তা করছি না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সেই রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গেই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি হয়েছে। ‘চুক্তি’-তে পক্ষ দুটো। চুক্তির শুরুতে যতোই বাংলাদেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের কথা বলা হোক, এই চুক্তি বিরোধী পক্ষের সার্বভৌম অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছে। এতে নিপীড়িতের সংগ্রাম এগিয়েছে বলে আমরা খুশি, কিন্তু সেটা কোন জাতীয়তাবাদী সত্য প্রতিষ্ঠার বিজয় কিনা, সেটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে এই চুক্তির একটি ইতিবাচক ফল আছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাহাড়ীদের ব্যবহার করে ভারতের হস্তক্ষেপের সুযোগ—প্রস্তুতি যুদ্ধ আপাতত বন্ধ হয়েছে।

তিন

‘পথ’ আর ‘কাজ’ নিয়ে লালন শাহের কথা বলতে গিয়ে দেরিদা আর রটিঁর কথা কেন তুললাম সেই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলে শেষ করব।

প্রথমত, ফকির লালন শাহের মতো ডিকনস্ট্রাকশন আর প্রেগমেটিজম উভয়েই সত্যের রাজনীতির বিরোধী। ভাষা, আত্মপরিচয় ও সমাজ প্রসঙ্গে প্রেগমেটিজমের কথা হচ্ছে এই সকল বিষয়ে কোন স্থির বা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। সত্যের নামে আমাদের মন বা জ্ঞান-বুদ্ধিবিবেচনা যা সন্ধান করে সেটা মানুষের মন বা চিন্তার সঙ্গে বাইরের জগতের মিল অন্বেষণ। সেটা শেষমেষ মনের ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায়, নিশ্চয়-সত্য নামক কোন অটল কিছু তাতে প্রতিষ্ঠা পায় না। নিজে সত্য বলে যা বিবেচনা করি, কিম্বা সত্য বলে যে-কথাগুলো কায়ম করতে চাই, সেটাই আমাদের যার যার কাছে সত্য। কারো কাছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর কারো কাছে বাংলাদেশী...।

ডিকনস্ট্রাকশান ভাষার ভেতরে আগে থেকেই সত্য বা পূর্বনির্ধারিত কোন সত্য থাকে বলে বিশ্বাস করে না। ভাষা ব্যবহারের গুণে একেকটি অবস্থা বা ব্যবস্থায় ভাষার মধ্য থেকে একেক রকম অর্থ তৈরি হয়। কিন্তু সত্য তো ভাষা দিয়েই প্রকাশিত হয়। যদি ভাষার কোন অন্তর্গত অর্থ না থাকে আর যদি ভাষার অর্থ অবস্থানুযায়ী নানান সময়ে নানান রকম হয়ে যায়—তাহলে তো স্থির সত্য বা নিশ্চয়-সত্য বলে কিছু

থাকতে পারে না। অন্তত কোন ভাষা বা চিহ্ন ব্যবস্থা দিয়ে সত্য প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ যদি সেটা থাকেও শেষমেশ ভাষার অর্থের মধ্য দিয়েই তো সত্যের প্রকাশ। কিন্তু ভাষা যদি নানান অর্থ তৈরি করে, তাহলে কোন অর্থ সত্য আর কোনটা নয় সেই বিবাদ মিটেবে কী করে? নিশ্চয় জ্ঞানের জন্য এযাবতকাল দর্শন যে কৌশল করে আসছে তা আসলে এক ‘অপর’-কে সামনে উপস্থিত সত্য হিশাবে হাজির করার প্রয়াস। ভাষার মধ্যে হাজির করা। কিন্তু ভাষায় যা হাজির আছে বলে আমরা ভাবি সেটা কখনই ভাষায় থাকে না, ভাষায় সবসময়ই তা অনুপস্থিত। আমরা যার যার মতো ভাষার অর্থ করি, কাজে কাজেই সত্যের অর্থও নানা রকম হয়। প্রেগমেটিজমের মতো ডিকনস্ট্রাকশানকে দিয়েও বলানো যায় যে সত্য তৈরি হয় অবস্থা অনুযায়ী। সত্যের নিজের কোন নিশ্চয়-ভিত্তি নাই।

সত্য সম্পর্কে এই ধারণা থেকে রিচার্ড রটি রাজনীতি সম্পর্কে খুব সরল একটা অবস্থান বেছে নিয়েছেন। যদি অটল কোন সত্য কোথাও না থাকে তাহলে রাজনীতির জগৎ বা রাজনীতির বিষয়ে কোন তাত্ত্বিক আলোচনা খুব একটা কাজের কিছু হতে পারে না। কারণ এই আলোচনা কীইবা আর দিতে পারে? আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের কোন সত্য ভিত্তি তো আর দিতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মানে সময়ের স্বল্প মাপে ফেলে কিছু ছোটখাট সংস্কার সাধন এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে আপোস। ব্যস। এক ধরনের ‘ম্যানেজ’ করা আর কী! বড়ো ধরনের কোন মৌলিক রূপান্তর নয়। রিচার্ড রটি প্রেগমেটিজমকে মার্কিন সমাজের উদারনৈতিক রাজনীতির পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন।

মানুষের সুখের দুশমন হচ্ছে লোভ, অসহিষ্ণুতা, ভগ্নামি ইত্যাদি। এগুলো দূর করবার জন্যে খুব বড়ো ধরনের বিপ্লবের দরকার নাই। যদি সুখী সমাজ চাই তাহলে বরং দরকার উদারনৈতিক রাজনীতির আরো ব্যাপক প্রচার ও মানুষের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া। অন্যের দুঃখে সংবেদনশীল হওয়ার জন্য বিরোট কোন তত্ত্বেরও দরকার পড়ে না। উদারনৈতিক সহমত সৃষ্টিই হচ্ছে রিচার্ড রটির রাজনীতির লক্ষ্য। তাঁর কাছে এটাই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র মানে সহমত বা মতের ঐক্য গড়ে তোলা—এই ধারণাটা অবশ্য জাক দেরিদা মোটেও মনে করেন না। তাঁর গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে ইনসাফের (Justice) ধারণা অঙ্গাঙ্গী জড়িত। যতোই আমরা মতৈক্য বা সহমতের কথা বলি না কেন প্রতিটি সিদ্ধান্তের মধ্যেই কিছু না কিছু বাদ থেকে যায়। প্রতিটি সিদ্ধান্ত সঠিক হোল কিনা সেই সন্দেহ থেকেই যায়। সারমর্ম, যদিও দেরিদার সারমর্ম করা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার, তিনি বলছেন, ডিকনস্ট্রাকশান বা অবিনির্মাণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বা প্রকাশ্য নৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ইনসাফ হয়ে ওঠে। এই কারণে যে, সমাজে আমরা যা কিছুই সিদ্ধান্ত নেই না কেন সবসময়ই মনে রাখতে হচ্ছে, কিছু একটা বাদ রয়ে গেল, কিছু একটা বাদ পড়ে গেল। কী বাদ পড়ল সেটা বোঝা যায় না, জ্ঞানের নজরে সহজে

পড়েও না। কিন্তু এই সংশয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অপারগতা আবার অন্যদিকে চলমান সমাজে সর্বক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাগিদ ইনসারফকে সক্রিয় রাখে। ইনসারফ মানে বিচার তো নয়ই, সুবিচারও নয়। ইনসারফ মানে এই টানাপোড়েন—সিদ্ধান্ত, কিন্তু আবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গভীর সংশয়। ইনসারফের এই ধারণা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক তুলে ধরেছে।

ইনসারফ কোন প্রতিষ্ঠান নয়। কোন সমাজ, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র বা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ইনসারফের প্রাতিষ্ঠানীকরণ সম্ভব নয়, দরকারও নাই। বরং ইনসারফের পাটাতনে দাঁড়িয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা, পর্যালোচনা, বিরোধিতা, রূপান্তর, বিপ্লব সম্ভব। কারণ কিছু একটা বাদ পড়ে গেলো বলেই এই পর্যালোচনা। ইনসারফ সেই হিশাবে বিনির্মাণের শর্ত, অতএব বৈপ্লবিক রাজনীতিরও শর্ত। দেরিদা কার্ল মার্কসের মতো গণতন্ত্রের ধারণাকে বাদ দেন নি। ইনসারফ গণতন্ত্র এখন যা আছে তেমন নিশ্চয়ই রাখবে না। তার রূপান্তর, পরিবর্তন বা বদলের কাজটিও করে যায় বা করে যাবে। কিন্তু রটির আপোসের রাজনীতি বা উদারনীতির মধ্যে সেই সম্ভাবনা নাই।

ইনসারফ মানে বিচার নয়, আগেই বলেছি। ইনসারফ সম্পর্কে দেরিদা বলছেন, ‘যদি আইনের বাইরে বা আইনের অতীত কোন অবস্থায় ইনসারফ থাকে তবু তাকে বিনির্মাণের অধীন আনা যায় না’। ইনসারফ মানে বিচারের ভুল বা অসম্পূর্ণতার জন্য সংশয় নয়। বিচার, আইন, রাষ্ট্র, সংবিধানের বাইরে এমন কিছু থেকে যাবেই যাকে আমরা আমাদের জ্ঞান প্রক্রিয়ার বা পর্যালোচনার অধীনে আনতে পারি না। তিনি বলছেন, ‘আইন তো বটেই—সবকিছুই অবিনির্মাণের অধীন আনা যায়, কিন্তু ইনসারফকে নয়। ইনসারফ হোল অবিনির্মাণের শর্ত’। আইনের পর্যালোচনা তো অবশ্যই হতে হবে, নইলে রাজনৈতিক অগ্রগতি কীভাবে হবে? অথচ, ‘ইনসারফ হচ্ছে এমন এক অভিজ্ঞতা, যার অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব’। একে সে কারণে ‘মরমী’ (mystical), অসম্ভব (impossible), অপার হয়ে থাকা (aporia)—ইত্যাদি নামে পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ব্যাখ্যা করছেন। এইসব ক্ষেত্রে ফকির লালন শাহের সঙ্গে দেরিদার মিলের অনেক জায়গা আছে, কিন্তু অমিলও অবশ্য আছে। মিল ও অমিল দুই দিকেই যেন আমাদের নজর থাকে। ততোদিনে....

আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়

পারে লয়ে যাও আমায়... !!

কার্তিক ও কর্তারূপে অন্ত্রেষণ

তাকে ভক্তি জানিয়ে বাক্যটি আরম্ভ করি।

অতঃপর সাধুগুরু বৈষ্ণব পীরমুর্শিদ সাধক জ্ঞানী সকলের চরণে ভক্তি – এটাই ফকির লালন শাহের ঘরের রীতি। কারণ যিনি সাধক একমাত্র তিনিই জ্ঞানী এবং যিনি প্রজ্ঞাবান একমাত্র তিনিই ইহলোকে পরম। অতএব যুগপৎ সাধক ও জ্ঞানীর রূপ ধারণ করেই প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটে এবং যখন তিরোধান করেন তখন তাঁর ডাকনাম চিহ্ন হিশাবে থেকে যায়। এই সেই চিহ্ন যা অক্ষর নামেও বিদিত। অক্ষর – যার ক্ষয় নেই। সেই অক্ষর থেকে অনর্গল জীবের মুক্তির জন্য অর্থ উৎপাদিত হতে থাকে। এই সেই অক্ষর, যা চিহ্ন বটে, অথচ চিহ্নের অতীত। তাঁর নামাশ্রয়েই মুক্তি। অতএব তাঁকে ভক্তি।

ফকির লালন শাহ সজ্ঞানে ১২৯৭ বাংলা সনের পয়লা কার্তিকে দেহ রক্ষা করেছেন। তাঁর ভক্তরা পয়লা কার্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। কিন্তু পয়লা কার্তিক লালনপন্থীদের কাছে উৎসব নয়, স্মরণ। অন্যদিকে কার্তিক বাংলার ঋতুর মধ্যে এই অর্থে অনন্য যে তখন নাকি দেহের ডাক পড়ে। বাংলার ভাবান্দোলনে অতএব কার্তিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। কার্তিক প্রস্থানের তারিখ, তিরোধানের সময়। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যে চলে যাওয়ার দরোজা কার্তিকে সাধকের সামনে জ্যোতির্ময় সিংহদ্বার হয়ে হাজির হয়। অতএব সাধক সারাজীবন তাঁর দেহ রক্ষা করার জন্য যে-সাধনা করেন সেই দেহ যেখানে যথায় যার কাছে রক্ষা করার তাঁকে ফেরত দেওয়ার সময়। মহাজনের মালখানা থেকে ধারে আনা পুঁজিপাট্টা সুদেআসলে হিশাব কষে ফেরত দেওয়ার সময়। যার শরীর তাকে নিবেদন করার মাস হচ্ছে কার্তিক। বাংলার সাধকদের প্রায় সকলের গোপন ইচ্ছা যে তাদের নাইয়ের যেন কার্তিক মাসে হয়। নিজের

তিরোধানের দিন নিজে জানা ও নিজেই স্থির করা বাংলার সাধনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাধকের কাছে মৃত্যুও সাধ্য। অর্থাৎ সাধক মানতে রাজি নন, তাঁর বাইরে মৃত্যুর অন্য একজন কর্তা আছেন। যদি সাধকের জীবন পরমেরই জীবন হয়ে থাকে, যদি জীব ও পরমের ভেদ তাঁর শরীরে তিনি মোচন করে থাকেন, তাহলে তিনি যেদিন যাবেন সেটা তাঁর ইচ্ছাতেই হতে হবে। আর প্রেমিকের এই ইচ্ছা ‘পরম’ বলি, ‘আল্লা’ বলি, ‘প্রভু’ বলি, ‘ঈশ্বর’ বলি – যে নামেই পরমকে ডাকি, তিনি কবুল করে থাকেন। মৃত্যু বরণের এই ইচ্ছা ও ইচ্ছা কবুলের মধ্য দিয়ে জীব ও পরমের মিলন হয়। জীবের রূপ পরিত্যাগ করে পরম অরূপে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অন্য জীবের রূপ নিয়ে তিনি আবার সাকার হন। আবার রূপ পরিগ্রহণ করেন।

অতএব মৃত্যু শোক নয়, আনন্দের ব্যাপার। ফকির লালন শাহের মৃত্যু সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয়, অনেকটা যেন প্রস্তুত হয়েই তিনি উৎসে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সারারাত ভক্তদের নিয়ে গান করেছেন, এক সময় শেষরাতের দিকে বলেছেন. আসি। তিনি কি আবার ফিরে আসবেন? অবশ্যই আসবেন। আসেন। কারণ প্রজ্ঞার কোনো বাঁধা ধরা যুগ নাই। তাকে আসতেই হবে। প্রতিটি যুগেই তিনি একটা বিশেষ রূপ নিয়ে হাজির হন। যথা, কলি যুগে গৌরান্দ্র রূপে, যাকে কৃষ্ণ জ্ঞানে বাংলা ভজনা করেছে। ফকির লালন শাহ রূপে যিনি হাজির ছিলেন এবং প্রজ্ঞার চিহ্ন হয়ে ডাকনাম মাত্র হয়ে আছেন, তাঁকে আমরা যদি আমাদের কালে আত্মস্থ করতে পারি কেবল তখনই নতুন রূপের আবির্ভাব সম্ভব হবে। এটাও লালনের ঘরের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

লালন ভক্তরা বলে থাকেন লালন পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। এটা ভাবের কথা। কারণ পুনর্জন্মকে শুধু আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করলে কথাটির কোনো মানে দাঁড়াবে না। প্রথমত, সকল জন্মই পুনর্জন্ম; সকল জন্ম একই প্রকার জন্মেরই পুনরাবৃত্তি। অন্যদিক থেকে, যে-প্রশ্নের মীমাংসা এই জন্মে হয় নি, সেই প্রশ্নের সুরাহার জন্য ‘মানুষ’ অন্য কোন দেহ ধারণ করে সেই প্রশ্নের ফয়সালার চেষ্টা কি চালিয়ে যায় না? অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে একবার যে প্রশ্ন কোন একজন মানুষ তুলে ঠিকই কিন্তু সেই প্রশ্ন তপ্তার পরে আরো অনেক মানুষের মধ্য দিয়ে মীমাংসায় পৌঁছাবার চেষ্টা চলে। একই ভাব, কথা বা বক্তব্যের কি পুনরাবৃত্তি ঘটে না? দেশকালপাত্রের পার্থক্য আছে, কিন্তু মানুষ তো সেই একই। নানান নামে এবং নানান রূপে বারবার পৃথিবীতে ফিরে আসছে, দেহ ধারণ করছে। প্রশ্নের মীমাংসা যদি আসলেই মানুষের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, তাহলে হয়তো আর একই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের ফিরে আসার দরকার হবে না। কে জানে?

একে বহে অনন্ত ধারা

তুমি আমি নাম বেওয়ারা

ভবের পরে

লালন বলে আমার আমি

জানলে বাধা যেত দূরে।

সাঁইর লীলা বুঝবি খাপা ক্যামন করে!

একের মধ্যেই অনেক - অনন্ত। লালন বলছেন। কিংবা এক এবং অনেকের মধ্যে ফারাকটা কী? তুমি এবং আমি না হয় দুই নামে নিজ নিজ 'আমিকে' প্রকাশ করছি— কিন্তু যিনি এই অনন্ত বেচিত্র্যে নিজেকে নানান নামে জাহির করছেন, তিনি তো সেই একই সত্তা। সেই এক, কিন্তু একই সঙ্গে অনেক কিংবা অনন্ত। আসলে এই যে 'আমার আমি'—সেই 'আমি'—কে জানলেই কিন্তু অবিদ্যার এই বাধা দূর হয়ে যেত। 'লালন' নামক নামচিহ্ন ধারণ করে মানুষ যেসব বাক্য উচ্চারণ করে গিয়েছে যে সকল প্রশ্নের ফয়সালা করেছে, কিংবা যে সকল সওয়ালের মীমাংসা করতে পারে নি—সেই একই বাক্য, একই মীমাংসা, একই প্রশ্ন তো মানুষ বারবারই করছে। মানুষ তাহলে ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্ভিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে, কিংবা জন্মগ্রহণ করছে। যদি বিভিন্ন 'আমি'-র মধ্যে ভেদগুণ লুপ্ত হয়, তাহলে একই মানুষ কি বারবার জন্মগ্রহণ করছে না? অতএব, ফকির লালন শাহ 'পুনর্জন্মে' বিশ্বাস করতেন এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

কিন্তু যদি এক মানুষই বারবার জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কেন ঘটে? এটাই হচ্ছে আদত প্রশ্ন। ফকির বলছেন,

গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়

গর্তে গেলে কূপ জল কয়

ভেদ বিচারে

তেমনি সাইজীর বিভিন্ন রূপ

জানায় পাত্র অনুসারে

কেমন করে!

বিভিন্ন আমি কে কী রূপ পরিগ্রহণ করে সেটা জন্ম দ্বারা স্থির হয় না। কিংবা কোনো নৈর্ব্যক্তিক আর্থসামাজিক অবস্থার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেও সেই অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। তার দ্বারা বড় জোর আত্মারূপের নির্ণয় হতে পারে, অর্থাৎ 'আমি' নামক সত্তাকে কর্তাহীন বস্তু বা কর্তাবর্জিত সত্তা জ্ঞান করে এক ধরনের জানা সম্ভব হতে পারে। যেমন আমরা বস্তুকে জানি। পাথর, পানি, পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদিকে জানি। কিন্তু 'মানুষ' কি বস্তু? প্রাকৃতিক বা সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রচলিত পদ্ধতি মানুষকে কর্তাহীন সত্তা বলেই সাধারণত গণ্য করে। মানুষের সক্রিয়তা, ব্যক্তির ভূমিকা বা শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাসকে যে বিশেষ রূপ দান করে কদাচিৎ সেই কর্তারূপের দিকে ইতিহাসের নজর নিষ্কিপ্ত হয়। অথচ সেদিকে নজর না ফেরালে সেই ইতিহাস মানুষের ইতিহাস হয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। সেই কারণে লালনের 'আমি'র বিচার আত্মারূপের বিচার মাত্র নয়। যদিও আত্মারূপের বিচারকে লালন নাকচ করেন নি। তাঁর আগের সকল সাধনার ধারা শুধু আত্মরূপকে শনাক্ত করার কাজেই মশগুল থেকেছে। নিজেকে জান - এই হচ্ছে ভাবুকতা, দর্শন বা জ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রধান রূপ। আত্মারূপে মানুষকে জানাই জ্ঞানের চরম বলে পরিগণিত হয়েছে। আত্মারূপের দ্বারাই 'আমি' নামক সত্তার বা মনুষ্যরূপের পরমার্থ নিরূপণ করা হয়েছে। শুধু প্রশ্ন করা হয়েছে, মানুষ কী? এ প্রশ্নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের 'করণ' কী। কী তার বিশেষ কাজ বা কী কর্মের দ্বারা সে নিজের পার্থক্য স্বয়ং নির্ণয় করে - সেই প্রশ্ন প্রায়ই উহ্য থাকে।

মানুষকে আত্মরূপে নিরূপণের সীমাবদ্ধতা ফকির লালন শাহের কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল, ফলে এর পর্যালোচনা তিনি করেছেন। আত্মরূপে মানুষ নির্ণয় আর কর্তা রূপে মানুষ নির্ণয়ের ভেদ তুলে তিনি বাংলার ভাবান্দোলনকে গুণগতভাবে ভিন্ন জায়গায় উন্নীত করেছেন। ভাবুকতার বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থি তিনি যেভাবে শনাক্ত করেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন ও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই সকল ক্ষেত্রে তার অসাধারণ উল্লেখ্য অবাক হয়ে যেতে হয়।

একটি মানুষ বা একটি শ্রেণী যে বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করেছে সেই রূপের বর্ণনা আত্মরূপ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু মানুষের বর্তমান ঐতিহাসিক রূপ বা প্রকাশ—যাকে আমাদের চোখের সামনে এখন হাজির দেখছি সেটা ঠিক এই রকমটি কেন হলো তা আত্মরূপ নির্ণয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। তার জন্য কর্তারূপের অন্বেষণ প্রয়োজন। একইভাবে যে রূপ আমরা আগামীতে গড়ে তুলতে চাই তাকে কী করে সম্ভব করে তোলা যায় সেই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্মরূপ নির্ণয় করে হয় না। তার জন্যও কর্তারূপের অন্বেষণ করা চাই। অর্থাৎ এ যাবৎকাল মানুষ কী হয়ে উঠতে চেয়েছে তার সন্ধান নেওয়া যেমন জরুরি তেমনি জরুরি এখন সে কী হয়ে উঠতে চায় তার খোঁজ নেওয়ার। অর্থাৎ এতকাল যাবৎ মানুষ বা মানুষের ইতিহাস কী হয়ে উঠতে চেয়েছে এবং আগামীতে কী হয়ে উঠতে চায় তার বিচার চাই। কিন্তু কর্তা কেবল ইচ্ছা বা সংকল্প ধারণ করেই কর্তা নয়। কর্তারূপী মানুষের নিশ্চয়ই কিছু ‘করণ’ রয়েছে, নিশ্চয়ই তার কিছু চর্চা বা আমল রয়েছে। কী সেই করণ, কী সেই আমল বা কী সেই চর্চা যা ‘মানুষ’ নামক নামচিহ্নের পার্থক্য সূচনা করে? সেই অর্থে—অর্থাৎ করণগত অর্থে কর্তারূপের অন্বেষণ লালনের ভাবুকতা ও চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কর্তারূপে নাই অন্বেষণ

আত্মারে কি হয় নিরূপন?

আত্মতত্ত্ব পায় শত ধন

সহজ সাধক জনে। —

আপনারে আপনি চিনিনে!

এই কারণে লালনের এই কথাটির কাছে আমি বারবার আমার বিভিন্ন লেখায় ফিরে আসি। ফিরে আসতে বাধ্য হই। কারণ এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য দর্শন যে জায়গা থেকে তোলে ফকির লালন শাহ সেই জায়গা থেকে তোলেন না। খেয়াল রাখতে হবে লালনের এই ধারণার মধ্যে বুর্জোয়া অর্থে কোনো ‘ব্যক্তি’ নাই। অর্থাৎ যে ‘আমি’ নিয়ে তিনি কথা তুলছেন তা ‘ব্যক্তি’ নয়।

এটাও পরিষ্কার লালনের কর্তারূপে আত্মাকে নিরূপণের প্রশ্ন দেহ ও মৃত্যুর ধারণার সঙ্গে জড়িত। কর্তারূপের মানুষের সঙ্গে তার জীবশরীরের জন্ম মৌলিক। লালন কচ্ছসাধক নন, কিন্তু দেহবাদী বা ভোগবাদী ও নন। দেহের দাবি বা জীবের

দাবির সঙ্গে পরমের দাবির যে বিরোধ তারই স্বয়ং প্রকাশ হচ্ছে দেশকালপাত্রের 'মানুষ'। তাহলে এই মানুষ চেনার পথ কী? সেই পথ জীব-পরমের ভেদ বিচার। কোনো ব্যক্তির ধারণা কিংবা বিমূর্ত মানুষের বয়ান, মানবতাবাদ বা বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা দিয়ে এই ভেদ মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনকি হেইডেগারও যখন মানুষকে *dasein* বলে অন্যান্য অস্তিত্বমান সত্তার মধ্যে ভিন্ন ধরনের 'আছে' বা 'আছি' বলে মনুষ্যময়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন ফকির লালন শাহ সে দিকেও যান নি। নতুনভাবে মানুষ ও মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে ভাবা ও মানুষের ইতিহাস নির্মাণের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে তাঁর ভাব। কর্তারূপ অন্বেষণের এই তাগিদ দর্শনের ইতিহাসে অসামান্য ঘটনা।

শুধু চোখ বুলিয়ে গেলেও বোঝা যায় বাংলার ভাবাদোলনের ক্ষেত্রে ফকির লালন শাহ সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছেন, যার নজির এর আগে আমরা ঠিক পাই না। নিজ নিজ সংকল্প ধারণ করেই প্রতিটি 'আমি' যা হয়ে উঠতে চায় তার সাধনা বা সংগ্রাম করে। প্রতিটি 'আমি' আত্মামাত্র নয়, কর্তাও বটে। ফলে তাঁর দৈনন্দিনের চর্চা, করণ, কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে তার কর্তারূপের বিকাশ ঘটায়। নিজের মধ্যে যে রূপ মানুষ অন্বেষণ করে সেই রূপই তো সে হয়ে ওঠে। যদি আমি নদী হয়ে উঠতে চাই তাহলে আমাকে গঙ্গায় বা বিশাল জলের প্রবাহে গিয়ে মিশতে হবে। জলের প্রবাহ হতে হবে। আর যদি কূপে বা গর্তে পড়ি তো আমি গর্তের কাদা হয়েই তো থাকব। অন্য কিছু নয়। ফকির লালন শাহ এটা মানতে রাজি নন যে কূপের জল আর নদীর জল নিছকই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মাত্র। না, এটা কখনোই তিনি মানবেন না, যে কারণে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর ভেদ বাংলার ভাবাদোলন কখনোই সদয়ভাবে দেখে না। জ্ঞানীদের সঙ্গ বা সাধুসঙ্গে সেই কারণে একমাত্র সাধকদেরই বসার অধিকার, অসাধু বা অজ্ঞানীর নয়।

কর্তারূপের অন্বেষণই মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কোন কর্তার পক্ষে আমি আমার জীবদেহে 'আত্মদান' করবো? এই প্রশ্ন লালনের ঘরের অতি গুরুত্বপূর্ণ করণগত প্রশ্ন। এটা শুধু 'কওয়া'র ব্যাপার মাত্র নয়। অর্থাৎ আমি ডাক্তার হবো নাকি ইঞ্জিনিয়ার হবো এসব নয়। কিংবা বিপ্লবী হবো কি হবো না, তাও নয়। এটা আত্মদানেরও ব্যাপার। 'আত্মদান' বাংলার ভাবাদোলনের অতি গোড়ার ভাবকথা। অর্থাৎ কর্তারূপী ইচ্ছা এখানে দৈহিক আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্ন নয়। জীবের আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই সে আকাঙ্ক্ষাকে ইচ্ছায় রূপ দিতে জানে। সেই ইচ্ছা বিমূর্ত ইচ্ছা নয়, তারও স্বাদ আছে। সে স্বাদের নেশা লাগে ভাবকের মনে। যে ইচ্ছার নেশায় ভাবুক রঙিন হয়ে যায়। অন্যদিকে, কেউ চাইলেই ইচ্ছা জাগে না, তার জন্য 'দৈহিক' প্রস্তুতি লাগে যাকে আমরা অন্যদিক থেকে বলতে পারি ইতিহাসের বৈষয়িক প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ভাবের ঘোর লাগে যুগের ইতিহাসে। তখনই বিপ্লবের সময়।

লালন পুনর্জন্ম মানতেন, আগেই বলেছি। কিন্তু কোন্ অর্থে সেটা তাহলে এই বিভিন্ন দিক থেকে বোঝা দরকার। জন্ম সকলের একই। কিন্তু সকল জন্মেই কি আসলে পুনর্জন্ম নয়। সকল জন্মেই কি সাঁইজী বা সেই পরমার্থিক ‘আমি’—যিনি খণ্ড খণ্ড হয়েও ‘অখণ্ড’ হয়ে বিরাজ করেন—তাঁরই জন্ম নয়? যাকে ‘খণ্ড’ করলেও যিনি ‘অখণ্ড’ থাকেন—সেই ‘পুরুষ’ বা ‘পরম’ যদি মনুষ্যরূপে খণ্ডাকার হয়ে জীবদেহ ধারণ করেন তাহলে তিনি খণ্ড হলেন কি? যিনি ‘অধরা’ তিনি যদি জীবশরীরে ‘ধরা’ দিয়ে থাকেন তাহলে কি তিনি আর অধরা থাকেন না? এই কারণে ‘আস্বাদন’ কথাটি বাংলার ভাবান্দোলনের দুর্দান্ত গোড়ার জিনিস। এই ধারণা হারালে বাংলায় ভাব বোঝা অসম্ভব। ‘খণ্ড’ যদি আসলে অখণ্ডেরই পুনর্জন্ম বা আবির্ভাব হয় তাহলে খণ্ডের কাজ হচ্ছে অখণ্ডের আস্বাদন। জীব যদি পরমের মুহূর্ত হয় তাহলে পরমের আস্বাদনই জীব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে।

ওপরের কথাগুলো বুঝলে বিভিন্ন পাত্র ধারণের মধ্যে শুধু পরমকে আবিষ্কার করলে চলবে না। অর্থাৎ জীবাত্মকে আত্মরূপে জানলে চলবে না—কর্তারূপেও জানতে হবে। আমরা বলি, সর্বভূতে ভগবান আছেন, কিংবা আল্লা সব জায়গায় আছেন—এই কথা বললে চলবে না। যার মধ্যে আছে আর যার পক্ষে সেই ‘আছে’কে আস্বাদন করা সম্ভব—অর্থাৎ মানুষ—সে যদি তা না করে তাহলে সে নিজেকে যে পাত্র রাখছে সেই পাত্রই তার পরিচয় হয়ে ওঠে। পানি গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়। কিন্তু নাল—নর্দমায় গেলে ময়লা পানিই হয়। সেই অর্থেই—‘তেমনি সাঁইজীর বিভিন্ন রূপ জানায় পাত্র অনুসারে।’ আমার আমি’ যখন নিজের কর্তারূপে অন্তর্দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ নদীর প্রবাহ না হয়ে গর্তের কাদা হওয়ার সংকল্প করে তখন তো নদী ও কূপজলের পার্থক্য হবেই। তাহলে কর্তারূপে মানুষের করণ সম্পাদনের মধ্যেই মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সেই কারণেই—

আপনারে চিনতাম যদি

মিলত অটল চরণনিধি

মানুষের করণ হোত সিদ্ধি

শুনি আগম পুরাণে

আপনারে আপনি চিনি।

মানুষের করণ। আত্মতত্ত্ব পায় শত ধন সহজ সাধক জনে। শত শত সহজ সাধক আত্মতত্ত্ব লাভ করেছেন, লালন সেটা স্বীকার করেন এবং জানেন। কিন্তু কর্তারূপে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি তো এখনো শুরুই হয় নি। সেই কর্তারূপে নিজের ‘আমি’কে যদি আমি চিনতে পারতাম তাহলে তো আমি সেই ‘অটল’ রূপকেই পেতাম—যাকে কেউ আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান বলে ডাকে। ফকির লালন শাহের যে কোনো গান, ভাব বা ভাষ্য নিয়ে একটুখানিও যদি কেউ ভাবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় ইনি খুব সহজ সাধক নন।

মৃত্যু ও পুনর্জন্মের প্রশ্নটাকে খুবই মৃদুভাবে নাড়া দিয়েও দেখা যায় যে, গভীরভাবে সেটা দেহরূপ নিয়ে হাজির থাকা 'আমি' সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে যুক্ত। যুক্ত মানুষের কর্তারূপ অন্ত্রেষণের মধ্যে আত্মারূপ নিরূপণ আর কর্তারূপ অন্ত্রেষণের মৌলিক ভেদ-বিচারে প্রবেশ না করলে 'পুনর্জন্ম' কথাটির কোনো অর্থ হয় না। লালনভক্ত যখন বলেন যে ফকির লালন শাহ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন, তখন লালনের জ্ঞানচর্চা ও কর্মযোগের ধারা সম্পর্কে না জানলে এর গভীর দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝে ওঠা মুশকিলের হয়।

রাজনৈতিক তাৎপর্য। লালনের আবার কিসের রাজনীতি? রাজনীতি বলতে কয়েকটি ক্ষমতালিন্দু দলের খেয়োখেয়ি নিশ্চয়ই এখানে বোঝানো হচ্ছে না। কর্তারূপে নিজেকে অন্ত্রেষণ করা মানে সামাজিক সত্তা হিসাবে সমাজে নিজের সক্রিয় ভূমিকার রূপ কি হবে সেই বিষয়ে ভাবা ও নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা। কর্তারূপে অন্ত্রেষণের মানে সমাজের মধ্যে নিজের ব্যক্তি ভূমিকা নির্ণয় করা, নিজেকে সত্ত্বানে সক্রিয় করা, সচেতনভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। ব্যক্তির ভূমিকা নির্ণয় বা নিজের কর্তারূপ অন্ত্রেষণের মানে আর যাই হোক ব্যক্তিতাত্ত্বিক হয়ে ওঠা নিশ্চয়ই নয়। নিজের কর্তারূপ অন্ত্রেষণ মানে নিজের ব্যক্তিরূপ অন্ত্রেষণ করা নয়। কর্তারূপ অন্ত্রেষণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোনো সুযোগ নেই। কর্তা হিসাবে কী সেই কর্মকাণ্ড যা মানুষকে মানুষ হিসাবে আলাদা করে, মানুষের সমাজের এমন বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলে যা সদানন্দময়। সেই রূপের সন্ধান খুব সহজ কাজ নয়। একে সমাজতত্ত্ব, কমিউনিজম যে নামেই খুশি আখ্যা করতে পারি। কিন্তু সেটা এমন এক রূপ যা এর আগে আমরা দেখিনি। দেখিনি, কিন্তু তার রূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইছি। তার জন্যই এই অন্ত্রেষণ। তার জন্যই নিজের কর্তারূপ সন্ধান করে বেড়ানো।

লালনের গানের সব সময়ই একটা দেহতাত্ত্বিক দিক আছে। বাংলার তন্ত্রের ধারার সঙ্গে লালনের ছেদ যেমন আছে, ধারাবাহিকতাও আছে। অতএব, আমরা যখন রাজনীতি বলি সেই রাজনীতিও ফকির লালন শাহের দিক থেকে দেহতাত্ত্বিকভাবে বোঝার ব্যাপার আছে। সেটা কিছুটা 'করণ' নামক এই ক্রিয়াবিশেষ্যটির দেহতাত্ত্বিক তাৎপর্য থেকে আমরা নিশ্চয় করতে পারি। নিজের দেহের সঙ্গে নিজে কর্তারূপে মানুষ কীভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার একটা করণগত অর্থ অবশ্যই আছে। উপরে যা বলেছি তার বেশি আমরা সেই দিকে এখানে আর যেতে চাইছি না। কিন্তু যে-অর্থে শরীরের করণে কর্তার অন্ত্রেষণ হয়, সেই একই অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক করণে বা চর্চায় একই কর্তারই অন্ত্রেষণ চলে।

যদি সমাজ, অর্থনীতি আর রাজনীতির কথাই বলি তবুও তো শেষাবধি সেটা শরীরের করণেরই ব্যাপার। নয় কি? উৎপাদন মানে কী? নিশ্চয়ই ভোগহীন উৎপাদন নেই। উৎপাদন ভোগের সঙ্গেই যুক্ত এবং ভোগ মাত্রই শারীরিক, শরীরগত ভোগ। শরীর ছাড়া তো ভোগ হয় না। অতএব, শরীর ছাড়া অর্থনীতি নেই। শরীর ছাড়া সমাজ

নেই। কাজে কাজেই শরীর ছাড়া রাজনীতিও নেই। মানুষের করণে সিদ্ধি লাভ করার প্রশ্ন শেষাবধি শরীরের করণের সঙ্গেই যুক্ত। আমরা কিভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করি তার ওপরই নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক রূপ—আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি।

আরো সহজভাবে যদি বুঝতে চাই তাহলে আমরা কি খাই, কিভাবে চলি, কার সঙ্গে সম্পর্ক করি, কার সঙ্গে করি না সবকিছুই শরীরের দাবি মেটানোর সঙ্গে জড়িত। এই অতি বাস্তব কথাটি বুঝলে বাংলায় ভাবান্দোলন ‘তন্ত্র’ বললে কি বোঝে সেই বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে। কারণ, ‘দেহ’ মানে শুধু ব্যক্তির দেহ নয়, ব্রহ্মাণ্ডই এক অখণ্ড শরীর—বাংলার ভাবান্দোলনের এটা গোড়ার কথা। সমস্যা হলো তাত্ত্বিক ব্যাভিচার সম্পর্কে মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী অতি উৎসাহী হওয়ার কারণে এই বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা করা দুঃসাধ্য। লিঙ্গের সম্পর্ক ছাড়া মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী দেহের আর কোনো সর্বব্যাপী সম্পর্ক বুঝতে পারে না। অতএব, তন্ত্র বা বাংলার দেহ সংক্রান্ত চিন্তা সম্পর্কে এতো বেশি আবর্জনা জমেছে যে, তাকে সাফ করা এখন রীতিমতো কঠিন কাজ। তাছাড়া মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী নিজের মানসিক বিকৃতিগুলো অন্যদের মধ্যে সন্ধান করে বেড়ায় বলে বাংলার বাউলদের সম্পর্কে আজগুবি কাহিনীরও অভাব নেই। রাজনীতি মানে একজন মানুষ কিভাবে চলে, তার খাদ্য ব্যবস্থা কেমন, সে কি খায় কি খায় না, তার পোশাক, আশাক, আচার—আচরণ, চলাফেরা, বাসস্থান এবং সর্বোপরি তার শারীরিক কাম ও প্রজননের সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুকেই সমগ্রভাবে যখন আমরা বিচার করি তখন তা আসলে দেহেরই বিচার—এই হচ্ছে বাংলার ভাবান্দোলনের খুবই দরকারি ও অনিবার্য একটি সিদ্ধান্ত।

পহেলা কার্তিক সামনে রেখে দেহ, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্পর্কে উপরের কথাগুলো মনে এলো। লালন, আবার বঙ্গে আবির্ভাব করবেন কিনা জানি না। তখন তার কি নাম হবে তাও এখন বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু একটা কাব্যিক বিশ্বাস আমার দৃঢ় যে, বঙ্গে তিনি আবার আসবেন। কারণ, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বাংলার ভাবুকতার ধারাকে যেখানে তিনি দাঁড় করিয়েছেন, সেখান থেকে শুরু করা ছাড়া আমাদের গতি নেই। তার জ্ঞানকাণ্ড, করণ ও বিধানের খোঁজ না নিয়ে উপায় নেই। লালন বঙ্গের ভাবান্দোলনে জীবন্ত হয়ে উঠবেন এর নানান লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। যেখানে তাঁর কাজের সাময়িক ক্ষান্তি সেখান থেকে বঙ্গের ভাবান্দোলনের ধারাকে পূর্ণগঠিত করা মানে লালনের পুনর্জন্ম। তাঁর আবার ভিন্ন নামে ফিরে আসা। এই কাজটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়েই এই কালের কাব্য ও ভাবুকতার একটা উল্লেখ্য ঘটবে।

কিন্তু সেই উল্লেখ্যেরও একটা শর্ত আছে। আত্মরূপে মানুষের রূপ নিরূপণের যুগ শেষ। অর্থাৎ মানুষ কী? এ প্রশ্ন উত্থাপন ও মীমাংসার পরিমণ্ডলে পড়ে থাকলে আর চলবে না। ‘মানুষ’ নামক বিমূর্ত ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে অদ্যাবধি যে যুগের বিস্তার আমরা দেখছি তার কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ঘোষণা ফরাসি দার্শনিক মিশেল

ফুকোর মুখে আমরা শুনেছি—কিন্তু সেটা পাশ্চাত্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই হচ্ছে সেই সময় যখন মানুষের করণ কিভাবে সিদ্ধ হয় সেই প্রশ্ন উত্থাপনের যুগ। বিশুদ্ধ ভাবুকতা বা দর্শনের পক্ষে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সেই যুগে আমরা প্রবেশ করেছি, যখন কর্তারূপে নিজেকে অন্বেষণের কাল শুরু হয়েছে। ‘মানুষ’ ব্যাপারটা কি সেটা কোনো অনুমান বা জানানার বিষয় হয়ে আর নির্ণয় করা যাবে না, মানুষ কি সেটা একমাত্র মানুষের হয়ে ওঠা দিয়েই আমাদের বুঝতে হবে। মানুষ কি হয়েছে আর কি হয়ে উঠতে পারে সেই কর্তারূপ অন্বেষণ করেই মানুষের নির্ণয় হতে পারে।

এই যুগ শুধু ভাবুকতার হতে পারে না। এই যুগ সমভাবে সক্রিয়তা, কর্মের কিংবা চর্চার। এই যুগ নিজের ভূমিকা নিজে নির্ধারণ করার যুগ। নিজেকে জানো – এই পরামর্শে আর সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। তুমি কি হয়ে উঠতে চাও সেই রূপের অনুসন্ধান করো—এই হচ্ছে এই যুগের মর্মকথা। নিজেকে জানা যথেষ্ট নয়, নিজেকে একই সঙ্গে হয়ে উঠতে হবে।

বাংলার ভাবের জমিনে দাঁড়িয়ে যিনি কর্তারূপে মানুষ অন্বেষণের ইশারা করেছিলেন তাকে নিছকই ভাবগত একটা ব্যাপার ভাবলে আমরা তাঁর কিছুই বুঝব না। উপরে যে কথাগুলো বলেছি তারও কোনো অর্থ হবে না। ফকির লালন শাহ করণকর্ম বা দেহচর্চার মধ্য দিয়ে নিজের কর্তারূপকে নিজ জীবদেহে বস্তুগতভাবে এমন স্তরে বিকশিত করেছেন যে কার্তিকের এক তারিখেই তিনি দেহ রক্ষা করবেন যেন সেটা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ‘কর্তা’র অধীনে দেহ – দেহের অধীনে নয় ‘কর্তা’—এই শিক্ষাটুকু পহেলা কার্তিকে জেনেশুনে ফকির লালন শাহের তিরোধানের অর্থ আমরা বুঝব। তিনি কার্তিকের একতারিখেই তিরোধা করেছিলেন।

তাকে আবার ভক্তি জানিয়ে শেখ করি।

আমাদের সময়: প্রসঙ্গ লালন

"With the reversal of metaphysics which was already accomplished by Karl marx, the most extreme possibility of philosophy is attained"

Martin Heidegger in The End of Philosophy

বাংলার ভাবান্দোলন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ‘ফকির লালন শাহ ও আমাদের সময়’ শিরোনামে একটি লেখা অনেক আগে লিখেছিলাম (পাক্ষিক চিন্তা, বছর ৪ সংখ্যা ৫, ১৫ কার্তিক ১৪০১, ৩০ অক্টোবর ১৯৯৪)। আরও কয়েকটি লেখা লালন নিয়ে লিখেছি বটে তবে ‘আমাদের সময়’ কথাটা শিরোনামে যখন লিখেছিলাম তখনই মনে হয়েছিল খুব হামবড়া একটা ভাব শিরোনামে রয়েছে। মনে খটকা লেগেছিল ‘আমাদের সময়’ কথাটার মানে কি? তবুও কিছু কথা প্রাথমিক ভাবে বলার দরকার ছিল। বলে রেখেছি। এর পর পরই আরও অনেক কথা পাড়বার সাধ হয়েছিল, কিন্তু সময়ভাবে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে অন্য কথাগুলিও পাড়া দরকার। কিন্তু কথাগুলো পাড়বার জন্য এখনও আরও প্রস্তুতি দরকার। কেন আরও প্রস্তুতি দরকার পুরনো কথার সূত্র ধরে খানিক বোঝানোর জন্য এই লেখা। একই সূত্রে দুই একটি বিষয়ও ঘষেমেজে তুলবার চেষ্টা করব। তারপর ‘আমাদের সময়’ কথাটির গুরুত্বের ওপর আরও জোর দিয়ে এই বিষয়ে কী প্রশ্ন তুলতে হবে তা উল্লেখ করে শেষ করব।

ফকির লালন শাহ সম্পর্কে অনেকের মতো আমার ভালবাসা ছিল সবসময়ই। খুব সরল ও সৎ ভাবে বলি, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ জাগে এমন এক কারণে যার সঙ্গে গান, কবিতা বা ভাবুকতার সম্পর্ক ছিল না। এখন যেমন আছে। সরাসরি। আমি ওষুধশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেছি, পেশায় ওষুধবিদ হিসাবেও কাজ করেছি। যখন শুনেছি লালন প্রায় ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন এবং তিনি আয়ুর্বেদী বা গাছগাছন্তের

চিকিৎসাও করতেন, তখন একটা পেশাগত আগ্রহ দানা বাঁধে। আসলে গাছগাছালির চিকিৎসা ফকির দরবেশদের মধ্যে এমন নতুন কিছু নয়। সেই জ্ঞান এখনও গ্রামে কমবেশি আছে। আমার এখনকার পেশাগত কাজ কিছুটা সেই সব নিয়েও রয়েছে। কিন্তু লালন ১১৬ বছর কী করে বেঁচে ছিলেন সেই খবর নিতে গিয়ে দেখলাম তার সঙ্গে প্রধান সম্পর্ক আয়ুর্বেদ বা গাছগাছন্তের চিকিৎসার নয়, সেটা গৌণ। প্রথম কারণ, জীবনাচারণ বা লালনীয় ভাষায় ‘করণকর্ম’। দ্বিতীয় কারণ, সেবা বা খাদ্যব্যবস্থা। এখানে আমি সেই দুটো বিষয় নিয়ে কিছু বলার অবসর পাবো না। সেই ইচ্ছে নিয়েও এই লেখা লিখতে বসিনি। আসলে ‘আমাদের সময়’ কথাটা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না, প্রায় দশ বছর তো ইতোমধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছে।

‘লালন ও আমাদের সময়’ নিবন্ধে লিখেছিলাম, তিনি এমন এক মানুষ যিনি জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে ‘প্রজ্ঞা ও মুক্তির পথ’ অন্বেষণ করেছেন। ‘প্রজ্ঞা ও মুক্তির পথ’ কথাটির ওপর—বিশেষভাবে ‘পথ’ ধারণাটির গায়ে আমি নিজেই এখন হোঁচট খেয়ে পড়ছি। যখন লিখছিলাম তখন কিছুটা তাড়াহুড়া ছিল নিশ্চয়ই। সব লেখার বেলাতেই অবশ্য একই কথা। তবে লেখাটি লিখবার কিছুদিন পরই টের পেয়েছি লালন কোন ‘পথ’ অন্বেষণ করেন নি। ততক্ষণে লেখাটি বেরিয়ে গিয়েছে। এই ভুলটি সহজে ধরতে পারতাম না। আমরা একটি পথ ধরে কোথাও একটা উদ্দেশ্যে চলেছি এবং পেছনে পেছনে পুরনো পথ ফেলে নতুন পথে সরলরেখায় এগিয়ে যাচ্ছি—এই ধারণাগুলোর দার্শনিক মুশকিল প্রকট। আমরা কি আসলে কোথাও যাচ্ছি নাকি? পথের শুরুটাও বা কোথায়? কী দিয়ে পথের শুরু আর শেষের দাগ দেওয়া হয়? দেওয়া কি সম্ভব? মানুষের ইতিহাস কোন একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে বিবর্তিত হচ্ছে এই আগাম উদ্দেশ্যবাদিতা বা টেলিওলজি নিয়ে সন্দেহ এই কালের ভাবুকদের মধ্যে ভারী টনটনে হয়েছে। তাছাড়া ‘মানুষের মুক্তি’ নামক বয়ানগুলো নিয়ে তর্ক তো আছেই।

‘মুক্তি’, ‘পথ’ ইত্যাদি নিয়ে দর্শনে টানাপোড়েন চলছে – এটা আমি জানতাম না তা নয়। আমার টুটি টিপে ধরে কেউ যদি অর্থ ছিনতাই করতে না আসে তাহলে যা লিখেছি সেটা মহা অপরাধ কিছু নয়। কিন্তু আমি যে-ভুল করেছি সেটা যে লালনের দিক থেকেও ভুল, সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করা দরকার। আমি নিন্দার্থে মধ্যবিস্তৃত, পড়ি ইংরেজি, কলোনিয়ান শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোলামি তো আমার হাডেমজ্জায় থাকবেই। তাছাড়া পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনা ছাড়া আমাদের সময়ে বাংলার ভাবান্দোলনের অর্থোৎপাদন সম্ভব কিনা সেই বিষয়েও প্রশ্ন আছে। (আমাদের সময় কথাটি আবার ব্যবহার করতে হোল)। পথ, পথের অন্বেষণ ইত্যাদি কথা খুব মধুর —কিন্তু দর্শন বা ভাবচর্চা মাধুর্যের বয়ান নয়। লালনের দিক থেকেও যদি বলি লালন কোন একটা ‘পথ’ অন্বেষণ করছিলেন, সেটা শুনতে হয়তো ভাল শোনাতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুশকিল বাঁধায়।

ভুল ধরতে পারলাম লালনেরই একটা গানে। বাংলাদেশের মোটামুটি নামকরা এক বাউল গানের গায়ক লালনের একটি গান ভুল ভাবে গাওয়ায় একদিন কানে খটকা লাগল।

লালন লিখেছিলেন, ‘সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তা না না না’। কিন্তু ক্যাসেটে যে গানটি ধারণ করা হয়েছিল সেখানে গাওয়া হচ্ছে, ‘সত্য পথে কেউ নয় রাজি...’। ‘কাজ’ আর ‘পথ’ নিয়ে একটা বিবাদ উপস্থিত হোল। তখনই বুঝলাম ‘পথ’ কথাটা খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। দেশকালপাত্রভেদে বিশেষ ‘কাজ’ সত্য হতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ যে-কাজটা করা হয় সেটাই ‘সত্য কাজ’। কিন্তু সাধারণ ভাবে সত্য—শাস্ত্র বা দেশকালপাত্রভেদে ‘সত্য’ বলে কিছু নাই। ‘সত্য পথ’ আবার কী? কার পথ সত্য? মুসলমানের, হিন্দুর, বৌদ্ধের, খ্রিস্টানের, নাস্তিকের....? যখনই ‘সত্য পথ’ নামক ধারণা মাথায় পেরেকের মতো বিধে যায় তখনই আমরা ‘সাম্প্রদায়িকতা বা ভেদবুদ্ধির ফেরে পড়ি। লালনও কোন সত্য পথের কথা বলেন নি, সত্য কাজের কথা বলেছেন। আরেকটি গান থেকে উদাহরণ দিয়ে দাবিটা আরও মজবুত করি।

সাধকের দিন শুরু হয় গোষ্ঠ গান দিয়ে। ‘লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন চলো গোকুলবিহারি/গোষ্ঠে চলো হরিমুরারি’। ঝাঁশি হাতে যে হরি সকালে গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায় তাঁকে ডাকছেন সাধু। ওঠো গোকুলবিহারি, ওঠো হে কৃষ্ণ, আমরা গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাব। তোমাকে ছাড়া আমাদের চলবে না। কারণ ‘আমরা ম’লে তুই বাঁচাবি, তাই তোরে সঙ্গে করি’। তোকে আমাদের সঙ্গে নেবার স্বার্থ আছে। লালন যদি অসাম্প্রদায়িক হয়ে থাকেন, যদি কোন ঘোষিত সত্য পথ বা ‘ধর্মে’ তাঁর অনাস্থা না থাকে তাহলে এই কৃষ্ণকে সকালে ডাকছেন কেন? কেনই বা লিখলেন, ‘এলাহি আলামিন গো আল্লা বাদশা আলমপানা তুমি’—তাহলে আল্লা, নবী রসুলকেও ডাকবার কারণ কি?

কিন্তু যে কৃষ্ণ বা আল্লাকে তিনি ডাকেন তারা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়গত ধর্মের কেউ নন। কৃষ্ণ সম্পর্কে গোষ্ঠ গানের ভাবপ্রকাশক প্রথম গানেই লালন বলে নিচ্ছেন:

সত্যাসত্য সকল বেদ-আগমে কয়

সচ্চিদানন্দ রূপে পূর্ণ ব্রহ্ম হয়

জন্মমৃত্যু তার নাই ভবের পর

সেতো নয় স্বয়ং কভু নন্দ লালা।।

বলেছেন, সব বেদ বা আগম শাস্ত্র বা সকল ধরণের ধর্মশাস্ত্রই সত্য আর অসত্য নিয়ে তর্ক করে বেড়ায়। তাদের কথাবার্তা সত্য প্রতিষ্ঠা, অসত্য মোচন করা। তাদের কলাম সত্য আর অসত্যের দাবি নিয়ে। কিন্তু আমি যে-কৃষ্ণের কথা বলছি তাকে এই সকল বেদ বা ধর্মশাস্ত্র পাওয়া যাবে না। কারণ সেতো কখনই নন্দের পুত্র কৃষ্ণ হতে পারে না। কারণ যাকে আমি ডাকছি সে আমার প্রজ্ঞার ডাক, প্রজ্ঞার নিজেকেই নিজে আহ্বান, নিজেরই সচ্চিদানন্দ রূপ পরিগ্রহণের ডাক। যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম হবেন, বা ধরাধামে আল্লার গুণাবলী অর্জন করবেন, নিরাকার যাঁর মধ্যে সাকার হয়ে উঠবে—তিনি আর কেউ নন মানুষেরই সচ্চিদানন্দ রূপ।

তবে আল্লা কেন নিজেকে প্রকাশ করতে চান, সেটা ভিন্ন বিতর্ক। প্রশ্ন ওঠে, নিরাকার কি সাকার রূপ গ্রহণ করতে পারে? যদি বলি আল্লা সেটা পারবে না, তাহলে আল্লা কথাটার আর কোন অর্থ থাকে না। আল্লা কথাটির মানেই তো তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি সবই পারেন। তাহলে তিনি নিরাকার হতে পারেন, আবার সাকারও হতে পারেন। আল্লার ধারণার মধ্যেই এই সম্ভাবনা নিহিত। যদি আল্লা আল্লাই হয়ে থাকেন তাহলে নিরাকার ঈশ্বর সাকার মানুষের রূপও পরিগ্রহণ করতে পারার কথা। অবশ্যই তিনি মানুষের রূপও ধরতে পারেন। এই জন্যই মকরুল্লাহ।

ধর্মের বলয়ে থেকেই যুক্তি দিচ্ছি। অ-ধর্ম কিম্বা দর্শনের জায়গা থেকে নয়। লালন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা ধর্মীয় আত্ম পরিচয়ের রাজনীতি মানেন নি। অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ‘ধর্ম’ ছাড়েন নি। এখানেই তাঁর সঙ্গে নাস্তিক আর ‘আধুনিক’দের বিচ্ছেদ। এখানে এসে ধর্ম কথাটা দারুণ এক নতুন অর্থ অর্জন করে। কেন তিনি ধর্ম ছাড়ছেন না? এর উত্তর অনেক গভীর এবং যুগপৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও প্রথাগত দর্শনের গোড়ায় গিয়ে আঘাত করে। নিরাকারের সাকার রূপ পরিগ্রহণ করা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দিক থেকে বোঝা বোধহয় খুব জটিল নয়।। আমরা আজ যা জানি বা বুঝি তা কয়েক শ’ বছর আগে এমনকি কয়েক দশক আগেও কি জানতাম বা বুঝতাম? যে জ্ঞান নিরাকারে হাজির—মানুষের মধ্যে সবসময়ই সম্ভাবনা হিসাবে যে প্রজ্ঞা সততই উপস্থিত—তারই তো সাকার রূপ দেখছি আমরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে কৃৎকৌশলে। যে মিশ্রি কাঠ কেটে চেয়ার বানায়, তার আগে চেয়ার তো নিরাকারেই তার ইচ্ছা, আনন্দ বা কাজের পরিকল্পনা হয়ে হাজির ছিল। তারাই তো রূপ পরিগ্রহণ করলো। অতএব নিরাকারের সাকার রূপ পরিগ্রহণ ধর্ম বা দর্শন কোন দিক থেকে জটিল কোন ব্যাপার নয়। তাহলে কাজ বলতে কি ফকির লালন শাহ নিরাকারের সাকার হয়ে ওঠা—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ রূপে পূর্ণ ব্রহ্ম হওয়া বুঝিয়েছেন? এটা প্রশ্ন হিসাবে আমাদের হাতে থাকুক এতো জলদি সিদ্ধান্তে না পৌঁছালেও চলবে। এতোটুকু আমরা বুঝেছি যে সত্য পথ বলে কিছু নাই। ঠিক তেমনি সত্য ধর্ম, সত্য নীতি, সত্য ভাব, সত্য দর্শন, সত্য জ্ঞান ইত্যাদিও প্রশ্নসংকুল। খোদ ‘সত্য’ ধারণাটি নিয়েই সাধকের সন্দেহ। সাধক বলবেন, তুমি কী, সেটা তোমার কাজ দেখেই বুঝব, তুনি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবছ বা কী বলছ বা আর দশজন কী বলে তার দ্বারা তোমার বিচার হবে না। কাজ। একমাত্র কাজের মধ্য দিয়েই ভাবটা বোঝা যায়, ধরা যায়। মার্কসপন্থীরা এর সঙ্গে থিওরি ও প্রাকটিসের পুরানা তর্কটা প্রয়োজন বোধ করলে ঝালিয়ে নিতে পারেন।

এটা তো আশা করি বললে ভুল হবে না যে ফকির লালন শাহ ‘অধরা’—কে ধরবার লক্ষ্যে ভাবুকতা ও দর্শনের দিক থেকে অনেক মৌলিক কথা তুলেছেন। ‘ভাবুকতা’ ও ‘দর্শন’ সমার্থক নয়। এই পার্থক্য না বুঝলে ফকির লালন শাহ বা বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে কিছুই বোঝা যাবে না। ‘ভাব’ এবং ‘দর্শন’ সংক্রান্ত প্রশ্ন—অর্থাৎ যেসব প্রশ্ন আমরা এর আগে করতে পারি নি বা শুনি নি, তিনি সেটা তুলেছেন ও শুনিয়েছেন।

আমি দাবি করেছিলাম তাঁর প্রশ্নগুলো কেবল গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর জায়গা থেকেই তোলা সম্ভব। সেই জন্য ফকির লালন শাহকে আমাদের সময়ে বুঝবার জন্য আমার দাবি ছিল তাঁকে শ্রেণীগত ভাবেও অনুধাবন করতে হবে। এই দিকটা এখন এতো পরিষ্কার যে আর বিশেষ না বললেও চলে।

নারী বা প্রকৃতির জায়গা থেকে কথাটি তখন পরিষ্কার করে তুলি নি। যদিও বাংলার ভাবান্দোলন চরিত্রের দিক থেকে জ্ঞাত বিরোধী। সেই দিক থেকে নারী-পুরুষ সামাজিক জ্ঞাত ভেদেরও বিরোধী (ভাব চর্চার দিক থেকে তাদের প্রাকৃতিকতার ভিন্নতার আলাদা অর্থ আছে)। তবে বিভিন্ন ধারার মধ্যে এই ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। নানান জনের চর্চা বা 'করণকর্মের' মধ্যেও। পুরুষতান্ত্রিকতা বললে নারী পুরুষের যে-ক্ষমতার সম্পর্ক বোঝায় গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর সহমর্মী ভাবান্দোলনের ধারা সবসময়ই তার বিরুদ্ধে লড়েছে। কিন্তু নারীর প্রশ্ন বাংলার ভাবান্দোলনে সরলরেখায় চলে নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজের বিদ্যমান পুরুষতন্ত্র সাধুগুরু বাউল বৈষ্ণবদের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সেটা কতোটা ভাবের অন্যঙ্গ আর কতোটা ভাবের সঙ্গে অসঙ্গত সেই বিচার করতে যাওয়া বিশাল একটা কাজ। শুধু ভাবের বিচার নয়, আর্থ-সামাজিক গবেষণারও বিষয়। যে আর্থ-সামাজিক কারণে পুরুষতন্ত্র বাংলার সাধুগুরু বৈষ্ণবদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সেই কারণটাকে ভাবের প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে বোঝা না গেলে, এই বিষয়ে মীমাংসা খুব সহজে হবে না। এই গবেষণার অভাবটা মেনে নিয়ে আমি এতেটুকুই শুধু দাবি করে রাখতে পারি যে লালনের ভাবের সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিকতার সম্পর্ক সাপে-নেউলের সম্পর্কের মতো।

বাংলার ভাবান্দোলনে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিচারের আরও জটিলতা আছে। শ্রেণী ও লিঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে যেসকল আধুনিক বয়ান আমরা শুনি তার একটা শ্রেণী পর্যালোচনা ছাড়া এই দিকে সহজে এগুনো যাবে না। সেই কাজ পাশ্চাত্যেও হয় নি। নারী বা প্রকৃতির প্রশ্ন বাংলার ভাবান্দোলনের খুবই গোড়ার বিষয়। অন্যদিকে 'পুরুষ' বা 'নারী' সম্পর্কে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা দিয়ে বাংলার ভাবান্দোলনের কিছুই বোঝা যাবে না। বরং পুরো বিষয়ই আবছা হয়ে হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কেন হবে তার একটু ব্যাখ্যা দিচ্ছি। 'পুরুষ' বললে আমরা যে কর্তাসত্তা (subject) বুঝি বাংলার ভাবান্দোলনে 'পুরুষ' কথাটির মানে একদমই উল্টা। বাংলার ভাবান্দোলনে এই ক্ষেত্রে হেরফের আছে বলে নদীয়া পরিমণ্ডলের পরমোৎকর্ষের নজির হিশাবে লালনের ভাবের মধ্যেই আমার কথা সীমাবদ্ধ থাক। (নদীয়া আর বন্দাবনের পার্থক্যও মনে রাখতে হবে)। যে বায়োলজিকাল পুরুষ আর নারী আমরা দেখি তার সঙ্গেও এই ধারণার মিল সামান্য। প্রাকৃতিক কারণে আমরা যে নারী বা পুরুষ দেখি তারা হচ্ছে 'লিঙ্গ'। লিঙ্গ কথাটার মানে বাংলার ভাবান্দোলনে ইংরেজি genital নয়। লিঙ্গবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারণে লিঙ্গ বললেই আমরা সংকীর্ণ ও শারিরীক অর্থ করি। অথচ লিঙ্গ মানে চিহ্ন। দাগ। বিচ্ছেদ। আবার একই সঙ্গে সংযোগ। বিচ্ছেদ ও

কেন সমস্ত
বিদ্যমান
'পুরুষতন্ত্র'
সবুজের
পুরুষতন্ত্র
একই
আর্থ-সামাজিক
সংস্কৃতি
আরও তার
ভাবচর্চা
একই স্তর
একই মাত্রা
একই ভাষা
'লিঙ্গ'।
কিন্তু লালন
প্রথমদিক
একই
কেন?

সংযোগের দ্বাদ্বিক সম্পর্কই লিঙ্গ। প্রকৃতির এক, একক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রাণবন্ত সত্তা বা প্রক্রিয়ার যে-মূহূর্তগুলোকে আমরা দাগ দিয়ে আলাদা করতে পারি অথচ পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে-মূহূর্তগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত তারাই লিঙ্গ।

যে কোন দেশকালে তাহলে প্রাকৃতিক পুরুষ আর প্রাকৃতিক নারী প্রকৃতিরই দুটো মূহূর্ত। কিন্তু যদি প্রাকৃতিক প্রজাতি হিশাবে তাদের প্রক্রিয়া চলতে হয় তাহলে এই মূহূর্তগুলোর ক্রমাগত পুনরুৎপাদন জরুরী। যদি মানুষ নামক প্রজাতিকে টিকে থাকতে হয় তাহলে নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলন হতে হবে। তাহলে লিঙ্গ মানে যেখানে প্রকৃতি একক মূহূর্ত না থেকে দুটো মূহূর্তে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা দুটো মূহূর্তের চিহ্ন ধরতে পারছি। আবার প্রকৃতিকে প্রক্রিয়া হিশাবে সচল করবার জন্য, যুক্ত হবার জন্য প্রকৃতি নিজেই দুটো মূহূর্ত হয়ে নিজের জন্য অপেক্ষা করছে। যেখানে ভাগ হয়েছে এবং যেখানে আবার সংযোগ হবে বা হচ্ছে, সেটাই চিহ্ন বা লিঙ্গ। অতএব লিঙ্গ মানে পশ্চিমা অর্থে লিঙ্গ নয়। জেনিটাল নয়। এটা পরিষ্কার পাশ্চাত্যবাদী লিঙ্গপ্রধান সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে না এলে বাংলার ভাবান্দোলনের মর্ম ধরতে পারা খুবই কঠিন।

এটাও তাহলে পরিষ্কার প্রাকৃতিক পুরুষ তার শারিরীকতার কারণে 'কর্তা' নয়, কর্তাসত্তা (subject) নয়। কর্তা হচ্ছেন প্রকৃতি। তিনিই একমাত্র কর্তা। এবং তাঁরই বিশেষ মূহূর্তে বা বিশেষ মহাযোগে 'পুরুষ' নামক সেই অধরার আবির্ভাব ঘটে। সেই অধরাকে ধরাই ফকির লালন শাহের 'করণ'। এই পুরুষই 'সহজ মানুষ'। কিন্তু তাকে শুধু তন্ত্রমূলক 'করণ' দিয়ে ধরলে চলবে না। ধরতে হবে 'দিব্যজ্ঞানে'। 'সহজ মানুষ ভজ্ঞে দেখ নারে মন দিব্যজ্ঞানে' কথাটা সেই জনাই। হিন্দু বা বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে এখানে নদীয়ার গোরা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও লালনের পার্থক্য। অর্থাৎ নদীয়া পরিমণ্ডলের সঙ্গে হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্রের আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। নদীয়ার ভক্তির ধারার যে 'করণ' সেটা তান্ত্রিক ধারারই বিবর্তন, কিন্তু তন্ত্র বললে আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, সেই তন্ত্র নয়। ফকির লালন শাহের 'করণে' বা তাঁর তান্ত্রিক ধারায় শারিরীক লিঙ্গের ভেদবুদ্ধি থেকে কোন আচরণ বরদাশত করা হয় না। নারী পুরুষ হিশাবে কোন প্রকার লিঙ্গকেন্দ্রিক আচরণ ঘোরতর ভাবে নিষিদ্ধ। শিষ্যরা সেই কাজ করছে কিনা সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে তাদের কোন 'সৃষ্টি' হোল কীনা। কোনও সন্তানাদি হোল কিনা। সন্তান সৃষ্টি নিষিদ্ধ করার অনেক কারণের মধ্যে এক নম্বর কারণ হচ্ছে অখণ্ড প্রকৃতির যে-ধারা একের মধ্যে অনন্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে তাকে 'অখণ্ড' রেখে প্রকৃতির উজানে ফিরে যাওয়া। নিম্নগামী না হওয়া। দুই নম্বর কারণ হোল প্রাকৃতিকতার বশে বশীভূত না হওয়া বা শারিরীক প্রবৃত্তি দমন করা, নিজের জৈবিক তাড়নাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সহজ মানুষের আবির্ভাবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কী দাঁড়াল? জগৎসংসারে পুরুষ মাত্র একজন। তাঁর কোন লিঙ্গ নাই।

স্ট্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নাই
নাহিরে নপুংসক সেই

যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর
কী দিব তুলনা তাহার
রসিক জনা জানছে এবার
অরসিকে চমৎকারা
নীচে পদো চরক বাপে
যুগলমিলন চাঁদ চকোরা।।

মহাযোগে যে সহজ মানুষের উদয় ঘটে, জগৎসংসারে যিনি একমাত্র পুরুষ, তিনি এক ও একক। তিনি 'বহু' নন। অতএব তাঁকে কোন 'সামান্য' (universal) ধারণা দিয়ে দেখা পাওয়া যায় না, বোঝা যায় না। তিনি স্ত্রী নন, পুংলিঙ্গ নন। তিনি নারী বা পুরুষ নন। এমনকি নপুংসকও নন। কেন 'নপুংসক' নন। কারণ তাঁকে যদি প্রথাগত অর্থে লিঙ্গ বা genital organ দিয়ে বুঝি তাহলে তো হোল না। 'নপুংসকতা' তো সেই প্রকার লিঙ্গকেন্দ্রিক ধারণা। ব্রহ্মাণ্ডের লিঙ্গ কি যদি জানতে চাই বা 'পুরুষ' কী লিঙ্গের বলে যদি প্রশ্ন তুলি, 'অরসিক'—কে কী করে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। সে তো লিঙ্গ ছাড়া কিছু বোঝে না। কী করে সেই অধরা-পুরুষের 'লিঙ্গের'—সেই চিহ্নের তুলনা দেওয়া সম্ভব? প্রশ্নের তাৎপর্য ও উত্তরের স্বাদ কি অরসিক বুঝবে? যে-অধরাকে ধরবার জন্য সাধকের নিষ্ঠা ও কঠোর করণকর্ম সেটা একমাত্র 'রসিক'—ই জানেন। আর অরসিক 'চমৎকারা' হয়—হতভম্ম হয়ে যায়। লালন বলছেন, যে পদ্যচক্রের সাধনের কথা আমি বলছি, যে 'যুগল-মিলন' সাধনার ধারা আমি চর্চা করি সেটা একমাত্র রসিকের পক্ষেই জানা, বোঝা ও চর্চা করা সম্ভব। অরসিকের নয়।

বাংলার ভাবান্দোলনে নারীপুরুষ প্রশ্নের রাজনৈতিক দিক নিয়ে পুরুষতন্ত্র বিরোধী নারীবাদীদের সঙ্গে লালনপন্থীদের মিল যোল আনা। এ অর্থে যে এই ধারা রাজনৈতিক ভাবে যে কোন প্রকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক (বা ক্ষমতার) অসাম্যের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সমান, কিম্বা সাধু ও অসাধু উভয়কে মুড়িমুড়াকির মতো একদরে বাজারে বিকোতে হবে—সেটা লালন মানবেন না। জ্ঞান এবং অজ্ঞান সমান কাতারে হাজির করা যাবে না। ফলে লালনপন্থীরা সাম্যবাদী নন, গণতন্ত্রীও নন। তাছাড়া 'গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার / অধঃপাতে গতি হয় তার'। যাকে জ্ঞানী বলে মানি, জীবনচর্চার গুণে যার মধ্যে পরমের ছবি আমরা দেখি তাঁকে তো আর সাধারণ অর্থে জীব মনে করা যায় না। তাঁর জীবন শুধু জীবের জীবন নয়। তাঁকে অন্য মানুষের মতো বিচার করলে চলবে না। বলা বাহুল্য, জ্ঞানচর্চার প্রথম শর্ত হচ্ছে ফকির বা স্বেচ্ছায় সর্বহারা হওয়া এবং জ্ঞান বিতরণ করে অন্যের ভিক্ষার ওপর জীবন নির্বাহ করা। জীবের জীবনে মানুষসহ প্রতিটি জীবই সমান। কিন্তু জীব যখন পরমের জীবন বেছে নেয়, পরমের জন্য নিজের জীবের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে, তখন তাকে জীবের কাতারে বিচার করা চলে না। সাধু আর অসাধু—কিম্বা জ্ঞানী আর অজ্ঞানী এক হতে পারে না—তাদের জীবনচরণও একরকম হতে পারবে না।

নারীপুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধ সম্পর্কে ‘লালন ও আমাদের সময়’ নিবন্ধে পাশ কাটিয়ে যাবার কারণগুলো বললাম। নিজের পক্ষে ওকালতি করবার জন্য নয়। আগের লেখার দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেবার জন্য। এই প্রশ্নটা বাংলার ভাবান্দোলনের গোড়া ধরে আলোচনা না করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই বেশি।

যতোটুকু ওপরে বলেছি, তাতে লালনের আরও কয়েকটি কালাম এখন বোঝা সহজ হবে। যেমন:

সুনত দিলে হয় মুসলমান
বলো নারী লোকের কী হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনি চিনি কিসে রে?

ধর্মতত্ত্ব যেভাবে নারীপুরুষ ভাগ করে সে বিভাজনের অযৌক্তিকতা তুলে লালন শুধু নারীপুরুষ ভেদকেই প্রশ্নবোধক করে তুলছেন না, খোদ ধর্মতত্ত্বকেও বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। তুলনামূলক ভাবে কঠিন উচ্চারণ গুলোও বোঝা হয়তো এখন খানিক সহজ হবে:

নিগম বিচারে সত্য গেল তাই জানা
মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা
.....
পুরুষ পরওয়ারদিগার
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার... ইত্যাদি

শেষ গানে লক্ষ করতে হবে একটা প্রচ্ছন্ন ঠাট্টাও আছে। পুরুষ পরওয়ারদিগার, ধর্মতত্ত্ব যখন এই দাবি করে তখন সেটা ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া পরওয়ারদিগারের লিঙ্গ নির্ণয়। কিম্বা, উল্টো ভাবে বললে, পরওয়ারদিগার ‘পুরুষ’। ধর্মতত্ত্ব যখন ক্ষমতার চর্চা হয়ে দাঁড়ায় তখন আল্লাকে ‘পুরুষ’ রূপে ভাবাই অভ্যাস। কর্তাসত্তা বা কর্তাগুণ (subjectivity) একমাত্র পুরুষেরই আছে। নারী বা প্রকৃতির নয়। পুরুষতন্ত্রের মধ্যে এই অভ্যাসের চর্চা ও বিস্তার। কিন্তু, লালন বলছেন, নিরাকার পুরুষকে ধর্ম যদি নিরাকারই ভাবতে চায় তাহলে সাকার পুরুষ হিশাবে তাকে ভাববার এই অভ্যাসটা কেন? যে-পুরুষকে তিনি পরওয়ারদিগার জ্ঞান করেন সেই পুরুষের অঙ্গ হয়েই ‘প্রকৃতি’ সবসময় ছিলেন। অন্যদিকে সাকার রূপে যখন প্রকৃতিকে ভাবি তখন তিনি নিরাকারেরই অঙ্গ ছাড়া আর কি? কর্তাসত্তা হিশাবে প্রকৃতি নিরাকারের, ‘মহাজনের’, সহজ মানুষের, অধরারই প্রকাশ। এই তো ব্যাপার। এক লাঠিতে অনেক সাপ মারছেন ফকির লালন শাহ। যেমন:

এক শরীরের কারণে পুরুষের কর্তাসত্তা হওয়ার দাবি বা ধারণা চ্যালেঞ্জ।

দুই. নিরাকার আল্লাহকে পুরুষ জ্ঞান করা এবং সাকার পুরুষ জ্ঞানে তাঁর গুণ বিচার করা, সাকার পুরুষ হিশাবে তাঁকে ধরে নেওয়া বা অনুমান করা। ইত্যাদি স্ববিরোধিতা বা ‘কুফরি’ নাকচ।

তিন. প্রকৃতিই কর্তা। প্রক্ৰিয়া হিশাবে সাকার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নিরাকার পুরুষের সাকার রূপ অর্জনের খবর প্রকাশ করা।

চার. এক ও একক পুরুষ—সেই মহাজন বা অধরাকে ধরবার জন্য প্রাকৃতিক চিহ্ন, মুহূর্ত বা ‘লিঙ্গ’ সংক্রান্ত ভাবমণ্ডলের দিগন্ত প্রসারিত করা।

পাঁচ. দিগন্ত প্রসারের মধ্য দিয়ে লালনের ঘরের করণকর্মের ভাবগত ভিত্তিটা লালনের আগের তাত্ত্বিক ধারা ও চর্চা থেকে আলাদা ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইত্যাদি।

‘লালন ও আমাদের সময়’ নিবন্ধে এই প্রশ্নগুলোর অনুপস্থিতি আরো বড়ো পরিসরে আলোচনার অভাবের দিকেই ইঙ্গিত করে। সেই জন্য আমার আসল প্রশ্নটি ঠিক কী ছিল, যে কথাটা তুলেছিলাম সেটা কীভাবে বলেছি—একটু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি:

‘এখন, আমাদের বর্তমান সময়ে ফকির লালন শাহকে আমরা কী করে দেখব? কী করে বিচার করব? তাঁর গান শোনা, গান ভালবাসা, গানের কথা বোঝা ও কথার ভেতরে প্রবেশ করা তো আছেই। সেই প্রয়াস চলবে। কিন্তু তাঁকে বুঝবার ও জানবার চেষ্টা শুরুর আগে কিছু দিক আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে।’

নিজের কথা নিজে টুকছি বেশরম হয়ে। এর কারণ হোল ‘লালন ও আমাদের সময়’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আসল কথা কিছুই বলা হয় নি। এখনও হোল না। কারণ কথা শুরুর ‘আগের’ কিছু দিক নিয়ে শুধু নাড়া চাড়া করেছি। আগের দিকগুলোও তো সব দিক নয়। ছিটেফোঁটা কিছু প্রসঙ্গ কেবল। যথা:

এক: শ্রেণী, জাত, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদ, সম্প্রদায় বিভক্তিসহ যে কোন প্রকার ভেদাভেদের বিরোধী ছিলেন লালন ফকির। ফলে তাঁর শ্রেণী ও জাত বিরোধী সংগ্রামের ধারা খুবই স্পষ্ট। এই দিকটা বোঝা খুবই সহজ।

দুই: নিরক্ষরতার সঙ্গে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার সম্পর্ক। শিক্ষা মাত্রই জ্ঞান নয়। মানুষের অভিজ্ঞতা যখন অক্ষরের দোষে দূষিত না হয়ে সং চিন্তের আনন্দ হয়ে রূপ লাভ করে, সেই সচ্চিদানন্দ রূপের প্রতি নিরিখ অটল রাখার প্রতি মনোযোগ।

যদিও প্রাথমিক ও মস্তব্যমূলক লেখা, তবুও ‘লালন ও আমাদের সময়’ নিবন্ধটি কিছু দিক হয়তো আমাদের ধরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু ‘আমাদের সময়’ কথাটি আমার মাথা থেকে কেন যাচ্ছে না এবং কেন এই বিষয়ে আরো বড়ো প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসতে হবে সেই সম্পর্কে দুই একখানা কথা বলে শেষ করব।

আমাদের সময়ে ‘মুক্তি’, ‘ব্যক্তি’, ‘শ্রেণী’, ‘লিঙ্গ’ ইত্যাদি নিয়ে যে প্রশ্নগুলো দর্শন ও রাজনীতিকে আলোড়িত করেছে সেখানে একটা শিথিলতা এসেছে। পুরনো প্রশ্ন ও

পুরনো উত্তর নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি যে জায়গায় জোর দেব সেটা কার্ল মার্কসের সূত্র ধরে। মার্টিন হেইডেগার কার্ল মার্কস সম্পর্কে বলেছেন মার্কস দর্শন বা পরাবিদ্যাকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। মার্কস মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা হেগেলের দর্শনকে পায়ের ওপর দাঁড়াবার যে কথা নিজে বলেছেন, এটা সেই রকম কথা নয়। মার্কস দর্শন বা পরাবিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অর্থশাস্ত্র নামক সম্পূর্ণ নতুন এক বিজ্ঞানে প্রবেশ করেন বা ফরাসি দার্শনিক ল্যুই আলথুসারের ভাষায় নতুন এক বিজ্ঞান ‘আবিষ্কার’ করেন। মার্টিন হেইডেগারের নিজের প্রকল্প ছিল দর্শন বা পরাবিদ্যার সম্ভাব্য পরিণতি সমাপ্ত করা, তাঁর ভাষায় দর্শনের enclosure বা ঘের দিয়ে তার সীমা টেনে দেওয়া। আমাদের সময়ে পাশ্চাত্যের দর্শন এই কাজটাই করছে বলে দাবি উঠেছে।

হেইডেগার বলেছেন কার্ল মার্কস পরাবিদ্যাকে উল্টে দেওয়ার কারণে দর্শনের চরম সম্ভাবনা কার্ল মার্কসের হাতেই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এরপরও হেইডেগার প্রশ্ন তুলেছেন যদি দর্শন বা পরাবিদ্যার দিন শেষই হয়ে গিয়েই থাকে, তার চরম সম্ভাবনা যদি অর্জিত হয়ে গিয়েছে বলে আমার বুঝে থাকি তাহলে কি দর্শন বা ভাবুকতা বলে আর কিছুই থাকবে না? দর্শন বা ভাবুকতা কি এমন কোন বিষয় বা ব্যাপার ভাবতে ভুলে গিয়েছে, তার বিষয় থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে, যে-বিষয় নিয়ে মানুষকে ভাবতেই হবে। চিন্তা যে স্থান থেকে শুরু করেছিলো সেটা একটা বস্তু হয়ে এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার মানে কি চিন্তার আর কিছুই চিন্তা করবার নাই? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কার্ল মার্কস দর্শন থেকে বেরিয়ে এসে অর্থশাস্ত্র নামক নতুন জ্ঞানে তৈরি করলেন, জ্ঞানের পর্যালোচনার একটা প্রকরণ ও পদ্ধতি গড়ে তুললেন। জ্ঞানের কাজ সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, সত্য অন্বেষণও নয়, বরং মানুষের ভাব, ভাষা, প্রকাশ, কথাবার্তা শাস্ত্র-বিজ্ঞান ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে শেখা। ক্রিটিক অব পলিকাল ইকনমি। অর্থশাস্ত্র নামক কোন সত্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠা নয়। বরং সকল প্রকার বিদ্যার পর্যালোচনা করতে শেখা। হেইডেগার ইঙ্গিত করছেন মার্কস যদি দর্শনের বাইরে বেরিয়ে এসে যে পরাবিদ্যার ওপর এতোকাল দর্শন দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে উল্টে দিয়ে থাকেন তাহলে দর্শন শেষ হয়ে গিয়েছে, ভাবচর্চার দিন আর নাই—এই কথা কি বলা চলে? বরং পরাবিদ্যার দিন শেষ হয়েছে বলে ভাব ও করণকর্মে অসীম সম্ভাবনা নতুন করে হাজির হয়েছে। এখানে কার্ল মার্কস, মার্টিন হেইডেগার এবং ফকির লালন শাহ কোথায় গিয়ে যেন পরস্পরের হাত ধরে ফেলেন।

আমাদের সময়ে পরাবিদ্যামূলক চিন্তার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। মেটাফিজিক্স আর সম্ভব নয়। তার জায়গা দখল করেছে অর্থশাস্ত্র। চিন্তা যে সকল অনুমান মেনে নিয়ে এতোকাল চিন্তা করে এসেছে সেই অনুমানের পরাবিদ্যা যদি একটা বস্তু এসে নিজের সীমা নিজে টেনে দেয়, বৃত্তায়িত হয়ে শেষ হয়, সকল অনুমানের সম্ভাব্য ফলাফলগুলো যদি আমাদের এখন জানা হয়ে যায়—তার মানে কি চিন্তার আর কিছুই চিন্তা করার

থাকল না? মার্টিন হেইডেগার বলছেন আমাদের সময়ে এটাই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন। চিন্তা কী চিন্তা করতে ভুলে গেল, সেটা সন্ধান করাই এখনকার কাজ।

সেই দিক থেকে বাংলার ভাবান্দোলনের অনুমান বা পরাবিদ্যার বস্তু কি টানা হয়ে গিয়েছে? ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের কারণে পাশ্চাত্যের যে-চিন্তাকে আমরা চিন্তার সর্বোচ্চ বিকাশ বলে জানি সেই চিন্তা সম্পর্কে কার্ল মার্কস আর মার্টিন হেইডেগারের রায় আমরা শুনলাম। সেই চিন্তার বিচারে আর সকল চিন্তাই তো অবিকশিত, পশ্চাতপদ—নয় কি? এটাই তো আমাদের ঔপনিবেশিক মনের বিশ্বাস। তাহলে এই বস্তু টানাটানির মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বেদ বুঝি কী করে? ভাবুকতার এই মীমাংসা ছাড়া ‘আমাদের সময়’ কথাটিকে পরিচ্ছন্ন ভাবে বোঝা যাবে না। যেভাবে এই ভাবের মীমাংসা হবে সেই ভাবটাই বা কি? কী সেই বীজের বীজ, জ্ঞানের জ্ঞান, চৈতন্যের চৈতন্য—যা আমরা ভাবতে ভুলে গিয়েছি?

মার্টিন হেইডেগার কথাটা পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে বলেছেন। এই দাবি করা কি যায় যে ফকির লালন শাহের শরণাপন্ন হলে তিনি সম্ভবত মনে করিয়ে দিতে পারবেন, চিন্তা কী চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছে। বা চিন্তা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া কোন বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি। হেইডেগার পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে যে দুটো প্রশ্ন তুলেছেন আমরাও সেই প্রশ্ন তুললে উপকার পেতে পারি।

এক. আমাদের সময়ে দর্শন বা ভাবুকতা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই কথাটার অর্থ কি? বাংলাদেশের কথা মনে রেখে আমরা যোগ করব, বাংলার ভাবান্দোলনও কি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে? নাকি এই কথা শুধু পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কেই শুধু খাটে।

দুই. এই চূড়ান্ত পর্যায়ে চিন্তার জন্য কী কাজ আর বাকি থাকল? ভাবুকতার ভূমিকা কি? যদি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমরা ঠিক মতো খুঁজতে পারি তাহলে ফকির লালন শাহের ‘করণ’ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও পরিচ্ছন্ন হবে।

আমাদের সময়ে চিন্তা বা ভাবুকতার জন্য কী কাজ বাকি থাকল? খুব সহজ কিন্তু অসাধারণ প্রশ্ন। প্রশ্নটা তোলা হল, এটাই বড়ো কাজ।

চিন্তার জন্য কী কাজ বাকি থাকল—আমাদের সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য ফকির লালন শাহের কাছে গেলে আমাদের নগদ কিছু লাভ হবে। এতোটুকুই আমার দাবি।

ইতিহাস ও দেশকালের প্রচলিত ধারণা এবং লালন

লালন হিন্দু ছিলেন নাকি মুসলমান ছিলেন এই তর্ক সীমান্তের দুই পাশের দুই সাম্প্রদায়িক ধারা বিস্তার দিন থেকেই করে আসছে। এই সাম্প্রদায়িকতার চেহারা কখনো খোলা, অতি অনায়াসেই চেনা যায়। কিন্তু অনেক সময়ই লুকানো: ইতিহাসের ছুতোয় বা গবেষণার অজুহাতে যখন লালনের জীবনবৃত্তান্ত খোঁজার হুজুগ ওঠে তখন এই গুঢ় সাম্প্রদায়িকতা কাঁজ শুরু করে দেয়।

হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা খেয়ে না খেয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন লালন একজন হিন্দু কায়স্থ, পদবী হচ্ছে কর। মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা কম না। তাঁরা ভুয়া দলিল পুঁথি আবিষ্কার করে প্রমাণ করে চলেছেন লালন আসলে মুসলমান। মুসলমানী হীনমন্যতা যাদের মধ্যে প্রবল তাঁরা আবার এটা বলতে ভোলেন না যে লালন আগে ছিলেন হিন্দু, তাঁর গুরু সিরাজ সাইয়ের মুরিদ হয়ে মুসলমান হয়েছেন। ইত্যাদি।

এগুলো এখন জানাজানি হয়ে গেছে। ছেঁউড়িয়ার মাজারে দূর-দূরান্ত থেকে সাধকরা যখন ফি-বছর পহেলা কার্তিকে তাঁদের সাইজীকে ভক্তি দেবার জন্যে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সকল লালন গবেষণার কেছা শুনে তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে ছি ছি করে উঠেছেন। একী কাণ্ড!! সাইজী তো নিজের পরিচয় দেননি গো বাপ, তো তোমাদের শিক্ষিতের ভেতর এই অশিক্ষা কেন এল বুঝায়ে কও দেখি যাদু? মানুষ কমনে হিন্দু মুসলমান হয়? এক প্রোড়া লালন ভক্ত থুতনিতে তর্জনি থুয়ে চোখ গোল করে প্রবল কৌতুকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আসলেই। মানুষ কেন হিন্দু মুসলমান হয়? কেন ধর্মে আচারে জাতিতে পরিচয়ে বর্ণে বর্ণাশ্রমে সাদায় কালোয় রাষ্ট্রে মানচিত্রে দেশে ভূগোলে ভাগ হয়ে যায়? কঠিন প্রশ্ন। ইতিহাস সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির ঘাণ্ড পণ্ডিতরা এই গুঢ় ব্যাপারটি বোঝার জন্যে এখনো নিজের চুল ছিঁড়ছেন বলেই তো জানি। আমি অধম কী আর উত্তর দেবো?

কিন্তু প্রশ্নটি যখন একজন লালনভক্ত বা তাঁর অনুসারী করেন তখন একটা ভয়াবহ মুশকিলে পড়তে হয়। কারণ তাঁর কাছে এটা প্রচলিত অর্থে ইতিহাসের প্রশ্ন নয়। ইতিহাসের প্রচলিত ও কমবেশি বদ্ধমূল ধারণা ধরে নেয়, সময় নামক একটি ব্যাপার অনাদিকাল থেকে অনন্তের দিকে সরলরেখায় বয়ে চলেছে, ওর মধ্যে ঘটছে নানান ঘটনা। সমাজ জাগছে, বিলয় লাভ করছে। রাষ্ট্র উঠছে, ভাঙছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সবই ঘটছে এই সরলরেখিক সময়ের মধ্যে। প্রশ্ন হোল, এই আবির্ভাব ও বিলয় কি সময়ের মধ্যে ঘটছে, নাকি আবির্ভাব ও বিলয়ের প্রাণবন্ত প্রক্রিয়াটাই স্বয়ং সময়? অর্থাৎ সময়ের মধ্যেই কি ইতিহাস ঘটে? নাকি ইতিহাস নিজেই সময়? ইতিহাস, প্রক্রিয়া, বিবর্তন, বিকাশ বা আবির্ভাব-বিলয়ের বাইরে কি সময় নামক কিছু আছে? কী সেই সময়? এই আবির্ভাব ও বিলয়কে আমরা যখন লক্ষ করি তখন কোথায় লক্ষ করি? কীভাবে লক্ষ করি? সময় নামক কোন দিগন্তে? নাকি স্থির বা স্থিতিমূলক কোন একটি সত্য বা কাল্পনিক দেশ বা দাগের ওপর দাঁড়িয়ে। এই দেশে যা প্রকাশ্য সেই দিকটাই শুধু আমরা দেখি; আর দেশের অতীত বা যা কিছু অপ্রকাশ্যে তা রয়ে যায় দাগের বাইরে, আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। এই যে একটা স্থিতিমূলক অবস্থান থেকে যা আবির্ভাব ও বিলয় লক্ষ করা ও বিচার করা তাকে কী বলব? দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি? দৈশিকতা? তাহলে সময় এবং দেশের সঙ্গে ফারাকটা কী? ইতিহাস কি সময়ের মধ্যে ঘটে? নাকি দেশের মধ্যে। সাধারণত দেখা যায় ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধারা আর স্বঘোষিত প্রগতিশীল ধারাও ধরে নেয় একটি সরলরেখিক সময়ের মধ্যেই ইতিহাস ঘটে। যেন সময় আর ইতিহাস আলাদা। বুঝিবা ইতিহাস, দেশ ও সময়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। সময় মানেই ইতিহাস থেকে ভিন্ন একটা ব্যাপার। অনাদি, অনন্ত ও আবহমান। ওর মধ্যে ইতিহাসের ব্যাপারস্যাপারগুলো ঘটে চলেছে। ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—যে নামেই এই দুই ধারাকে ডাকা হোক—উভয়ের কেউই ইতিহাস ও সময়ের সম্পর্ক নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। এটা তাদের জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ই নয়। ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞান বা পশ্চাদ্দপ ধারার বিপক্ষে অগ্রসর চিন্তা হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একসময় চ্যালেঞ্জ হুঁড়েছিল দারুণ। সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত দেশগুলোর পতনের মধ্য দিয়ে বোঝা গেল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত জ্ঞানতত্ত্বের গোড়ায় ভয়ানক গলদ আছে। ইতিহাস ও সময় সংক্রান্ত পশ্চাদ্দপ ধ্যানধারণার ওপরেই এই জ্ঞানতত্ত্ব দাঁড়ানো। সময় ও ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয়ে চুপ থেকে ইতিহাস বদলে ফেলা যায় না, এই সত্যটা ইতিহাস নিজেই আমাদের সম্প্রতি শিক্ষা দিয়েছে। এখানে শুধু বলে রাখা দরকার কার্ল মার্কসের চিন্তার মধ্যে দ্বাদ্বিক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামক কোন পরিগঠন বা পরিভাষা নেই।

তাহলে, সাঁইজী তো নিজের পরিচয় দেননি গো বাপ, তো তোমাদের শিক্ষিতের ভেতর এই অশিক্ষা কেন এল বুঝায়ে কও দেখি যাদু? মানুষ কমনে হিন্দু মুসলমান হয়? এই প্রশ্নাত্মক কৌতুকটির মর্ম অনেক অনেক গভীর। এর বিস্তার বিশাল।

লালন কি জন্মলাভ করেছিলেন? নাকি তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল? কবীর ভক্তদের মুখে শুনেছি কবীর আসলে বঙ্গে লালন নাম নিয়ে আবার ধরা দিয়েছেন। দুজনেই লালিত হয়েছেন তাঁতীদের মধ্যে। লালন নিজেও তাঁর গানে এই জোয়ার কথা বলেছিলেন।

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই
ভক্ত কবীর জেতে জোলা
প্রেমভক্তিতে মাতোয়াল
ধরেছে সেই ব্রজের কাল
দিয়ে সর্বশ্ব ধন, তাই।।

জাতপাত ধর্মভেদে ঘোর অবিশ্বাসী এবং নাথপন্থার সঙ্গে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কারণে লালন আর কবীরকে আসলেই ফারাক করা মুশকিল। তারা তাঁর জ্ঞানকে আয়াত গণ্য করে। ফলে কোরানের আয়াতের বিকৃতি যেমন ঘোর অপরাধ তেমনি লালনের গানের কথা ও সুরের বিকৃতিও সমান অপরাধ। কিন্তু তাঁরা মোল্লা পুরোহিতের মতো কোন প্রকার সংযবদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করেন না বলে ওই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু করছেন না। মুখ বুজে সত্য করে চলেছেন। তারা বলেন, মুহম্মদ যে জ্ঞান আল্লার কাছ থেকে পেয়েছেন সেই সত্য জ্ঞানই বাংলায় আলো হয়ে উঠেছে। একে প্রতীকী বা আক্ষরিক যে কোন অর্থেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবে তাঁরা কক্ষণো লালনকে পীরপয়গম্বর বলে দাবি করেন না। মুহম্মদই দুনিয়ার শেষ নবী। এখানেই সব তর্কের পরিসমাপ্তি টানতে হবে। এই অর্থে যে মুহম্মদই হচ্ছেন দুনিয়ার শেষ জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁকে আল্লার বরাতে জ্ঞান প্রচার করতে হয়েছে। এই সত্য এখন রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে যে এখন আর সেই বরাতের দাবিদার কেউ হতে পারবে না। কিন্তু আল্লার সঙ্গে মানুষের পারস্পরিকতা শেষ হয়ে যায় নি। জ্ঞানীর জ্ঞান বা গুরুস্বরূপ প্রজ্ঞার মধ্যে পরম স্বয়ং হাজিরা দেন। ফলে জ্ঞানীর মধ্যে আমরা সেই সাকার ও নিরাকারের দৈব সম্পর্কই আমরা দর্শন করি। সাকারে নিরাকারের আবির্ভাবের স্বভাবটাই এমন – সহজ ও সজ্ঞান মানুষের মধ্যেই তার আনন্দ, প্রজ্ঞার সদানন্দ রূপের মধ্যেই তার অভিপ্রকাশ। তাঁর লীলা।

এগুলো ভক্তের ভাষা বলে আমরা উপেক্ষা করি। ব্যাপারটা মোটেও এমন নয় যে ভক্তেরা জ্ঞানেন না তাঁরা কী বলছেন। একটা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতা। ঘটনা আমরা যেমন দেখি তেমনই তাকে বোঝা। প্রকট চক্ষুকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রাবল্যে এটাই নিরন্তর আমরা করি। আমরা যা দেখছি তাকেই বাস্তব বলে বিশ্বাস করছি। কিন্তু যদি যা দেখি তাই সত্য হোত তাহলে তো পৃথিবীতে বিজ্ঞানেরই জন্ম হোত না। কথাটা কিন্তু আমার নয়। পরম পূজনীয় কার্ল মার্কস মশায়ের। কিন্তু ভক্তের পক্ষে তাঁর বরাত টানলাম। ভক্তির পক্ষে আর একটি যুক্তি দিয়ে প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

আমরা দেখি মানুষ জন্ম লাভ করে। দিনক্ষণ পলদণ্ড মোতাবেক ঘড়ি ধরে সেই জন্মের ঘন্টা সেকেন্ড মিনিট নিক্রপণ করা যায়। ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটিকে জন্মের ক্ষণ বা মুহূর্তের ব্যাপার বলে গণ্য না করে তাকে সমগ্র প্রকৃতি বা বিশ্বনিখিল বা যে কোন নামই দেওয়া হোক—সেই সমগ্র ব্যাপারের নানান উপাদান, অংশ ভগ্নাংশ, ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলাফল আকারে দেখি তাহলে সেই জন্ম লাভ কি সময় দিনের ব্যাপারে মেপে বলার দরকার হয়? তাকে বলতে পারি আবির্ভাব। যা ছিল না, তার হয়ে ওঠা। সেই হওয়াটা প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ার দ্বারা ঘটে—এটা লালনপন্থীরা ঘোরতরভাবে অস্বীকার করবেন। চর্চা করতে হবে, করণ করতে হবে। কারণ মানুষ নিজেই তো প্রকৃতি। তাহলে সজ্ঞান প্রকৃতি হিসাবে সে তার শরীরকে যদি গর্ভবতী নারীর মতো যত্ন নেয়, সেবা করে, নিয়ম, সংস্কার ব্রত মেনে চলে তখনই সহজ মানুষের আবির্ভাব ঘটে। লালন যেই তারিখে জন্ম লাভ করেছিলেন সেই তারিখে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্ম হয়েছিল। কই, তারা লালন হোল না কেন? অতএব জন্ম সম্পর্কে সময়মূলক বা সময় দ্বারা নির্দিষ্ট বা নির্ণীত যে—ধারণা তা আবির্ভাব সংক্রান্ত দৈশিক ধারণার মধ্যে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অন্যদিকে বিশেষ (particular) ও সামান্যের (universal) মধ্যে ভেদ ও অভেদের সীমারেখাগুলো পরিষ্কার জানার ব্যাপার আছে। লালন মানে একজন মানুষ। মানুষ একটি সামান্য ধারণা। আমরা সকলেই মানুষ। কিন্তু মানুষ নামক সামান্য মাত্রই লালন নন। অন্যদিকে লালন নামক একজন বিশেষ মানুষের মধ্যে মানুষ নামক সামান্যের অসীম সম্ভাবনার খানিক মূর্ত রূপ আমরা লক্ষ করছি। তার মানে মানুষ মাত্রই বা মনুষ্যরূপ ধারণ করলেই এই বিশেষগুণ লাভ হয় এই কথাও সত্য নয়। এই দিকটা এই কারণে বলে রাখছি যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা সাম্যসংক্রান্ত তথাকথিত আধুনিক ধারণা বিশেষ ও সামান্যকে গুলিয়ে ফেলে। মানুষ নামক সামান্য ধারণাকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে এই আদর্শ দাবি করে সকলেই যেহেতু মানুষ এতএব সকলেই সমান। এই মানদণ্ডে একজন জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, লোভী ও নির্মল, কুটিল ও সরল, শোষক ও শোষিত, মজুর ও পুঁজিপতি উভয়েই সমান। রাষ্ট্র ও আইনের চোখে এই দুই বিরোধী চরিত্রের মানুষ সমান, অতএব সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য। ইত্যাদি।

তাহলে লালনের কেন এই আবির্ভাব ঘটে তার জন্য ইতিহাস খাঁটলে হবে না। খাঁটতে হবে জীবস্বরূপ অবস্থায় বা জীবদ্দশায় মানুষ তার পশুস্বভাবের সঙ্গে কীভাবে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে বা করে। কী করে প্রেমকে কাম থেকে আলাদা করে। এই সকল লড়াই বা করণ এর মধ্যেই তার ব্যাখ্যা সন্ধান করতে হবে। সেই করণ জানতে হবে শিখতে হবে – যেন প্রজ্ঞার পুনরাবির্ভাব ঘটে। কবীর আর লালনের জীবন, চর্চা ও জ্ঞানকথার মধ্যে প্রবল মিল দেখে ভক্তুরা বলেন ফকির লালন শাহ হচ্ছেন আসলে কবীর স্বয়ং। কারণ সকল জীবের মধ্য দিয়ে একই প্রজ্ঞা নিজের বিকাশের জন্য জীব-

স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। লালন আর কবীর জীব রূপে আলাদা কিন্তু একই প্রজ্ঞার আরেকটি মূহূর্ত মাত্র। সময়-এর ধারণা দ্বারা দুটো এবং চোখে যা দেখি সেটাই সত্য এই অজ্ঞানতায় যারা বিভ্রান্ত, তাঁরা ভক্তের এই কথাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করেন। ভক্তেরা কখনই দাবি করেন না কবীর আর লালন একই লোক, একই মানুষ। তাহলে তো আবির্ভাব কথাটার কোন মানে হয় না। তাঁরা বলবেন, একই প্রজ্ঞা একদা সাধক কবীর রূপে, আবার অন্যত্র ফকির লালন রূপে আমাদের দেখা দিয়েছেন। হয়তো ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর বহুজন্মের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখা দিয়ে চলেছেন। যেন আগামীতে আবার সেই প্রজ্ঞার দর্শন আমরা লাভ করি। বলাবাহুল্য, বাংলার ভাবুকতার মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনেরই আধিপত্য।

সাইজী তো নিজের পরিচয় দেননি গো বাপ, তো তোমাদের শিক্ষিতের ভেতর এই অশিক্ষা কেন এল বুঝায়ে কও দেখি যাদু? মানুষ কেমনে হিন্দু মুসলমান হয়? এই প্রশ্নের অবশ্যই একটা প্রথাগত ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রচলিত অর্থে ইতিহাস ও তার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমাদের প্রথাগত জ্ঞান অগ্রসর হয়েছে অবশ্যই। ঔপনিবেশিকতা ও মধ্যবিস্তরণের ঐতিহাসিক পরিগঠন বিচার করে শিক্ষিতের মধ্যে কেন অশিক্ষা এল তার একটা বিশ্লেষণ অবশ্যই হতে পারে। এই প্রকার কোন বয়ান পেশ করলে লালনপন্থীরা একতারার লাউ পিটিয়ে কারো মাথা ফাটাতে আসবে না। সেটা নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্নটি আরো অনেক গোড়ার। এই প্রকার প্রশ্নকারীর প্রশ্ন আরো গোড়া থেকে উঠে আসে। প্রশ্নের শেকড় ধরতে না পারলে উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের ধারণার সঙ্গে সময় সংক্রান্ত ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার সঙ্গে রয়েছে দেশ সংক্রান্ত ধারণার যোগ বা বিযুক্তি। ধরা যাক আমরা যেমন করে সময়কে বিচার করি, দেশ ব্যাপারটাকে বুঝি, অন্যে যদি ঠিক সেই রকম না বোঝে তাহলে তার প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তরের প্রত্যাশার সঙ্গে আমাদের কোন মিলই হবে না। বিশেষত যদি এই বিষয়ে তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট সতর্ক, পরিণত ও আমাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বিকশিত হয়। তো আমরা বুঝতেই পারব না প্রশ্নটার মানে কী, বা কী উত্তর প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

জাতপাত, ধর্মাতার ও বর্ণাশ্রমের ব্যাখ্যার জন্যে প্রাক-পুঁজিতাত্ত্বিক সমাজগুলোর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন বিচার একটি প্রগতিশীল রেওয়াজ। আর ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস এবং দুনিয়া-জোড় পুঁজির আত্মস্বীকৃতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে পুরনো শ্রেণীর বিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন নতুন শ্রেণী যেভাবে গড়ে ওঠে—সেই গড়ে ওঠার ইতিহাস ও সেই সঙ্গে তাদের মনোগঠনের বিবর্তন বিচার করলে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় প্রভৃতি বিষয় আমাদের কাছে যথেষ্ট স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। প্রগতিশীলতা দাবি করে ঐতিহাসিকভাবে কোন বিষয়ের বিচার তার সত্য রূপ সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। অন্য যে কোন

পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি অগ্রসর, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি জায়গায় গিয়ে এই পদ্ধতি দুটো সংকটের মুখে পড়ে। সেটা হোল বর্তমানের মধ্যে যে ইতিহাসকে আমরা নির্মাণ—করি, সেটা আমাদের নির্মাণ এই উপলব্ধিটুকু একটা সংকট সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সময় আর ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্কটা কী? দেশ বা দৈশিকতার ভূমিকাটাইবা কোথায়। এগুলো বিশাল প্রশ্ন। কিন্তু তুলে রাখাও কম বড়ো কাজ নয়। আমাদের আগ্রহ আপাতত শুধু দ্বিতীয় প্রশ্নে। ফকির লালন শাহের সুবাদে বঙ্গে এই প্রশ্নটি আজ হোক কাল হোক উঠতই।

লালনের গানে বা ভাবে এবং একই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের মধ্যে কোন প্রকার সরলরৈখিক সময়ের ধারণা কাজ করে না। এমন কোন ‘ইতিহাস’কে এই চিন্তার ধারা আগে থাকতেই আছে কি নেই বলে ধরে নেয় না। এই ধরনের কোন ‘ইতিহাস’ আগে থাকতেই মেনে নেওয়ার মানে জ্ঞান তার নিজের ধারণা পরীক্ষা না করে একটা পূর্বানুমানকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। এমনকি মার্কস বা হেগেলীয় ধরনের ‘দ্বন্দ্বিক’ ইতিহাসের অস্তিত্ব আগাম মেনে নেয়াও হচ্ছে একটি অপরিষ্কৃত পূর্বানুমান—প্রবল এক অধিবিদ্যা। লালনের ‘ভাব’ এই প্রকার কোন অধিবিদ্যাকে স্বীকার করে না। তাছাড়া, আগেই বলেছি, ইতিহাস মানেই হচ্ছে নির্মাণ। কারো না কারো তৈরি করা জিনিস। আমাদের মাথা মস্তিষ্ক কল্পনা ও নানাবিধ বুদ্ধিবৃত্তির উপাদানে ও নির্দেশে বানানো। আসলেই কি ‘ইতিহাস’ নামক কোন অতিবস্তু আছে? এই যে এখন আমি একটি বাক্য লিখছি—লিখলাম, এটা কিন্তু ইতিহাস নয়। কারণ আমি একটি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সময়যাপন করছি। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডে আগের এই ক্রিয়াত্মক ঘটনাটিকে আমি যখন ইতিহাস হিসাবে লিখি, তখন কখনোই আমি আগের মূহূর্তে ফিরে যেতে পারি না। আমি আমার নিজের কন্জির ঘড়ি দেখে বড়োজোর বলতে পারি—এক মিনিট উনিশ সেকেণ্ডে আগে আমি একটি বাক্য লিখেছিলাম, সেটি হোল—‘এই যে এখন আমি একটি বাক্য লিখছি—লিখলাম, এটা কিন্তু ইতিহাস নয়’। ইত্যাদি। এতে যা দাঁড়াল তা হোল আগের একটি ঘটনার বর্তমান বর্ণনা। সেটা তো বর্তমান হোল, অতীত নয়। তাহলে কি করে সেটা ইতিহাস?

যা সামনে নেই তাকে পেশ করা, প্রকাশ করা বা বর্ণনা করার মধ্যে কোনই দোষ নেই। সেটা দারুণ কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়াটা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। কারণ ধরে নেওয়া হয় ইতিহাস নামক কিছু বোধহয় আসলেই আছে। আসলেই বুঝিবা সময়ের ভেতর কিছু ঘটনা ঘটে যা অন্যকে বলা যায়, ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায়। সময় এবং ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা তো আছেই। যেমন, ঘটনাই কি সময় নয়? ঘটনার বাইরে যে সময় সেটা আবার কিসের সময়? ঘড়ির? সেটাও তো মিনিট আর সেকেণ্ডের কাঁটার টিক টিক ঘটনা। চাবি না দিলে বা ব্যাটারি খতম হয়ে গেলে ঘড়িও শেষ। তাহলে, ঘড়ির ঘটনাই কি সময়? নাকি ঘটনাটি একটি সময়ের মধ্যেই ঘটছে কেবল? কোন সময়ের মধ্যে? সেই সময়টাই তো দেখছি আবার

ঘড়িরই সময়। এই সকল মুশকিলের এখনো আসান হয়নি। ব্যাপারগুলো যতো সরল মনে আমরা গ্রহণ করি ঘটনা মোটেও ততো স্বচ্ছ নয়।

উত্তর দেবার জন্য ইতিহাস ও দেশকাল সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছি না। মুশকিলটা টের পাওয়াটাও বড়ো কাজ। আমাদের তৈরি করা ইতিহাস ছাড়া ইতিহাস নামক কিছু কি আছে? তাহলে ইতিহাস নামক এক পরাবিদ্যার ভূত আমাদের ঘাড়ে সবসময়ই চেপে বসে থাকে কেন? সেই কারণে বর্ণ, ধর্ম, জাতি, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের মধ্যেই আন্বেষণ করতে আমরা অভ্যস্ত। দর্শন বা প্রজ্ঞার গোড়ার জায়গাগুলোতে নয়। অন্যদিকে নির্মিত ইতিহাস, যার মধ্যে আমরা প্রায়শই নিজেদের আত্মপরিচয় সন্ধান করি, ‘সময়’ সেখানে অধিপতি। অনাদি ও অনন্ত একরৈখিক কালেরই আধিপত্য। ছোট, অতি সরল প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হলে আমরা হকচকিয়ে যাই। আমরাই সময়, নাকি সময়ের মধ্যে আমরা বাস করি? আমরাই ইতিহাস, নাকি ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সময়যাপন ঘটে?

এই সকল মুশকিল কি লালন জানতেন? সেটা আরো গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যে দিকটা প্রবলভাবে আমাদের ভাবায় সেটা হোল লালন কিংবা তাঁর ধারার আগে পিছের জ্ঞানসাধকদের কাছে প্রধান বিচার্য বিষয় ‘সময়’ নয়, বরং ‘দেশ’? অর্থাৎ দেহ, মানুষের শারীরিক ভূগোল? দৈশিক বিস্তার নিয়ে যা অস্তিত্বমান। সেই কারণে দেহ বা শরীর জ্ঞানচর্চার জন্যে বাংলার সাধকদের কাছে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দেহের বিচার ছাড়া, দেহচর্চা থেকে আলাদা বা দেহতাত্ত্বিকতার বাইরে কোন জ্ঞানচর্চা হতে পারে না। কোনো ভাবের উদয় অসম্ভব। যার মধ্য দিয়ে বা যার মাধ্যমে আমাদের বাক্য উৎপাদিত হয় ও বোধগম্য হয়, যা নিয়ে আমরা কথা বলি বা কথা বলতে পারি, তদুপরি কথা বুঝি – তা হচ্ছে আমাদের শরীর। শরীরের বাইরে কোন জ্ঞান নেই, কোন ভাব নেই, কোন সময় নেই, কোন ইতিহাস নেই। এই শরীরই কথা বলে, এর মধ্যে ‘আমি’ নামক যে বোধটার অস্তিত্ব আছে বলে আমরা অকারণে নিশ্চিত থাকি আসলে মাংসপিণ্ডের বাইরে তো তার কোন অস্তিত্ব নেই। অসীম বা অধরাকে এই সসীম খাঁচার মধ্যে ধরবার সম্ভাবনাটুকু আছে, মনুষ্যরূপের সঙ্গে অন্য জীব শরীরগুলোর এখানেই পার্থক্য। কিন্তু সেই সম্ভাবনার চর্চা যদি করা না হয় তাহলে এই শরীরের সঙ্গে পশুর শরীরের কোন পার্থক্য নেই। রক্তমাংসের মানুষের বাইরে চেতনা নামক কোন ভূত নেই। যা চেতনা তাই শরীর। শরীর যদি জেগে থাকে তখন আসলে চেতনাই জেগে থাকে। যখন আমরা সচেতন থাকি তখন আসল চেতন হয়ে থাকে শরীর। চেতনার সচেতন হয়ে ওঠার কোন অর্থ হয় না, শরীরের মধ্যে শরীর হয়েই চেতনা সচেতন হয়ে উঠতে পারে, নইলে নয়। যদি শরীর মরে তবে চেতনারও দশাপ্রাপ্তি ঘটে। চেতনা যদি জ্ঞানী হওয়ার চর্চা করে, ভাব আকাঙ্ক্ষা করে বা ‘অধরা’কে ধরতে চায়, তাহলে তাকে ‘করণ’ বা দেহচর্চার নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হতে হবে। চেতনার বিকাশ বা ভাবের বিকাশ মানে শরীরেরও বিকাশ। দেহচর্চা বা

‘করণ’-ই হচ্ছে ভাবের পথ, জ্ঞানী হয়ে ওঠার উপায়। যেহেতু শরীরের বাইরে কোন ভাব বা জ্ঞান নেই, অতএব ভাব বা জ্ঞান আলাদা কোন বস্তুর মতো ‘অর্জন’ বা ‘লাভ’ করা যায় না। শরীরই জ্ঞান, শরীর নিজেই স্বয়ং ভাব হয়ে ওঠে। গুরুর ভজন তখন জ্ঞানের ভজনা, ভাবের উপাসনা। বিমূর্তভাবের পূজা হয় না। কারণ বিমূর্ত জ্ঞান বা হাওয়াই ধ্যানধারণা বলে কিছু নেই। পৃথিবীর প্রতিটি জ্ঞানকথার আবির্ভাব ঘটেছে কোন না কোন রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে দিয়ে। সেই কারণে শরীরের মধ্যে বা শরীর হয়ে শরীরের নিয়মকানুন জেনে শরীরকে না জাগালে জ্ঞানের উৎপাদন ঘটে না। ভাব বিকশিত হয় না। চেতনা ও শরীরের যে পার্থক্য আমরা অনায়াসেই মেনে নিই, বাংলার ভাবুকতার মধ্যে তার স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। অতএব তাঁরা যখন আত্মার কথা বলেন তখন তাঁরা দৈশিকতার মধ্যে বিস্তৃত দেহের কথাই বলেন। আত্মজ্ঞানের কথা যখন তাঁরা বলেন, তখন তাঁরা গ্রীক দার্শনিকদের মতো ‘নিজেকে জানো’ এই প্রকার প্রবল ভাববাদ পরামর্শ দেন না। আত্মজ্ঞান মানে নিজের শরীর সম্পর্কে জ্ঞান। শরীরের সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতি বা বিশ্বনিখিল কেমন করে জড়িত তার বিচার।

‘দেশ’ এবং ‘কাল’ সংক্রান্ত বিচার ও বিশ্লেষণ ছাড়া বাংলার ভাবুকতা অনুধাবন করা রীতিমতো অসম্ভব। এই কাজটি একদমই হয়নি। সেই কারণেই বাংলার সাধকদের দেহচর্চা সম্পর্কে নানান আজগুবি, বিকৃত এবং বাজে কথার শেষ নেই। তাছাড়া সব ‘সাধু’ মানেই তো সত্যিকারের সাধু নয়। সকলেই জ্ঞানসাধক নয়, ভাবের পাগল নয়। ভুয়া ও নকল মাল আছে বিস্তর। বিকৃতি তো আছেই। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু ভাবুকতার মূল নাড়িটি ধরবার কাজটি বিন্মিত হওয়ার পেছনে দেহচর্চা বা সাধকের ‘করণ’ সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গবেষকদের অবজ্ঞা, অজ্ঞানতা ও বিকৃতির প্রতি কৌতূহল এখনো বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে আছে। বাংলার ভাবুকতার ধারা সময়কেন্দ্রিক নয়, বরং দৈশিক; এতোটুকু বুঝতে পারলে সম্ভবত তাঁদের চিন্তা অনুধাবনের একটা চাবি আমরা পাবো। এখানে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত আকারে নয়, বরং অন্বেষণের জন্যে আলো ফেলবার উপায় হিসাবে বলছি। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের বেশ কিছু জ্ঞানসাধকদের সঙ্গে পেয়ে এবং তাঁদের গান, কথা, জীবনচর্চা ও করণের নানান দিক সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতার পর এই প্রশ্ন আমার মনে তীব্রভাবে জেগেছে। সময় এবং দেশের ধারণার দিকটা খানিক নজরে এলেই কেবল, আমার মনে হয়, ফকির লালন শাহের চিন্তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য কিছুটা আন্দাজ করা যায়। তবে আমার ব্যক্তিগত অন্বেষণ ভিন্ন। বাংলায় ভাব, জ্ঞান বা দর্শনচর্চার ধারাকে যদি আমরা বিকশিত করতে চাই, তাহলে বাংলার ভাবুকতার সঙ্গে গিট না বাঁধলে সেটা আদৌ সম্ভব বলে আমি মনে করি না। দেশকাল সংক্রান্ত এই প্রশ্নটি সেই ক্ষেত্রে একটি জুংসই প্রশ্ন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিকতার গণ্ডির বাইরে—অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতার ঔরসে গড়ে ওঠা ভদ্রলোক সংস্কৃতির ইংরেজ তাঁবেদারি, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা, তদুপরি জাতীয়তাবাদ এবং আত্মপরিচয়ের ঘাপলার বাইরেও যে বাংলার

একটা নীরব ইতিহাস আছে সেদিকে মুখ ফেরাবার সময় এসেছে। ভদ্রলোকরা যখন ঘোরতর হিন্দু, মুসলমান বা বাঙালি হয়ে উঠছে তখন কেন সাধকরা ‘মানুষ’ ভজনা করে আর সহজ মানুষের কথা বলে ঔপনিবেশিক কালটা কাটিয়ে দিলেন? এখানে কোন জাতীয়তাবাদ নেই কেন? আত্মপরিচয়ের সংকট কেন এখানে অনুপস্থিত? এখানে কেন হিন্দু মুসলমান নেই? ইতিহাসের এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কেউ ব্যাখ্যা করেছেন বলে চোখে পড়েনি। এর ব্যাখ্যা নামলে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণাও আগাগোড়া বদলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ইউরোপে যখন ‘ব্যক্তি’, ‘অধিকার’, ‘গণতন্ত্র’, ‘সাম্য’ ইত্যাদি নিয়ে তোলপাড় চলছে তখন ‘সহজ মানুষ’ সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ ঘটছে বাংলায়। ‘সহজ মানুষ’ বা ‘মানুষ’ নামক ব্যাপারটি বাংলায় কোন বিমূর্ত বিষয় নয়, পাশ্চাত্য বা বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে এর যোগ খুবই ক্ষীণ। রাম রহিম যদু মধুর মধ্যে ‘মানুষ’ নামক যে সাধারণ বিমূর্ত সত্তার (essence) মানদণ্ড প্রয়োগ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্য বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রস্তাব করে ও রাজনৈতিকভাবে ‘গণতন্ত্র’ নামে প্রতিষ্ঠা করে, তার সঙ্গে বাংলার ‘সহজ মানুষ’ নামক ধারণার কোন মিলই নেই। কারণ এই ‘মানুষ’ বিমূর্ত কোন সত্তা নয়, বরং বস্তুময়, যার আবির্ভাব ঘটে নরনারীর শরীরে, দৈশিকভাবে বিস্তৃত অসীম নিখিলেরই অভিপ্রকাশ হয়ে, সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে। রক্তমাংসের মানুষ কী করে প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চেতনসম্পন্ন শারীরিক সত্তা হয়ে আবির্ভূত হয়—এই অতীব বস্তুময় প্রক্রিয়াটি কেন সাধকদের এতো বিস্মিত করে রাখল? বীর্ষ ও ডিম্ব কী করে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য থেকে মানুষ উদ্ভিত হয়, এই রহস্য কে সমাধান করবে? এই অপার জ্ঞানের সেই রহস্য ভেদের জন্য বাংলা কাতর হোল কেন? নারী ও পুরুষের মিলনে সন্তান হয়, এই উত্তরে বাংলা খুশি নয়। বারবার লক্ষ কোটি যোনি ভ্রমণ করে মানুষের রূপ পরিগ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বোঝা দরকার। কে সেই অধরা? ধরা দেয়, অথচ ধরা যায় না। দৈশিকতার বিস্তারের মধ্যে যে হয়ে ওঠে, কিন্তু কোথা থেকে সে হয়ে ওঠে? তার মূল কই? সেই মূল বা শেকড় অন্বেষণ মানে সহজ মানুষের খোঁজ করা। এই কারণেই মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়া ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাম ও প্রেম সংক্রান্ত জ্ঞান ও চর্চা সহজ মানুষকে ধরার জন্য জরুরী। মনে রাখা দরকার, প্রকৃতি বা এই বিশৃঙ্খল—অসীমকে যে নামেই আমরা আখ্যা দেই না কেন, একমাত্র মানুষের রূপ নিয়েই সে নিজেকে চেনে এবং জানে। দ্বিদলে নিজেকে ভাগ করে নিজের সঙ্গে তার নিজেরই লীলা। কিন্তু কে এই লীলাময় কর্তা? কার লীলা? কেন করে? কী চায় সে?

সময় সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা এখানে নেই। অনুযঙ্গ হিসাবে লালনের গানে ‘সময়’ নামক ব্যাপারের ব্যবহার আছে। তবে তার অনুযঙ্গ সবসময়ই গৌণ। লালনের গানে সময়ের সরাসরি ব্যবহার আছে এমন খুবই পরিচিত গানের কথাই ধরা যাক : ‘সময় গেলে সাধন হবে না, দিন থাকতে দিনের সাধন কেন করলে না’—এই ভাবেই এবং এই ভুল কথাতেই গানটি ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে যথেষ্ট পরিচিত। ফরিদার গায়কীর একটা

মাধুর্য আছে সেটা অনস্বীকার্য। সুরের প্রসঙ্গ এখানে তুলব না। কিন্তু কথার বিকৃতি ক্ষমার অযোগ্য। এটি আসলে একটি সাধনতত্ত্বের গান—অর্থাৎ শরীর সংক্রান্ত গান। গানটির পদে যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তার ফলেই মনে হয়, সময় এখানে খুবই মুখ্য একটি প্রসঙ্গ। সাধক যেন নিজেকে বলছেন, দিন থাকতে কেন দিনের সাধন তিনি করলেন না। যদি সময় চলে যায় তাহলে তো আর সাধন হবে না। আসলে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে দিন থাকতে দিনের সাধন কথটার কোন মানেই হয় না। দিনের সাধন কথটার মানে কী? দিনের বেলার সাধনকর্ম? সাধনার কাজ কি রাতে হয় না?

গবেষক শক্তিনাথ ঝা সম্প্রতি লালনের শিষ্য ভোলাই শা-র একটি খাতা উদ্ধার করে মূল বানান অক্ষুন্ন রেখে প্রকাশ করেছেন।

সোমাই গেলে রে ও মন সাধন হবে না

দিন ধরিএ তিনের সাধন কেন করলে না। ইত্যাদি।

লালনের গানগুলোর প্রামাণ্য পাঠ এখনো একটি সমস্যা হয়ে আছে। কিন্তু শক্তিনাথ ঝা-র গবেষণার কারণে এই গানটির ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। প্রথমই আমরা লক্ষ করছি লালনের দেহতাত্ত্বিক ও দেহতাত্ত্বিক করণমূলক গানগুলোকে সচেতনভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। শক্তিনাথ ঝা যে খাতা আবিষ্কার করেছেন সেখানে গানটির পাঠ আমরা প্রচলিত বানানে পাঠকের সুবিধার জন্যে এখানে হাজির করছি। পাশাপাশি গানটি যেভাবে গাওয়া হচ্ছে তার কথাও তুলে দিচ্ছি। গানের কথা বিকৃত করার কারণে যে সকল ক্ষেত্রে অর্থের প্রকট বিকৃতি ঘটেছে, সেই জায়গাগুলো মোটা হরফে পেশ করছি।

সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না

দিন ধরিয়ে তিনের সাধন কেন জানলে না।

জান না মন খালে বিলে

মীর থাকে না জল শুকালে

কি হয় তারে বান্দাল দিলে

শুকনো মোহনা।।

অসময়ে কৃষি করে

মিছেমিছি খাট মরে

গাছ যদি হয় বীজের জোরে

ফল ধরে না।।

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়

ম হা জ ন সেই দিনে উদয়

লালন বলে তার সময়

দণ্ডেক রয় না।। [১]

সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না, দিন ধরিয়ে তিনের সাধন কেন জানলে না—
এই রকম গানে সময় শব্দ হিসাবে আছে অবশ্যই, কিন্তু প্রত্যয়গতভাবে নাই। কারণ
এই সময় শরীরের, দেহের, জোয়ার ভাঁটার, ঋতু অর্থে চক্রাবর্তমূলক সময়। এই সময়
সরলরৈখিক হয়ে বয়ে যায় না। এই সময় বার বার দৈশিক শরীরের বিস্তারের মধ্যে
ফিরে আসে। বারবারই প্রত্যাবর্তন করে। সেই কারণে শরীরের ভূগোল—যেমন, ‘খাল
বিলে’র প্রতীক বা অনুযঙ্গ কিংবা বীজ বা গাছের প্রতীক, মাছের কথা, মোহনা শুকিয়ে
যাবার কথা প্রবলভাবে উপস্থিত। ভৌগোলিকতা বা দৈশিকতার মধ্যে কোন কিছুর
আবির্ভাব বা বিলয় ঘটেছে। যে জলে তরঙ্গ হচ্ছে সেই তরঙ্গ আবার জল হয়েই জলে
ফিরে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন ও সরলরৈখিক সময়ের মতো জলের বাইরে বিচ্ছিন্ন কোন তরঙ্গ
নেই। এই জলের মধ্যেই আসেন মীনরূপে সেই মহারাজ। এই লীলার মধ্যেই তাঁর
উদয়। তাঁকে ধরতে হবে শরীর সংক্রান্ত ‘তিন সাধন’ পদ্ধতির করণ দিয়ে। যখন জল
থাকে কেবল তখনই সেই মাছের – সেই মহাজনের আবির্ভাব ঘটে।

এই গানের দেহতাত্ত্বিক গুঢ়ার্থ বিচারের সুযোগ এখানে নেই। আমরা কথার
বিকৃতির জন্যে সময় সংক্রান্ত ধারণাটিরও কী পরিবর্তন হয়েছে, সেদিকে শুধু নজর
ফিরিয়ে শেষ করব। প্রথমত, এখানে যে ‘সময়’ চলে যাওয়ার কথা হচ্ছে সেটা প্রচলিত
অর্থে সময় নয়। বড়োজোর সুযোগ অর্থেই এর ব্যবহার। সেই কারণেই কথাটি দিন
থাকিতে দিনের সাধন নয়—দিন ধরে তিনের সাধন। অর্থাৎ সুযোগ বুঝে তিনের সাধন
চর্চা করতে হবে, এই কথাটাই এখানে মুখ্য। সেই সুযোগ শরীরে একবার ধরা দিয়ে
আবার চলে যায় না। ঋতুচক্র মেনে আবার ফিরে আসে। অথচ ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে
গানটির বিকৃতি ঘটিয়ে মধ্যবিস্তৃশ্রেণী শুনছে এইরকম:

সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকিতে দিনের সাধন
তুমি কেন জানলে না।।

জান না মন খালে বিলে
থাকে না মীন জল শুকালে
কি হবে আর বান্দাল দিলে
খাকলে মোহনা শুকনা।।

অসময়ে কৃষি করে,
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদিও হয় বীজের জোরে
তাতে ফল ধরে না।।

অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
ম হা যো গ সেই দিনে উদয়

লালন বলে তাহার সময়
দণ্ড রয় না।

এবার ‘মহাযোগ’ আর ‘মহাজন’ শব্দ দুটির প্রবল পার্থক্যের কথা বলে শেষ করব, শক্তিনাথ বা মূল খাতা থেকে সঠিক পাঠোদ্ধার করেছেন কিনা সেই সন্দেহ মনে রেখেই বলব, ‘মহাজন’ কথাটিই লালনের সার্বিক জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে শুদ্ধ পাঠ। কারণ ‘মহাযোগ’ শব্দটি সময়মূলক ধারণার সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বাস হয় না লালন ঠিক এইভাবে পদটি রচনা করবেন। দ্বিতীয়ত ‘মহাযোগ’ সেই দিনের উদয়, কথাটার কোন পরিষ্কার মানে হয় না। অমাবস্যার মধ্যে পূর্ণিমা হওয়ার মতো অদ্ভুত ঘটনা আমরা যে সময় সম্পর্কে পরিচিত তার মধ্যে ঘটার সম্ভাবনা একদমই নেই। তাহলে কীকরে তা ঘটে? লালন বলছেন, এটা ঘটে না—এটা বরং হয়। খেয়াল করতে হবে কথাটা হোল, অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়। এই বাক্যগুলোকে অনেকেই প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কারণ সময় সংক্রান্ত তাঁদের ধারণার মধ্যে এই ব্যাপার অসম্ভব বলেই তাঁরা মনে করেন। তাঁদের কথা হোল ঋতুমতি নারীর শরীরের যে অমাবস্যা তার মধ্যেই পূর্ণিমার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু লালনের কাছে শরীর মানেই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আর ভাষা বা বাক্য মানেই তো কাব্য। তাহলে কেবল প্রতীক জ্ঞান করে এই কথাগুলোর মানেও করা যাচ্ছে না। লালনের জ্ঞান ও চর্চার সামগ্রিকতার মধ্যেই একে বুঝতে হবে।

ফকির লালন শাহকে স্মরণ করতে সময় ও দেশ সম্পর্কে লালনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ওপর জোর দিয়ে এবারকার মতো শেষ করব। শুধু এই উপমহাদেশে সময় সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রহিলা খাপরের একটা সাবধান বাণী মনে করিয়ে দেব। [২] এটা মনে করার কোনই কারণ নেই যে, এই অঞ্চলে, অর্থাৎ বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে সময়ের ধারণা মানেই চক্রাবর্তমূলক ধারণা। এই সাধারণীকরণ বিপজ্জনক ও ভুল। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য মোটেও এই কথাটি প্রমাণ করা নয়। আমরা শুধু বলছি, দেশকাল সম্পর্কে আমাদের যে প্রথাগত ধ্যানধারণা, সেখানে দাঁড়িয়ে লালনের গান ও তাঁর জীবনচর্চা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা বাতুলতা। তাকে এখানে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ব্যস।

অতোটুকুই। প্রথাগত ধ্যানধারণার সঙ্গে খাপ না খেলে লালনের কথা যাঁরা বদলাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণও আমাদের উদ্দেশ্য। এই বিকৃতি অন্যায্য।

টীকা

[১] শক্তিনাথ বা, ফকির লালন সাঁই: দেশ, কাল এবং শিল্প; সংবাদ; কলকাতা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫৫। শক্তিনাথ গবেষণার দিক থেকে দরকারি কাজ করেছেন, তবে তাঁর ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ করার বিষয়ে একটু সতর্ক থাকার দরকার আছে। এটা অবশ্য তাঁর ব্যাপারেই সত্য নয়, প্রায় সকল গবেষকদের ক্ষেত্রেই বোধহয় খাটে।

[২] Ramila Thapar, Time as a methaphor of History : Early India, Krishna Bhardwaj Memorial Lecture : Oxford University Press. Delhi 1996 / প্রফেসর থাপার বক্তৃতাটি ছাপা হয়ে সম্প্রতি বেরিয়েছে। রমিলা ঠিকই ধরেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ‘আধুনিক’ ইউরোপের বাইরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিহাসের ধারণা বা প্রগতির ধারা গড়ে ওঠেনি বলে যে বর্ণবাদী মত হাজির করেন তার পক্ষে তাঁরা প্রায়ই যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, ভারতবর্ষে সময় সম্পর্কে ধারণা সরলরৈখিক নয়, বরং চক্রাবর্তমূলক। ইতিহাস মাত্রই সরলরৈখিক, কাজে কাজেই চক্রাবর্ত মূলক সময়ের ধারণা ইতিহাস ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না—এই ধরনের মূল্যায়নের বর্ণবাদী দিকগুলো সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, সময়ের সরলরৈখিকতার বিরুদ্ধে লালন চক্রাবর্তমূলক সময় প্রস্তাব করছেন, এই সত্য প্রতিপাদন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে লালনকে কিছুই বোঝা যায় না। বরং দেশ বা দৈশিক বিস্তার বা দৈশিকতা লালনের চিন্তায় কীভাবে দেহ শরীর ও প্রজননমূলক জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেদিকে নজর ফেরানোই উদ্দেশ্য। এই দিক থেকে লালনের চিন্তার দার্শনিক বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরাও দরকারি।

ফকির লালন শাহ এবং কমলকুমার মজুমদার : ঈর্ষা ও কবিতার কথা

কোন নামে ডাকিলে তারে

হৃদ-আকাশে উদয় হবে ॥

আপনায় আপনি ফানা হলে

সেই ভেদ জানা যাবে

আরবি ভাষায় বলে আল্লা

ফারসিতে হয় খোদাতালা

গড বলেছে যীশুর চেলা

ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে ॥

মনের ভাব প্রকাশিতে

ভাষার উদয় এ জগতে

মনাতীত অধরে চিনতে

ভাষা বাক্য নাহি পাবে ॥

আল্লা হবি ভজন পূজন

সকলি মানুষের সৃজন

অনামক অচিনায় বচন

বাগেন্দ্রিয় না সম্ভবে ॥

আপনাতে আপনি ফানা

হলে তারে যাবে জানা

সিরাজ সাই কয় লালন কানা

স্বরূপ রূপে দেখ সংক্ষেপে ॥

—ফকির লালন শাহ

শুরু এই রকম: ‘রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ’—কমলকুমার মজুমদার ‘ভাব প্রকাশ বিষয়ে’ লিখছেন। এই রকম আরম্ভ শুধু এইখানে নয়, তাঁর মেলা গদ্যে আছে। আমারও সাধ হয় আমিও যখন কোন কথা লিখি তখন এইরকম কিছু একটা বলি। লিখি যে, ‘আলেক সাই’। বা, আরো লিখি, ‘জয় গুরু, জয় ফকির লালন শাহ’। ফকির লালন শাহের কথা হঠাৎ মনে আসে নি। তাঁকে নিয়ে তেরো চৌদ্দ বছর বয়েস থেকেই ভাবছি। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ছেঁউড়িয়া পর্যন্ত গেছি। কিন্তু তিনি সেখানে নেই। সেই অন্ত্রের খবর এখানে দেবো বলে এখন লিখতে বসি নি। একটা ঈর্ষা কাজ করছে আমার মধ্যে। কমলকুমার মজুমদারের প্রতি ঈর্ষা। সেই ঈর্ষার কথা কইব, সঙ্গে আরো নানান টুকরো খুচরো হাস্যকাপাতলা কথা।

এই হরফগুলি চৌদ্দশ এক সালে লিখছি, পয়লা কার্তিকের হপ্তাখানেক আগে। ফকির লালন শাহ দেহ রক্ষা করেছেন আজ থেকে বহুবছর আগে। বাংলা ১২৯৭ সালের (খ্রিস্টীয় ১৮৯০ সালে) পয়লা কার্তিকে সারারাত শিষ্যদের সঙ্গে গান করে প্রভাত হচ্ছে—হচ্ছে এমন আলো আঁধারির মধ্যে শিষ্যদের ফেলে থুয়ে বললেন, আমি চললাম। কোথায় চললেন, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যেতে হচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছেন, কী ব্যাপার, কী বিষয় কিছু খোলাসা না করে বললেন, যাচ্ছি। সেই যে গেলেন তারপর থেকে কেউই অন্ধকারের শেষে ভোর হয় হয় রকম সুবেহসাদেকের সন্ধিক্ষণে তাঁর যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি। তাঁর আল্লা, ঈশ্বরের ধারণা আমাদের প্রথাগত চিন্তার মধ্যে পড়ে না। পরকাল মানতেন না। দেশকালপাত্রের অতীত কোন ‘পরমাত্মা’-কে মানতেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো যত মত তত পথেও বিশ্বাস করতেন না। তাহলে গেলেন কোথায়? এই কাতর প্রশ্ন মনের মধ্যে ফণা তুলে থাকে বলে কমলকুমারের বিরুদ্ধে ঈর্ষা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে মনে হোল।

কিসের ঈর্ষা? ঈর্ষা এই কারণে যে কমলকুমার মজুমদার ভক্তিভরে বললেন, ‘রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ’। অথচ ‘আধুনিক’দের কেউই গোঁস্বা করল না। কেউই বললো না তিনি পশ্চাৎপদ, অনাধুনিক, প্রতিক্রিয়াশীল, ইত্যাদি। এক জায়গায় ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি হিন্দু। খুবই সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু। কিন্তু আধুনিকরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বললো না। আমার ঠিক ঈর্ষা এখানেই। তাঁকে এই নিন্দা বহন করতে হয় নি, এর কারণ তিনি হিন্দু। কলকাতার সংস্কৃতিবান আধুনিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তিনি মধ্যমণি। ‘রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ’—এই ভক্তি প্রকাশের অধিকার তাঁর আছে।

তো তাতে কী হয়েছে? ঈর্ষা কেন? ঈর্ষা এই কারণে যে আমি হিন্দুর ঘরে জন্ম গ্রহণ করি নি। জন্মসূত্রে আমি মুসলমান। আমি যদি কোন ভক্তিভাব আমার রচনায় প্রকাশ করি সঙ্গে সঙ্গে আমি পশ্চাৎপদ, অনাধুনিক ও সাম্প্রদায়িক হয়ে যাব। আর, যেহেতু জন্মসূত্রে ইসলাম আমার ধর্ম, তো সেটা আমার অপরাধ। কারণ ঘাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মনে করেন তাঁরা শিক্ষিত ও প্রগতিশীল হবার জন্যে প্রাণপণ

প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন যে ইসলাম বর্বর আর অসভ্যদের ধর্ম। ইসলামের মধ্যে কোন দর্শন বা মহৎ চিন্তা নেই, এটাই হোল আধুনিক, সভ্য ও বিদ্বজ্জনদের দাবি। এই এক দারুণ সংকট। আমাকে আধুনিক, সভ্য ও প্রগতিশীল হবার জন্যে ইসলামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। যদি তাঁর প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করি তাহলেও আমি সাম্প্রদায়িক হয়ে যাব। অতএব কমলকুমার মজুমদার যখন লিখছেন, ‘রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ’ — আমাকে সেটা মহৎ সাহিত্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। আমি তাঁকে অনুকরণ করে লিখতে পারবো না ‘জয় গুরু, জয় ফকির লালন শাহ’। কারণ, আমি পূর্ববঙ্গের মুসলমান। আমি সাহিত্য করি ঠিকই, কিন্তু আমার নিবাস কলকাতা নয়, ঢাকা। আমাকে সমঝে চলতে হবে।

এটা কি শুধু কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে সত্য? না। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে-ধারা এখন প্রতিষ্ঠিত তার জন্ম হয়েছে জন্মসূত্রে হিন্দু লিখকদের হাতে। তাঁরা সকলে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ঔদার্যে আর সহনশীলতায় তাঁদের অনেকেই স্নানামন্য। অপর সম্প্রদায় ও ধর্ম থেকে জানবার অধীর আগ্রহ তাঁদের অনেকেরই ছিল। সেগুলো যেমন ইতিহাস তেমনি শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের কাছে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির যে-ধারা গৃহীত ও স্বীকৃত সেটা জন্মসূত্রে হিন্দুদের তৈরি জিনিস এটাও সমান সত্য। কলকাতার বাবু হিন্দুদের হাতে পয়দা হয়েছে এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শ্রেণী হিসাবে তাদের পরিগঠন ঘটেছে ইংরেজ আমলে। কিন্তু এখন সেটা আমাদের, বাংলা ভাষায় আমরা যারা কথা বলি আমাদের সকলের। একে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে মোটেও বাধা নেই। কিন্তু আমরা যেহেতু ইতিহাস ভুলে যাই সেই কারণে কথাগুলো চাঁচাছোলা করে বলতে হোল।

বিশেষ আরেক কারণে এইরকম ন্যাংটা করে বলা হোল। প্রতিষ্ঠিত এই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। যদি না বুঝি তাহলে এই সীমাবদ্ধতা আমরা ধরতে পারব না, সামনে এগিয়ে যেতে পারব না। এই সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে সামনে পা বাড়াতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে নিজেদের শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দাবি করে তাদের নিয়ে হয়েছে মুশকিল। তারা ইতিহাসের কথা শুনতে চায় না। তারা বাংলাদেশে যে ‘আধুনিকতা’ এখনো ফেরি করে বেড়াচ্ছে সেটা তিরিশ দশকের অতি নিম্নস্তরের আধুনিকতা। অন্যদিকে আবার তাদের কাছে কমলকুমার মজুমদার বড়ো মাপের ‘আধুনিক’ লিখক। এই কারণেই আমি কমলের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছি। অথচ মজা হোল এই যে কমল মোটেও এঁদের লিখক নন। তিরিশের খেঁটু থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তিনি তাঁর বিষয় আর ভাষা নিয়ে এলাহী কাণ্ড করে গেছেন। ‘বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন বলে বাংলার ভক্তির দিকটি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ‘রাধে মাধবায় নম, তারা তারা, জয় রামকৃষ্ণ’ খুব সহজে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, লিখা শুরুর আগে এই কথাগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করতেন। হিন্দু হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন পুরো

মাত্রায়। ফলে রামকৃষ্ণ অবধি পৌছাতে পেরেছিলেন। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ রামকৃষ্ণের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছে। কমলের চেয়েও বিবেকানন্দ ঠাকুরের আরো কাছে গিয়ে পৌছেছিলেন। কিন্তু নিরক্ষর লালনের কাছে না হিন্দু না মুসলমান শিক্ষিত কেউই পৌছাতে পারে নি। ফকির লালন শাহ এতে দারুণ বেঁচে গিয়েছেন। নিজে কোন ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে বিশ্বাস করতেন না। যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাঁর নাগাল পেত তাহলে তাঁকে ধর্ম প্রচারক বানিয়ে ছাড়ত। রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে এখন যেমন রামকৃষ্ণ ধর্ম ও সাম্প্রদায় হয়ে উঠেছেন।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান ধারা ঐতিহাসিক কারণে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগতভাবে সংকীর্ণ। শুধু এতেটুকু বললে এগুলো কথার কথা ছাড়া অধিক কিছু হবে না। প্রশ্ন হোল এখান থেকে বেরুবো কী করে? পথ কোনদিকে? নদীর এক পারে আমরা একদেশদশী পড়ে আছি, অপর পাড়ে পৌছাব কী করে? নদী সাঁতারে পেরুবার সাথে কমল রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়েছিলেন। লিখছেন:

একাকী গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আমি যুগপৎ আড়ষ্ট এবং ভয়ঙ্কর আত্যন্তের চারিদিকে নেহারিলাম; সহসা, আহা কি ভাগ্য! প্রত্যক্ষিলাম ঐ পশ্চিমের সেই গোল বারান্দাতে দাঁড়াইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। আঃ বাঁচিলাম মাউ! ঠাকুর রামকৃষ্ণ এক তীর-গঙ্গার ঐ অমোঘ প্রহেলিকায় আমি মস্তিত, আমি প্রাণপণ সাঁতরাইয়া ঐ পদছায়াতে পৌছাইব। ঐ তিনি। মা দেখিলেন, ঠাকুরের পদযুগল হইতে ফেনিল উচ্ছ্বাসে জলের উৎস নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে পুরোভাগে সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। মা মনে মনে ভাবিলেন ইনিই তো সব—ঐর পাদপদ্মা থেকেই তো গঙ্গা। মা নিকটবর্তী জবাবক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া রামকৃষ্ণ চরণোদ্ভূত পবিত্র গঙ্গাবারিতে মুঠা মুঠা পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি এই অন্ধকার হইতে সেই উৎসে যাইব।' [কবিতীর্থ ১৮, নবম বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৯৬]

গঙ্গার এক পারে দাঁড়িয়ে অন্য পারে কমল মজুমদার রামকৃষ্ণকে দেখছেন। তাহলে তিনি আসলে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ান নি, ভক্তিরূপে অপর পাড় থেকে ঠাকুরকে শুধু দেখেছিলেন। দেখেছিলেন যে গঙ্গা ঠাকুরের পা থেকে নির্গত হচ্ছে এবং মা তারা নিজেই ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। 'আমি প্রাণপণ সাঁতরাইয়া ঐ পদছায়াতে পৌছাইব'—এই সংকল্প জেগেছিল ঠিক। কিন্তু কেবলি সংকল্প। গঙ্গায় কমলকুমার ঝাঁপ দিয়েছেন এই তথ্য আমার জানা নেই।

কমলের কথার প্রতীকী মানে দাঁড় করালাম। আসলে এই ক্ষেত্রে প্রতীকী আর আক্ষরিক অর্থের সীমারেখা খুবই ক্ষীণ। কলকাতার অধিবাসী হয়ে গঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে কলকাতা না ছেড়ে ঠাকুরকে নদীর অপর পার থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত শহুরে বৃত্ত থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। কিন্তু তবু কমল ঠাকুরকে দেখেছিলেন, বাংলার ভক্তির স্বাদ তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। ভাবের সঙ্গে ভক্তির গঙ্গাযোগ তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। এখানে

কমল অসাধারণ। তাঁর সঙ্গে ঠিক এখনটাতে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী-সংকীর্ণ মধ্যবিত্তের এক ফোঁটাও মিল নেই। কলকাতার বাবুমার্কা আধুনিকদের তিনি তাঁর ভাষা দিয়ে একটা বুঝ দিলেন। ভাষার কেদানি খুঁটে খুঁটে দেখতেই ওরা ব্যস্ত রইল। তিনি ভাষা দিয়ে কী করছেন সেটা তারা ধরতেই পারল না। তিরিশের দশকে ভাষা আর আঙ্গিক নিয়ে বাবুরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কমল তিরিশের পরে এসে ‘আধুনিক’দের ভাষা আর আঙ্গিকের কেদানি দেখিয়ে বাবুদের একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন, অসুবিধা হোল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাজ করলেন অন্য জিনিস নিয়ে। আমরা যারা কমলকুমার মজুমদারের পরে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, আমাদের পক্ষে এখন রূপের ঠাকুরকে গঙ্গার এপারে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলে চলবে না। প্রাণপণ সাতরাইয়া তাঁর পদছায়ায় পৌছাইতে হইবে।

ঠিক আছে। কিন্তু যারা ভক্তি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাঁরা জানেন যে পদছায়ায় পৌছানো মানে রূপের ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়া নয়। তাঁর মধ্যে মিশে যাওয়া। কারণ, কমলই অন্যত্র বলেছেন, ‘ঠাকুর তুমি বলিয়াছ, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন’। তাহলে সাতারে নদী পেরুবার লক্ষ্য শেষাবধি ঈশ্বর দর্শন। এটাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য।

দুই

‘মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন’—এই কথা আমি এখন আঁকড়ে ধরব। বাক্যটি আলিসনে বেঁধে সাতারে গঙ্গা পেরুবো। অপর পারে ঠাকুর এখন নেই। তাঁকে সেখানে খুঁজবো না। বরং ঈশ্বরের অন্বেষণে ছেঁউড়িয়া যাব। আমার মতলব সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণীগত সংকীর্ণতা থেকে কোন না কোনভাবে একবার বেরিয়ে পড়া। তারপর দেখা যাবে। সব পথ ঈশ্বরের দিকে নয়, জানি। কিন্তু ছেঁউড়িয়ায় ফকির লালন শাহের একটি ঠিকানা তো চিনি। দেখি সেখানে কী আছে। কিন্তু তার আগে কিছু অন্য কথা।

মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন। এটা কি কেবল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা? ঈশ্বরের জায়গায় যদি আল্লা আর দর্শনের জায়গায় ‘দিদার’ শব্দটি বসাই তাহলে দেখবো এই কথা বহু আগে সুফি দরবেশরা বলেছেন। আল্লার সঙ্গে ‘দিদার’ হতে হবে, মোলাকাত হতে হবে, তাঁর দর্শন সকল এবাদতের লক্ষ্য, তাঁর মধ্যেই মিশে যেতে হবে, এই কথা বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এগুলো হোল ভক্তির কথা, মারেফাতের কথা। যাগযজ্ঞ আচারবিচার বা বিধি বিধানের কথা নয়। যদি ভক্তি ও মারেফাতের পথের মধ্যে এই ঐক্য থাকে তাহলে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক সেই ঐক্যের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করল না কেন? আসলে নিপীড়িত শোষিত নিম্নবর্ণের মানুষ সবসময়ই এই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে এবং অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছে। অনৈক্য তীব্র সহিংসতার রূপ নিয়েছে প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, গরিব ও নিম্নবর্ণের মধ্যে নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সংঘাতের চরিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কারো চোখে ধরা পড়ে নি যে

তাও নয়। ধরা পড়েছে। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সমঝোতা এবং সমন্বয়ের তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এই সৎঘাতকে আশ্রয় করে যে রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে এই উপমহাদেশে যিনি দারুণ সক্রিয় ছিলেন তিনি হলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। মওলানা আজাদ মারেফাতপন্থী ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো রাজনীতি। কমল মজুমদারের মতো তিনি সাহিত্যিক নন। তিনি শরিয়তী ইসলামের কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মকে পরস্পরের কাছে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল ইসলামের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা হাজির করা, যাতে তার মর্মবাণী মানুষকে আকৃষ্ট করে; ভেদবুদ্ধিজাত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা নয়। মানুষ জীবনের লক্ষ্য আল্লার দিদার লাভ করা, একথা তাঁর কলম দিয়ে বেরুবার কথা নয়। কিন্তু ঈশ্বর বা আল্লা সম্পর্কে তিনি কিছু কথা বলেছেন আমাদের আলোচনাকে আরো মুখর করবার জন্যে তার উল্লেখ দরকার।

মওলানা আজাদ বলছেন, আল্লার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের উৎপত্তি মানুষের ‘মন’ থেকে নয়। মানুষের স্বভাব বা ‘প্রকৃতি’র মধ্যে তার কারণ খুঁজতে হবে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতিকে মানুষের ‘মন’ থেকে তিনি আলাদা করছেন, দেখা যাচ্ছে। কারণ, বলা হয়, মানুষের ‘মন’-এর ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা পর্যায়ে আল্লা সংক্রান্ত ধারণা জাগে। তাহলে ‘আল্লা’র ধারণা মানুষের মনের তৈরি জিনিস—বিবর্তনের পরিণতি—এই নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নাকচ করবার জন্যে মওলানা আজাদ মানুষের ‘মন’কে মানুষের ‘প্রকৃতি’ থেকে আলাদা করে ভেবেছেন। মানুষের প্রকৃতি শাস্ত বা অপরিবর্তনশীল এই দাবি তিনি কোথাও করেন নি। কিন্তু কোরানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লা সংক্রান্ত ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর কথা হোল মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই ধারণা বা ভাব। ফলে মানুষ তার চৈতন্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্বৈত সত্তার উপলব্ধি টের পায়। এমন এক সত্তার উপলব্ধি ঘটে যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। অদ্বৈত সত্তা সংক্রান্ত এই বোধ ক্রমে ক্রমে বিকৃত হয়, অধোগতি ঘটে এই উপলব্ধির। তখনই বহু ঈশ্বর, বহু মূর্তি, বহু দেবদেবতা আল্লার স্থান দখল করে নেয়।

লক্ষ্য করার বিষয় হোল মওলানা একই সঙ্গে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনাও করছেন। ইউরোপের পণ্ডিতরা উল্টো কথা বলেন। তাঁদের ধারণা দেবদেবতা, বহু ঈশ্বর, প্রাকৃতিক সত্তার ওপর ঈশ্বরগুণ আরোপ করেই মানুষের ধর্মচেতনার যাত্রা শুরু হয়েছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে এই চেতনাই অদ্বৈত সত্তার ধারণায় পৌঁছেছে। আঠার শতাব্দিতে পণ্ডিত মহলে এই ধারণা প্রসার লাভ করে। মওলানা আজাদ দেখিয়েছেন ইসলামের সঙ্গে এইসকল ইউরোপীয় পণ্ডিতের মিল নেই। ইসলাম বরং উল্টো কথা বলছে। আদিতে অদ্বৈতবাদই ছিল মূল ভাব, তার বিনষ্টি ঘটেছে ইতিহাসে। আল্লার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণার উদয় নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পার্থক্য মওলানা আজাদ

পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। মওলানা আজাদের কথা হোল আল্লার শাফায়াত বা গুণাবলী সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তন ঘটেছে ইতিহাসে, সেটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে অদ্বৈত সত্তা সংক্রান্ত ধারণার কার্যকারণ। সেটা ইতিহাসের ফসল নয়, মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির ধর্মই হচ্ছে এক অদ্বৈতের জন্য আকৃতি, এক ও অদ্বিতীয় আল্লার উপলব্ধি, আল্লার একত্ববোধ ইত্যাদি।

মওলানা আজাদ এক ও অদ্বিতীয় আল্লা নামক ভাবের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে পাশ্চাত্যের বিবর্তনবাদী বা একরৈখিক ঐতিহাসিক পদ্ধতি নাকচ করে দিয়ে প্রাচ্যের চিন্তাপদ্ধতির পক্ষে দাঁড়ালেন। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁর এই বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের গুরুত্ব বোঝা দরকার। কার্ল মার্কস চিন্তা বা ভাবের বিকাশের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদী একরৈখিক ইতিহাসে বিশ্বাস করতেন না। গ্রীক সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবার বহু আগের সমাজ গ্রীস। সেই সমাজে চিন্তা, ভাব, শিল্প, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য বোধের বিকাশ একরৈখিক ইতিহাসের নিয়ম মেনে চলে নি। সমাজ জটিল ও আধুনিক না হলে সেই সমাজে সুসম চিন্তার উদয় ঘটে না এই চিন্তা মার্কস নিজেও নাকচ করে দিয়েছিলেন। তাহলে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে এক ও অদ্বিতীয় আল্লা বা ঈশ্বরের ধারণার উদয় ঘটেছে—এটা মার্কসেরও কথা নয়।

কিন্তু মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির তো একটা ইতিহাস আছে। প্রাকৃতিক সত্তা হিসাবে মানুষের উদয়ের একটা ইতিহাস আছে। মার্কস তাকে প্রাকৃতিক ইতিহাস হিসাবে স্বীকার করতেন, মওলানা আজাদ সেই দিকে যান নি। কিন্তু শরিয়তপন্থী হয়েও তিনি মারফতের কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালেন। যদি মানুষের স্বভাবের মধ্যে আল্লার উদয় সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাহলে আল্লাকে পেতে হলে মানুষকে তার নিজের স্বভাব বুঝতে হবে। আল্লাকে তো তাহলে আসমানে খুঁজে লাভ নেই। এই কথার সঙ্গে ফকির লালন শাহের কোন বিরোধ হবে না। কিন্তু মওলানা আজাদ এই রকম সিদ্ধান্তেও পৌছাতে চান নি। তিনি তাঁর কথাকে যুক্তির শেষ জায়গায় নিতে বোধহয় বিড়ম্বনা বোধ করেছেন।

মওলানা আজাদ আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কোরানের আল্লাসংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি কোরানের আল্লা সংক্রান্ত ধারণার গৌরব প্রচার করতে চেয়েছেন। ফলে একটা সাম্প্রদায়গত স্বার্থ তাঁর ছিল। তাঁর কথা হোল মোটা দাগে আল্লা সংক্রান্ত দুটো ধারা লক্ষ করা যায়। একদিকে তাঁর ওপর মানবিক গুণাবলী (anthropomorphic) আরোপের চেষ্টা চলে। যেমন, তিনি শক্তিমান, দয়ালু ইত্যাদি। অন্যদিকে তাঁকে নিগুণ প্রমাণের প্রয়াস নেয়া হয়। কোরান দুটো পথই বাতিল করে দিয়েছে। কীভাবে? ভাষায় আল্লার ওপর নানান সিফাত বা গুণ কী আরোপ করা চলে কিন্তু সেই গুণের লক্ষণ সম্পন্ন কোন বস্তুময় সত্তার সঙ্গে আল্লার তুলনা চলে না। সেটা হবে শেরেকি। তাঁকে এক ও

অদ্বিতীয় রূপেই ভাবতে হবে। দুই পথের ভুল শুধরে কোরান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে, মওলানা এই কথা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

ফকির লালন শাহ কোন শব্দ, বাক্য, উচ্চারণ, গ্রন্থ, কালাম, মন্ত্র বা আয়াতের গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। নিরক্ষর আর নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হবার কারণে তাঁর কাছে কোন সম্প্রদায়ের আল্লা বা ঈশ্বরচিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ অর্থহীন। অতএব আল্লা বা ঈশ্বরকে যখন তিনি ‘সাঁই’ নামে ডাকেন তখন সেই নাম আর কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া থাকে না। সকলের হয়ে যায়। কিন্তু এতে সংকট মেটে না, কারণ আকুতি ও প্রশ্নের মীমাংসা তো নামের মধ্যে নেই। অতএব তাঁকে ফের প্রশ্ন করতে হয়েছে, ‘কোন নামে ডাকিলে তারে হৃদাকাশে উদয় হবে?’ নিজেই আবার উত্তর দিয়েছেন, ‘আপনায় আপনি ফানা হলে সেই ভেদ জানা যাবে’। সমস্যাটা ভাবের এবং ভাষার। কোন নামে ডাকলে মনের মধ্যে সেই ভাব জাগবে যাতে আল্লা বা ঈশ্বরের দর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায় বা তাঁর উপলব্ধি ঘটে। শব্দ এবং ভাবের মধ্যে সম্পর্ক কী? এটা লালনের প্রশ্ন।

‘যে আমরা বাঙলা লেখা ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, যে বাঙলাতেই কথা বলি, ঘরকন্না করি, এখন তদ্বিষয়ে আমাদের জানা প্রকাশিব’—এই বলে কমল মজুমদার ‘ভাব প্রকাশ বিষয়ে’ কথা শুরু করে বললেন, ‘প্রথমেতেই বলিব আমরা থিয়েটারের লোক’। শব্দ এবং ভাবের সম্পর্ক তাহলে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করতে হলে তাকে ‘অভিনয়’ করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। যেমন শিশির ভাদুড়ি করতে সক্ষম। ‘অর্থাৎ যে কোন পরিচিত অক্ষর দ্বারা তিনি সর্বৈব ভাবে আপনার স্বরবৃত্তি প্রকাশে দক্ষ ছিলেন’।

তাহলে লালনের ‘নাম’ ধরে ‘ডাকা’ মানে কি অভিনয় করা? কমল মজুমদার জানান যে আমরা যাকে অভিনয় বলি সেখানে অভিনেতা আর শ্রোতা বা দর্শক এক নয়। কমপক্ষে দুই জন। কিন্তু লালনের নাম ডাকাকে যদি আমরা অভিনয় বলি তো সেখানে যিনি ডাকছেন এবং শুনছেন উভয়েই কি তাহলে এক ব্যক্তি? কারণ যিনি এই নাম ডাকছেন তিনিই সেই নামের গুণে রসবিহীন হচ্ছেন। এই অভিনয়ও তো শরীরের। এই জনেই এই অভিনয়—ধর্মের নাম দেহতত্ত্ব। মানুষের কায়া বা দেহকে সেই নামের গুণে জাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। যে জাগরণের মধ্য দিয়ে শরীরে ‘সাঁই’—এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। কমল মজুমদার যেহেতু দূর থেকে ঠাকুরকে দেখেছেন সেই কারণে সাধকের অভিনয়কেও দূর থেকেই দেখেছেন। কাছে যেতে পারেন নি। কিন্তু শব্দ ও ভাবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেহের যে একটা ভূমিকা আছে এটা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল।

মনে হতে পারে আমি জোর করে কমলের লিখাকে ধর্মের মধ্যে কিম্বা সাধকের পথে নিতে চাইছি। তো কমল মজুমদার থেকেই আবার উদ্ধৃতি দেই। ‘শব্দ সম্পর্কে আলোচনা সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রেরই বিষয়ীভূত ছিল—আমাদের দেশে ধর্ম আর দর্শন একই। এমনকি মহাপ্রভুকে, রামকৃষ্ণকে—বহুমত মানিলেও অন্য অনেক প্রচলিত ধারা খণ্ডন করিতে হয় (তাহারা নৈয়ায়িক ছিলেন) সঠিক শব্দে তাঁরা অদ্বিতীয়।’

তাহলে ধর্ম বা মত সঠিক শব্দ প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। ধর্মালোচনা মানে শব্দ ও ভাবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। আমাদের দেশে দর্শনের আলোচনা মানেই তাই। কারণ আমাদের ধর্ম আর দর্শনে কোন ফারাক নাই। এই কথা আমি লিখলে আমি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যেতাম। আধুনিক কমল মজুমদারের বরাতে বলা গেল খুব সহজে।

শব্দ ও ভাবের সম্পর্ক নিয়ে কারবার করে কবিতা। তাহলে ধর্ম বা ধর্মালোচনা মানে কবিতা চর্চা। কমলের রচনা সে কারণে একান্তই কবিতা। তিনি আসলে কবিতাই করছেন। কারণ কমল মজুমদার আদতে কবি। নিজে কবি বলে কমলকুমার মজুমদার বাউলদের কবিত্ব ধরে ফেলেছিলেন খুবই সহজে। ছেলেবেলায় রাজশাহীতে কমল মজুমদার খাতুরির মেলায় যেতেন। সেখানে দেখতেন যে মেলা ছেড়ে ‘উঁচু’ থাকের সাধকরা শব্দ ও ভাবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে পদ্মার চরে চলে যেতেন। ‘গভীর মধ্যরাত, শুধু গাঁজার ধোঁয়ার কুণ্ডলী, নিস্তব্ধতা, মাঝিদের আলাপ, কাশির শব্দ, মাঝে একতারার ইতস্তত আলাপ।’- এগুলো কমল মজুমদারের বর্ণনা। আরো উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বাউলদের সবই প্রণালী (process): ধরি মাছ না হুঁই পানি, চুল ভিজাব না, অষ্টপাশ ভেদ জানবি। সকলেই নূতন কোন শব্দের খবর দিতে পারে কিনা তাহার তত্ত্ব লয়। তাহাদের ছেঁড়া কস্থা পদ্মার হাওয়াতে মৃদু উড়িতে আছিল, ইহারা এখানেও সভয় পশ্চাতের দিকে তাকায়। (এখানে দর্শনেন্দ্রিয়র সব কথা আছে - তাকায়টি ঠিক) ইহারা আপন বা সমষ্টিগত absurdity কে লইয়া চলা-ফেরা করে, যখন নৃত্য করে তখনও, যখন জপ করে তখনও। ইহাদের ধারা চর্যা ইহাতে মানে অদ্যও ‘আলেখ’ ইহারা রহিয়াছে।’ [কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, ১৯৮২]

কী কী কথা আছে এখানে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে ভাবোদয়ের সম্ভাবনার কথা মওলানা আজাদের বরাতে দিয়ে আমরা বলেছি সেই আল্লা, ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে খুঁজছে বাউল। দ্বিতীয়ত করণের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ দেহতাত্ত্বিক করণকার্য বা চর্চার কথা। কারণ নিজের স্বরূপে ‘আলেক সাই’-কে পাওয়ার পথ হচ্ছে দেহের পথ, বস্তুবাদী পথ—অধ্যাত্মবাদী পথ নয়। তৃতীয়ত ‘সকলেই নূতন কোন শব্দের খবর দিতে পারে কিনা তাহার তত্ত্ব লয়’। তার মানে নূতন ভাবের উদয় মানে নূতন শব্দের উদয়। কিম্বা নূতনভাবে চেনা শব্দের ব্যবহার। ঐ উদয় বা নব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শরীর জেগে ওঠে, ঈশ্বর দর্শন ঘটে, বা তার ভাবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘটে।

ফকির লালন শাহ বাউল নন। তিনি নিজেকে ‘ফকির’ বলতেন। কিন্তু আমরা ফকির বলতে যা বুঝি তিনি সেই ফকিরও নন। সন্ন্যাসী ছিলেন না। শব্দ এবং ভাবের সম্পর্ক তাঁর কাছে স্রেফ উচ্চারণের বা ব্যবহারের বিষয় ছিল না। অতএব তাঁর নাম ধরে ডাকলেই যে তাঁর ভাব উদয় হবে না সেই খবর তিনি জানতেন। ভাব শুধু বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয় নয়; তাকে শরীরের মধ্যে, নিজের করণকার্য বা দেহসাধনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। ভাবের একটা বস্তুময় প্রকাশ ঘটানো চাই। যে রূপের আকৃতি জেগে উঠছে নিজের স্বরূপে তাকেই দেখতে হবে। এই ‘সংক্ষেপে’ দেখার

প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার একটা ধারা গড়ে উঠেছে তাঁর হাতে। এই ধারা অধ্যাত্মবাদী কোন ধারা নয়। এটা একটা বস্তুসম্মত প্রক্রিয়া এবং এর শিক্ষার পথ শারীরিক। সে এক অপরাধ 'অভিনয়'—শিক্ষার্থী নিজেই যেখানে একই সঙ্গে অভিনেতা ও দর্শক। মনের অতীত যে 'অধর'—যাকে ধরা যায় না, তাকে চিনতে ভাষায় বাক্য রচনা সম্ভব নয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যিনি আছেন তাঁকে ধরা যায় না। কারণ তাঁকে ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। যে অচেনাকে কোন নামে ডাকা যায় না সেই অচিন স্তরে মানুষের বাক্যস্ত্র কাজ করে না। কিন্তু মানুষ যখন সেই স্তরে পৌঁছায় তখন তার শরীর হয়ে ওঠে সেই ভাবের বস্তুময় প্রকাশ। সেখানে মানুষের নিজের আর ভাবের অভেদ ঘটে। সেই স্তরে পৌঁছানোর পথ হচ্ছে নিজের মধ্যে নিজের লয় ঘটানো।

তাহলে ঈশ্বর, আল্লাহ বা আলেক সাঁই নিয়ে এতো কথা কী শেষাবধি শব্দ ও ভাবের সম্পর্কের মামলা? আসলে কি তবে কবিতার সংকট নিয়েই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি? কিন্তু যে কবিতা আমরা লিখি, কবির যে জীবন আমরা চর্চা করি তার সঙ্গে তো ফকির লালন শাহের কবিতা বা জীবনের কোন মিল নেই। তাহলে কি কবি ও কাব্যের এক মারাত্মক অধঃপতন ঘটেছে? তাহলে কি কবি বলে যাদের আমরা চিনি তারা কেউই কবি নয়? মুর্গির ওড়ার ক্ষমতা নেই, তার নষ্ট দেহ, তার পালক ভারি হয়ে গিয়েছে। তবু মুর্গি নিজেকে পাখি মনে করে। এই কি অবস্থা?

আমার ভয় এটাই। আমার ভয়, শুধু সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণী সংকীর্ণতার মধ্যেই আমরা খাবি খাচ্ছি না, আমরা ভুলে গিয়েছি ভাব কাকে বলে এবং কবিতা কী জিনিস? কমল মজুমদার কাব্যের জীবন্ত বিগ্রহ দেখেছিলেন গঙ্গার ওপারে। তাঁর বরাতে আমরা যদি ছেঁউড়িয়ার দিকে চলতে শুরু করি হয়তো কাব্য আবার দেখা দিতে পারেন। হয়তো সেই শব্দ আমরা খুঁজে পাবো যাতে আমাদের সংক্ষিপ্ত স্বরূপের মধ্যে ভাবের উদয় ঘটতে পারে আবার। বলাবাহুল্য এই পথ পাশ্চাত্যের পথ নয়, এটা প্রাচ্যের পথ। এই পথে চলার ধরণ আলাদা। যে আমরা বাঙলা লেখা ব্যতীত আর কিছু জানি না, এটা তাদের পথ।

কমলকুমার মজুমদার এই পথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'আমরা খুব গ্রাম্য'—এই কথা বলা সত্ত্বেও তাঁকে সকলেই অত্যাধুনিক মনে করে। তিনি ধন্য। তাঁকে আবারো ঈর্ষা জানাই। নিজের মুশকিল জেনেও তাঁর দেখাদেখি আমি গ্রাম্যতার নিশান উড়াই। কারণ আমি ঢাকার, অতএব অতীত কলকাতাপ্রিয়তায় ও কলকাতার অনুকরণে সিদ্ধ!

অতঃপর বলি, তথাপি বাংলা কাব্যের পথ ছেঁউড়িয়ার দিকে চলতে শুরু করেছে।

আছে ভাবের তালো সেই ঘরে
যে ঘরে সাঁই বাস করে ।।

ভাব দিয়া খোল ভাবের তালো
দেখবি সেই মানুষের খেলা

ঘুচে যাবে শমন জ্বালা
থাকলে সেই রূপ নেহায়ে।।

ভাবের ঘরে কী কুদরতি
ভাবের লন্ঠন ভাবের বাতি
ভাবে বিভাব হয় এক রতি
অগ্নি সে রূপ যায় সরে।।

ভাব নৈলে ভক্তি কি হয়
ভেবে বুঝে দেখ মন রায়
যার যে ভাব সেই দেখতে পায়
লালন কয় বিনয় করে ! !

(শক্তিনাথ বা সম্পাদিত ভোলাই শা খাতা গান ন: ২০৯। এই গানের নানান
বিকৃত পাঠ আছে। শক্তিনাথ বা সম্পাদিত পাঠই আমার কাছে সঠিক বলে মনে
হয়েছে।)

পাবে সামান্যে কি তার দেখা

এক সাধুর স্মৃতি মনে পড়ছে। তাঁর চেহারা আবছা মনে পড়ে, কিন্তু কথাগুলো কানে গেঁথে আছে। কথাগুলো যখন শুনেছি তখন তাঁর বলার ভঙ্গিটা মজার লেগেছিল, সে কারণে শ্রুতি বহুকাল স্মৃতিকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। তবে সবকথা সেদিন বুঝতে পারি নি। আজো বোধহয় পারি না। কথা সাধারণত তার সব অর্থ এক সঙ্গে খালাস করে না। ইশারায়, ইঙ্গিতে, সময় বুঝে, মওকা মতো নানান মানুষের কাছে বিবিধ কায়দা ও বেকায়দায় শব্দ বা কথা নিজের গোমর প্রকাশ করে। এ বছর কার্তিকে লালনের মৃত্যুদিবস নিঃশব্দে পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ “সামান্য” শব্দটি তোলপাড় করে উঠল। খুবই ছোট ও অতীব সামান্য একটি শব্দ। এরপর থেকে শব্দটিকে মগজ থেকে ঘষে ঘষেও তুলে ফেলতে পারছি না।

‘সামান্য’—কী মানে এই ‘সামান্য’ নামক শব্দটি? তদুপরি বাংলা ১৪০২ সালের পয়লা কার্তিকে এই সামান্য শব্দ অসামান্য হয়ে উঠল কেন? আমরা লালনকে ভুলে যেতে চাই, কিন্তু তিনি দাগ দিয়ে নিজের চিহ্ন ঠিকই যেন রেখে যান। না, শুধু ইতিহাস হিসেবে নয়। শব্দ হিসেবে। এই দাগ কারো জন্ম বা মৃত্যুর তারিখমূলক ঘটনার দাগ নয়। ক্যালেন্ডারে আমরা যেমন লাল বা নীল দিয়ে গোল করে আঁকি, তেমন দাগ-আঁকা নয়। এটা শব্দের দাগ। শব্দ দিয়ে দাগ নয়। বরং শব্দ নিজেই একটা চিহ্ন হয়ে যায়। অন্য রকম দাগ। অতঃপর এই দাগ ভাষার অপরাপর অর্থসকলকে বদলাতে থাকে। যেমন, সামান্য। এই শব্দে দাগ দিয়ে রেখে ফকির লালন এখন আমাদের সঙ্গে নানান ফিকিরে প্রবেশ করছেন।

সাধুর কথা দিয়ে শুরু করেছি। মনে পড়ছে সাধু বলেছিলেন, গিট বাঁধো, নইলে কবি হবা কী কইরো।

বহুবছর আগে কোনো এক পয়লা কার্তিকের মেলায় ছেঁউড়িয়ার লালনের মাজার থেকে খানিক দূরে কালীগঙ্গার ধারে তিনি আসন পেতেছেন। খুবই সাধারণ একজন লালনপন্থী ফকির। তেমন ভক্ত পরিবেষ্টিত নন। মাজারের হৈ-হট্টগোল এড়াতে আমি কালীগঙ্গার ধারে এসে দেখি অনতিশয় অন্ধকারের গায়ে কুয়াশার একটা প্রলেপ জমা হয়েছে। প্রায়-শুকনো নদীর ধারে এসেই যেন সেটা আবিষ্কার করার দরকার ছিল। ওরই মধ্যে মানুষজনের চলাফেরা। এখানে তেমন জটলা আর ভিড় নেই। গানের কিছু মুর্ছনা আর কিছু কোলাহলের মিশ্রণে যে-সন্দেহ তৈরি হয় সেই রকম। কোনো ভিড়ভাটা নেই। নদীয়া এইখানে কালীগঙ্গার পাশে অনেক বেশি স্থির ও প্রশান্ত। ওরই মধ্যে সাধুর এই ছোট জটলা। একতারা বাজিয়ে প্রায় নিঃশব্দে তিনি গান করছেন। তার এক ভক্তকে শুধাই, এতো দূরে কেন?

ভক্ত আমাকে কাছে-দূরের ভেদ বোঝাবার জন্য বিস্তর জ্ঞান দিতে থাকল। নিজের অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতার জন্য সেই সকল কথা কিছু আমার মধ্যে প্রবেশ করলো আর কিছু কথা ভাবাকুল নদীয়ায় হারিয়ে যাবারই কথা ছিল। ধরে রাখার কোনো সাধও আমার ছিল না।

ষাট দশকের শেষের দিকের ঘটনা, এখন আমার কিছুই তেমন মনে নেই। এতেটুকু মনে আছে যে পাকিস্তানি আমলে লালনকে ‘মুসলমানিকরণ’-এর যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তার প্রতি আন্তরিক লালনপন্থীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ তখনই লক্ষ্য করেছি। লালনপন্থীরা এর আগে লালনকে ‘হিন্দু’ প্রমাণ করবার প্রক্রিয়াকে রুখে দিয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ-অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রমুখের আমল থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা কোনো প্রমাণ ছাড়া ক্রমাগত বলে যাচ্ছে লালন ছিলেন হিন্দু, জাতিতে কায়স্থ। তারপর পাকিস্তান আমল থেকে শুরু হলো পাঁচটা হামলা। মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা খেয়ে-না-খেয়ে জ্বাল তথ্য ও ভুয়া দলিল বানিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে লালন নাকি জন্মগতভাবেই মুসলমান। লালনপন্থীরা পাকিস্তান আমলে প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা এই মুসলমানিকরণ প্রক্রিয়াকে ঘৃণা করেছে। এই ঘৃণার প্রকাশ হিসেবে ষাট দশকের শেষের দিকে দেখেছি আন্তরিক লালনপন্থীরা মাজারে তাদের সাইজীকে ভক্তি জানাবার পর মাজারে থাকেন নি, বা মাজারে বসেন নি। বসেছেন মাজার থেকে দূরে।

মুসলমানিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রস্তাবে ১৯৪৩ সালে পাকিস্তান সরকার ‘লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা করে। মাজারের ভেতরে সাধুদের সমবেত জায়গা দখল করে নিয়ে এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। একই সময়ে পাকিস্তানি সরকারের টাকায় লালন শাহ মাজারের ইটের গাঁথুনি ওঠে, সৌধ গড়া হয়। লালন রাজা-বাদশাহ ছিলেন না, কিম্বা সুফি বা দরবেশও ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফকির। ইসলামি সংস্কৃতির আবহে রাজা-বাদশাহদের বিপরীতে সুফি ও দরবেশদেরও মানুষের আধ্যাত্মিক জগতের রাজা হিসেবে এক ধরনের স্বীকৃতি দেবার রেওয়াজ

আছে। সেই জন্য তাদের মাজারে ইমারত বা সৌধ গড়ে তোলার ঐতিহ্য চালু করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু বাংলার এই ফকির সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। গাছতলা বা বড়ো জোর কুঁড়েঘরের বেশি কিছু তাঁর মাজারে করা সম্ভব কিনা সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে সকলেই তো আর ফকির হয় না। তাদের অনেকেই স্থায়ী কিছু গড়ে উঠুক এটা হয়ত চাইতেন। কিন্তু মাজারে স্থাপত্য এবং আঙ্গিক মোটেও লালনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এটা তারা বুঝে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানি আমলের মাজার তার স্থাপত্যের দিক থেকে পাকিস্তানি ভাবটাই গড়বার চেষ্টা করেছে। লালনের ভাব নয়।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের উদ্দেশ্য যাই থাকুক রাষ্ট্র ও তার তাবেদার বুদ্ধিজীবীরা মাজারে হস্তক্ষেপ করার ফল যে অশুভ হতে বাধ্য এটা লালনপন্থীরা অনায়াসেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। জাতপাতসম্প্রদায়বিরোধী লালনকে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংকীর্ণ করে ফেলবার খারাপ প্রয়াস চলছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে লালনের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটছে। এই সকল সত্য সাধুদের চোখ এড়ায় নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র' নামটি বদলে ফেলা হয়। নতুন নাম হয় লালন একাডেমি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর লালনকে মুসলমান প্রমাণ করার গবেষণা কমে নি, বরং বেড়েছে। ফলে মাজারের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য দায়দায়িত্বে যারা আছেন তাদের সঙ্গে লালনপন্থী সাধকদের বিরোধ বেড়েছে। অন্যদিকে, লালন একাডেমি মূলত এখন পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসক। তিনিই আসলে প্রকারান্তরে মাজারের হর্তাকর্তা। একটা নাম কা ওয়াস্তে কমিটি থাকলেও লালন একাডেমি ও লালনের মাজার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একজন আমলার ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক, আমলাতান্ত্রিক গণবিরোধী আবহের কাঠামোর মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অর্থাৎ সাধকের সাধনার ক্ষেত্রকে সাম্প্রদায়িক করে তোলা এবং আন্তরিক লালন অনুসারীদের মাজার থেকে বিতাড়িত করাই এই রাষ্ট্রের লিখিত বা অলিখিত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ফকির লালন শাহের মাজারের পরিস্থিতি এই রকম একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর একটা মারাত্মক ফল হয়েছে এই যে নিজেদেরই তীর্থক্ষেত্র লালনের মাজার থেকে লালনপন্থী সাধকরা ক্রমে ক্রমে উৎখাত হয়ে গিয়েছেন। পাকিস্তানি আমলে প্রক্রিয়াটির শুরু, বাংলাদেশে আমলে তার বিকাশ, বিস্তৃতি ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ এক অদ্ভুত দেশ, যেখানে আমলাতন্ত্র এতোই বিস্তৃত ও শক্তিশালী যে দীনহীন ফকির লালন শাহের মাজারও তাদের হস্তক্ষেপ থেকে রেহাই পায় নি।

বহুবছর আগে কালীগঙ্গার তীরে একজন লালন ভক্ত আমাকে কাছ-দূরের ভেদ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, বুঝিনি। তবে এখন লালনের মাজারে গেলেই বুঝতে পারি। থাক। আজ শুধু স্মৃতিকে খানিক খুঁড়ি। দেখি কিছু মেলে কিনা। সাধুর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতেই বললেন, কী কাম করা হয় বাবাজী?

আমি সাধুর সঙ্গে ঠাট্টা করার জন্য তারুণ্যের অহমিকায় বলি, কবি, কবিতা লিখি।

: বাহ। ভালো। কবিতা লিখা ভালো কাজ। তো গিট বাঁধিছ কার সঙ্গে?

: গিট? আমি অবাক হই।

: হাঁ হাঁ গিট। গিট বাঁধো, নইলে কবি হ'বা কী কইর্যো।

প্রথমে কৌতুক ও তাচ্ছিল্যভাব জেগেছিল। পরে ভাবলাম বোধহয় খুব রহস্যজনক দেহতাত্ত্বিক কথা হয়ে গেলো, আমি ধরতে পারলাম না। বোকার মতো আকুপাকু কিছু একটা বলেও ছিলাম, মনে পড়ে। বোধহয় বুঝিয়েছিলাম গিট কী করে বাঁধে সেটা তো আমি জানি না। ভেবেছিলাম প্রশ্নের উত্তরে সাধু আমাকে সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দেবেন। দেহসাধনার প্রক্রিয়া ও করণ সম্পর্কে বলবেন। দেহকে বাঁধতে বলবেন। রতিসাধনার গুট সব তত্ত্বের ইঙ্গিত দেবেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করি। সাধু গম্ভীর হয়ে আমার চোখে চোখ রেখে সিধা চাইলেন। তারপর আসনের পাশ থেকে এক খণ্ড খড় টেনে বার করলেন। ভক্তদের মধ্য থেকে আপদমস্তক নিঃশ্ব, অর্ধ-উলঙ্গ এক কৃষকের হাত টেনে নিয়ে ডান হাতের সঙ্গে তার বাম হাত বেঁধে দিলেন। তারপর প্রবল অট্টহাসি। হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ...। পুরো নদীয়া শ্রীচৈতন্য দেবের কাল ও হোসেন শাহের আমল পর্যন্ত হেসে উঠলো। সাধুর হাসির সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাসছে। হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ। তাহলে, এ হলো গিট বাঁধা, খুবই সহজ কাজ। আহ্ কতো সহজ!!! কবিরা যদি পারতো এতো সহজে গিট বাঁধতে। মানুষের সঙ্গে কবির ও কবিতার গিট বাঁধা? কী সোজা!! খড় নিয়ে নিঃশ্ব মানুষের হাতের সঙ্গে কবির হাত বেঁধে দেওয়া!!! ব্যস!! একটা বিশাল জোকার হয়ে আমিও হেসে উঠি। হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ। কালীগঙ্গাও হেসেছিল।

তামাশা সেরে সাধু বললেন, কী চাও? শব্দ না সত্য?

আমি এতো কঠিন প্রশ্ন এর আগে কখনো শুনি নি। আমি রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিশের কবিদের কবিতা পড়ে সেই সময় কবিতা লেখা শিখছি। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব, সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তীর বহু কবিতা আমাদের ঠেটস্থ। এই হিসেবে আমি তখন আসলে কেবল শব্দ শিখছি। শব্দ আর সত্যের মধ্যে যে একটা সম্পর্কের ব্যাপার আছে সেটা কখনো মনেই হয় নি। প্রতীক নির্মাণ, চমৎকার শব্দপ্রয়োগ, সচেতনভাবে কবিতাকে অস্পষ্ট রাখা ইত্যাদি করে 'আধুনিক' কবি হওয়ার সাধনা করছি। আমি কনফিডেন্টলি বললাম, শব্দ।

তড়াক করে সাধু উঠে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে একটা কেরোসিন তেলের টিন বেরিয়ে এলো, যেন আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা। ভেতর থেকে কী সকল হাবিজাবি ঝেড়ে সাধু টিন খালি করলেন। তারপর একটা লোহার ডাণ্ডাও বেরিয়ে এলো। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই সাধু সেই লোহার দণ্ড দিয়ে টিন পেটাতে শুরু করলেন।

বিকট উৎকট আওয়াজ। অসহ্য! তার সঙ্গে বাজখাঁই গলায় ভয়াবহ চীৎকার। একসময় থেমে ধপাস করে বসে পড়েই গস্তীর মুখে বললেন, শব্দ এখন পাইছস, ভাগ। তুই সত্য যখন পাবি তখন আমাকে ডাকে পাঠাইয়া দিবি। ভাষায় তুই-তোকারি থাকলেও কোনো ক্রুদ্ধতা বা ভীষণ কোনো রাগ ছিল না। বরং কণ্ঠে একটা অনুনয় ছিল। যদি সত্য পাই তাহলে যেন তাকে সত্যি সত্যিই ডাকে পাঠিয়ে দেই। পাকিস্তান আমলে পোস্টাফিস এখনকার চেয়েও ঠিক ছিল। সত্য পাঠালে ডাকপিয়ন ঠিকই সাধুকে হয়তো পৌঁছিয়ে দিতো।

: ডাকে পাঠাবো? মানে সত্য যখন পাব তখন সেই সত্য কাগজে লিখে খামে ভরে পোস্টাফিসের মারফত পাঠাবো? গাঁইগুই করতে থাকি।

সাধু কোথেকে একটা ব্যবহৃত জরাজীর্ণ খাম বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। সত্য পাঠাবার জন্য খামটাও হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি এটাকে মহাত্মাশা গণ্য করে হাত ঠেলে উঠে পড়লাম। ভক্তরা কাঁ কাঁ করে চীৎকার করে উঠলো, নিন, নিন, সাধু দিচ্ছে, নিন। খামে কইরো সাধুকে সত্য পাঠাইয়া দিয়েন। সকলকেই হঠাৎ খুব সিরিয়াস মনে হোল। কেউই কিন্তু মশকরা করছে না। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। মহাপাগলদের খপ্পরে পড়েছি মনে হলো। নিজেকেই ফের প্রশ্ন করি, কী ছিল সাধুর প্রশ্ন? শব্দ চাও না সত্য চাও? কী ছিল আমার উত্তর? শব্দ। তাহলে সাধু আমাকে যা চেয়েছি তাই দিয়েছে। আমি তো সত্য চাইনি। আমি সাধুকে প্রশ্ন করিনি শব্দ আর সত্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? সত্য আর শব্দকে আলাদা করবো কী করে? সত্য কি শব্দে, অক্ষরে বা বাক্যে প্রকাশিত হয়? সত্যকে পাওয়া বা সত্যকে দেখা এক কথা, আর তার প্রকাশ অন্য কথা। মানুষের ভাষা কি সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম? কিম্বা সেই গোড়ার কথাও তো তুলতে পারি নি যে সত্য কী?

হঠাৎ করেই আবার পরিবেশ বদলে যায়। আর শুরু হয় একতারার আওয়াজ। প্রেমজুড়িও তাল দেবার জন্য বান বান করে ওঠে। তখন, কালীগঙ্গার তীরে, আজ থেকে বহু বছর আগে, ফকির লালন শাহের একটি গান সেই ‘পাগল’ আমাকে লক্ষ করে গেয়ে ওঠে। গানটি পুরো না শুনে আমি স্থান ত্যাগ করতে পারি নি। আজ পাঠকদের জন্য পুরো গানটি উদ্ধৃত করছি এই কারণে যে শব্দ চাই না সত্য চাই—এই প্রশ্নে তাড়িত হওয়ার মতো কিছু মানুষ হয়তো এখনো বঙ্গ আছে। কিন্তু শব্দ ও সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তো দর্শনের একদমই গোড়ার প্রশ্ন। কেন আমরা তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ শ্রেণী গোড়ার প্রশ্নগুলো বেমালুম ভুলেছি। আর কেনই বা গরিব আর নিঃশ্বের সংস্কৃতি এই গোড়ার প্রশ্নের সমাধান ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব বলে কখনোই বিশ্বাস করে নি? বঙ্গ অসাধারণ। নদীয়া বাংলার প্রাণ ও জ্ঞানের তীর্থ। নদীয়া বারবার গোড়ার প্রশ্নগুলো তুলে বাংলার ভাবুকতার ধারাকে অপরিসীম শক্তিশালী করে গেছে। ফকির লালন শাহ হচ্ছেন সেই গোড়ার মানুষ—কবিদের কবি, ভাবুকদের ভাবুক। বাংলা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ফকির লালন শাহের গোড়ার কিছু

একি

প্রশ্নের মীমাংসা করতেই হবে। না করলে বাংলার কোনো জাগরণ, রূপান্তর ও পুনর্গঠন অসম্ভব বলে আমি গণ্য করি। শুধু দার্শনিক বা সাংস্কৃতিক অর্থে নয়—রীতিমতো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অর্থেও। কেন করি, সে সম্পর্কেই দু একটি কথা বহু বছর আগে শোনা গানটিকে উপলক্ষ করে বলবো। আগে তাহলে গানটি পুরো পড়ে নেওয়া যাক।

পাবে সামান্যে কি তার দেখা
বেদে নাই যার রূপরেখা, ওরে
বেদে নাই যার রূপরেখা ॥

নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে
সদাই ফেরে অচিন দেশে
দোসর তার নাইকো পাশে
ফেরে সে একা একা, ওরে
ফেরে সে একা একা
পাবে সামান্যে কি তার দেখা ॥

কেউ বলে পরম ইষ্টি
কারো না হৈল দৃষ্টি,
বরাতে দুনিয়া সৃষ্টি
তাই নিয়ে লেখাজোখা, ওরে
তাই নিয়ে লেখাজোখা
পাবে সামান্যে কি তার, দেখা ॥

কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেব
সে তুলনা কি আর দেব
লালন বলে গুরু ভেব
যাবে রে মনের ধোঁকা, ওরে
যাবে রে মনের ধোঁকা
পাবে সামান্যে কি তার দেখা ॥

দুই

প্রশ্ন

ফকির লালন শাহের এই গানটির ব্যাখ্যা করতে পেরে একটি দীর্ঘ দার্শনিক গ্রন্থ অতি অনায়াসেই দাঁড় করানো সম্ভব, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু সাধু যখন আমাকে শব্দ চাই না সত্য চাই সেই প্রশ্ন করেছিলেন, তখন পরিস্কার গুরুতেই আমাকে একটা শ্রেণীগত অবস্থান নেওয়ার জন্য বাধ্য করেছিলেন। কারণ শব্দ বা সত্য কী, কিম্বা তাদের সম্পর্কটাও বা কীভাবে নির্ণীত হয় সেটা বিচার করবার পদ্ধতির এটা অংশ।

অর্থাৎ নিজের অন্ত্রেষণের বিষয়টা আসলে কী, কী খুঁজছি—সেটা তো আগেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয় থাকে। আমরা কেউ কেউ হয়তো বা সে সম্পর্কে সচেতন থাকি, আর অধিকাংশই থাকি না। প্রতিটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেবার পশ্চাতে এই অদৃশ্য অন্ত্রেষণের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা কাজ করে যায়। শব্দ চাই না সত্য চাই এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হবার ফলে সেই দিন নিজের গোপন ও অচেতন ইচ্ছাটা নিজের চেহারা দেখিয়ে ফেলেছিল। নিজের মধ্যবিস্তৃত ‘শিক্ষিত’ ইচ্ছার মধ্যে সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা কই? তাই উত্তর দিয়েছিলাম শব্দ। অতএব টিনের পিটুনি ও ভয়বহ চীৎকার ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলো না। এটাই পুরস্কার।

এটা কি তাহলে সত্যি যে মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর ধ্যানধারণা ও ভাবনাসিঁচুত কেরোসিনের টিনের বাড়ি আর বিদ্যুটে চীৎকার ছাড়া কিছুই নয়? তাদের ধ্যানধারণা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি কি শুধু শব্দ দিয়ে তৈরি? ওর মধ্যে কি কোনো আন্তরিক উপলব্ধি নেই? কোনো সত্য নেই? এই শ্রেণীর পক্ষে সত্য অন্ত্রেষণ কি আসলেই অসম্ভব? সত্য কি নিজের প্রকাশভঙ্গি নিজেই স্থির করে নেয়? নাকি বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে তার অনিবার্য ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। অনেকে বলেন, শব্দ দিয়ে সত্য তৈরি হয় না। বরং সত্য তার দরকারি শব্দগুলো ভাষা থেকে খুঁড়ে বের করে, সত্য ভাষাকে ঘষেমেজে হাজির করে কিম্বা প্রয়োজনে নতুন ভাষা তৈরি করে। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ফার্দিনন্দ দ্য সসিওরের সময়কালে এসে নতুন করে জানল ও শিখল যে সত্য বা শব্দের মধ্যে কিম্বা অন্য কথায় প্রকাশিতব্য বিষয় (Signified) আর শব্দ বা প্রকাশের মাধ্যমের (Signifier) মধ্যে নিত্য ও অনিবার্য কোনো সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে সাধুকে saint বললে আর বাংলায় ‘সাধু’ বললে একই বিষয় নিয়েই কথা বলা হয়, একই সত্য এখানে প্রকাশিত। একই বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হলো কেবল। সাধু এবং saint ইত্যাদি। অতএব শব্দ ও সত্যের সম্পর্ক নিত্য নয়। যদি তাই হয় তাহলে আজ থেকে বহুকাল আগে কালীগঙ্গার তীরে লালনপন্থী সাধু টিনের শব্দ শুনিয়া ভুল করেন নি। তিনি কি গোপনে ফার্দিনন্দ দ্য সসিওর পড়েছিলেন?

যদি শব্দ সত্যের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত না থাকে তাহলে সত্যের বাইরে শুধু শব্দ আকারে থাকতেই পারে। নয় কি?

শব্দ এবং সত্যের সম্পর্ক সংক্রান্ত গুরুতর দার্শনিক প্রশ্নের অন্তরমহলে এখানে প্রবেশ করব না। এমন কি সত্য কী, সেই গোড়ার প্রশ্ন উঠে রাখলেও ক্ষতি নেই। তবে এখানে হঠাৎ ছেড়ে দিলে একটা বিপদ হবে এই যে আজকাল যারা নতুন নতুন জাক দেরিদা পাঠ করছেন তারা অবশ্য ভাববেন, দেরিদা যে সসিওর-এর শব্দ ও সত্যের সম্পর্ক সংক্রান্ত তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন আমি বোধহয় তার খোঁজ খবর রাখি না। আমি দেরিদা পড়ে বুঝেছি তিনি শব্দের মধ্যে যে সত্য নেই বা থাকে না সেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। শব্দের অর্থ খুঁজলে আমরা এক ডিকশনারি থেকে আরেক ডিকশনারির মধ্যে চালাচল করতে পারি, কিন্তু কখনোই শব্দ কোন শেষ সত্য বা

আসল বিষয়কে প্রকাশ করতে চাইছে সেটা খোদ শব্দটির মধ্যে হাতড়ালে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ এইরকম ধীরস্থির কোনো সম্পর্ক কোনো শব্দের মধ্যেই নেই। কবি বা অকবি প্রত্যেকের শব্দের জন্য এই দিক থেকে সমান। শুধু শব্দ বা প্রতীক বানানোকেই যারা পদ্য বলে থাকেন এবং নিজেদের তৈরি করা শব্দ বা প্রতীককে যারা অভিজাত জ্ঞান করে পদ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন তাদের জন্য এটা খুবই খারাপ খবর। সাধারণ মানুষের ভাষাকে এবং মানুষের সাধারণ ভাষার কাব্যশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার এলিটিজম থেকেই এই শ্রেণী-অহমিকার উৎপত্তি। শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বিষয়ে সসিওরের ধারণা, কিম্বা যারা মনে করেন শব্দ একদিকে আর শব্দের অর্থ বা সত্য অন্যদিকে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকে তাদের অবস্থানের গলদ দেরিদা দেখিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেছেন। এর ফলে আমরা সেই জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি কোনো শব্দচিহ্নই তার অন্তর্গত কোনো অর্থ তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করে না। কারণ তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে থাকা কোনো অর্থ শব্দ বা ভাষায় থাকে না। এটা বরং অবস্থাভেদে তৈরি হয়, বক্তব্যের নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, একটা বলকের মতো নিজের জানান দিয়ে যায়। অনেকটা যেন অর্থ আছে, আবার নেইও। অধরা। কিন্তু ধরাও দেয়। এখান থেকে সেই সিদ্ধান্ত জন্ম লাভ করে যে ভাষা তার স্বভাবগুণেই কাব্য। কারণ গদ্যের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে আর কাব্যের নেই এই অসত্য কথা আর কবিদের অভিজাততাত্ত্বিক গোমর দেরিদা ফাঁস করে দিয়েছেন। যদি তাই হয় তাহলে কাব্য, গদ্য, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, দর্শন এগুলোর মধ্যে শ্বাস্থত কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। সবই চিহ্নমালা, সবই text। জাক দেরিদা পাঠ করে এটা বুঝেছি যে শব্দ চাই না সত্য চাই এটা একটি দারুণ প্রশ্ন। সাধু একবারও বলেন নি যে শব্দের মধ্যে সত্য পাওয়া যাবে। এটাও বলেননি যে সত্যের মধ্যে শব্দ আছে বা সত্য শব্দের মধ্য দিয়েই বা কোনো চিহ্নমালার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। শব্দ ও সত্যের বা শব্দ ও তার অন্তর্গত অর্থের মধ্যে যে একটা অনিবার্য সম্পর্ক আমরা ভাষা ব্যবহারের অভ্যাসবশত ভেবে বসে থাকি সেটা সাধুর প্রশ্নের মধ্যে আগে থাকতেই ধরে নেওয়া ছিল না। তাহলে কি শব্দ আর সত্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই? শব্দের অন্বেষণ আর সত্য লাভ বা সত্যের চর্চা কি দুটো আলাদা ব্যাপার? উত্তর দেবার জন্য প্রশ্ন করি না। প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছিল বলে রিপোর্ট করলাম। এটাও কম দায়িত্ব পালন নয়। কালীগঙ্গার তীরে কুয়াশামাখা এই প্রশ্ন। এখনো ভুলতে পারছি না।

শব্দ ও সত্যের প্রশ্নটিকে সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি প্রায়ই। যখন আমরা কোনো বিষয়কে জানার, বোঝার ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করি তখন কি আমরা বিষয়টির প্রকাশ নিয়ে খুশি থাকি, কী করে তা বললাম, লিখলাম বা ব্যক্ত করলাম সেখানেই কি শেষ? নাকি খোদ বিষয়টিকে ধরবার জন্যে, পাবার জন্য, চর্চার জন্য নিজে সেই সত্য হয়ে উঠবার জন্য কাতর হই? যে শব্দে বিষয়টি ব্যক্ত করা হয় তাতেই কি চলে? নাকি আসলকে পাবার, দেখার বা জানবার জন্য আমরা আকুল হই।

নাকি নিজেই আমরা আসল হয়ে উঠি। মানুষের জীবনচর্চার বাইরে, ‘মানুষ’ নামক অভিজ্ঞতার বাইরে, মানুষের ইতিহাসের বাইরে সত্য বলে কি কিছু আছে?

শব্দ চাই না সত্য চাই এই উচ্চারণের অর্থটারও কি কোনো দেশকালপত্র ভেদ আছে? এখন কি এই প্রশ্নের আর কোনো উপযোগিতা নেই? কে জানে?

তিন

ফকির লালন শাহের গানটির ‘সামান্য’ কথাটার চলতি মানে হচ্ছে তুচ্ছ, সাধারণ বা ক্ষুদ্র। এই অর্থটা ভাষার দিক থেকে বিকৃতি, এটা শব্দটির আদি অর্থ নয়। লালন এখানে শব্দটি নিয়ে একটু খেলছেন। চলতি অর্থে তিনি বলছেন, তাকে কি সামান্য কিছুতে পাওয়া সম্ভব? তিনি কি এতোই তুচ্ছ? এতোই সহজ? অন্যদিকে একে তিনি ব্যবহার করছেন ‘সামান্য’ বা universal বলতে ইংরেজিতে যা বুঝি সেই অর্থে। বলা বাহুল্য তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেন নি। মানে ধরতে যদি কষ্ট হয় সেই তকলিফ কামাবার জন্য উল্লেখ করেছি। গুস্তাখি যেমন মাফ হয়।

এই ‘তিনি’ বা যাকে পাবার কথা বলা হচ্ছে তিনি আমাদের অপর, other। যাকে আমরা খুঁজি। সত্য, আল্লাহ, প্রেম, বিপ্লব, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম—যা খুশি নাম দেওয়া যেতে পারে। কেন? কারণ এই সবই ‘সামান্য’ বা universal ধারণা। আবার অন্যদিকে ‘সামান্য’ শব্দটিকে ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে তিনি অসাধারণ গভীর এক মজার ব্যবহার করেছেন। সেটা ধরতে হলে ভারতের এই দুই ঐতিহ্যবাহী দর্শনে শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার।

বৈশেষিক দর্শন ছয় পদার্থ স্বীকার করে। তার মধ্যে ‘সামান্য’ একটি। দ্রব্য, গুণ, মর্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ—এই হোল ৬টা পদার্থ। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে এই সকল পদার্থের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে। সেটা আমাদের এখানে দরকার নেই।

নিত্য ও অনেক সমবেত পদার্থের নাম সামান্য, এর অপর নাম জাতি। এই হলো সামান্যের একটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ ব্যাখ্যা। এখন ‘অনেক সমবেত’ কথাটার মানে কী? অনেক কিছুকে একখানে সমবেত করা। যদি পৃথিবীর ও বিশ্বনিখিলের সমস্ত কিছুকে ‘সমবেত’ করা হয় তাহলে কি দুনিয়ার সত্যকে পাওয়া যাবে? কিংবা আল্লাহ, ঈশ্বর, বা গডকে পাওয়া সম্ভব? শুধু একত্রিত করলেই বা একটা কিছু সংযোগ থাকলেই সেটা ‘সামান্য’ হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ‘সামান্য লক্ষণে অভিহিত হইয়াছে যে নিত্য ও অনেক সমবেত পদার্থ তারই নাম সামান্য।’ অনেক পদার্থের নিত্যত্ব আছে, অনেক, সমবেতত্ব নাই, আবার অনেক—সমবেতত্ব আছে, নিত্যত্ব নাই। অতএব তারা সামান্য নয়।

ফকির লালন শাহ এখানে বৈশেষিক এবং ন্যায়শাস্ত্রের ধারায় গড়ে ওঠা সমস্ত সৃষ্টিজগতের সত্য জ্ঞান করে ঈশ্বর বা পরম কোনো সত্তার ধারণাকে নাকচ করছেন। অনেক-সমবেত এই সৃষ্টিজগতের নিত্য সত্য, সেই সত্তার ধারণা হচ্ছে ‘সামান্য’ ধারণা। এখন লালন বলছেন, পাবে সামান্যে কি তার দেখা। এখানে এই ‘সামান্য’ আর আমাদের চলতি কথায় সামান্য বলতে যা বুঝি দুটো এক কথা নয়।

‘সামান্যে’ তার দেখা পাওয়া যাবে না এই ঘোষণা দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনেরও মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে বিমূর্তভাবে আমরা যে সামান্যের (universal) ধারণা করি তাতে এই ‘অপর’-কে জ্ঞানগত ভাবেও ব্যাখ্যা হয় না। আসলে সকল প্রকার জ্ঞানকাণ্ড – যার পরিমণ্ডল সামান্য/বিশেষ ধারণার ওপর দাঁড়ানো, তাকেই প্রচলিত ভাবে লালন নাকচ করছেন। কারণ এই ধারণার কারণেই আমরা কেবল এক নিরাকার ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে পৌঁছাই। লালন বলছেন, এই অপরের বাস হচ্ছে ‘অচিন’ দেশে। ‘অচিন দেশ’ মানে অচেনা দেশ নয়। বরং এর মানে যা অচিহ্নিত, বা যাকে কোন চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা সম্ভব নয়। যদি তাই হয় তাহলে এই ‘অপর’-কে কোনদিন দেখা বা দেখানো সম্ভব নয়। লালন নিরাকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন না। যে ব্রহ্ম একা একা ও নিঃসঙ্গ। যার কোনো দোসর নাই। যদি তার কোনো দোসর না থাকে তাহলে তাকে প্রকাশ করবে কে? তাহলে দেখা যাচ্ছে ফকির লালন শাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধিবিদ্যাকে এখানে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন।

এরপর বলছেন যদি ‘পরম ইষ্ট’ বা পরম কোনো ‘ইষ্ট’ হিসেবে এই সামান্যকে ধারণা করা হয় তাহলেও হবে না। এখানে তার সঙ্গে প্রচলিত নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রের ধারণার পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। জার্মান দার্শনিক ইন্সমেনুয়েল কান্টের নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত ধ্যানধারণা এই পরম ইষ্টের ধারণাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। পরম ইষ্টের এই ধারণার বিপরীতে লালনের অবস্থানের তাৎপর্য বহুদূর বিস্তৃত। অন্যদিকে ধর্মশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা কিম্বা বিজ্ঞান এই ‘সামান্য’কে একটা আদি কারণ বা আদ্যাবস্থার ‘বরাত’ হিসেবে গণ্য করে। স্টিফেন হকিংস যখন তাঁর Brief History of Time-এ দুনিয়া সৃষ্টির এক আদি ‘বরাত’-এর ধারণা করেন সেটাও এক ‘সামান্য’। লালন বলছেন এই সকল ‘বরাত’-এর ছুতো দিয়ে সকল শাস্ত্রে লেখাজোখা চলছে। তার কাছে সেটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব, দর্শন কিম্বা বিজ্ঞান ‘সামান্য’ ধারণার মধ্য দিয়ে যে অধিবিদ্যাকে হাজির করছে তিনি তাকে মানছেন না। এই সকল লেখাজোখার কোনো মূল্য তার কাছে নেই।

শেষে তিনি ‘সামান্য’কে যেভাবে বুঝেছেন তার একটা তুলনা দেবার চেষ্টা করছেন। বলছেন, কেউ যদি কিঞ্চিৎ ধ্যান করে তাহলে তাকে মহাদেব গণ্য করা হয়। ধ্যানী মহাদেবকেই তো আমরা বিশাল মনে করি। তাহলে যদি এই কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব পাওয়া যায় তাহলে যে সামান্যে তার দেখা পাওয়া যাবে তার জন্য আরো গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া চাই। কিন্তু এই মানুষ শুধু ধ্যানী মানুষ নয়, একই সঙ্গে

করণিক। অর্থাৎ কর্মসম্পন্ন মানুষ। তাকে কিছু সুচিন্তিত কাজকর্মের মধ্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। সাধুরা যাকে দেহসাধন বা করণ বলে থাকেন। সব মিলিয়ে মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে সাধনা সেদিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন। সেই পথেই ‘সামান্য’ নিজের স্বরূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। সকলকে, আরো সহজ করে বোঝাবার জন্য বলা হচ্ছে এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার মূর্ত উপস্থিতি চিনবার জন্য সামান্যকে ‘গুরু’ হিসেবে বুঝে নিলেই মনের ঝোঁকা কাটবে। কারণ যিনি প্রজ্ঞাবান নন, তিনি তো আর গুরু হতে পারেন না। লক্ষ্য করার বিষয়, লালনের গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এখানে বাউল, ফকির বা সহজিয়াদের প্রচলিত গুরুত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলার ভাবুকতার ইতিহাসের দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। যা আরো ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অন্যদিকে এটাও বোঝা দরকার যে দেহচর্চা সংক্রান্ত তান্ত্রিক ও লালনীয় ধারা এমন একটা কালপর্বে বিকশিত হচ্ছে যখন উৎপাদন তার নিজস্ব রূপ নিয়ে বাংলার ইতিহাসে হাজির হয় নি। কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বিকশিত হয়ে ওঠার ফলে ফরাসি অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন ফিজিওক্রাটিক ধারা উৎপাদনকে কৃষি পণ্যের বিচলনের প্রক্রিয়া হিসেবে আলাদা করে চিনতে পারছে। উৎপাদন যদি একটা সার্বজনীন চরিত্র পরিগ্রহণ না করে তাহলে ‘উৎপাদন’ শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। উৎপাদন সংক্রান্ত ধ্যানধারণার বিকাশও হয় না। হতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনৈতিহাসিক।

কিন্তু যেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হলো বাংলার সাধকরা পুনরুৎপাদনকে বা প্রজ্ঞাতি হিসেবে মানুষের উৎপাদনকে ‘উৎপাদন’-এর ক্ষেত্র আকারে চিহ্নিত করেছেন। এবং এই নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃতি নিজেকে কী করে বৈষয়িকভাবে উৎপাদন করে তার গভীর ও বিচিত্র দিকগুলো কখনো সরাসরি, কখনো ইশারায়, কখনো সাঙ্খ্যভাষায় আলোচনা করেছেন। বাংলার দেহচর্চার ধারার মধ্যে ঐতিহাসিক মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন সংক্রান্ত ধ্যানধারণাগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক পর্বগুলো অনায়াসেই শনাক্ত করা যায়।

তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তান্ত্রিক সাধক, বাউল ও লালনপন্থীদের এই করণের দিকটা, বা দেহচর্চার বিজ্ঞানটা ধরতে পারে না বলে একে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। এটাও সমান সত্য যে সাধু বা বাউল নামে যা আমরা সাধারণত দেখে থাকি তাদের মধ্যে বিকৃতির প্রাবল্য আছে। কিন্তু মূল ধারাটিকে জানা ও বোঝার কাজটা তো করতেই হবে।

লালন বিশ্বাস করতেন না ‘করণ’ ছাড়া জ্ঞান সম্ভব। প্রকৃতির বাইরে প্রক্রিয়ার বাইরে, মানুষ যে প্রক্রিয়ার মূহূর্ত —কোনো জ্ঞান নেই, থাকতে পারে না। লালন সকল অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করবার জন্যই করণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিকতা নাই। কিন্তু উৎপাদন পরিমণ্ডল একটি সমাজে গড়ে ওঠার আগে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া সমাজ কী করে বিচার করে তার

দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ না করলে লালনকে বোঝা অসম্ভব। তাঁর সামান্য বা গুরু হচ্ছেন তিনিই যিনি আচার-আচরণে, নিজের যৌনসংস্কৃতি এবং তার সঙ্গীর সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্মাণের চর্চার মধ্য দিয়ে এমন কিছু বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করেছেন যা বা সেই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া অর্জন কখনোই সম্ভব নয়।

শব্দ চাই না সত্য চাই? আজ বলি, সত্য চাই। কিন্তু সত্য কোনো আমলকি নয়। সেটা তো প্রক্রিয়া মাত্র। ইতিহাস। কিন্তু এটাও আংশিক সত্য।

ভাবচর্চা ও লালন : কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় ও পদ্ধতিগত প্রসঙ্গ

ভাবের বিচার করতে গিয়ে নানান পদ্ধতিগত জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। বিশেষত বাংলার ভাব নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে তা লিখিত কোন গদ্যে আমরা পাই না। তার পয়দা শ্রুতি ও কণ্ঠে, অনুষ্ঠান ও সংস্কারে এবং নানা ভাবগত সম্পর্ক রচনায়। এখানে আমি ফকির লালন শাহ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করবো। প্রতিটি বিষয় নিয়েই আলাদা করে লেখা দরকার। কিন্তু সেই সুযোগ এখানে নেবো না। কিছু বিষয় সহজ ভাবে ও সংক্ষেপে তুলে ধরাই এখানে ইচ্ছা। নানান কারণে এটাই এখন জরুরী।

ভাবচর্চা ও সাধুগিরির প্রকারভেদ

‘ভাব দিয়ে ভাব নিলে পরে তবেই রাঙা চরণ পায়’

লালন সাধুগিরি ফলানোর ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য কোন সাধকই তা চাইতে পারেন না। সাধক বা সাধনা ফকির লালন শাহের কাছে একান্তই জ্ঞানচর্চা বা ভাবের বিকাশের জন্য শিষ্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু ‘ঘরের কাজ’ এবং চলাফেরা খাওয়াদাওয়ায় কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা বেঁধে দেওয়া। কিন্তু জ্ঞান নাই, জ্ঞানের পিপাসা নাই, এমনকি জ্ঞান দূরের কথা কাণ্ডজ্ঞানও হোল না—লালন এই ধরনের কোন সাধনা যে করেন নি সেটা তাঁর গান শুনলেই আমরা বুঝতে পারি। মানুষ, পশুপাখি কীটপতঙ্গ বা সৃষ্টি জগতের সেবা হল না বা অন্যকথায় ‘প্রকৃতির দাসত্ব’ করার খবর নাই কিন্তু ডুগডুগি বাজিয়ে উদাস হয়ে বাউল সাজা লালনের ঘরের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। যে কারণে প্রথমেই যে দিকটি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে সেটা হোল, লালন সন্যাসী, উদাসী বা তথাকথিত ‘বাউল’ ছিলেন না। অথচ এই অর্থেই মধ্যবিস্তৃতির ‘বাউল’ কথাটা বোঝে। এই দিক থেকে ফকির লালন শাহকে ‘বাউল

সম্রাট' আখ্যা দেওয়া বাউল বা উদাসীদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু ঠিক না। বাউলগিরি ও লালনের ভাবচর্চা পরস্পরের বিপরীত। তারা চরিত্রের দিক যে সম্পূর্ণ আলাদা সেই বিষয়ে সতর্ক হবার সময় হয়েছে। অথচ তাঁকে 'বাউল সম্রাট' আখ্যা দিয়ে সারাজীবন তিনি যে সকল আচার, অভ্যাস বা সংস্কার মানুষের ভাব, জ্ঞানচর্চা কিম্বা নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিকাশের পরিপন্থি বলে শিষ্যদের পরিহার করতে বলেছেন সেই সকল 'কদাচার'-ই তাঁর নামে আবার জোরে শোরে প্রত্যাবর্তন করেছে।

'কদাচার' কথাটা লালন নিজে ব্যবহার করেছেন, যদিও পাপ ও পুণ্যের ভেদ বিচার যে সহজ নয় সেই দিকেও তাঁর নজর ছিল কড়া। কদাচার কথাটা নৈতিক মূল্যায়ন নয়। জীবের স্বভাব অতিক্রম করে পরমের স্বভাব অর্জনের জন্য যে সাধনা বা পিপাসা সেই আলোকে যে-সকল কর্মকাণ্ড মানুষকে জীবের স্তরের বৈধে রাখে সজ্ঞানে সেই কাজগুলো করা কদাচার বটে। সেই সকল আচার আচরণ সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে পরিহার করার মধ্য দিয়ে—অর্থাৎ জীবনাচরণে জীবরূপেই পরমকে আত্মদানের তাগিদে জীব-স্বভাব শাসনের জন্য কিছু 'কাজ' তিনি লালন অনুসারীদের নির্দেশ করেছেন। এই 'শাসন' সন্যাসীমূলক কচ্ছসাধনা নয়। বরং জীবাবস্থার মধ্যেই যে পরমের 'বারাম' বা আবাস সেই অবস্থাকে পরমাবস্থার দিকে নেবার চর্চার প্রস্তুত ছিল তাঁরা। ধর্মের বিধান আকারে নয়, যে কোন সজ্ঞান ও সচেতন মানুষ নিজের জীবনাচারের মধ্যেই সেই কাজ অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারেন। এই জীবনাচার নিজেকে একই সঙ্গে নিজের কাছে আর সমাজে ভাল, সুন্দর ও মধুর রাখবার আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ওর জন্য 'বাউল' হবার বা কোন গুরুর কাছে চালপানি নিয়ে শিষ্য হবার বাধ্যবাধকতাও লালনের ধারায় নাই। তবে গুরুবাদী ধারা হবার কারণে গুরুশিষ্যপরম্পরায় পুরুষ-প্রকৃতি বিচার বা নারী-পুরুষ সম্পর্ককে আরো গভীর, অটল ও প্রেমময় করবার চর্চার একটা প্রয়োজনীয়তা লালনের ঘরের মানুষেরা স্বীকার করেন। সে তাগিদ অবশ্যই আছে। সেই চর্চা জীব-স্বভাব থেকে পরমের আত্মদানের দিকে যাবার চর্চা—'কাম' থেকে 'প্রেমে' উত্তরণের পথ। এই পথ যে শুধু গুহ্য সাধন প্রণালী দ্বারাই অর্জন হয় বা হতে পারে তার কোন গ্যারান্টি লালন কোথাও দিয়েছেন বলে আমার চোখে পড়ে নি। আমরা যাকে ভালবাসি সেই ভালবাসার মধ্যে কাম এবং প্রেম উভয়ই 'মাখাজোখা' হয়ে থাকে। প্রকৃতি রূপে জীবাত্মার অর্থ শারিরীক কামনা চরিতার্থ করা। এই তাগিদ জীব মাত্রেরই আছে। একে বাস্তব মনে নিয়ে শারিরীক কামনাকে এক সময় অপর শরীরের জন্য কামনার স্তরে না রেখে কীভাবে পরমের প্রেম-বাঞ্ছায় বা পরমকে আত্মদানের আকাঙ্ক্ষায় রূপ দেওয়া যেত পারে—বাংলার যুগল সাধনা বা ভাবচর্চার এই নিরিখ বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ ধারাটি ফকির লালন শাহের মধ্যেও আমরা পাই। কাজের দিক থেকে তাঁর আগের সাধকদের তুলনায় এই ক্ষেত্রে নতুন কিছু তিনি বলেন নি, কিন্তু এই কাম ও প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা বা চর্চার ভাবগত দিক তাঁর কাছে যতো পরিচ্ছন্ন অন্যদের কাছে অতো স্পষ্ট ভাবে আমরা পাই

না। ভাব যেন অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কেবলই দেহে গিয়ে ঠেকে যায়। কারো কারো কাছে ইঙ্গিত পেলেও তা শেষাবধি দেহবাদিতার চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারেন নি বলেই আশংকা হয়। ‘ভাব দিয়ে ভাব দিলে পরে তবেই রাঙা চরণ পায়’—এই কথা লালনের কাছে আমরা নতুন ভাবে শিখি। অর্থাৎ দেহচর্চার নিজস্ব কোন মূল্য বা আলাদা কোন মূল্য ফকির লালন শাহ মানেন নি। তার বহু গানে বরং অস্বীকারই করেছেন। তাঁর কাছে দেহ, কাম, যুগল সাধনা ইত্যাদি ভাবচর্চারই রূপ। নিছকই দেহচর্চা নয়।

প্রকৃতি রূপে পরমের বাঙ্খা—অর্থাৎ নারী—পুরুষ রূপে যে-প্রাকৃতিক সম্পর্কের দিকে আমরা স্বভাবের বশে আকৃষ্ট হই সেই আকর্ষণের মধ্যে থেকেই জীবের স্বভাবকে পরমের স্বভাবে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা বাংলার ভাবচর্চা বিচারের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতিগত প্রশ্ন তৈরি করে। প্রাকৃতিক ইতিহাসকে মানুষের ইতিহাসে রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা ও সংকল্প বিপ্লবী রাজনীতির তাগিদ তৈরি করে। প্রাকৃতিক সম্পর্কে পরমের সম্পর্কে রূপান্তর ঘটাবার যে ধারা আমরা বাংলার ভাবুকতার মধ্যে দেখি তার সঙ্গে বিপ্লবী ইচ্ছা ও সংকল্পের মর্মগত মিল টের পাওয়া যায়: ইহলৌকিক সম্পর্ক বা ইতিহাসের মধ্যেই পরমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বা ইতিহাস আবাহন। এই দিক নিয়ে একদমই কাজ হয় নি। কিন্তু ফকির লালন শাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণের প্রধান কারণটা ঠিক এই খানেই। বাউলদের নিয়ে নৃতাত্ত্বিক বা সামাজিক গবেষণা, কিম্বা বাউল চিন্তার মর্মভেদ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে বৈপ্লবিক প্রেমে লালনের আসক্তি তার সঙ্গে এ কালের আকাঙ্ক্ষার যোগ ঘটানোই ভাবচর্চার প্রধান পদ্ধতিগত প্রশ্ন। এই আকাঙ্ক্ষার ধারাবাহিকতা এবং ছেদ বিচারই আমাদের লক্ষ্য। আসলে কাব্য, দর্শন বা ভাব মাত্রই পরমের বাঙ্খা করে, কিন্তু শরীর, জীব-স্বভাব বা প্রাকৃতিকতার সঙ্গে পরমের সম্পর্ক রচনার জায়গাটা ঠিক কোথায়, কীভাবে তার চর্চা করতে হবে সেই নির্দেশ বা নির্দেশের ইঙ্গিত আমরা লালনে পাই। যদি ব্যক্তি শরীর বা দেহ না ভেবে এই শরীর বা দেহকে আমরা সমাজদেহ বা সমাজ শরীর ভাবি? তাহলে বাংলার ভাবচর্চা কি আমাদের নতুন ভাবে সমাজ ও ইতিহাস বিচারের কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারে? প্রাকৃতিকতার চর্চা যদি একই সঙ্গে ভাবের চর্চা হয় এবং প্রকৃতি ও ভাবের মধ্যে—কিম্বা বস্তু ও চেতনার মধ্যে যদি কোন ভেদ না থাকে—তাহলে ভাবচর্চা একই সঙ্গে প্রকৃতি চর্চাও বটে। বাংলার ভাবচর্চা বা ভাবুকতা দেহবাদী ছিল কথাটা সত্যি। কিন্তু দেহকেন্দ্রিক বা দেহসর্বস্ব ছিল না। এই অর্থে দেহকে ভাব থেকে বা ভাবকে দেহ থেকে আলাদা ভাবা হয় নি: দেহের বাইরে কোন ভাব নাই বা ভাবের বাইরে কোন দেহ নাই। যদি এই দিকটা বুঝি তাহলে দেহই বাংলার সাধনার ধারার লক্ষ্যবস্তু—কাজে কাজেই নানান গুহ্য সাধন পদ্ধতিই বাংলার ভাবুকতার মূল কথা—এই কথার কোন অর্থ হয় না। এই অবস্থানে আমাদের সায় নাই। বাংলার ভাবুকতা ও তার চর্চার ধারা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগত বিচ্যুতি বা বিকৃতি সম্পর্কে সতর্ক হবার সময় এসেছে। সেই কারণে লালনকে ভাবচর্চার গুরু হিশাবে প্রতিষ্ঠা জরুরী। ‘বাউল সম্রাট’

আখ্যা দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে পুলক বোধ করে এবং মহা রহস্যময় আর অতিশয় গুহ্য কিছু ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছে ভেবে তাদের ফিস ফাস গুজ গাজ অনেক আবর্জনা দ্রুত করে। সাফ করা দরকার।

দোল ও কার্তিক

দোলপূর্ণিমা দিনটি ফকির লালন শাহের ভারী পছন্দের দিন। জীবদ্দশায় এই দিনটিতেই ভরা পূর্ণিমায় তিনি ‘সাধুসঙ্গ’ করতেন। তাঁর ভক্ত, অনুরাগী ও অনুসারীরা তাঁর তিরোধানের পরেও এই দিনটিতেই সকলে একত্রিত হতেন। এই কারণে ছেঁউড়িয়ায় মতিজান-লালন ও তাঁদের ভক্তবৃন্দের যে স্মৃতিধাম রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে সাধুরা দোলে এখনও একত্রিত হন। এই সঙ্গটি ফকির লালন শাহেরই প্রবর্তন করা দোল উৎসব হিসাবে পরিচিত। ঝাঁরা লালনের ‘ঘরের মানুষ’ – তাঁদের কাছে এই দিনটি সেই কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দোলে লালনের ঘরের সাধুদের সকলে মিলে সাধুসঙ্গে মিলিত হওয়া ধীরে ধীরে একটা বিধান আকারে গড়ে উঠেছে। এক হিসাবে বছর শেষে দোলের সাধুসঙ্গ সাধুদের পরস্পরের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার। বছরব্যাপী তাঁরা কী করলেন, কী জানলেন, কী তাঁদের অর্জন ইত্যাদি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা।

দোল উৎসবের সঙ্গে পহেলা কার্তিকের অনুষ্ঠান একদমই ভিন্ন। লালনের তিরোধানের তারিখ ছিল পহেলা কার্তিক। ফলে অনেকটা মৃত্যুদিবস পালন করবার জন্যই দিনটি পালন করা শুরু হয়। ছেঁউড়িয়ায় এই দুটো দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। দোলপূর্ণিমা লালনের ঘরের সার্বজনীন উৎসব বা মেলা। সকলেই এই মেলায় আমন্ত্রিত। এই মেলার কোলাহলের মধ্যে লালনের ঘরের সাধুরা নিরবে নিভৃত পরস্পরের সঙ্গে ‘বেচাকেনা’ করেন। মিলিত হন। অর্থাৎ গত এক বছরে কার কি অভিজ্ঞতা, কার কি জ্ঞান অর্জন হয়েছে ইত্যাদি নানান জ্ঞানগত বিষয় দেওয়া নেওয়া চলে। একই সঙ্গে প্রচুর গান তো চলেই। তবে গান গাইবার কিছু নিয়ম বা শৃঙ্খলা মেনে। নিয়ম বা শৃঙ্খলা না মেনে গান গাইলে লালনের ঘরের ভাবচর্চার রূপটি সহজে ধরা পড়ে না। এই জন্যই শৃঙ্খলা। তার মানে লালনের ভাব বুঝতে হলে গানের কথা বা সুর জানা যথেষ্ট নয়। কখন কীভাবে গানটি গাওয়া হচ্ছে এবং তার পরিবেশনার বিচারও জরুরী।

লালনের ঘরের সাধুদের জন্য দোল-উৎসব অতএব বাৎসরিক জ্ঞানচর্চার দিন। সকলে মিলে গান, আনন্দ, উৎসব তো আছেই। লালন ভক্ত, অনুরাগী বা কৌতুহলীরা লালনের ঘরের তত্ত্বকথা বুঝবার জন্যই এই দিনে একত্রিত হন। লালন তত্ত্বচর্চার জন্যই এই দিনটির প্রবর্তন করেছিলেন যাতে নিরক্ষর মানুষও ভাব ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশের অধিকার পায় ও জ্ঞানচর্চার শক্তি অর্জন করে। সাঁইজীর সাধুসঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্য দোলে ছেঁউড়িয়ায় ‘সাধুসঙ্গ’ পালন বিধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু পহেলা

কার্তিকের অনুষ্ঠান ‘উৎসব’ নয়। এটা বিরহের, হারাবার, বিচ্ছেদের দিন। এই দিনে সাধারণত দৈন্য গান গাওয়াই বিধান। এই পার্থক্যগুলো মনে না রাখবার কারণে ভাবুকতার পরিবেশের পরিবর্তে ছেঁউড়িয়া ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হয়েছে।

এখন যারা দোলে-কার্তিকে ছেঁউড়িয়ায় যান তাঁরা আগের সেই ভাবুকতার পরিবেশ দেখতে পান না। ইতিহাস জানেন না বলে এই দুটো দিনের ভাবানুষ্ঙ্গ অনুধাবনও তাঁদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। সাধুদের পরিবর্তে স্থানীয় রাজনীতির টাউট, লালন একাডেমির অক্ষমতা ও অজ্ঞতার একচেটিয়া প্রতাপ এবং তার সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে ছেঁউড়িয়ায় দোলপূর্ণিমার আনন্দ ও গম্ভীর মাধুর্যের স্বাদ যেমন কমে গিয়েছে। তেমনি কার্তিকে সাঁইজীর তিরোধানের যে হাহাকার সেই উপলব্ধিও কমে গিয়েছে। পুরো পরিবেশ এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেন ভাব সাধনা বা ভাব চর্চার পরিবেশ বিম্বিত হয়। কাজে কাজেই সাধুরাও বিতাড়িত হয়। গত দুই দশক ধরে তাই হয়েছে।

লালনের জীবদ্দশায় খুব বড়ো কোন সঙ্গ হয়েছে বলে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নাই। তবে এখন কৌতুহলী মানুষের আগাগোনা বেড়েছে। এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্যও বেড়েছে। এগুলো খারাপ নয়, যদিও টাউট-বাটপারদের উৎপাতও বেড়েছে। আমার ধারণা যদি আমরা বাংলার ভাবচর্চার তাৎপর্য নীতিনির্ধারণক মহল এবং লালন অনুরাগীদের যদি বোঝাতে সক্ষম হই তাহলে ছেঁউড়িয়ায় খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ে তোলা মোটেও কঠিন কোন কাজ হবে না।

লালন সম্পর্কে গল্প ছড়িয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই, কারণ তাঁর গান ও জ্ঞান উভয়েরই জনপ্রিয়তা ছিল প্রবল। তিনি যে নতুন কিছু বলছেন গানের কাব্যগুণের কারণে সাধারণ শ্রোতার খানিক আন্দাজ করে ফেলতে পারত। কিন্তু তাঁর তত্ত্বকথার তাৎপর্য ধরবার জন্য যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে সমাজের প্রস্তুতির দরকার ছিল তার ঘাটতি তাঁর সময়ে যেমন ছিল, এই কালে সেই ঘাটতি আরো প্রবল। অনেকের ধারণা বা দাবি যে তাঁর জীবদ্দশায় অনেক ভক্ত ছিল। এই কথা সত্য নয়। ঠিক যে আশেপাশের বহু মানুষই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ফকিরফ্যাকড়ারা সমাজে কখনই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এখনও নয়। তাছাড়া জীবদ্দশায় নানা কলংক ছড়িয়ে ছেঁউড়িয়ায় ফকির লালন শাহের জীবন অনেকে অতীষ্ঠ করে তুলেছিল সেই ইতিহাসও আছে। কিন্তু তিনি তবুও ছেঁউড়িয়া ছেড়ে যান নি। ছেঁউড়িয়া এই জন্যই তাঁর কারণে ধন্য হয়ে আছে।

তাঁর তিরোধানের পর তাঁর নাম যতোই ছড়ালো ততোই দোল পূর্ণিমার দিনটিতে লোকসমাগমও বাড়লো। ক্রমে ক্রমে দিনটি একটি মেলার রূপ নেয়। ইতোমধ্যে লালনের স্মৃতিক্ষেত্রের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোল লালন একাডেমি এবং সাধকদের স্থান দখল করে নিল রাষ্ট্র। লালনের মাজার ও লালন একাডেমির মূল নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত হলেন একজন আমলা। ক্রমে ক্রমে সাধুরা বিতাড়িত হলেন মাজার থেকে। সেখানে

এখন বিল্ডিং উঠেছে। আধুনিক কায়দায় অনুষ্ঠান হল, মঞ্চ, আবাসিক হোটেল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। সাধকরা এই দিনটিতে একত্রিত হয়ে লালনের বিধিবিধান মোতাবেক 'সঙ্গ' করতেন। সেই বিধিবিধান দূরে থাকুক, নিজেদের ইচ্ছিত নিয়ে সাধুগুরুরা এই দিনটিতে তাদের পরম গুরুর প্রবর্তিত সঙ্গ শেষ করতে পারলে বাঁচেন।

লালনের ভাব কোন ধর্ম নয়। এই দিক থেকে ধর্মপথ হিশাবে লালনপন্থা নামে কোন 'পথ', 'পন্থা' বা ধর্মের অস্তিত্ব দাবি করা লালনের ভাবের সঙ্গে স্বেবিরোধী। কিন্তু ভাবচর্চার অনুযায়ী হিশাবে কিছু বিধিবিধান, অনুষ্ঠান আছে। বিশেষত সাধুসঙ্গ, সেবার বিধান, ভক্তিবিধান ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য ভাবচর্চার পরিবশ তৈরি করা এবং ভাবুকে ভাবুকে সম্পর্ক গড়া ও তা বিকশিত করে তোলা। যেহেতু লালন পন্থা কোন ধর্ম নয় সেই জন্য যারা ভাবচর্চার এইসকল অনুষ্ঠানাদি ও বিধানগুলো মেনে চলেন তাঁদেরকেই আমরা লালনের ঘরের মানুষ বলছি। সেই দিক থেকে লালনের 'ঘর' নামে একটা কথার চল আছে। এই ঘরের মানুষেরা লালনের নির্দেশিত কিছু নিয়মনীতি, করণকর্তব্য বা বিধিবিধান মানেন। কিন্তু লালনের 'ঘর' বললে লালন নিজের ঘর ছাড়া আরো যে চারটি 'ঘর'কে বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁরাও অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, পাঞ্জু শাহ চৌধুরি, সতী মা, দেলদার শাহ। লালনের ভাবকে এই চারটি ঘরের ভাবের আলোকে বুঝবার একটা ইঙ্গিত আছে এখানে।

মাজার বনাম স্মৃতিধাম

হেঁউড়িয়ার মতিজান-লালন ও তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের যে স্মৃতিধাম আছে তাকে আমরা এখন 'মাজার' বলি। এর আগে একে 'সমাধি' বলা হতো। বলাবাহুল্য দুটো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক তাদের সাম্প্রদায়িক কারণেই এই ভাবে নামকরণ করেছে। এলাকায় দেশ ভাগের আগে হিন্দু প্রভাবের কারণে একে 'সমাধি' বলা হত, অন্যদিকে পাকিস্তান আমল থেকে একে 'মাজার' বলার চল বাড়ে এবং ক্রমে ক্রমে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যেহেতু পীর-দরবেশদের সমাধিক্ষেত্রকে 'মাজার' নামে চেনে, অতএব এই নামে কোন দোষ দেখতে পায় না। কিন্তু জানা দরকার যে ফকির লালন শাহ ঘোরতর ভাবে 'মাজার' বিরোধী মানুষ। তিনি মানুষ 'ভজনা' করতেন, কোন মৃত জিনিস তিনি পূজা করতেন না। 'ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার / সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার'—তাঁরই কথা। ভাব, জ্ঞান বা শক্তি জীবন্ত মানুষেরই স্বভাব, মৃত মানুষ বা কবরের তলার মানুষের কোন ঐশ্বরিক বা দৈবিক কোন ক্ষমতাই নাই। এই দিকটা যদি আমরা বুঝি তাহলে লালনের মাজার 'জিয়ারত' করা, কবরে কপাল ঠেকানো, কবর সেজদা লালনের শিক্ষা ও ভাবের সঙ্গে মেলে না। তবে লালন ভক্তদের ভক্তি আর সেজদা সমার্থক নয়। কিন্তু ভক্তির সম্পর্ক সবসময়ই মানুষে মানুষে হয়, কবরের পাথরের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক হয় না। লালন ভক্ত ও অনুরাগীরা এই দিকে সতর্ক থাকলে ভাল হয়।

তার মানে লালন যেখানে শুয়ে আছেন লালনের ঘরের মানুষের কাছে কি তার কোন মূল্য নাই? অবশ্যই আছে। তাঁদের কাছে এটা স্মৃতিক্ষেত্র। এটা শুধু লালনের স্মৃতিক্ষেত্র নয়, এটা মতিজ্ঞান ও তাঁর আরো অনেক ভক্তদের স্মৃতিক্ষেত্র। কিন্তু এই স্মৃতি তো শুধু কবরের নয়, এই স্মৃতি তিনি যে গাছ লাগিয়ে গিয়েছিলেন, যে ভাবে তাঁর আখড়াকে সাজিয়ে রেখেছিলেন সেই সবই তাঁর স্মৃতির অংশ। কিন্তু আমরা দেখছি লালনের নিজের হাতে লাগানো আম গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, তাঁর সময়ে তাঁর বা তাঁর ভক্তদের হাতে লাগানো আখড়ার কোন গাছপালাই এখন আর নাই। মনে রাখা দরকার লালন ১১৬ বছর বেঁচে ছিলেন এবং তিনি গাছগাছড়া সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞও ছিলেন। গাছপালা বা প্রকৃতির সঙ্গে লালনের ঘরের মানুষদের সম্পর্ক সেই কারণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো। অবিচ্ছেদ্য। এখন সেখানে লাগানো বিদেশি গাছ লালনের ভাবের সঙ্গে যেমন অসঙ্গতিপূর্ণ তেমনি তাঁকেই যেন অপমান করবার জন্য লাগানো হয়েছে। লালনের কবর আছে। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচিহ্নগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে – এটা যে সম্ভব হয়েছে তার দ্বারা লালন ভক্তির দৌড় কতোটুকু তার একটা মূল্যায়ন আমরা করতে পারি।

লালনের ঘরের মানুষদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে। ফকির লালন শাহের লাগানো বা তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের লাগানো কোন গাছ যদি কেউ নষ্ট করে তাহলে তাঁদের ক্ষমতা খর্ব হয়। আসলে গাছপালা রক্ষার জন্যই এই সংস্কার। কিন্তু ভাবচর্চার দিক থেকে এর অর্থ আরো গভীর। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় গাছপালা কেটে লালনের স্মৃতিক্ষেত্রে বিল্ডিং বানিয়েছেন আর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় লালনের স্মৃতিক্ষেত্র পরিদর্শন করতে যখন গিয়েছিলেন তখন অনেক গাছপালা কেটে ফেলা হয়। শেখ হাসিনা যে বছর বিল্ডিং বানিয়েছিলেন তার পর তিনি ক্ষমতাহারা হয়েছেন আর ক্ষমতায় ফিরতে পারেন নি। এই লেখা যখন লিখছি তখন শেখ হাসিনা কারাগারে। খালেদা জিয়ার অবস্থা তো আমরা এখন দেখছি। ক্ষমতা থেকে তাঁর পতন ঘটেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। তিনি এবং তাঁর দুই সন্তান এখন কারাগারে। বাংলাদেশ এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। লালনের ভক্তদের মতে এই দুই শক্তিদ্বারা মানুষ সাইজীকে অপমান করেছেন বলে তাঁদের এই দুর্দশা হয়েছে।

এই সংস্কার আমাদের মানবার আমাদের দরকার নাই। কিন্তু এই সংস্কার থেকে শিখতে যেন আমরা ভুল না করি। মূল কথা হচ্ছে ক্ষমতা বা দর্প যদি ভাব ও জ্ঞানের উদ্যানে প্রবেশের সময় মাথা নত করে প্রবেশ ও মাথা হেঁট করে হাঁটতে না শিখে তখন সেই ক্ষমতা এবং দর্প ভাবুকতার কাছে চূর্ণ হয়। ভাবুকতার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বিচারও তাহলে একটা পদ্ধতিগত প্রশ্ন আকারে আমরা তুলতে পারি। এই বিচার সাধকদেরই একটা কর্তব্য হয়ে ওঠে। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাই মানবেতিহাসকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়—নিছকই ক্ষমতার বাহাদুরি, অহংকার বা দর্প নয়।

স্থাপত্যের দিক থেকে এখন যেভাবে লালনের কবর ‘পীর’দের কবরের মতো গম্বুজ দিয়ে বানানো হয়েছে তার পেছনে আছে নিজামুদ্দিন আউলিয়া বা অন্যান্য

পীরদের মাজারের আদল। এই স্থাপত্য পীরমুর্শিদদের জন্য সুন্দর, আরব বা উত্তর ভারতের সংস্কৃতির জন্য মানানসই। কিন্তু লালন বাংলার। লালনের ভাবের সঙ্গে এই স্থাপত্য সম্পূর্ণ অসঙ্গত। চৌচালাই লালনের স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই মাজার-স্থাপত্যের কারণে স্মৃতিক্ষেত্রও ক্রমশ ‘মাজার’ হয়ে উঠেছে এবং একজন মাজার বিরোধী জ্ঞানীপুরুষ কেন মানুষ ভজন্যর কথা বলেছেন, কবর পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন—সেই শিক্ষা দেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে।

পানি

পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি। ‘পানি’ লালনের ভাবচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তাঁর জন্মও পানি থেকেই। তিনি কালীগঙ্গার সন্তান। এই সত্য ছাড়া তাঁর আর কোন ঠিকানা নাই। হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকেরা তাঁর জন্ম সম্বন্ধে নানান মিথ্যাকাহিনী ছড়িয়েছে এবং এখনও ছড়াচ্ছে। তাঁর নামে নির্মিত সাম্প্রতিক সিনেমা তার একটি প্রমাণ। যিনি ভাবগত ভাবেই চেয়েছেন তাঁর জন্মপরিচয় কেউ না জানুক, কেউই তাঁকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা কোন জাতে বা পাতে না ফেলুক। অতএব নিজের পরিচয় যিনি সজ্ঞানে এবং সচেতন ভাবে গোপন করে গিয়েছেন—সেই মানুষটির ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর মিথ্যা পরিচয়ের দাবি মহা অপরাধ। যে সকল সাম্প্রদায়িক মানুষ তাঁর পারিবারিক ও ধর্ম পরিচয় নিয়ে অতি আগ্রহী তারাই আমাদের সমাজে অ-সাম্প্রদায়িকতার ভেক পরে ঘুরে বেড়ায়। এদের একদল লালনকে হিন্দু বানায়, আরেকদল বানায় মুসলমান।

হেঁউড়িয়া এতোটুকুই জানে যে তিনি কালীগঙ্গায় ভেসে এসেছেন এবং তাঁকে মলম শাহ অজ্ঞান ও অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন। মতিজান ফকিরানী তাঁকে সেবাসুশ্রাষায় জীবন দান করেন। তিনি কখনই আর মলম শাহ আর মতিজান ফকিরানীকে ছেড়ে যান নি। হেঁউড়িয়া ছেড়ে না যাবার এটাই প্রধান কারণ। আর অপর কারণ কালীগঙ্গা। নদী। প্রবাহ। জল। কালীগঙ্গার তীরে মতিজান ফকিরানী আর মলম শাহের কুঁড়েঘরেই তিনি জগৎ ডেকে নিজের কাছে নিয়ে আসার সাধনা করেছেন। তাঁর কবরের পাশে আর কারুরই স্থান হয় নি। একমাত্র স্থান হয়েছে মতিজান ফকিরানীর। ফকির লালন শাহ ভাষায় বা শব্দে সবকথা বলতে চান নি। কিন্তু সাধক যিনি, যিনি তাঁর অনুরাগী, যিনি তাঁর মতোই ‘পূর্ণচন্দ্র’ ও ‘পূর্ণব্রহ্ম’, তাঁরা তাঁর ‘লীলা’-র অর্থ বুঝতে খুবই সক্ষম। লালনের উদয় কালীগঙ্গা থেকে এটাই চরম ও পরম সত্য। তাঁর কোন বংশ নাই, পরিবার নাই, জাত নাই। পরিচয় মাত্রই মানুষকে বিভক্ত করে—এই ধরনের পরিচয়ের রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে মানুষ তিনি। তাঁকে যখন আমরা ভক্তি তখন তাঁর এই অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। পানি থেকেই তাঁর জন্ম এর মধ্যে প্রতীকী অর্থ যেমন আছে, একই সঙ্গে তাঁর জাতপাতবিরোধি রাজনীতি এবং বংশ পরিচয়ের

সুতা ছিড়ে ফেলবার ভাবও রয়েছে। সাম্প্রাদিকতার বিরুদ্ধে প্রতীকী ভাবচর্চার মধ্য দিয়ে এতো বড়ো লড়াই আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নাই।

তাঁর জন্ম নদী থেকে, প্রবাহ থেকে, পানি থেকে। এর যেমন আক্ষরিক অর্থ আছে, এর ভাবার্থও ফকির লালন শাহের ভাবজগতে গভীর। আগুন নয়, মাটি নয়, জগৎসৃষ্টির কারণ-উপাদান হচ্ছে জল। পানি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি এই রকম কোন ‘কারণ’ বা ‘বরাত’ দিয়ে বাংলার ভাব সৃষ্টিকথার বয়ান করবে না। ফলে কারণ-উপাদান মানে পানি দিয়েই মানুষ তৈরি, তা নয়। আমাদের আরো ভেতরে যেতে হবে।

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়

মহাজন সেই দিনে উদয়

লালন বলে তাহার সময় দণ্ডেক রয় না।

যিনি জলে উদিত হন সেই উদয় বা আবির্ভাবের মুহূর্ত শরীরগত ভাবে, রসতাত্ত্বিক কল্পনায় এবং জ্ঞানচর্চায় নিস্পন্ন করাই ‘জন্ম’। অখণ্ডের বিখণ্ডীভবন। যিনি এক তাঁর অনেক হবার মুহূর্ত। এটাই মহাজনের বা সহজ মানুষের উদয়। তাহলে পানি, পানির প্রবাহ এবং সেই প্রবাহেই যে শক্তির উদয়, মহাজনের আবির্ভাব ইত্যাদি বাংলার ভাবান্দোলনের অতি প্রাথমিক বিষয়। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর প্রবাহ ও মোহনা সংক্রান্ত কল্পনা, চিন্তা ও জ্ঞান এই ভাবের অতি প্রাথমিক পাঠ। কিন্তু মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী যখনই এই সকল বিষয় নিয়ে গবেষণায় নেমেছে তখনই তাকে বিকৃত করেছে। তাদের নিজ শ্রেণীরই কামচিন্তা, যৌনবিকৃতি এবং নানাবিধ চর্চার ফ্যান্টাসি তারা বাউল ফকিরদের মধ্যে আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়েছে। বাউল ও ফকিরদের সম্পর্কে মধ্যবিস্তৃত শিক্ষিত শ্রেণীর যেসকল লেখা গবেষণা আমরা পড়ি এবং তাদের তৈরি সিনেমা দেখি তার সঙ্গে বাংলার ভাবজগতের কোন সঙ্গতি নাই। এইগুলো আমাদের পাঠ করতে হবে অনেকটা ফ্রয়েডিয় কায়দায়। নিজেদের অবচেতনে, অবদমিত মনে, যে সকল আকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সা শিক্ষিত মধ্যবিস্তৃত দাবিয়ে রাখে, সেই সকল কামচিন্তা ও লিপ্সাই তারা বাউল ফকিরদের ওপর আরোপ করে। এটা তাদের নিজ শ্রেণীরই বায়োগ্রাফি। নিজেদের চরিত্রটাই তারা লালনের নামে নাটকে, সিনেমায়, গল্পে আঁকে। বাউল ফকিরদের সম্পর্কে তারা যেসব গল্প কাহিনী ফাঁদে সেটা নিজেরা গোপনে যা করতে চায় তারই ফর্দ।

যাঁরা বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে জানতে চান, বুঝতে চান, গবেষণা করতে চান তাঁদের প্রথম পাঠ হচ্ছে এই সকল জঞ্জালের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া। তারপর বাংলার ভাবান্দোলনের অতি মৌলিক ভাব-প্রস্তাবনা গুলো বুঝতে শেখা। ফকির লালন শাহের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সত্যিকারের লালন অনুসারীর জীবন ফুল দিয়ে বিছানো নয়। এখনও। তাঁর বহু ভক্তের কথা শোনা যায়। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর ভক্তের

সংখ্যা বেশি ছিল না। তাঁর তিরোধানের পর মনিরুদ্দিন শাহ এবং ভোলাই শাহের ঝগড়া যদি আমরা দেখি তাহলে এটাও অনুমান করতে হয় যে তাঁর ভাব অনুধাবন এবং সেই ভাব চর্চা করবার যোগ্য ভক্তের অভাব ছিল। এখনও আমরা দেখি একই গুরুপাটের অন্তর্ভুক্ত ভক্তদের মধ্যে ঝগড়া, মনকষাকষি, একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের গিবত গাওয়া, ইত্যাদি।

সাধুসঙ্গ

‘সাধুসঙ্গ’ কথাটি সাধকদের খুবই পবিত্র জিনিস। ‘সাধু’ শব্দটি আমরা খুবই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করি বলে বাংলার ভাবান্দোলন যে-অর্থে কথাটি প্রয়োগ করে সেই অর্থ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। যিনি সাধক, তিনিই সাধু। এটাই কথাটির আক্ষরিক মানে। কিন্তু সাধনা তো নানারকম হতে পারে। লালনের ঘরের সাধনা, ঘরের কাজ বা করণকর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ‘সাধু’, ‘সাধুসঙ্গ’ কথাগুলোর আক্ষরিক অর্থ বাদ দিলে কে কার সঙ্গে সঙ্গ করছে, কোন ঘরের মানুষদের সঙ্গে কারা বসছে সেই বিচার থেকেই যায়। লালনপন্থীদের সাধুসঙ্গ আলাদা জিনিস। সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গ সেই অহংকার লালনপন্থীদের নাই। কিন্তু তাঁদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে তাঁরা চান।

অপর দিকে আচারের দিক থেকে বা সাধুগুরুদের পরিচিত বিধিবিধান মেনে যারা খিলকাধারী তাঁরাই সাধু নামে পরিচিত। খিলকা নেবার একটা অনুষ্ঠান আছে। খিলকা নেওয়া এবং বিশেষ ধরনের সাদা পোশাক পরবার অর্থ হচ্ছে জীবিত অবস্থাতেই মরে যাওয়া। আত্মিক অর্থে। মৃত্যুর ভয় অতিক্রম করা। যে জ্যাস্ত থাকতেই মরে তার তো আর মরবার ভয় নাই। এর একটা সাংস্কৃতিক অর্থ আছে। বাংলার ভাব জানে যে মৃত্যু মানে ইহলৌকিকতারও মৃত্যু—অতএব ইহলৌকিকতার আদলে আরেকটি ‘পরলোক’ তারা নির্মাণ করে না। কিন্তু ভাবগত ভাবে এক ‘অপর লোক’ কল্পনা করে যেখানে সে ‘নাইয়র’ যায়। কিন্তু মৃত্যু অতিশয় বাস্তব একটি ঘটনা। প্রত্যেককে একাই তার মৃত্যু ভোগ করতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে খিলকা পরা, খেলাফত নেওয়া ইত্যাদি মৃত্যুর জন্যই একধরনের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি। এর সঙ্গে প্রথাগত ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের কোন মিল নাই। পরকালে কোন পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে সাধু খিলকা নেয় না। সাধুর খিলকা মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবার জন্য। মৃত্যুভয় কাটিয়ে উঠে মৃত্যুর জন্য সানন্দ প্রস্তুতিই সাধুর কর্তব্য। সাধক জানেন জীবদেহ নশ্বর, কিন্তু কর্মই মানুষকে অমর করে। সেই দিক থেকে খেলাফত গ্রহণ বা খিলকা পরা মানে ইহলোকে সমাজের জন্য কাজ করা—সমাজের দাসত্ব মেনে সমাজের সেবাই সাধুর অমরতার পথ। ইহলৌকিকতাই এখানে মুখ্য। পারলৌকিকতা নয়।

এই ব্যাপারগুলো একটু জোর দিয়ে বলছি কারণ বাংলার জীবন্ত ভাব যদি আমরা এই কালের জন্য জীবন্ত করে তুলতে চাই তাহলে বিস্তর জঞ্জাল আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। সাধনা, সাধক, সিদ্ধি ইত্যাদি মোটেও কোন রহস্যজনক আধ্যাত্মিক

ব্যাপার নয়। সমাজে ইতিহাসে মানুষের নানান সংগ্রামের একটি ধারা আকারেই একে বুঝতে হবে এবং সেই ধারার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং এখনকার উপযোগিতা আমাদের বোঝার দরকার আছে। কিছুদিন আগে দেখেছি যে ঢাকায় আর্ট কলেজের সীমানার মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী সাধুসঙ্গের আয়োজন করেছেন। এই উৎসাহ ইতিবাচক সন্দেহ নাই। যারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁরা আমার খুবই স্নেহের পাত্র। কিন্তু সাধুসঙ্গ তো নিজে সাধক না হলে ডাকা যায় না। এটা হয়ে গেল অনেকটা এইরকম যে আমি নামাজ পড়ি না, নামাজ সম্পর্কে আমার ধারণাও নাই, কিন্তু ইমাম হয়ে মৌলানা মৌলবীদের আমার পেছনে নামাজ পড়তে, জমায়তে হতে ডাকা। আমরা যেন এই খেলো জায়গায় ‘সাধুসঙ্গ’-কে নিয়ে না যাই। গরিব ও নিরীহ বলে লালনপন্থী বা বাংলার ভাবুকদের আমরা যা খুশি তাই করতে পারি না।

ফলে যা হবার তাই হয়েছে। যারা সেই ডাকে গিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন গৈঁজেল। গাঁজা খেলেই লোকে খারাপ হয়ে যায় এটা ঠিক নয়। কিন্তু ফকির লালন শাহ ঘোরতর ভাবে সকল প্রকার নেশাদ্রব্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পাপপুণ্যের ভেদ করতেন না, ফলে তাঁর ‘দরবার’ সকলের জন্যই খোলা। সকলের জন্যই উন্মুক্ত। কিন্তু লালনের ঘরের সাধুসঙ্গে কোন প্রকার নেশা দ্রব্য— এমনকি বিড়িসিগারেটও নিষিদ্ধ। এই কথাগুলো পরিষ্কার করে এখানে বলছি এই কারণে যে শিক্ষিত মহলের অধিকাংশই এই তথ্য জানে না। ফলে সাধুসঙ্গে গাঁজা খাওয়া তাঁরা স্বাভাবিক মনে করেন। না। এটা অতিশয় অস্বাভাবিক। লালনের ভাবের ঘোরতর বিরোধী ধারা।

যেদিন ঢাকা শহরে এই ঘটনা ঘটল তারপর দিন সব বড়ো বড়ো পত্রিকায় ছবি ছাপা হোল বিশাল গাঁজার কল্লিতে দম দেওয়া হচ্ছে। চতুর্দিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সারা দেশের মানুষ এটা শিখল এবং বুঝল যে সাধু মানে গৈঁজেলগিরি। গাঁজা খাওয়াই সাধুগিরি। যেসকল মানুষ ফকির লালন শাহের গান অনুরাগে শোনেন তাঁরাও মনে এই ভেবে ব্যথা পেয়েছেন যে তাহলে ফকির লালনও গাঁজা খেতেন। তিনিও গৈঁজেল ছিলেন।

আমাদের জন্য এই উদাহরণটা খুবই জরুরী এই কারণে যে নেশা এবং ভাব এক জিনিস নয়—এই পার্থক্য বাংলার ভাবান্দোলন করতে জানে এবং খুব কঠোর ভাবেই করেছে। জ্ঞানচর্চার ধারা আর নেশাখোরী হওয়া আলাদা দুটো পথ। এই খবর সকলের কাছে জোরের সঙ্গে প্রচার করা কর্তব্য। ফকির লালন শাহ ভাবের নেশায় পাগল হবার পক্ষে, কিন্তু নেশাদ্রব্য দ্বারা যারা ভাবের ভান করে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গ নিষিদ্ধ। সাধুসঙ্গ তো দূরের কথা। তবে তাঁদের ভালবাসতে হবে, তাঁদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়াও সাধুর চরিত্রে থাকতে পারবে না। হয়তো সাধুই সমাজে এঁদের একমাত্র ভরসা।

পুরানা তন্ত্র ও নানাবিধ কদাচার ও বিকারের বিরুদ্ধে বাংলার ভাবান্দোলন কঠোর ভাবে লড়েছে। গৈঁজেল ও নেশাখোররাও দমসাধনার নামে এইসকল চর্চা অব্যাহত

রেখেছেন। সবসময় সাধক এই লড়াইয়ে সফল হয়েছেন এটা দাবি করা যাবে না। সেই লড়াই করতে গিয়ে দেহের মূল্যকে তাঁরা কখনই গোণ করেন নি। অর্থাৎ ইহলৌকিকতার পরিমণ্ডল তাঁরা ত্যাগ করেন নি। তন্ত্র বা দেহতাত্ত্বিক চর্চা নামে যে সকল মুখরোচক কাহিনী সাধকদের সম্পর্কে চালু আছে তার অধিকাংশের সঙ্গে সত্যিকারের সাধকের সম্পর্ক অতিশয় ক্ষীণ। নাই বললেই চলে। তাঁরা কামাচার ও কদাচারের বিরুদ্ধে সবসময়ই লড়েছেন। কাম এবং প্রেম মাখামাখি করে থাকে সেই সত্য তাই বলে ভোলেন নি। তাঁরা তো লালনের গানে শুনেছেন—‘বিষামতে আছে রে মাখাজোখা’। প্রজ্ঞা বিষে এবং অমৃতে—কামে এবং প্রেমে মাখামাখি করেই দিব্যজ্ঞান হয়ে ওঠে। কামাচার এবং কদাচারের তাঁরা ভয়ানক বিরুদ্ধে। কিন্তু জীবের মধ্যে কাম আছে বলেই জীব পরমের প্রেমে পড়তে জানে—এই সত্যের ঘোষণাও বাংলার ভাবান্দোলন থেকেই উঠেছে।

কদাচার সমাজে সবসময়ই ছিল। অর্থাৎ ভাবচর্চার জন্য যে সকল কর্মকাণ্ড প্রতিবন্ধক—তার বিরুদ্ধে লড়াইও সমাজে চালু আছে। বাংলার ভাবান্দোলনের এই দিকটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে কদাচারকেই আমরা সাধনা বলে শনাক্ত করব। এর বিপদ ভয়াবহ। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা কদাচারকেও পণ্য করে এবং মুনাফা কামানোর ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের এই যুগে অনেক বেশি সাবধানী হতে হবে।

বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে এই কয়েকটি কথা আশা করি লালন অনুরাগীদের কাজে লাগবে। এখন বাংলার ভাবান্দোলন নিয়ে নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রসঙ্গে কিছু পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

নিজের দরকার আর সমাজের দাবি

বাংলার ভাবান্দোলন এবং ফকির লালন শাহ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে আমি নানান সময়ে লিখেছি। লিখেছি নিতান্তই নিজের দরকারে, কিন্তু দরকারটা রাজনৈতিক। এখানে সেই বিষয়ে দুই একটি কথা বলব।

নিজের দরকার আর সমাজের দাবির মধ্যে একটা বিন্দু নির্ণয় করেই বোধহয় লেখকরা লিখে থাকেন। এই বিন্দু ভাবুক আবিষ্কার করেন এক ও অনেক এসে যে মুহূর্তে বা কালদৈশিকতায় এসে দাঁড়ায় সেখানটায়। একেকটা যুগের একেকটি মুহূর্ত বা এক ও অনেকের মিলনের জায়গাটা ধরতে পারার মধ্যেই ভাবুকের গৌরব। আজকাল অবশ্য লেখকের স্বাধীনতা নিয়ে কান ফাটানো হৈ-হল্লা ও হট্টগোল হয়। চড়া ও কড়া গলার প্রহারে মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটে। নিজের দরকারে লিখি বলার মানে অতএব এই নয় যে আমি তথাকথিত ‘লেখকের স্বাধীনতা’ নামক কেছায় বিশ্বাস করি। দুনিয়ার কোথাও এই প্রকার ডুমুরের ফুল কেউ দেখেছেন বলে আমার জানা নাই। কিন্তু সেই তর্কে এখানে ঢুকে পড়বার ইচ্ছা আমার এখন নাই।

নিজের দরকার কথাটা তাহলে এই অর্থেই সত্য যদি এই কালের এক ও অনেকের মিলনবিন্দুটা ধরতে লেখক সক্ষম হন। সেটা পাঠকই বিচার করবেন। তবে কাণ্ডজ্ঞান তো বলে যে আমরা লিখি অন্যদের জন্যই। নইলে লেখা লিখবার আর প্রকাশেরই বা দরকার কী? নিজের মধ্যে অনেককে আর অনেকের মধ্যে নিজেকে দেখবার শিক্ষাটা আমি অবশ্য বাংলার ভাব-জগত থেকেই পেয়েছি। বাংলার ভাবের রাজনীতি নিজের বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। পরম লোকে (পরলোকে নয়) জীবের মুক্তি কেবল তখনই সম্ভব ইহলোকে ব্যক্তি যখন নিজের সেবা না করে সমাজের বা অনেকের সেবা করে যায়। ইহলোকে সমাজ বা অনেকের ‘দাসত্ব’ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে—অর্থাৎ ভাবযোগ ও কর্মযোগ উভয় যোগেই মাথা পেতে নেওয়াই সাধুত্ব। এই অর্থে গুরুর দাসত্ব মানা মানে পরমের সাকার রূপের প্রতি নিরিখ রেখে পুরো সমাজ তো বটেই—গাছপালা পশুপাখি বস্তু-অবস্তু সকল কিছুর দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে গ্রহণ করা। যেসব ভাবুক জন্মসূত্রে হিন্দু তাঁরা হিন্দু পুরাণের বরাত দিয়ে বলবেন, বিষ্ণু জগতের পালনকর্তা। সাধু বিষ্ণুর কাজটাই ইহলোকে করেন। যারা যীশু বা হজরত ঈসার অনুসারী তাঁরা বলবেন প্রভু নিজের দেহে পেরেক আর অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ধারণ করে জীবজগতকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর ইহলৌকিক দেহ পরমেরই রূপ। এই অর্থেই তিনি ‘ঈশ্বরের পুত্র’। ইসলামও হজরত ঈসাকে ‘রুহুল্লা’ বা নিরাকারের আত্মা বা মনুষ্যরূপের মধ্যে আল্লার অতি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সরল প্রকাশ বলে মানে। যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাঁরা কোরানশরিফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, আল্লাহ তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এই কথা কোরান শরিফে বলেন নি। তিনি ফেরেশতাদের বলোছেন আমি দুনিয়াতে ‘খলিফা’ বা আমার প্রতিনিধি পাঠাব। ‘খলিফা’ বা ‘আল্লার প্রতিনিধি’ দুর্দান্ত দার্শনিক ভাবে ভর্তি। ইহলোকে মানুষ তাহলে খোদা বা আল্লারই প্রতিনিধি। অতএব তাঁর কাজ করা, পরমের কর্তব্য পালন করা—অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির সেবা ও সেই সৃষ্টির লালন পালনের মধ্য দিয়েই মানুষ আল্লার দর্শন বা দিদার লাভ করে। মোকামে মাহমুদায় প্রবেশের এটাই শর্ত। কারো রিজিকে বা জীবিকায় হস্তক্ষেপ বা জীবিকার শর্ত বিনষ্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে সেই কারণে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। সাধু তাঁর জন্মসূত্রে মুসলমান ভক্তদের বলেন, ইহলোকে নিজের জীবস্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরমের ভাব অর্জন করো, আল্লার নূরে আলোকিত হও, মানুষের সমাজের অনেকের সেবা কর—এটাই দাসত্ব, এটাই ইসলাম, এটাই আত্মসমর্পণ। বাংলার ভাবান্দোলন ধর্মের সঙ্গে বিরোধে জড়ায় নি। মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার ধর্ম হিশাবে যেসক চর্চা বিদ্যমান তাদের সঙ্গে অযথা সংঘাত ও সংঘর্ষ তৈরি করা নয়। বরং যে ধর্মের মানুষ যে কথাটা সহজে তার নিজ ধর্মের ভাষা ও ভাবের পরিমণ্ডলে বোঝে তাকে সেই ভাবে বোঝানোই নিয়ম।

বৌদ্ধ ধর্মের কথা এখানে তোলা দরকার। বাংলার ভাবের শেকড়টা টানলেই তথাগতের চাদরে টান পড়ে। সরাসরি। জীবে দয়া এবং অহিংসা পরম ধর্ম—এই ভাব

এখনও বাংলার চাষাভূষা খেটেখাওয়া মানুষের মধ্যে নাড়া দিলেই তার আকুলতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বাংলার ভাবান্দোলনের এই এক অদ্ভুত শক্তি। কতো ধর্ম এলো আর গেলো—কতো তত্ত্ব আসবে আর যাবে—কিন্তু নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্য ধর্মের ভেতর থেকে কথা টেনে নিজের আসল কথা বলে যাওয়ার কায়দা তার এতোই প্রখর যে বিস্মিত হতে হয়। বলাবাহুল্য বাংলার ভাবান্দোলন একদিকে কোন প্রথাগত ধর্ম, শাস্ত্র বা বেদবাক্য মানে না—কিন্তু আধুনিকদের মতো তাঁরা ‘ধর্ম’ বিরোধী নন। ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজের কাম লোভ লালসাকে ন্যায্য প্রমাণ করবার জন্যই ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ধর্মের বিরোধিতা করে। কারণ ধর্মের অর্থ শুধু মোল্লাপুরোহিতদের ষড়যন্ত্র হতে পারে না। মানুষ মাত্রই নীতিনৈতিকতা বিধিবিধানের অধীন। এ ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু মানুষের সমাজ আর পশুপাখি কীটপতঙ্গের সমাজের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে।

পশু পাখি কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রকৃতিগতভাবে বা তার প্রাকৃতিক তাগিদে ‘সমাজ’ গঠন করে। আর মানুষের সমাজ মানে প্রকৃতিগত নয়—সেটা ভাবের ব্যাপার—যে সমাজে ভাবের মাধুর্য যতো মহৎ সেই সমাজ তত মহৎ। ধর্ম মানুষকে পরমের ভাবে ভাবিত করে—সেই চর্চা মানুষের অবশ্যই দরকার। পরমের ভাব ছাড়া জীব নিজের পশুস্বভাব থেকে মুক্তি পায় না। এই মুক্তি ইহলোকেই হতে হবে। পরলোকে নয়। আর পরলোক বলে কিছুই নাই। আছে জীব আর পরম। জীব পরমকে যুগে যুগে যতোটুকু অনুধাবন করতে পারে ততোটুকুই সে বাস্তবায়িত করে। ধর্মের বিরোধিতা করা মানে নিজের পশুস্বভাবের পক্ষে নানান কায়দায় যুক্তি হাজির করা ছাড়া আর কী? ব্যক্তি স্বাধীনতার ছুতায় ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধিতার অর্থ অনেকের বিপরীতে নিজের আত্মস্বার্থের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা। বাংলার ভাবান্দোলন ব্যক্তির এই আত্মকেন্দ্রিক কামনা বাসনাকে কখনই ‘মুক্তি’ বা ‘স্বাধীনতা’ বলে মানে নি। আমিও মানি না।

নিজের (ও অনেকের) দরকারে লেখাগুলো লিখতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম বাংলার ভাবান্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদ্ধতিগত মুশকিল আছে। সেই মুশকিল নিয়ে লেখালেখি করলে আমরা বেশ এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেই জায়গায় যাবার আগে যে সকল মিথ্যা অনুমান, বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও বাংলার ভাবুকদের (যেমন, ‘বাউল’, ফকির ইত্যাদি) জীবনযাত্রা সম্পর্কে যেসকল কল্পকাহিনী ছড়ানো হয়েছে সেইসকল জঞ্জাল সাফ করা জরুরী। না করলে অগ্রসর হওয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য। এই জঞ্জালের সঙ্গে এখন লালন ও হাসন রাজা নিয়ে সিনেমাও যুক্ত হয়েছে। এই জঞ্জাল সাফ করার কাজও প্রায়-অসাধ্য হয়ে উঠেছে। কোন একটা জায়গা থেকে আমাদের শুরু করতেই হয়। খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। আপাদমস্তক শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা অগ্রসর হতে পারব না, এই প্রকার অনুমানও আমার মনে ধরে না। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে লেখালেখির মধ্য দিয়েই হয়তো কীভাবে আগ বাড়তে হবে আমরা বুঝব। অনেকটা শিশুর মতো ঝুঁকি নিয়ে হাঁটতে শেখার মতো।

মোন্দা কথা বাংলার ভাবান্দোলনের ইতিহাস ও স্বভাবচরিত্র অন্বেষণ, গবেষণা এবং এই কালের জন্য নতুন করে পাঠ করবার রীতি আমরা লিখতে লিখতেই আবিষ্কার করব।

এই বিষয়ে যে লেখালেখি আমি করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে বাংলার ভাবান্দোলন এবং বিশেষভাবে লালন সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করবার জন্য একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা। সেই কাজ করতে গিয়েও রাজনৈতিক অর্থেই লেখাগুলো প্রায় ক্ষেত্রেরই ভাব বা দর্শন বিচারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, নিজের ক্ষমতা কতোটুকু তার হিসাব না করে। এখন আরো খানিকটা গুছিয়ে কীভাবে অন্বেষণ ও গবেষণার কাজটা করা যায় সেই সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব এখানে তুলব। আবারও, নিজেরই দরকারে। কিন্তু অনেকেই যেহেতু বাংলার ভাব নিয়ে আজকাল আন্তরিকভাবেই উৎসাহী এবং ভাব চেনা ও চর্চার তাগিদ বোধ করছেন, লেখাটা তাঁদের জন্যও বটে। এই ধরনের লেখালেখিতে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও ভাববিনিময়ে সুবিধা হবে আশা করি।

বাংলার ভাবান্দোলন?

একটি পদ্ধতিগত প্রশ্ন থেকেই যায়। সেটা হোল, বাংলার ভাবান্দোলন বা ভাবগুচ্ছের নতুন ডাকনামের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। একই প্রশ্নের অন্দরমহলে আরো অনেকগুলো প্রশ্ন লুকিয়ে আছে।

এক. বাংলার ভাব যখন বলছি তখন কি আমরা শুধু বাংলাদেশ নামক ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার কথা বলছি? না। সেই দিকটা পরিষ্কার থাকা দরকার। একই ভাবে ‘বাঙালি’ বা তথাকথিত ‘আবহমান বাঙালি’ নামক কলকাতাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সংজ্ঞার ফেরেও আমরা পড়তে চাইছি না। যদি পড়ি তাহলে তার সাম্প্রদায়িক প্রত্যুত্তর ‘বাংলাদেশী’ বা ‘আবহমান বাংলাদেশীর’ অনর্থক তর্কে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। ‘বাংলাদেশ’ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ‘বাংলাদেশী’ পরিচয়টা সেই দেশের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় হতেই পারে। ঠিক তেমনি ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অবশ্যই ‘বাঙালি’। যেমন আছে চাকমা, সাঁওতালসহ প্রায় পঁচিশটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। অন্যদিকে বাঙালিদের একাংশ ভারতীয় আর একাংশ বাংলাদেশী। এই সত্য যদি আমরা বাস্তব বলে মানি তো ব্যস্। মামলা চুকে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচয় আর ভাষা ও সংস্কৃতিগত পরিচয় নিয়ে তর্কের মীমাংসা আমরা এখনও করি নি।

তদুপরি এখন ‘বাংলাভাষা’ বলতে আমরা যার সঙ্গে পরিচিত তার বাইরে এক বিরাট ও বৃহৎ বৃত্ত রয়েছে। সেই বৃত্তের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে দীনেশ চন্দ্র সেনের ‘বৃহৎ বঙ্গের’ ধারণা আমাদের মাথায় থাকা দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে দীনেশচন্দ্র’র অনুগামী। তাঁর অনুপ্রাণনায় আসুক না আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরাসহ ভারতের এই পূর্বদিকের অঞ্চলের অনেক খানি। পশ্চিমবঙ্গ তো

অবশ্যই। ভাব, ভক্তি, লড়াই সংগ্রামের যে ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে চাইছি তাকে আগাম ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা টেনে আমরা চিনতে পারব না, বরং ভুলই করব। যেমন, আসামে শংকরদেবের (ভারতের শংকরাচার্য নয়) ভাব না জানলে ও না বুঝলে বাংলার ভাব বুঝব কী করে? আসামের বৈষ্ণব ভাবের এরকম কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার সঙ্গে বাংলার ভাবের মৈত্রী রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ‘বাংলার ভাবান্দোলন’ নামে যে ব্যাপারটির আমরা একটা ডাকনাম দিয়েছি তার মানচিত্রটা আঁকব কীভাবে? এই বিষয়ে আরো গবেষণা দরকার। প্রশ্নটা তুলে রাখাই এখনকার জন্য যথেষ্ট।

দুই দর্শন বা ভাবের জন্য ডাকনাম স্থির করা দরকার কি? তার বিপদও আছে। পশ্চিম বাংলা গত কয়েকদশকে হাতে গোনা যে-কয়জন প্রখর দার্শনিকের জন্ম দিয়েছে তাদের মধ্যে বিমলকৃষ্ণ মতিলালের নাম আগে আসবে। পশ্চিমবাংলা আরো অনেক প্রতিভাবান মানুষের জন্ম দিয়েছে, যেমন সুকুমারী ভট্টাচার্য বা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক। আরো উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে। তবে আমরা বাংলার ভাবান্দোলনের জায়গা থেকে কথা বলছি বলে বিমলকৃষ্ণ মতিলালের প্রসঙ্গ তুলছি। বিমলকৃষ্ণ মতিলালের রচনা আমাদের জন্য অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু বিমলবাবু যখন ‘ভারতীয় দর্শন’ নামে দর্শনের একটি মানচিত্র আঁকেন, তখন তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া মুশকিল হয়। এই ধরনের ডাকনাম আদৌ সঙ্গত কিনা সেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ভারত একটা রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সত্তা। কিন্তু ভারতের ভাব বা দর্শন তো কোন ভূগোল বা রাজনৈতিক সীমানা মেনে চলে নি। এই ভূখণ্ডে নানান ধর্ম, নানান ভাব, নানান সংস্কৃতি। তাঁর আলোচনা পড়লে বোঝা যায় তিনি আসলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত দর্শনকেই ভারতীয় দর্শন বলছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকদের আলোচনা এসেছে মাঝে মাঝে, কিন্তু হিন্দু দর্শনের প্রসঙ্গে। কিন্তু ওর মধ্যেও নানান স্রোত আছে। সংস্কৃত দর্শন কিম্বা বাংলার ন্যায় বা নব্যান্যায় ও তাদের টীকাভাষ্য একটো একপক্ষীয় ব্যাপার নয়। তর্ক বিরোধ স্ববিরোধিতা ইত্যাদি তো আছেই। তাহলে ভারত নামক এক বিশাল দেশের চিন্তা ও দর্শনের বিপুল বৈচিত্র্যকে ‘ভারতীয় দর্শন’ নামে ডাকবার মুশকিল আছে। সেই মুশকিল আরো গভীর হয় যদি শুধু প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত দর্শন আলোচনাকেই ভারতীয় দর্শন বলা হয়।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল আমাদের মধ্যে এখন নাই। ফলে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগও আর নাই। কিন্তু ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার পড়ে মনে হোল তিনি হয়তো এই ধরনের ডাকনামের মুশকিল সম্পর্কে মৃত্যুর আগে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি ‘ভারতীয় দর্শন’ না বলে ক্লাসিকাল স্টাডিজের কথা বলছিলেন। শুধু ভারতীয় দর্শন কথাটা যে হিন্দু দর্শনেরই প্রতিধ্বনি সেটা বুঝতে পারা তাঁর জন্য কঠিন ছিল না। বলেছেন, Classical Studies-কে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যতে পারে, একটি সংস্কৃত-পালি আর অন্যটি আরবি-ফার্সি। এবং দুটিকেই আমি

parallel বা সমান্তরাল মর্যাদা দেব।' খুব ঠিক কথা। ক্লাসিকাল স্টাডিজ (সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফারসি) বা ধ্রুপদী চর্চার পক্ষে তাঁর শক্ত মতকে আমাদের অবশ্যই সমর্থন করা উচিত। বাংলা সাহিত্য দর্শন বা ইতিহাসে কাউকে স্নাতক ডিগ্রি পেতে হলে এই চারটি ভাষার কমপক্ষে একটির ওপর দখল না থাকলে কোন ডিগ্রি দেওয়া বন্ধ করতে পারলে খুবই একটা কাজের কাজ হোত। তাঁর কথা থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

ধ্রুপদী চর্চা বলতে আমি আবার শুধু অতীতের সাহিত্যপাঠ বোঝাচ্ছি না। দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সেই সহজ সত্যটি মনে রাখতে হবে যে মানুষ ভুঁইফোড় নয়, তার একটা নির্দিষ্ট অতীত, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট আছে। আমাদের মানস ও চিন্তাধারারও একটা প্রবাহ আছে এবং এসবই তো নেমে এসেছে প্রাচীন যুগ থেকে। এখন তার সঙ্গেই যদি আমাদের কোন যোগ না থাকে আমরা তো আমাদের মাটির তলই খুঁজে পাব না। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। বুঝতে পারব না কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এবং কীভাবে। আর আমরা যদি সচেতন ভাবেই এই অজ্ঞাত অবস্থানকে মেনে নিই আমাদের পক্ষে বা চিন্তার ক্ষেত্রে আদৌ কোন সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব? সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে এই চিন্তাসৃষ্টির কোন base বা ভিত্তিভূমি থাকবে না। জানেন, পুরোপুরি ধার করা বস্তু নিয়ে বেশি দূর এগোন সম্ভব নয়, বিশেষ কতকগুলি গাছের পরিচর্যা ও বর্ধনের জন্য টব যথেষ্ট নয়, তাদের মাটিতেই রোপণ করতে হবে। অতএব সৃজনমুখী চিন্তার স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। what we are and what we can do 'or the 'uture—এ দুটি প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাব আমরা যদি এই মাটির যোগকে অস্বীকার না করি।

কথাগুলো ভাল। তবে পুরানা। কিন্তু মতিলাল এই কথা স্বীকার করছেন, 'এই ধারণাগুলো পাস্চাত্য থেকে এসেছে এবং একে মূল্য দেওয়া হয় বলেই সেখানে humanistic education—এর কথা নতুনভাবে ভাবা হচ্ছে এবং প্রবর্তনও করা হচ্ছে।'

তিন. প্রাচীন দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে এই কথাটা স্বীকার করে নেওয়া দরকারি। কিন্তু দর্শন যদি জীবন্ত হয় তাহলে তাকে প্রাচীন বলার দরকার কী? সমাজ যে অর্থে অতীত হয়ে যায় চিন্তা কি সেই অর্থে অতীত হয়ে যায়?

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার কারণ হচ্ছে প্রাচীন দর্শন পড়া দরকার সেই প্রশ্নে তাঁকে সাক্ষী মানা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি পড়তে বলছেন সেখানে আমার খুব একটা সায় নাই। আমি তথাকথিত 'ঐতিহ্য' নামক স্থিরনির্দিষ্ট কিছু আছে বলে মানি না। তবে চিন্তা কীভাবে গড়ে ওঠে বা বিশেষ বিশেষ পরিমণ্ডলে কীভাবে চিন্তার বিশেষ রূপ গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস জানা দরকার। ইতিহাসকে জানা আর তাকে 'ঐতিহ্য' জ্ঞান করে আগলে রাখার মধ্যে পার্থক্য আছে। তথাকথিত 'অতীতে' আমাদের এখনকার চিন্তাকে 'রোপণ' করতে হবে, এটাও খুব একটা কাজের কথা নয়। চিন্তার ইতিহাস থাকতে পারে; কিন্তু এই প্রকার 'অতীত'—যাকে ভিত্তি জ্ঞান করে আমাদের এখনকার ভাব চর্চা করবার পরামর্শ দিচ্ছেন মতিলাল সেই প্রকার সরলীকরণে ধরা দিতে রাজি না হওয়াই ভাল। বরং আমি বলব ভিন্ন কথা। বলব,

ভাবের ইতিহাস পাঠ করতে হবে তার অতীতকে ধসিয়ে দেবার জন্য। ইংরেজিতে যাকে বলে exhaust করে দেবার জন্য। যেসব ইঙ্গিত ইশারা বা সম্ভাবনা প্রাচীন দর্শন বা ভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে তাকে আমাদের কালের মধ্যেই আত্মস্থ করে নিতে হবে। এই কালে তার যদি কোন উপযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ভেঙে দেখাতে হবে। চতুর্দিক মেলে দিয়ে তার সমূহ রহস্য ভেঙে দিতে পারলেই নতুনের জন্ম হতে পারে। আমি ভাঙায় বিশ্বাসী—ধরে রাখায় নয়। ভাঙাই গড়া।

কিন্তু তাঁর প্রতি অবিচার হবে যদি তাঁর আরেকটি উদ্ভৃতি না টুকি। তিনি বলছেন:

‘আমি কখনও বলি নি এবং বলব না যে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে, এই অতীতেই তো অনেক অন্যায্য অবিচার ছিলো যা অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চায় না, সত্যি বলতে কি অতীতের বহু অনাচার থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি, বহুদূর এগিয়েছি, এবং এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেই হবে। কিন্তু অন্য দিকে এগিয়ে যাবার দুর্ময় তাগিদেই যদি আমরা অতীতকে পুরোপুরি বর্জন করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি, তাহলে তো ইংরেজিতে বলতে গেলে—we shall throw away the baby with the bathwater। অতীতের সম্পদকে অক্ষত রাখতে হবে এবং একইসঙ্গে বলতে হবে প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রত্যাভর্ন অসম্ভব। (যদিও অনেক ধর্মপ্রচারক এখনও এ প্রস্তাব দিয়ে থাকেন)। খুব খোলাখুলি বললে পূর্ণ প্রত্যাভর্নের দাবী করার অর্থই হোল অহেতুক ধ্বংসের সৃষ্টি করা, মানুষকে ভাঙতা দেওয়া।’

পুরনো সমাজে ফিরে যাওয়া আর পুরানা দর্শন বা ভাবের মাটিতে নতুন গাছ লাগানো এক কথা হোল না। সপ্রাণ চিন্তা বা জীবন্ত চিন্তার কোন অতীত নাই। চিন্তা যখন অগ্রসর হয় তখন সে তার আগের চিন্তাকে আত্মস্থ করেই অগ্রসর হয়। প্রাচীন যদি এখনকার জীবন্ত চিন্তার পরিমণ্ডলে হানা দেয় তাহলে তার মানে হোল প্রাচীনের অন্তর্গত সম্ভাবনার পুরাটা আমরা এখনও আত্মস্থ করি নি। তার মধ্যে এমন কিছু রয়ে গেছে মানুষের যা দরকার।

তাহলে বাংলার ভাবান্দোলন যখন বলি তখন ‘বাংলাদেশের ভাব’ বলে চিরায়েত কোন ‘ঐতিহ্য’ আছে বলে আমি দাবি করি না। কিম্বা দুই বাংলা মিলিয়েও কোন বিশেষ ভাবের কথা ভাবি না। কিন্তু বাংলার ভাব নামে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ধারাকে মোটাদাগে ধরবার চেষ্টা আমাদের করা দরকার। কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে ওর সম্ভাবনা ইঙ্গিত ইশারাগুলো আমরা পুরাপুরি ধরতে পারি নি। কারণ মনোযোগ দেই নি। অথচ এই কালে বাংলার ভাব পরিমণ্ডলের সম্ভাবনা বিস্তার। কারণ এই ভাব এখনও জীবন্ত, পুরানা কিছু নয়। আমার এই প্রাথমিক মূল্যায়ন আদৌ সঠিক কিনা সেটা বিচার করে দেখা দরকার। তার জন্যই আমার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত লেখালিখি।

চার. ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, পরিবেশ, আবাস, আবহাওয়া ইত্যাদি সবকিছুর একটা প্রভাব ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর পড়ে। আমরা দাবি করব না যে সেটা যান্ত্রিক ভাবে ঘটে। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক দাসব্যবস্থার সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে কার্ল মার্কসের একটি পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত ছিল যে সংস্কৃতি আর

উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে ঠিকই, বৈষয়িক অবস্থা ভাবের বিষয় ও রূপ নির্ণয় করে কথাটা সত্য; কিন্তু তবুও তারা হাত ধরাধরি করে চলে না। গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি দাসব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দর্শনের বা ভাবের অতি মৌলিক প্রশ্ন মানুষ করেছে। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা পুরানা দাসব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ভাব বা দর্শনের দিক থেকে মৌলিক চিন্তা করতে সেই সমাজের মোটেও অসুবিধা হয় নি। অতএব একদিকে সমাজের বৈষয়িক দিকের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক আর অন্যদিকে সেই সম্পর্ককে যান্ত্রিক সূত্রে না ভেবে ঐতিহাসিক ভাবে বিচার করার একটা পদ্ধতি আমাদের বের করতে হবে। ধরা যাক আমরা নাথপস্থীদের ভাব, ভাষা, চিন্তা বুঝতে চাই কিম্বা বুঝতে চাই বৌদ্ধ তন্ত্র বা হিন্দুতন্ত্রের বিষয়াবলী। যে বিশেষ সমাজ কাঠামোর মধ্যে তাদের পরিগঠন ঘটেছিল সেই সমাজ ও সেই সমাজের চিন্তার সম্পর্কটা তাহলে কীভাবে বিচার করব? এই কথাটা কেন ভাল করে বোঝা দরকার তার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলার ভাবের খুবই গোড়ার একটি প্রতিজ্ঞা, প্রস্তাব বা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যা আছে ভাঙে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের শরীরে যা আছে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও তাই আছে। কথাটা যতো সহজ মনে হয় মোটেও অতোটা সহজ নয়। অথচ এই সিদ্ধান্তকে আগাম মেনেই বাংলার ভাবের মধ্যে তুমুল বিকাশ ঘটেছে। সমাজের বৈষয়িক অবস্থা তখন নিশ্চয়ই বিকাশের এমন স্তরে পৌঁছায় নি, যার সঙ্গে এই অমূল্য সিদ্ধান্তের ভাবের স্তর সমান্তরাল। যদি গ্রীক সমাজের ভাবের ওপর ‘আধুনিকতা’ দাঁড়িয়ে আছে মানি, তাহলে বাংলার এই ভাবের ভূমিকাটা কি? এই ভাব সনাতন ধর্ম, হিন্দু, কী বৌদ্ধ—যে উৎস থেকেই নির্মিত হোক না কেন, বাংলা এই ভাবটা ধরে রেখেছে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে বাংলা নিজের একটা ব্যাখ্যাও খাড়া করেছে, টের পাওয়া যায়। কী তার উপযোগিতা? নাকি মানুষের ইতিহাস এই ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদজ্ঞানের স্তরটাকে অতিক্রম করে এসেছে। এর উপযোগিতা আর নাই। পেছনে আর ফিরেও যাওয়া যাবে না। আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অভেদ জ্ঞানের প্রশ্নটা এই কালে আরো নতুন ভাবে ও প্রবল শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের বৈষয়িক অবস্থার কারণে যদি এই ভাবের উদয় ঘটে থাকে তাহলে উভয়ের সম্পর্ক বুঝবার একটা দায় আমাদের থেকেই যায়। বাংলার ভাব যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে বাংলার বিশেষ বৈষয়িক দিকটার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বোঝা দরকার। কোথায় বাংলার বৈশিষ্ট্য? যেমন, উত্তর ভারতের ভক্তিবাদ আর নদীয়ার বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বৈষয়িক জীবন এই পার্থক্য রচনার ক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা রেখেছে? ইত্যাদি।

পাঁচ. বাংলার ভাব বেদবিরোধী শাস্ত্রবিরোধী—প্রথাগত ধর্ম বা যাকে ইংরেজিতে organised religion বলে—তার প্রতিপক্ষ। তাহলে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বা দার্শনিকেরা যেভাবে সুসংগঠিত লিখিত শাস্ত্র বিচার করেছেন সেই রকম কোন শাস্ত্র, গ্রন্থ বা সর্বসারসংগ্রহ বাংলার ভাবান্দোলনে নাই। বাংলার ভাব একান্তই মৌখিক

সংস্কৃতি নির্ভর। তার মাধ্যম কান এবং শ্রুতি। অর্থাৎ গান। লিখিত পুঁথি যে একেবারেই নাই তা নয়। কিন্তু সেটাও পড়বার জন্য যতোটা তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে শোনাবার জন্য। কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলনের আলোচনা আমরা করতে চাইছি লিখিত ভাষায়। শ্রুতি ও কানের সংস্কৃতিকে আমরা গুটেনবার্গ টেকনলজির মধ্যে গ্রেফতার করতে চাইছি। এই দিকটায় সতর্ক থাকার দরকার আছে। পুঁথি ও ভাবগানে যে তত্ত্বটা কাব্য হিসাবে পেশ করা হয়েছে তাকে উপাদান ধরে নিয়ে আমাদের অর্থোৎপাদন করতে হচ্ছে। এটা কতোটুকু ন্যায্য, সেটা আগে থেকেই আমরা দাবি করতে পারবো না। কিন্তু যদি বাংলার ভাবান্দোলনের একটা পরিমণ্ডল আমরা আমাদের মতো করেও ব্যাখ্যা করি এবং একই সঙ্গে যদি তা এই কালের দর্শন বা চিন্তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে—আধুনিকতা বা উত্তরাধুনিকতার সঙ্গে বাহাস করতে সক্ষম হয়, তাহলে মন্দ কী? এই রকম একটা গুপ্ত সংকল্প আমাদের মধ্যে কাজ করলে দোষ কী? ভালই তো হয়।

বাংলার ভাব ও ভাবকের জীবনাচরণ

বাংলার ভাবুকদের পুঁথি গান ইত্যাদি বাংলার ভাবোদ্ধারের উপাদান সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার ভাবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তির জীবনাচারকে তার ভাব থেকে আলাদা করা যাবে না। ভাবের সঙ্গে জীবনচর্চার যে ভেদ আমরা অজ্ঞাতসারে মানি, সেই জায়গায় দাঁড়ালে বাংলার ভাবান্দোলনের কিছুই বোঝা যাবে না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন ‘শ্রীচৈন্যরিতামৃত’ লিখলেন তখন গৌরান্দের জীবনী একই সঙ্গে ভাবের ব্যাখ্যাও হয়ে উঠল। চৈতন্যের জীবলীলাই তাঁর ভাবের ভাষা হয়ে উঠেছিল। তাঁকে আলাদা করে দর্শনের সন্দর্ভ লিখতে হয় নি। তাঁর জীবনাচরণই ভাবের ভাষা হয়েছে বাংলায়।

লালন থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। লালনের জীবনের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে; এক, তিনি তাঁর পরিচয় জানান নি। অর্থাৎ তাঁর বাবা মা বা বংশের কোন পরিচয়ই তিনি জানান নি। হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা তাঁর সম্পর্কে নানা কেচ্ছা বানিয়েছে এবং এখনও বানাচ্ছে। এই না জানানোটা ছিল খুব সজ্ঞান ও সচেতন সিদ্ধান্ত। কারণ তিনি জাতপাত মানতেন না। সাম্প্রদায়ের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়কে যুক্ত করেন নি। অতএব নিজের জন্ম-উৎস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকা ও কাউকে না জানানোর খুবই সঙ্গত কারণ হচ্ছে কেউ যেন তাঁকে হিন্দু বা মুসলমানের সন্তান বলে শনাক্ত করতে না পারে। এই ক্ষেত্রে তাঁর জীবনাচরণকে তাঁর ভাব থেকে আলাদা করা যায় না।

দুই, জন্মের উৎস গোপন রাখার বিপরীতে যে ‘লীলা’ তিনি প্রদর্শন করেছেন তার অর্থ বোঝারও প্রয়োজন আছে। তিনি পানি থেকে উঠে এসেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্ম বা সৃষ্টির শর্ত হচ্ছে জল—এই ভাবটা কালীগঙ্গায় তাঁর ভেসে আসা এবং মলম শাহের ঘরে চিরজীবন থাকার মধ্যে ব্যক্ত। পানি লালনের ভাবের জগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

তিনি, তাঁর গুরুর কোন সন্ধান পায় নি কেউই। কখন কোথায় কীভাবে তিনি গুরুসঙ্গ করেছেন তার কোন প্রমাণ নাই। তাঁর গুরু সম্পর্কে নানান কেছাকাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু কেন তিনি গুরুকে গোপন রেখেছেন সেই তত্ত্ব না বুঝলে লালনের ভাব বোঝা অসম্ভব। গুরুকে আড়াল রাখা তাঁর ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি প্রথাগত গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর গানে ‘গুরু’ সংক্রান্ত যে ধারণা আমরা পাই সেটা একদমই নতুন।

চার, নিজের কোন ছবি তিনি রেখে যান নি। এটা হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন তিনি। কুষ্টিয়া ও কুমারখালি তাঁর আমলে যথেষ্ট আধুনিক ও বাড়ন্ত শহর ছিল। কিন্তু নিজেকে আড়াল করেই তিনি রেখেছিলেন। এই কথাটা না তুললেও চলত। কিন্তু লালনের স্কেচ বলে যেটা চালু আছে আর ঝুঁটি ঝাধা যে ছবি লালনের ছবি বলে প্রচলিত এগুলোর একটিও লালনের নয়। এই সত্য অনেকেই হয়তো জানেন না।

আপাতত এই অতি প্রাথমিক বিষয়গুলোর দিকে যদি আমরা নজর দিতে পারি ও ময়লা আবর্জনা ও জঞ্জাল সরিয়ে বাংলার ভাবের জায়গাটা শনাক্ত করতে পারি তাহলে বহুদূর যেতে পারব আমরা।

ফকির লালন শাহ যেন আমাদের সহায় হন, এই কামনা করি।

কৃষি, ভাব ও কাব্য

আমি কৃষিকাজ করি। চাষাবাদ করতে ভালবাসি। একা করি না। অনেক কৃষকের সঙ্গে একসঙ্গে করি। একে কৃষকরা নাম দিয়েছে নয়াকৃষি আন্দোলন। বলাবাহুল্য, নয়াকৃষি আমার নিজের কোন ব্যাপার নয়, কৃষকদের বিষয়, তাদেরই আন্দোলন। তাদেরই লড়াই, তাদেরই সংগ্রাম। আমি ততোটুকুই তাদের, যতোটুকু আমি কৃষক হতে পেরেছি। কিন্তু নয়াকৃষি করতে গিয়ে নিজেকে অনেক প্রশ্ন করেছি, অনেক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে আমার। নানান কৃৎকৌশলগত প্রশ্নেরও মীমাংসা করতে হয়েছে, চাষাবাদের নতুন ধরণ অনুসন্ধান করতে হয়েছে, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সামনের সারির বিষয়গুলো জানতে হয়েছে, ভালমন্দবিচার করতে হয়েছে। ইত্যাদি। আমার জন্য ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমি এখন যেখানে আছি সেখানে এসেছি। এখানে নয়াকৃষির চাষাবাদ কৌশল নিয়ে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি নিজে কীভাবে নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে নানান চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসেছি তারই কাহিনী বলার চেষ্টা। আমার অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলব, কিন্তু নিজের কথা আসলে নয়। সেই প্রশ্নগুলোই তোলার চেষ্টা করব যে সকল প্রশ্ন আমরা অনেকেই হয়তো আজকাল করছি।

আমরা কোন প্রকার বিষ, সার এবং মাটি তলার পানি ব্যবহার করি না, কোন শ্যালো বা ডিপ টিউবওয়েল না। যে এলাকায় নয়াকৃষি আন্দোলন শক্ত ভাবে ভিত গড়তে পারে সেখানে শ্যালো বা ডিপ টিউবওয়েল থাকলেও সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ মাটির ওপরের পানি ব্যবহারই নয়াকৃষি পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পানি খুবই মূল্যবান সম্পদ। অথচ মাটির তলা থেকে পাম্প দিয়ে পানি তোলার কারণে আর্সেনিক দূষণের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা নয়াকৃষিতে নাই। হয়তো আর্সেনিক দূষন বন্ধের জন্য এটাই একমাত্র পথ। এগুলো নগদ লাভ। অন্যদিকে এই পদ্ধতিটি প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর পদ্ধতি। আমরা বিচিত্র জাতি ও প্রজাতির চাষাবাদ একসঙ্গে করি। কৃষিতে আমরা বনের নকল

করি। অর্থাৎ বনের মতো চাষাবাদ। এর সুবিধা বহু। প্রথমত এককট্টা চাষাবাদের পরিবর্তে বাহারি বা বৈচিত্র্যময় চাষাবাদে কৃষকের সমৃদ্ধি বাড়ে। পরিবেশে ও প্রাণসম্পদে যেমন, বৈষয়িক ভাবেও। তাছাড়া রাজনৈতিক দিকও আছে তার—বীজের জন্য বীজ কোম্পানি বা বাজারের ওপর নির্ভরশীল সম্পর্ক থাকে না থাকে না কৃষকের। নির্ভরশীলতার সম্পর্কের বিপরীতে সে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক নির্মাণের লড়াই চালায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা আমরা বলি, কিন্তু ‘সাম্রাজ্যবাদ তো আর হাওয়াই ব্যাপার না, উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ তো হাজির থাকে। তাহলে সেখানে, উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের ধরণটা কেমন হবে? রাজনৈতিক লড়াই চালাতে হবে সেটা তো আহাম্মকেও বোঝে। কিন্তু নতুন উৎপাদন সম্পর্ক নির্মাণের লড়াই, নিদেনপক্ষে তার সম্ভাবনা অনুসন্ধানের চেষ্টা কি ততোদিন মূলতবি রাখতে হবে? এই হচ্ছে প্রশ্ন।

বাজার ও বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সীমা কতোটুকু? কতোটুকু জিত হবে কৃষকের? তার বিপদগুলো কোথায়? এই প্রশ্নগুলো একই সঙ্গে যেমন উৎপাদনের, তেমনি রাজনীতির। খুবই জরুরী প্রশ্ন। কিন্তু ঘরে বসে তর্কাতর্কি করে এসবের উত্তর পাওয়া যাবে না। লড়েই দেখতে হবে, কী সম্ভব, আর কী সম্ভব না। কৃষকের নগদানগদি লাভ তো আছেই, আগেই বলেছি। যেমন, স্থানীয় বীজ আর মিশ্র ফসলের কারণে কৃষকের জমিতে কোন পোকামাকড় রোগবালাই লাগে না। অতএব বিষ ব্যবহারের কোন দরকারই পড়ে না। মাটির তলা থেকে যদি পানি তোলা আমরা বন্ধ করি তাহলে আর্সেনিক বিষে আমাদের মরতে হয় না। ইত্যাদি। আর, সবচেয়ে বড় কথা—এই পদ্ধতির উৎপাদনশীলতা রাসায়নিক কৃষির তুলনায় অনেক বেশী।

যেহেতু কৃষিকাজ আমি নিজের হাতে করি, ফলে এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে খুবই পরিষ্কার। কিন্তু কৃষি আমার কাছে উৎপাদন, রাজনীতি, বিজ্ঞান বা কৃৎকৌশল মাত্র নয়। একই সঙ্গে ভাব এবং কাব্য। হয়তো শুধুই ভাব, কিম্বা শুধুই কাব্য। একই তো কথা। কিন্তু কথাটা সবসময় সবজায়গায় আমি জোর দিয়ে বলি না। আজকাল ‘ভাব’ বা ‘ভাবুক’ বললেই বিজ্ঞানের বিপরীতে একটা জ্ঞানশূন্য উদাসীনতা বোঝায়। ফলে ‘ভাব’ মানে যে এই রকম বাড়লিয়ানা নয়, সেটা নিয়ে অকর্মাদের সঙ্গে তর্ক করলে এনার্জি খরচ করা ছাড়া আর কোনলাভ হয় না।

‘ভাব’ কথাটা আপাতত পাশ্চাত্য অর্থে দর্শন বলে ধরে নেওয়া যাক, যদিও বঙ্গ সত্য মানে দর্শন—অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান ‘দর্শন’ করা বা দেখা নয়। সত্য দেখাদেখির ব্যাপার কি? বরং হয়ে ওঠার ব্যাপার। সত্যের বিচার কিছু দেখিয়ে, দর্শন করে, বা প্রমাণ দাখিল করে নির্ণয়ের মামলা নয়। সেই তর্ক থাকুক। কিন্তু বাংলার ভাবান্দোলনের একটা জের আমার ওপর আছে, সেটা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে দৈনন্দিন ওঠাবসার ভাষা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। সেই জের ভর করে থাকে বলে কৃষিতে আমার আগ্রহ নতুনভাবে চিন্তা করতে পারার তাগিদ হয়ে ওঠে। প্রথাগত চিন্তার নিগড় থেকে বেরিয়ে আসার চর্চার দরকারে। কয়েকটি উদাহরণ দেব।

‘আধুনিকতা’ বা প্রগতির ধারণাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে দেখি আমাদের মধ্যে এক বিচিত্র কুসংস্কার বাসা বেঁধে থাকে বা আছে। যেমন, আমরা ধরেই নি, কৃষি মানে পশ্চাতপদতা। আমাদের অবিচল বিশ্বাস সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে আমাদের ইনডাস্ট্রিয়াল বা শিল্পসভ্যতাই গড়তে হবে। আমরা যখন কাউকে গালি মারি তখন তাকে ‘চাষা’ বলে চিহ্নিত করি। চাষী মানেই বুদ্ধিহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। আর ‘আধুনিক’ মানুষ মানে শহুরে, টিপটপ। যে প্রকৃতির মধ্যে ‘আধুনিক’ মানুষ বাস করে তাকে হেগেলের ভাষায় বলা যায় ‘দ্বিতীয় প্রকৃতি’। এই প্রকৃতি আসল বা আদি প্রকৃতি নয়। এটা মানুষেরই তৈরি করা। যে বাস্তবতার মধ্যে আধুনিক মানুষ বাস করে সেটা প্রাকৃতিক অর্থে ‘বাস্তব’ নয়, বানানো।

তো আমার মনে প্রশ্ন এলো, এটা কী করে ঘটল? কী করে এই কুসংস্কার আমাদের মধ্যে দানা বাঁধল যে কৃষি মানেই পশ্চাতপদতা। আর ‘আধুনিকতা’ আর ‘অনাধুনিকতা’-র ব্যাপারটাই বা কি? ‘আধুনিকতা’ নিয়ে বিস্তার তর্ক চলছে। কিন্তু সেইসব চলছে বইপত্রে। আজকাল পোস্টমডার্নিজম নিয়েও হাঁক ডাক আছে। এই ধরনের তর্ককে বলা হয় speculative তর্ক, কাজের সঙ্গে তার যোগ কম। আমি কাজের সঙ্গে যুক্ত না করলে কোন জিনিস সহজে বুঝতে পারি না। বুঝতেও চাই না। জানি, আমার বুদ্ধি খুবই কম। আমি দেখি যে মানুষ কত বুদ্ধি প্রদর্শন করছে, তারা মডার্নিজম, পোস্টমডার্নিজম, উত্তরাধুনিকতা ইত্যাদি নিয়ে গল্প করে, লেখালিখি করে। বই পড়ে বইয়ের ভাষায় বইয়ের মধ্যেই লেখালিখি করে। এটা নাকি জ্ঞানচর্চা। এর জন্য যে প্রতিভার দরকার সেটা হয়তো আমার নাই। অন্যদিকে ভাব বা দর্শনকে কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, এই জিদ আরো অনেকের মতো আমার সবসময়ই ছিল। এখনও আছে। জিদটা বামপন্থীরা যেভাবে থিওরি এন্ড প্রাকটিস কিম্বা মেন্টাল আর ম্যনুয়েল লেবারের ব্যবধান ঘুচাবার জন্য দরকার বলে দাবি করে সেই দাবির চাপ আমি মানি। কিন্তু সেটা শ্রেণীভেদ মোচনের দিক থেকে যতোটা তাৎপর্যপূর্ণ, চিন্তা ও তৎপরতার ভেদ বুঝবার জন্য ততোটাই অপরিচ্ছন্ন। কারণ তত্ত্বচর্চাও চর্চা। আর বিশুদ্ধ চর্চা বলে কিছু আছে কিনা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।

দ্বিতীয়ত জীবনটা নিশ্চয়ই বই পড়ে কাটাবার জন্য হতে পারে না। অল্প সময়। ভাল করে নিজেকে উপভোগ করতে হবে। নিজের শরীর, কল্পনা, সংকল্প, আনন্দ, স্বপ্ন—সব কিছুই স্বাদ নেওয়া চাই। সেটা সরাসরি কোন কাজ না করলে কীভাবে সম্ভব? আত্মদান। নিজের স্বাদ নিজে গ্রহণ করা। অন্তরঙ্গে রাখা বহিরঙ্গে কৃষ্ণ—বঙ্গে এই ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষ হয়ে নিজেকেই নিজে আত্মদান করতে চেয়েছিলেন শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ‘আত্মদান কথাটির দার্শনিক তেজ, ওজন, আর ধার দারুণ। সেই কারণেই আমি নিজের জন্য একটি কাজের ক্ষেত্র খুঁজছিলাম যেখানে নিজেকে প্রকৃতি হিসাবে আমি যেমন স্বাদ নিতে পারি, আবার প্রকৃতিস্বরূপ হয়েও প্রকৃতির মধ্যেই কর্তাসত্তা বা ‘আমি’ ব্যাপারটা আসলে কি সেটা বুঝতে পারি। ‘কর্তা’-রূপ আর একই

সঙ্গে নিজেই 'প্রক্রিয়া' বা প্রাকৃতিকতার ইতিহাস হয়ে ওঠার একটা ভাব তৈরী হয়ে উঠছিল আমার মধ্যে। সেই জন্যে দুটো ক্ষেত্র আমি আমার জন্য খুবই উপযোগী ভেবেছি। এক. কৃষি কাজ। আর দুই. রান্না। দুটোই আবার আমার কাছে ভাব বা কাব্যের সমার্থক। এমন কাজ যেখানে আমার নানান বৃত্তির সঙ্গে আমার নিজেরই একটা সরাসরি বোঝাপড়া হতে পারে। নিজের শরীর ও প্রকৃতির সঙ্গে 'আমি' বা আমার অব্যবহিত সম্পর্কের ধরণটা সেই কাজের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি। আত্মদান। অর্থাৎ নিকে নিজের আত্মদান হয়। বঙ্গ দর্শন চর্চার এই ধারাকে একসময় বলা হোত 'তত্ত্ব'। বাংলার সাধক, যেমন ফকির লালন শাহ—এই অর্থেই একে বলবেন 'করণ'। সোজা কথায় 'করা'। ক্রিয়াপদ। করণ? যেখানে কর্তা ও প্রক্রিয়া বা পুরুষ ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন অথচ দেশকালপাত্র ভেদে আলাদা হয়ে পরস্পরকে জানছেন, পরস্পরের স্বাদ নিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে বদলে যাচ্ছেন, বদলাচ্ছেন, ইত্যাদি।

আধুনিকতার প্রশ্নে ফিরে আসি। আমি ভেবেছি যদি শুরুতেই আধুনিকতা বা প্রগতি সম্পর্কে কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় না করি তাহলে দর্শন বা ভাব চর্চা আমার দ্বারা হচ্ছে না। প্রথমত 'আধুনিকতা' নামক ধারণাটার দার্শনিক পর্যালোচনা জরুরী। কিন্তু এই ধারণা সম্পর্কে কুসংস্কার মাথায় নিয়ে তো সে পর্যালোচনা হতে পারে না। আধুনিক আর অনাধুনিক—এই দ্বিভাগ কে কখন কিভাবে কি উদ্দেশ্যে করে তার বিচারও তো দরকার।

কিন্তু আমি একটু আগ বাড়িয়ে কথা বলছি। আধুনিকতা আর অনাধুনিকতার দ্বিবিভাগ যেভাবে তাত্ত্বিকভাবে হাজির আমি সেই ভাবে অগ্রসর হওয়া আমার জন্য উপযোগী মনে করি নি। একই তর্কে আমরা প্রবেশ করতে পারি যদি 'শহর' ও 'গ্রাম' কিম্বা 'কৃষি' সভ্যতা বনাম 'শিল্প' সভ্যতা নিয়ে তর্ক করি। কেন কৃষি সভ্যতা অনাধুনিক আর পশ্চাতপদ? আর শহর মানেই আধুনিকতা? অথচ এই অনাধুনিক—আধুনিক ভেদ নিয়েই তো আমরা আছি। অথচ এটা যে একটা প্রশ্ন, এর যে মীমাংসা দরকার সেই তর্কে আমরা যাই না। কুসংস্কারের মতোই আমরা ধরে নিয়েছি গ্রাম মানেই মন্দ, শহর মানেই চকচক, ঝলমল, ভালো।

কিন্তু সেই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গেলেও কৃষি সভ্যতাটা আসলে কী জিনিস তার একটা অভিজ্ঞতা বা স্বাদ দরকার। আমি নয়াকৃষি শুরু করার বহু আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম এটাই হচ্ছে আমার জন্য পথ। আরো গভীর দরকারগুলো আগে থেকেই টের পেতাম। যেমন 'প্রকৃতি' কথাটার মানে কি? শহরের মানুষের কাছে তার যে অর্থ কৃষকের কাছে কি তার মানে একই রকম? যদি অর্থের মানে ভিন্ন হয় তাহলে অর্থের বিচার দিয়ে একটি শব্দ বা ধারণার পর্যালোচনা চলতে পারে না। যে পরিবেশ, পরিস্থিতি বা বাস্তবতার মধ্যে শব্দ বা ধারণাটি দানা বাঁধে তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অতএব আমি চাষী হওয়ার সাধনাকে ভাব বা দর্শন চর্চার জন্য আমার উপযোগী বলে শনাক্ত করেছি। হয়তো আমার স্বভাবের মধ্যে সবসময়ই একজন কৃষক ছিলেন।

সেটা ভুল করেছি নাকি ঠিক করেছি সেই বিচার আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যে কথাগুলো এখন আমি অনেক সহজে বলতে পারি সেটা অভিজ্ঞতার কারণে পারি। এটা বুঝি। বই পড়ে নয়। যদি আধুনিকতা বা পোস্টমডার্নিজম নিয়ে কেতাবি ভাষায় কথা বলতাম তাহলে অনেক কথা সহজ করে বোঝাতে পারতাম না। আমি স্বীকার করি ইংরেজি অনুবাদে ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার লেখা আমি পড়েছি। কিন্তু তাঁর বই পড়ে তাঁকে আমি যতোটা বুঝতে পারি, কাজের মধ্যে তাঁকে ধরতে পারি অনেক সহজে। একবার রিচার্ড কিয়ার্নি (Richard Kearney) আর তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সময় মডার্নিটি বা আধুনিকতা নিয়ে কথা উঠল। জাক দেরিদা বললেন, ‘মডার্নিটি নামক পরিভাষাটি নিয়ে আমি খুব সুখ পাই না’। এর অনেক কারণ আছে। একটা কারণ বোঝা খুবই সহজ যখনই কোন কিছুকে আমরা ‘আধুনিক’ বলে ছাপ মারি তখন তাকে আমরা একটা সরলরৈখিক ঐতিহাসিক গতিপথের মধ্যে দাগ টেনে চিহ্নিত করি। নীচু অবস্থা থেকে উচ্চতর একটা অবস্থায় কোন কিছুর বিবর্তন হয়েছে সেই কেচ্ছার মধ্যে ধারণাটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করি। এই রকম একদিক থেকে আরেকদিকে সরলরেখায় ছুটে যাচ্ছে এই রকম ‘ইতিহাস’ আদৌ আছে কিনা কিম্বা নীচু স্তর থেকে উচু স্তরে ‘বিবর্তন’ হয় এই রকম মানসিক সংস্কারের আদৌ কোন সত্যতা আছে কিনা সেই বিচার না করেই ‘আধুনিকতা’-র ওপর ছাপ মারা হয়।

ঠিক তেমনি ‘কৃষি’ সভ্যতা ইতিহাসের পিছে না আগে এই বিচার করবার আগে ইতিহাস সম্পর্কে অনুমান হোল ইতিহাস যেন দাগ টেনে দেখাবার মতো ব্যাপার, ওর আগপিছ আছে। সরলরৈখিক। কৃষি কি নীচু স্তরের সভ্যতা? কে বলবে? কারণ বিবর্তনের ধারণার মানদণ্ড দিয়ে কৃষিকে বিচার করাটাই তো দেরিদায় কথায় প্রশ্নবোধক হয়ে পড়েছে।

কিন্তু দেরিদা যে এইসব কথা বলেছেন এটা আমরা কমবেশী জানি। তাঁর যে কথাটা আমরা কাছে নতুন ও বেশী ভাল লেগেছে সেটা হোল এই রকম: ‘কোন কিছুর অর্থ কতোটা আধুনিক, অভূতপূর্ব বা নতুন হয়ে হাজির হোক তাতে কিছুই আসে যায় না, কিছুই কখনো একদম *মডার্নিস্ট* হতে পারে না, একই সঙ্গে সেটা *ফিরে আসা*ও বটে। ইতিহাসে আমাদের দুটো দিক খেয়াল রাখতে হবে। একদিকে ভেদ ঘটে যায়, যার মধ্যে ফাঁক বা অভাব তৈরি হয়। সেই ফাঁক বা অভাবের মধ্যে যেসব বিষয়গুলো ইতিহাসে খুবই গোপন ও ভুলে যাওয়া অধ্যায় হিশাবে লুকিয়ে ছিল তারা বারবার ফিরে আসে, ক্রমাগতই উঠে আসে... তাহলে (আধুনিকতা/অনাধুনিকতা—ফ.ম) এই ধরণের পরস্পর বিরোধী দার্শনিক কূটাভাসের পাল্লায় না পড়ে এই মায়া অতিক্রম করে একইসঙ্গে ঐতিহাসিক ভেদ আর ফিরে আসার ধারাবাহিকতা আমাদের বুঝতে হবে, যেখানে কখনই অতীতের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাঙন ঘটে না, আবার কোন কিছুই বিশুদ্ধ ধারায় বাহিত হয়ে যায় না’

খালি দেরিদা এই কথা বলেছেন, এটা ঠিক না। বহুজন এই ধরণের কথা বলেছেন। দেরিদার দোহাই দিয়ে নিজের কথা বলার সুবিধা হচ্ছে তাঁর খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা। তাঁর কথা ধরে নয়াকৃষি সম্পর্কে প্রথম যে কথা বলব সেটা হোল: নয়াকৃষির পেছনে শিল্প সভ্যতার বিপরীতে কৃষি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা কাজ করছে না। ‘কৃষি’ ও ‘শিল্প’ দুটোরই রূপ বা অর্থের মধ্যে কোথায় অভাব বা ফাঁক রয়ে গিয়েছে সেটা সুনির্দিষ্ট চর্চার মধ্য দিয়ে শনাক্ত করা এবং নতুন রূপটা দেখিয়ে দেওয়া বা নতুন অর্থের উৎপাদনই নয়াকৃষির সাধনা।

এই কথা যারা বুঝবেন তাঁরা সার আর বীজ ব্যাপারি বহুজাতিক কোম্পানির প্রপাগান্ডা মার্কা প্রশ্ন আশা করি আর করবেন না। যেমন, ‘আপনারা কি তাহলে মাস্কাতার আমলের কৃষি চালু করতে চাইছেন?’, ইত্যাদি। একজন বিশুদ্ধ ইডিয়টকে কে বোঝাবে যে সার, বিষ আর মাটির তলা থেকে পানি তুলে চাষাবাদ করাটাই এখন মাস্কাতার আমল হয়ে গিয়েছে। এটাই পুরনো ও বাতিল কৃষি। প্রাণবিজ্ঞানের জগতে একটা বিপুল বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, এরপর সার, বিষ আর পাম্পের পানি দিয়ে কৃষি কাজ করা আকাট মূর্খতার লক্ষণ। প্রাণ ও পরিবেশের ক্ষতির কথা তো তুললামই না।

আরেক প্রকার ইডিয়ট আছে। এরা বলে এতো মানুষ বাড়ছে ‘আধুনিক কৃষি’ ছাড়া মানুষ খাওয়াব কী করে? এই ইডিয়টকে কে বোঝাবে যে যদি এমন কৃৎকৌশল আমরা ব্যবহার করি যাতে প্রকৃতি ও পরিবেশই ধ্বংস হয়ে যায় সেই কৃৎকৌশল দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে কি করে? তাছাড়া বারবারই বিশেষজ্ঞরা বলছেন খাদ্য পৃথিবীতে যথেষ্ট আছে। খাদ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা নাই, মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি যোগান দেবার মতো খাদ্য আছে। কিন্তু মানুষ ক্ষুধার্ত কেন? কারণ বিতরণের সমস্যা। খাদ্য উৎপাদন হোল, কিন্তু যার পাওয়া দরকার সে পাচ্ছে না। তাকে দেওয়া হচ্ছে না বা তার কেনার সামর্থ্য নাই। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার চরিত্রই হচ্ছে এমন পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলেও গরিব না খেয়ে মরবে। তাহলে আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে উৎপাদন বা কৃৎকৌশলের সমস্যা বলবার কোন মানে হয় না। আসলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আড়াল করে, তার খোলনলচা বদলাবার কথা না বলে এরা মানুষকে সংখ্যা বানিয়ে যারা এই ব্যবস্থার শিকার তাদেরকেই অভিযুক্ত করে। আশ্চর্য!

নয়াকৃষি সেই অভাব আর ফাঁকগুলো নিয়েই তাহলে কাজ করছে। মানুষের বেড়ে ওঠার গোপন ও গভীর তলাগুলোতে যা হারিয়ে গিয়েছিল। যেগুলো ফিরে আসে বলে দেরিদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং কার্ল মার্কসও। মার্কস কি যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না সেই আদি অবস্থার কথা ভাবেন নি? মানুষের সঙ্গে মানুষের পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বিলয় ঘটানো গেলে মানুষের আসল রূপটা আমরা দেখব, তার আসল ইতিহাস শুরু হবে—এই কথাগুলো কি আমরা শুনি নি? আর যখন সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোতে সেই অভাব ও ফাঁকগুলো ফিরে আসে তাহলে তার রূপ কেমন হতে পারে তার আগাম খোঁজ নেবার জন্যই নয়াকৃষি।

বলাবাহুল্য কাব্য বা ভাবুকতার রূপ ধারণ না করে কিছুই প্রত্যাবর্তন করে না। ফলে কৃষি বা চাষাবাদ কথাটার ভাবার্থ বড়ো পরিসরে বুঝতে হবে। নইলে আমার কথা অস্পষ্ট থেকে যাবে।

নয়াকৃষি ও নয়াকৃষির দশ নীতি

কিন্তু নয়াকৃষি তো আসলে কৃষকদের ব্যাপার তাহলে তাঁরা কী করে কাজটি করলেন?

প্রায় অসাধ্য সাধনের মতো বাংলাদেশের কৃষকরা নয়াকৃষি আন্দোলন শুরু করেছেন। দশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলো। পেছনের দিকে তাকালে এটা এখন অবিশ্বাস্য মনে হয়, কারণ শুরুটাই ছিল অসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়ে। শুরুতে যেসব কৃষক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অদ্ভুত জীব মনে করেছিল অনেকেই। কিন্তু তাঁরাই পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণার ফলাফলের অভিজ্ঞতার ওপর নয়াকৃষি দাঁড়িয়েছে। নয়াকৃষি একান্তই কৃষকদের গবেষণার ফল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে বাংলাদেশের কৃষকদের নিজস্ব অবদান। প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কম পক্ষে পাঁচ ছয় বছর ব্যয় হয়েছে। তারপরই শুরু হয়েছে সফলতার আলোকে প্রচারের কাজ। সেই দিক থেকে নয়াকৃষির বয়েস পাঁচ ছয় বছরের বেশী হবে না। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু কৃষক পরিবার এই আন্দোলনের সঙ্গে আজ সরাসরি যুক্ত। যদি হিসাব করি নয়াকৃষি পরিবার সংখ্যা এখন দুই লাখ ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারি। অনুরাগী ও সমর্থক তো আছেই। কিন্তু এই সংখ্যা অনুরাগী ও সমর্থকদের বাদ দিয়ে। যেসব কৃষক পরিবার সরাসরি নয়াকৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে।

কৃষক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন, কিন্তু নয়াকৃষি ‘টেকনলজি’ নয়। টেকনলজির বাপ। শুরুতে চাষীদের হাতে আমি একটি লাঠি তুলে দিতাম। দিয়ে একটি বাচ্চা শিশুকে সামনে এনে বলতাম এর মাথায় একটি বাড়ি দিন। চাষীরা বোকা হয়ে আমাকে ভাবত আমার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলত, বাচ্চাটা তো মারা যাবে। আমি বলতাম, লক্ষ টাকা দেব একটা বাড়ি দিন। বলাবাহুল্য, আমি যে কিছু একটা বলতে চাইছি চাষী সেটা বুঝত। বলতাম, টাকা পেকে কি করবেন? লাভ হলে? কেন করবেন না? চাষীরা বলত, কারণ মাথায় বাড়ি দিলে বাচ্চাটির ক্ষতি হয় এটা আমরা জানি, তাই বাড়ি দেব না।

তখন বলতাম, তাহলে কীটনাশক ব্যবহার করলে কীটপতঙ্গ পশুপাখি, গরুছাগল, মানুষ সকলেরই ক্ষতি হয়? কীটনাশক ব্যবহার করেন কেন? তখন তারা বলত, কী করব? নইলে তো ফসল হবে না। বলতাম আগে যে কীটনাশক ছাড়া ফসল হোত? তখন কীভাবে হোত। তখন বেরিয়ে আসত পোকামাকড় রোগবলাই আসা শুরু হয়েছে আধুনিক কৃষিরই হাত ধরে। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়। যদি আমরা জানি আমার কাজে ক্ষতি হবে তাহলে সেই কাজ করব কেন?

চাষীরা এই নীতির দিকটা, নৈতিকতার শক্তিটা অতি অনায়াসেই বুঝত। তারা বলত, তাহলে কী করে সার আর কীটনাশক ছাড়া চাষাবাদ করা যায় আমাদের শিখিয়ে দিন। তখন আমি বলতাম, আমি কী করে শেখাবো? আমি তো শিখতে এসেছি। আর আমি তো জাদুকর না। একটা কিছু দিয়ে দেব আর তা কাজ করবে সেই জিনিস আমার নাই। আমি শুধু আপনাদের বিবেক জাগাতে এসেছি। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে সুরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া আমি আর কি করতে পারি? যদি ধর্ম থাকে তাহলে সার ও কীটনাশক ছাড়া কীভাবে চাষাবাদ করা যায় সেটা আপনারাই জানেন, ভুলে গেলে আবার ঘাঁর মনে আছে তাঁর কাছে শিখতে পারেন, কিম্বা নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবার বের করতে পারেন। আপনার মধ্যেই ধর্ম আছে, তাকে জাগিয়ে তোলেন।

নীতি, নৈতিকতা, বিবেক, ধর্ম—ইত্যাদি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিপরীতে স্থাপন করি। ইংরেজিতে *ethos* বা *ethical*—অর্থাৎ অপরের প্রতি সংবেদনা, সম্পর্ক রচনা ও পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের যে তাগিদ—তাকে *religion* বলে না। আবার বাংলায় যাকে আমরা ধর্ম বলি সেটা ইংরেজি *religion*-এর অনুবাদ নয়। কিন্তু আমরা গোলমাল পাকিয়ে ফেলি, গোলমালের মধ্যেই থাকি। ‘ধর্ম’—যা প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল একমাত্র সামাজিক মানুষের মধ্যেই সম্ভব—সেই ধর্ম ছাড়া মানুষের সমাজ, মানুষের ইতিহাস ইত্যাদি কথারও কোন মানে হয় না। সেই কারণে বাংলার ভাব পরিমণ্ডলে বাস করি বলে আমি বর্ণশ্রম প্রথা, বর্ণবাদ, শ্রেণী, পুরুষতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা—ইত্যাদির ঘোর বিরোধী হওয়া আর ‘ধর্ম’ বিরোধী হওয়াকে সমার্থক মনে করি না। ধর্ম নাই তো ‘মানুষ’ নাই। আর ধর্ম মানে হচ্ছে মানুষ কী করে প্রকৃতির সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া। তার ভিত্তিতে শত্রু মিত্র ভেদে রাখা টানা। কার্ল মার্কস, লেনিন বা মাও জে দং এই অর্থে ধর্মের সংগ্রামকে বলতেন, শ্রেণী সংগ্রাম। যে লড়াই পাশ্চাত্য অর্থে একই সঙ্গে *ethical* ও *political* পর্যায়ের লড়াই। নয়াক্ষি মার্কস, লেনিন বা মাও জে দংয়ের অর্থেও ধর্ম—অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর ঘটানোর সংগ্রামের পাশাপাশি নৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াইও বটে। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো যখন পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার এই কালে মানুষের দ্রবীভবন ঘটছে বা ঘটে গিয়েছে বলে দাবি করলেন, তখন তার মানে দাঁড়াল এই যে ইতিহাসের কর্তাসত্তা হিশাবে ‘পুঁজি’ বহাল তরিয়তে ঠিকই রইল, কিন্তু ‘মানুষ’ আর রইল না। বা ‘মানুষ’ থাকুক এটা তিনি চাইলেন না। একই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল বা পুঁজির মুনাফা কামানোর জন্য গোলাম হয়ে থাকা বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল রইল ঠিকই, কিন্তু মানুষের জায়গা থেকে—অর্থাৎ নতুন সম্পর্ক ও সংবেদনার জায়গা থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নতুন ধরণের সম্পর্ক নির্মাণের কোন সম্ভাবনাই তিনি আর রাখলেন না। অন্যদিকে জাক দেরিদা যখন নানাবিধ চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে সত্যের হালহকিকত নির্ণয় নিয়ে ব্যস্ত

রইলেন, তিনি মানুষের কর্তব্য নির্ণয়ের নতুন কোন পথ আর দেখাতে পারলেন না। ঘুরে ফিরে তাঁর রাজনীতি উদারনৈতিক রাজনীতির বলয়ের মধ্যেই খাবি খেয়ে শেষ হয়ে গেলেন। তাঁর বিপরীত ধারার দার্শনিক জুরগেন হেবারমাসও একই উদারনৈতিক রাজনীতিরই মধ্যেই। উভয়ে দুই মেরুর বলে আমরা জানতাম—কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান নেবার দিক থেকে দেখা গেলো তাঁদের গোড়া এক জায়গাতেই।

তাহলে ন্যাক্ষি আন্দোলন ‘ধর্ম’ বলে যে ভাবকে পরিচ্ছন্ন করতে চাইছে তাকে না বুঝলে ন্যাক্ষি আন্দোলনকে বোঝা সহজ হবে না। কারণ একদিকে ন্যাক্ষির কাজ আসলেই প্রথাগত অর্থে ‘বিজ্ঞান’ ও ‘কংকৌশলের’ সামনের সারির কাজ নিয়ে—অথচ ন্যাক্ষি তাকে এইকালে মানুষের নীতি, নেতিকতা, ধর্ম—অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংবেদনশীলতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে করতে রাজি না। ন্যাক্ষি যে অর্থে ‘ধর্ম’ বোঝে সেই অর্থে ‘নীতি’ নিরপেক্ষ বা ‘ধর্ম’ নিরপেক্ষ কোন বিজ্ঞান নাই। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কংকৌশলকে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক, প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনব্যবস্থা ও রাজনীতি থেকে আলাদা স্থাপন করবার যে কুসংস্কার দানা বেঁধে আছে, ন্যাক্ষি সেই কুসংস্কার মানে না। মানুষের বিকাশের জন্য এই কুসংস্কারগুলোই ভয়ানক বাধা হয়ে আছে।

ওপরের কথাটা যদি বোঝাতে পারি তাহলে বোঝা যাবে কেন ন্যাক্ষি গ্রীন রেভ্যুলিউশন বা ‘সবুজ বিপ্লব’-এর মতো নতুন কোন টেকনোলজি বাইরে থেকে প্রবর্তনের প্রস্তাব করে ও চাপিয়ে দিয়ে শুরু করে নি। অথচ সবসময়ই বিজ্ঞান চর্চা কংকৌশল প্রবর্তন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এই আন্দোলনের অন্তর্গত তাগিদ ছিল। অন্তর্গত তাগিদ কেন? কারণ আবিষ্কারটা হতে হবে কৃষকেরই ভেতর থেকে, হতে হবে কৃষকেরই আবিষ্কার। হাজার বছর ধরে কৃষক আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে কৃষি সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। মানুষ ও প্রকৃতির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে ভূমিকা রেখেছে। কী প্রণোদনা কাজ করেছে সেই আবিষ্কারের পেছনে? ন্যাক্ষি সেই প্রণোদনাকে কাজে লাগাবে বলে প্রথম থেকেই মনস্থির করেছিল। শুরু থেকেই এই দিকটা পরিষ্কার ছিল। এই প্রণোদনা বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শিল্পসভ্যতা এবং শহুরেপনার কারণে নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তথাকথিত ‘আধুনিকতা’ কিম্বা শহুরে হওয়া মানেই ‘সভ্য’ হওয়ার দাপটের বিপরীতে এই কালে সেই প্রণোদনাকে শুধু বিজ্ঞান ও কংকৌশলে মনোযোগী হলে চলছে না, নেতিক ও রাজনৈতিক হয়েও উঠতে হচ্ছে।

কিন্তু কেন কৃষকের প্রতি এই পক্ষপাত? প্রথম কারণ হচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জ্ঞানের একটা বিভাজন ঘটেছে। যাকে আমরা এখন ‘বিজ্ঞান’ বলি—এটা আসলে কর্পোরেট বিজ্ঞান। যুদ্ধবাজ ও হানাদার সংস্কৃতি থেকে এই ‘বিজ্ঞান’ বা ‘টেকনোলজি’-কে আলাদা করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজ্ঞান বললেই মনে হয় ডিগ্রীধারী কিছু লোক তাদের নিয়ন্ত্রিত ল্যাবরটরিতে যেসকল পরীক্ষানিরীক্ষা করে—ওটাই শুধু ঘটনাঘটন

ব্যাখ্যার একমাত্র এবং শেষ উপায়। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের যে স্পিরিট আমরা আগে দেখেছি, নানান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে লড়েছে, মানুষের সংকল্প, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, কল্পনার ওপর দাঁড়াবার জন্য তার যে লড়াই—এখন সেটা আর নাই, এখন বিজ্ঞান দাঁড়ানো মুনাফার ওপর। লাভ নাই তো সেই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানও নাই। যেমন, কী জানলে বা কী ধরনের গবেষণা করলে বাংলাদেশের কৃষকের সমৃদ্ধি হবে, খাদ্যে সার্বভৌমত্ব আসবে—কর্পোরেট বিজ্ঞান সেই কাজে উৎসাহী নয়। কিন্তু ধানে ড্যাফোডিল জীন ঢুকিয়ে হলুদ বানিয়ে তাকে ভিটামিন এ ধান বানাতে সিনজেন্টা কর্পোরেশানের মহা লাভ। সেই দিকেই কর্পোরেট বিজ্ঞানের নজর। বাংলাদেশের কোন ধানে ফলন বেশী, আর ‘ফলন’ বলতে বাংলাদেশের কৃষক কী বোঝে সেটা বিজ্ঞান জানতে চায় না। জানতে চায় কী ধান বাংলাদেশের কৃষক ব্যবহার করলে কীটনাশক, সার ও বীজ কোম্পানির মুনাফা হবে। সেই ধরনের প্রজাতি ও জাত প্রবর্তন করছে বিজ্ঞান যাতে কোম্পানির লাভ কিন্তু কৃষকের সর্বনাশ।

অতএব বিজ্ঞানকে পুঁজির কবল থেকে মুক্ত করবার একটা লড়াই জারী রাখতে হবে। সেই লড়াই তীব্র করবার শর্ত হচ্ছে কৃষক তার দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা, তার যুক্তি, তার দেখবার ও বিচার করবার ক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিদিন যে ‘জ্ঞান’ নির্মাণ করছে তাকে দৃশ্যমান করে তোলা। বিজ্ঞানীর মতো কৃষকও পরীক্ষানিরীক্ষা বা trial and error-এর মধ্য দিয়ে এগোয়—কোনই তফাত নাই। এই জ্ঞানের শক্তিটাকে উন্নত কৃষিচর্চার মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া নয়াকৃষির কাজ। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার ইতিবাচক ফলাফলগুলো যেন কৃষক তার জ্ঞানপ্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তার জন্য তার পথ পরিষ্কার করে দেয় নয়াকৃষি। কাজের মধ্য দিয়েই নয়াকৃষি প্রমাণ করে যে এই কালে বিজ্ঞান আসলে কর্পোরেশানের হাতে বন্দী। এই বিজ্ঞান সত্যিকারের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র নয়, মুনাফার ক্ষেত্র মাত্র। বিপরীতে দরকার সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। নয়াকৃষি সেই কারণের কৃষকের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে। কর্পোরেশানের বিপরীতে মানুষের জ্ঞান, চর্চা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার শক্তিকে তার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এই আন্দোলন।

শ্রুতি ও কন্ঠনির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে (Oral Cultures) তথাকথিত গ্রন্থকেন্দ্রিক (Textual and linear Culture)। আজকাল এই সত্য কমবেসি প্রতিষ্ঠিত যে শ্রুতি ও কন্ঠনির্ভর সংস্কৃতির মধ্যে জ্ঞানের জে চর্চা ও বিকাশ তার নিজের একটা স্বভাব আছে, গ্রন্থকেন্দ্রিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যার নাল পায় না। অতএব এই সংস্কৃতি ও তার জ্ঞানকলাকে রক্ষারও একটা দায় আছে নয়াকৃষির। এই কাজটি করতে গিয়ে নয়াকৃষির পাশাপাশি গড়ে উঠেছে নবপ্রাণ আন্দোলন।

আসলে ‘টেকনলজি’ বা ‘কৃৎকৌশল’ কথাটি তো খুবই প্রশ্নবোধক ধারণা। ‘উচ্চ ফলনশীল বীজ’ মানে কি? যে বীজে সার, বিষ আর পানির পাম্প ব্যবহার করতে হয়? যদি দেশীয় ধানের জাতে ঠিক মতো সার দেওয়া হয়, মাটি ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি

ঠিক রাখা হয় তাহলে কি দেশী জাত একই ফলন দেয়, নাকি দেয় না? সেই গবেষণা কই? কে করল? অথচ পঞ্চাশ দশকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন ও লিখেছেন যে স্থানীয় বহু জাত আছে যার উৎপাদনশীলতা তথাকথিত ‘উফশী’-র চেয়ে বেশী। তাহলে ফোর্ড আর রকফেলার ফাউণ্ডেশান আর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সম্প্রসারণ কর্মসূচী হিশাবে ‘উফশী’ নামক যে জাতগুলো একদিকে চালু করা হোল আর অন্যদিকে কৃষকের হাজার হাজার জাত চুরি (biopiracy) করে নিয়ে যাওয়া হোল তার পেছনের উদ্দেশ্য কি উন্নত কৃৎকৌশল প্রবর্তন নাকি অন্য কিছু? ‘সবুজ বিপ্লব’ তো ‘লাল বিপ্লব’ ঠেকাবার রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল। সেই বিচারও তো দরকার।

সবুজ বিপ্লবের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে কৃৎকৌশলের সমালোচনা দিয়েই এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু নতুন ধরনের কৃষি চর্চার ফলাফল হিশাবে নয়াকৃষি নিত্য নতুন আবিষ্কার ও কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করেছে। সার, বিষ, পানির পাম্প দিয়ে মাটির তলার পানির ব্যবহার নয়াকৃষিতে হয় না। নয়াকৃষির এই সব হচ্ছে প্রাথমিক সরল পদক্ষেপ। তারপর ক্রমশ নয়াকৃষির চাষাবাদ পদ্ধতি আরও জটিল, নতুন, প্রকৃতির প্রাণবৈচিত্র্য ব্যবহারে আরো বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে প্রকৃতি বা আরও বড়ো পরিসরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পর্ক বেড়েছে। বাংলার প্রাচীন ভাব ও ভাষার অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যেমন ফকির লালন শাহ ও বাংলার সুফি, দরবেশ বয়াতিদের ভাব ও জীবনযাপনের সঙ্গে নয়াকৃষির আন্তরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হয়েছে। নয়াকৃষি হয়ে উঠেছে একটা জীবন যাপন পদ্ধতি, জীবনের প্রতি একটা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সুস্বাস্থ্য নিয়ে আনন্দময় জীবন যাপন। কৃষকদের এই ভাবের কথাগুলো নতুন করে বোঝাতে হয় নি। এটা তাদের মধ্যেই ছিল। নিজেদের কুসংস্কার, ভুল চিন্তা, অনৈতিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাদের নিজেদেরই সংগ্রাম আছে। তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণীভেদ, লিঙ্গভেদ, পুরুষতান্ত্রিকতা, অধিপতি শ্রেণীর চিন্তা-চেতনা ও আকাশ্ণার আধিপত্য—সবই আছে। কমবেশী সবসময়ই হাজির থাকে। এই সবের বিরুদ্ধে সে তার নিজের ভাব নিজের ভাষা নিয়ে সবসময়ই লড়ছে। আমাদের কাজ ছিল সেই ভাব আর ভাষা আয়ত্ত্ব করা, কৃষকের চিন্তার জগতটাকে কৃষকের জীবনচর্চার জায়গা থেকেই বোঝা। তারপর বিরোধগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা এবং সংকটগুলো চেনা। তারপর কৃষকেরই চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাধান খুঁজে বের করা অথবা অন্য শ্রেণী বা পেশার চিন্তার সঙ্গে তাকে পরিচিত করানো। যদি নগদ হিশাব করি তাহলে বলতে হবে এতে আমাদের উপকার হয়েছে বেশী। আমরা শিখতে পেরেছি দ্রুত এবং নিজেদের ভুল চিন্তা সহজেই আমাদের নিজের চোখেই ধরা পড়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের উপকার হয়েছে অসামান্য।

আধুনিক কৃষির নামে রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার করে কৃষি কাজ করানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সেচের জন্যে শ্যালো এবং ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহার করা

হয়। আধুনিক কৃষিতে প্রথম দিকে ফলন বেশী হয়, তাও শুধু ইরি ধানের, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ফলন পড়তির দিকে ধায়। তখন বেশি বেশি সার-বিষ দিলেও আর কাজ হয় না। ইতোমধ্যে মাটি নষ্ট হয়, মাটির স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে বাংলাদেশের প্রাণবৈচিত্র্য ভিত্তিক বাহারি ও নানা জাত ও প্রজাতির ফসল চাষের চর্চা ও সংস্কৃতি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় biodiversity-based production systems—মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ময় বা ধ্বলস হয়ে যায়। ওর জায়গায় এক ফসলী চাষাবাদ বাড়ে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় monoculture। ইরি ধান বা বিরি ধান করতে গিয়ে কৃষক নিজের ঘরের বীজ হারায়। এক ফসলের অভিজ্ঞতাও তিক্ত হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে মাছ মরে, পশুপাখী কমে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং কৃষক ধুঁকে ধুঁকে শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। এখন কৃষক আর্সেনিকের বিষে মরছে। গরিব আরো গরিব হয়, জমিহারা হয়, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে বসে। একসময় দেখা যায় সেই গ্রামের বাড়ন্ত ঘরের কৃষকটিই বা তার ছেলে মেয়ে হাত পাতছে পেটের ক্ষুধায়। পাচার হয়ে যাচ্ছে নারী ও শিশু।

বাঁচার জন্য অনেক কৃষক অন্য পেশায় চলে যায়। মনে রাখা দরকার কৃষককে জমি ছাড়তে বাধ্য না করা হলে কিম্বা জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ না হলে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিস্তার সম্ভব নয়। কারণ এরাই তো কারখানায় নিজের শ্রম বিক্রি করে পুঁজিকে বাড়তি মূল্য উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে। যারা অন্য পেশায় যায় না বা উচ্ছেদ হয় না তারা এখনও কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করে চলেছেন। নয়াকৃষি মনে করে না যে কৃষককে চিরজীবন কৃষকই থাকতে হবে। কিন্তু গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর তো বা বিশ্ব পুঁজির দরকার মিটিয়ে সম্পন্ন করতে হবে এমন কোন কথা নাই। নয়াকৃষি মনে করে লেনিন ও মাও জে দংয়ের কথা সঠিক যে শহরের খেটে খাওয়া শ্রমিক ও জনগণের সঙ্গে কৃষকের একটা ‘বৈপ্লবিক মৈত্রী’ তৈরীর রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আছে বাংলাদেশে, যে মৈত্রীর ভিত্তি হবে আমাদের গ্রামে এবং শহরে উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তরটা কীভাবে করলে আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে বিশ্বব্যবস্থায় শক্তিশালী জনগোষ্ঠী হিসাবে টিকে থাকতে পারব।

নয়াকৃষি মনে করে সেই রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে কৃষকদের কৃষি কাজে টিকিয়ে রাখা এবং বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার কাজও জরুরী। সেই জন্যও ফসল উৎপাদনের জন্য একটা নতুন পথ খোঁজার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কৃষকের বাঁচা মরার লড়াই থেকেই নয়াকৃষি আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক পর্বটির শুরু। ফাঁপা বুলি বা যারা কৃষকদের শোষণ ও শাসন করে সেই ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে দাবি দাওয়া তুলবার প্রহসন করে আমরা নয়াকৃষি আন্দোলন শুরু করি নি। সেটা দরকার, কিন্তু নিজেরা যা পারি তা তো আগে করতে হবে। কৃষক তার নিজের সমস্যা নিজে কতোটা আগে সমাধান করতে পারে সেই কাজে মনোযোগ দিয়েছি। এবং সেই কাজ করতে গিয়েই কৃষকদের সংগঠিত করা বেশি ফলপ্রসূ মনে করেছি।

এতক্ষণ যা বলেছি তার তিনটি দিক খেয়াল করতে হবে:

এক. নয়াক্ষির ভাবগত বা দার্শনিক দিক, এখনকার অধিপতি দর্শন, ভাব বা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা চেতনা দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি মোকাবিলা। আমি শুধু ভাবের দিকটা খানিক ইশারায় বলেছি, বাকি দিক নিয়ে অন্যত্র বলা যাবে। এখানে তা বাহুল্য হবে।

দুই. বিজ্ঞান ও কংকৌশলের সামনের সারির কাজে উৎসাহী থাকা এবং নতুন প্রণোদনা, আবিষ্কার ও সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতন থাকা। নয়াক্ষি মানে নতুন ধরণের কৃষি—এটা পুরানা বা প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা নয়। আবাসবিদ্যা (ecology), প্রাণবৈচিত্র (biodiversity), নানান প্রাণ ও অপ্রাণ মিলে একটি আবাসে যে বিশেষ ধরণের সক্রিয় রূপ পরিগ্রহণ করে (ecosystem ebL ecosystem 'unction)—ইত্যাদি বিজ্ঞানচিন্তার খুবই সামনের সারির ব্যাপার। প্রাণবিজ্ঞানের জগতে যে বিপুল বিপ্লব ঘটেছে নয়াক্ষি তাতে সাড়ে ষোল আনা উৎসাহী এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে নয়াক্ষি অবদান রাখতে চায়।

তিন. মানুষের, বিশেষত কৃষক ও একই সঙ্গে গ্রাম থেকে উজাড় হয়ে যাওয়া শহরের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর এই মুহূর্তের, এখনকার সমস্যা সমাধানের জন্য নয়াক্ষি সমান সংকল্পবদ্ধ। বিপ্লবের পর সব ঠিক হয়ে যাবে—এই আশায় নিজের এই মুহূর্তের দায়িত্ব এড়াবার প্রতিশ্রুতি নয়াক্ষি দেয় না। কিন্তু শুধু নয়াক্ষির মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটবে এই মিথ্যা কথা নয়াক্ষি বলে না।

কোন বইপত্রের তত্ত্ব নিয়ে কিম্বা কারো কারিগরি পরিকল্পনা মাফিক নয়াক্ষি গড়ে ওঠে নি। নিজেদের সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কৃষককে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। ষাট দশক থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত আধুনিক কৃষির নামে রাসায়নিক সার, বিষ, পাম্পে তোলা সেচের পানি এবং তথাকথিত 'উফশী' বীজ ব্যবহার করে দেশের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ আবাদি জমি ইতিমধ্যেই একফসলী ব্যবহারের অধীন চলে এসেছে। কৃষকরা সার ও বিষ ব্যবহারের ভয়াবহতা বা সেচের পানি তোলার ফলে ভূগর্ভের পানির ভয়াবহ সমস্যা অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন। আর্সেনিকের বিষে বিশাল জনগোষ্ঠী এখন আক্রান্ত। এখন কি হবে? অধিক ফলনের নামে যারা লক্ষ লক্ষ মানুষ মারার অবস্থা সৃষ্টি করেছে এদের বিচার কে করবে? ওদিকে গরিব কৃষকরা চাইলেও আর নগদ টাকা দিয়ে সার-কীটনাশক কিনতে পারছেন না। এখন শুরু হয়েছে কৃষকের বীজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য হাইব্রিড বীজের আমদানি। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি। ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নয়াক্ষির কৃষক সংগঠিত হচ্ছেন।

নয়াক্ষি আন্দোলনের প্রথম কাজ কৃষকের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোলা। অর্থাৎ সমাধান কৃষকের কাছে নাই সেটা কোম্পানি বা সরকার করে দেবে এই

ধারণা থেকে মুক্ত করে আনা। তাকে মানসিক বল দেয়া। সংকটের সমাধান যে তার হাতের কাছেই আছে সেই দিকটা তুলে ধরা। যেটুকু জমি তার আছে তাতেই নগদ কোন টাকা খরচ না করে কি করে উন্নত চাষাবাদ করা যায় তার কিছু প্রাথমিক পদ্ধতি আবিষ্কার নয়াকৃষির প্রথম সাফল্য। দ্বিতীয়ত কৃষক নিজের জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কি করে আরো উন্নত পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে পারে শর্ত তৈরি করে দেয় নয়াকৃষি। স্থানীয় জাত নিয়ে নানান ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা, মিশ্র ফসলের বিপুল ফলন বৃদ্ধির সাফল্য এবং সর্বোপরি পোকামাকড়, কীটপতঙ্গসহ সব প্রাণই যে সম্পদ এবং কী করে আপদকে সম্পদে পরিণত করতে হয় অতি উৎসাহে চলে তার গবেষণা। যে পোকামাকড় কীটপতঙ্গকে কৃষক শুধু অপকারী বলে এতোকাল ‘আধুনিক’ কৃষির কাছে শিখেছে, অচিরেই কৃষক টের পায় এগুলো ডাহা মিথ্যা কথা। একটি ফসলের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি পোকা অপকারী মনে হলেও সামগ্রিক কৃষির জন্য সেই একই পোকার অসাধারণ অবদান কৃষক টের পায় এবং কী করে সেই পোকাকে বিষ দিয়ে ধ্বংস না করে ফসলের মাঠ থেকে তাড়ানো যায় তার গবেষণা কৃষক শুরু করে। সমাধান বের করতে তার মোটেও বিশেষ সময় লাগে না। আপদকে কৃষকের উপকারী প্রাণ সম্পদে পরিণত করতে পারায় বিপুল উৎসাহে নয়াকৃষি বেড়ে ওঠে। এখন নয়াকৃষি মাছ, গরুছাগল, হাঁসমুরগি পালন, ফলমূল চাষ, মশলা চাষ, ওষুধি গাছ সংরক্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কৃষি পরিবারের দ্রুত আর্থিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনয়নের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে। নয়াকৃষি নিজের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের ওপর এখন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারো সাধ্য নেই তাকে এখন কেউ টলায়।

কীটনাশক বন্ধ করার জন্যে কৃষকদের মধ্যে প্রথম থেকেই মতৈক্য ছিল। বিশেষত মহিলারা নিজেদের ও শিশুদের স্বাস্থ্যের বিপর্যয়ের কথাটা প্রথম থেকেই বলছিলেন এবং তাঁরা কীটনাশক অবিলম্বে বন্ধ করার কথা তুলেছেন। কীটনাশক বন্ধ করার জন্য প্রথমদিকে যেসব কৃষকরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত ছিলেন ক্ষুদ্র চাষী এবং মহিলারা। প্রথম অবস্থায় যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা দলে দলে সংগঠিত হয়ে সবুজ সার তৈরি ও কম্পোস্ট তৈরি করা এবং এর ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তাঁরা কম্পোস্ট তৈরি করতে লাগলেন কচুরি পানা দিয়ে এবং এ থেকে জৈব সার তৈরি সহজ হবার কারণে ধীরে ধীরে কম্পোস্ট কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বর্ষাকালে এই কচুরিপানা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ আত্মোপলব্ধির কারণেই ফসল উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার থেকে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করতে পারলেন। এটা ছিল নয়াকৃষি আন্দোলনের অগ্রযাত্রার একটা বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রথম ধাপ। কারণ দীর্ঘ বিশ ত্রিশ বছরের আধুনিক কৃষির প্রচার এবং সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতার পর নতুন কোন ধারণা আছে কিনা এই কথা বোঝা তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। কিন্তু

কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে আত্মবিশ্বাস জন্মানোর কারণে তাঁরা নয়াকৃষি পদ্ধতির চাষ করাকে একটি আন্দোলনের রূপ দিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য নয়াকৃষির সাধারণ কিছু নীতিও ঠিক করে নিলেন। কৃষকদের বিভিন্ন সভায় এবং তাঁদের নিজস্ব কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নয়াকৃষির নীতিগুলো কবিতার ছন্দ আকারে গড়ে উঠতে থাকে। কৃষকরা বলেন, নয়াকৃষি কোন যাদুগরি নয়, কলাকৌশল নয়, কোন নতুন প্রযুক্তির প্রচলনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানির ধন্দাও নয়। এটা আমাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার একটি আন্দোলন। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে নতুন কিছু করতে হলে কাজের জন্যে সুনির্দিষ্ট নীতি আমাদের লাগবেই। আমরা আনন্দে থাকতে চাই সবাইকে নিয়ে, সব ধরনের প্রাণী নিয়ে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের মিথ্যা কথা বলে অন্য সকল প্রাণ হত্যা করার উল্লাস কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। এটা পিশাচের কাজ। নয়াকৃষি আন্দোলন মানুষসহ গাছ-পালা, লতা গুল্ম, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ—প্রতিটি প্রাণীর প্রতি ভালবাসা ও মায়া মমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নয়া কৃষি জীবন ও জগতের প্রতি একটি আনন্দময় দৃষ্টিভঙ্গী। পরম আনন্দই সজ্ঞান জীবনের লক্ষ্য—এটা কৃৎকৌশলের নীতিহীন ভাষ্য নয়। এটাই মনুষ্যজীবন।

অন্যদিকে নয়াকৃষির অতি অগ্রসর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বুঝতে যারা অক্ষম তাঁরা অনেকেই একে পুরানা জমানার কৃষি মনে করেন। পুরানা জমানার কৃষি কিন্তু আধুনিক কৃষির মতো ধ্বংসাত্মক নয়। তবে পুরানা জমানার কৃষি বলতে তাঁরা বোঝান নিম্ন মানের প্রযুক্তি এবং ল্যাবরেটরি মার্কা বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি। এঁরা অবশ্যই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এঁদের ধারণা রাসায়নিক সার-বিষ, সেচের যন্ত্র এবং ল্যাবরেটরীতে উৎপাদিত এবং কোম্পানীর বাজারজাত বীজ করলেই সেটা “উন্নত” প্রযুক্তি। বিষে ও পরিবেশ বিপর্যয়ে সবদিক ধ্বংস হলেও। যারা আধুনিক কৃষির খাদ্য খান তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে প্রতিদিন পরিবারের সদস্যদের তাঁরা বিষ খাওয়াচ্ছেন এবং নিজেও খাচ্ছেন। নয়াকৃষি ছাড়া বিষহীন খাদ্য তিনি কোথায় পাবেন? তথাকথিত ‘আধুনিক’ কৃষিই আসলে পুরাতন পশ্চাতপদ কৃষি—কারণ সার ও বিষ ছাড়া ফসল উৎপাদন করা যায় এবং অতি সহজেই অধিক ফলন ফলানো সম্ভব সেই বিজ্ঞানের খবর ‘আধুনিক’-দের কানে পৌঁছায় নাই। কিম্বা পৌঁছালেও কীটনাশক, সার ও পাম্প কোম্পানির স্বার্থে তারা সেটা বলেন না। চেপে যাচ্ছেন।

অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারবাদী ও বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা লুটকারী কৃষির বিপরীতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য কৃষকরা তাঁদের আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন ‘নয়াকৃষি’। মানুষের জন্য এবং অন্য যে কোন প্রাণীর জন্যে ক্ষতিকর পদ্ধতি বাদ দেওয়া, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষত্রের নতুন আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা কৃষি কাজে ব্যবহার, প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা ও বিকাশ এবং সবচেয়ে বড় কথা কৃষকের জ্ঞানের ভিত্তি, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক শক্তি বিকশিত করে তোলাই নয়াকৃষির মোদ্দা কথা।

প্রথম অবস্থায় কৃষকের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্প সন্ধান। প্রথমে তাঁরা জৈব সার এবং জৈব কীটনাশকের ব্যবহারও করেছেন। পরে দেখা গেলো আসলে শুধু রাসায়নিক নয়, কীটনাশক জৈব হলেও তার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। জৈব কীটনাশকও প্রাণ হত্যা করে। কৃষকরা নিজেরাই পদ্ধতি খুঁজে পেলেন। আসলে পোকা দমন বলে কিছু নেই, মূল কথা হচ্ছে কী করে ফসলের সাথে কীটপতঙ্গের ব্যবস্থাপনা একীভূত করা যায়। একক ফসল না করলে তো অনেক পোকাই আসে না। মিশ্র ফসলের ক্ষেত্রে এক ফসলে যা অপকারী, অন্য ফসলে তা উপকারী। তাহলে নয়াকৃষি চাষাবাদে ফসলে পোকা লাগা কথাটার তো কোন মানে হয় না। তাছাড়া পাখী এবং অন্যান্য প্রাণী থাকলে তারাই নিজেদের আহার হিসেবে পোকা খেয়ে ফেলে। এভাবে নয়াকৃষির কৃষকদের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে তাঁরা কোন অবস্থাতেই প্রাণ হত্যাকারীর ভূমিকা নেবেন না। এই সিদ্ধান্তের যে নৈতিক আনন্দ তার তুলনা চলে না। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, অতএব তাকেই সকল প্রাণ সংরক্ষণ, রক্ষা ও বিকাশের দায়িত্ব নিতে হবে, এই উপলব্ধি নয়াকৃষির কৃষকের জীবন বদলে দেয়। তার শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ দাঁড়ায় সৃষ্টি রক্ষা ও বিকাশের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণে। এর ফলে নয়াকৃষি ধর্মপ্রাণ অথচ অসাম্প্রদায়িক জনগণের মনের কথা হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যক্তির উর্দ্ধে সমষ্টির স্বার্থ এই নীতিতে যারা সমাজ গড়ে তুলবার আদর্শে বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছেও এই চাষাবাদ চর্চা রাজনৈতিক চর্চারই সম্প্রসারণ বলে অনায়াসেই স্বীকৃত হয়। নয়াকৃষি ধীরে ধীরে নিজের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে থাকে।

রাজনীতির আরো প্রথাগত অর্থ যদি ধরি তাহলে নয়াকৃষি সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতির চর্চা। একথা আগেই বলেছি। এই চর্চা নিছকই রাজনীতির চর্চা মাত্র নয়, একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তুলবার চর্চা। রাসায়নিক সার, বিষ ও পাম্প বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য। সাম্রাজ্যবাদী বাজার সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে এইসকল ‘কৃৎকৌশল’ কৃষিতে প্রবর্তন করা হয়েছে। কৃষক নিজের কৃৎকৌশল সাম্রাজ্যবাদী টেকনলজির বিপরীতে প্রতিস্থাপন করে এবং কৃষির উৎপাদন সম্পর্কে এমন এক রূপান্তর ঘটায় যা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অথচ ফলাফলের দিক দিক থেকে অনেক উন্নত। নয়াকৃষি আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের বিপরীতে নতুন ধরণের শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করে।

ফলে নয়াকৃষি করবেন বলে যদি কোন কৃষক সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাঁর প্রথম পরীক্ষা হয় তিনি কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করেছেন কি না। এভাবে নয়াকৃষিতে প্রথম নীতি হিসেবে স্থান পেলো কীটনাশক বন্ধের বিষয়টি। এরপর সার ব্যবহার, বীজ সংরক্ষণ করা, মাটির তলার পানি ব্যবহার একে একে কৃষির ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে নীতি ঠিক হয়ে গেলো। আধুনিক কৃষি আসার পর এই প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান বিলুপ্ত করে বিদেশ থেকে আনা প্রযুক্তির ওপর

নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। এর ফলাফল হিসেবে আমরা দেখেছি পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। কৃষকের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষক পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থার বিপরীতে নয়াকৃষির কৃষকরা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখা কৃষিকাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে নীতি প্রণয়ন করেছেন। মনে রাখার জন্য হাতের দশটা আঙুল গুণে নয়া কৃষির দশ নীতি মুখস্থ রাখছেন। সেই দশ নীতি এখন কৃষকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার কৃষকরা একত্রিত হচ্ছেন, সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

কিন্তু হুঁশিয়ার করে দওয়া দরকার যে নীতি মানে এককাট্টা একরকমের “মডেল” নয়। নয়া কৃষির প্রতিটি কৃষক পরিবারই ভিন্ন, নয়া কৃষি মানেই কৃষক পরিবারের বৈচিত্র্য, গ্রামের বৈচিত্র্য আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, ইত্যাদি।

সেই জন্য নয়াকৃষির কৃষক ছড়া আউড়িয়ে বলেন: নীতি শুধু ভাবগীতি, অঞ্চল ভেদে চাষ নীতি।

নয়াকৃষির কৃষক ভাই ও বোনেরা ছন্দের মাধ্যমে, গানে গানে এবং কবিতায় যতোভাবে সম্ভব তাঁদের কথা আর দশজন কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। সব কৃষক ছাপার অক্ষরে পড়তে পারবেন না বলে তাঁরা কথা এবং গানের মাধ্যমকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। এতোদিন এই দশনীতি ছাপা হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, পাবনার কৃষকরা নতুন নতুন গবেষণা এবং কাজ করে এখন অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। এখন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে, নতুন এলাকার কৃষকরা নয়াকৃষি আন্দোলনে যুক্ত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। ইতিমধ্যে নিশ্চিত বিষয়গুলো নীতি আকারে তাঁরা হাজির করেছেন। নয়াকৃষি আন্দোলনের কৃষকদের দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতার ফসল এই দশ নীতি। টাঙ্গাইলে ১৯৯৮ সালে একটি কর্মশালায় সকল এলাকার কৃষক এবং নয়াকৃষি আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মী, নবপ্রাণ আন্দোলনের শিল্পীরা মিলে দিনে রাতে বিস্তারিত আলোচনা করে এই নীতিগুলো চূড়ান্ত করেছেন। এরপর প্রতিবছরই আবার পর্যালোচনা চলেছে। কাজের মধ্য দিয়ে চিন্তা আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

‘লোকায়ত’ জ্ঞান, প্রাণবৈচিত্র্য আর নয়াকৃষি

কর্পোরেট বিজ্ঞানের বিপরীতে নয়াকৃষির জ্ঞান বা বিজ্ঞান চর্চার যে প্রভেদ টেনেছি সেই কথাটা আরো বোঝাবার জন্য আরো কিছু কথা বলা দরকার।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের দিকে ইউরোপে ও মার্কিন দেশে মার্কসের তরুণ বয়সের রচনা কেন্দ্র করে ‘বিচ্ছিন্নতা’, ‘বিচ্যুতি’ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত দার্শনিক আলোচনা হয়। হয়েছে। এর ইতিবাচক দিক হচ্ছে মার্কসের তরুণ বয়সের লেখালিখিগুলো আবার পাঠ্য বিষয় হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই লেখাগুলোর বরাতে মার্কসের একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার চেষ্টা চলেছে যার মধ্যে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে নিরামিষ করে দেওয়া

যায়। মার্কসের দর্শনের একটা সার কথা হচ্ছে দর্শনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, চর্চার 'জগতে' প্রত্যাবর্তন করা। (এখানে 'জগত' কথাটি উপনিষদের অর্থে বুঝতে হবে। জগত মানে যা চলমান, চলিষু, পরিবর্তনশীল, রূপান্তরপ্রবণ, জীবন্ত, ইত্যাদি ...। সেই কারণেই জগতের কানে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসিয়েছি।) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে মার্কসকে আবার দার্শনিক বানাবার ঘোরতর চেষ্টা চলে। সেই ক্ষেত্রে তারা দুর্দান্ত ভাবে সফলও হয়। লেনিন বা মাও জে দংকে —এমনকি স্টালিনকে বাদ দিয়ে মার্কসের আলোচনা অসম্ভব। মার্কসকে দার্শনিক বানাবার প্রক্রিয়ায় তারা কিন্তু বাদ পড়ে যায়। ভাবখানা এমন যে ইউরোপীয়রাই একমাত্র দর্শন বোঝে এবং করে। ইউরোপের বাইরে, যেমন এশিয়ায়, আমাদের কাজ হচ্ছে ইউরোপীয় দর্শনের প্রয়োগ করা, চর্চা করা বা বাস্তবায়ন করা। বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কী করে হাত ধরা ধরি চলে পাশ্চাত্যে মার্কসকে চর্চাশীল দার্শনিক বানাবার মধ্যে তার নজির মেলে।

মার্কসের পরিশ্রেক্ষিতে 'বিচ্ছিন্নতা', 'বিচ্যুতি' এইসকল শব্দ ও ধারণাগুলোর আবির্ভাব ও ব্যবহারের পেছনে এই দিকগুলো আছে। তবুও নয়াক্ষি করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে ইতিহাসের পেছনে 'বিচ্ছিন্ন' কথাটা আমরা আলাদা হয়ে যাওয়া, ভাগ হওয়া, দূরত্ব তৈরি করা এই সকল অর্থে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। যেমন যদি বলি প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব বাড়ছে, আমরা প্রাণ বা প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি—তাহলে তার একটা অর্থ তৈরি হয়। কিন্তু কথাগুলোর ভাব আরো ভালভাবে চেপে ধরতে হলে মার্টিন হেইডেগারের সঙ্গে জাঁ পল সর্বের তর্কটা প্রাসঙ্গিক ভাবে আসে। কিন্তু এখানে সেই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নাই।

আমি তরুণ বয়সে কবিতা বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে যখন লেখালিখি শুরু করি আমার মনে হয়েছিল আমি ঠিক লিখতে পারছি না। কারণ কি? প্রকৃতির যে-একটা দৈনন্দিন আয়োজন আছে সেই আয়োজন থেকে আমি খুব দূরে এসে ছটকে পড়েছি—এই অনুভব তীব্র হতে থাকল। সেই আয়োজনগুলোর মজা আমি আর ধরতে পারছি না। যদিও কিছুটা বিস্ময় কাজ করে কিন্তু সেই বিস্ময়ের মধ্যে উপলব্ধির দূরত্ব কাটছে না। কী করে সেই দূরত্ব কাটিয়ে তোলা যায় তার তাগিদটা সেই সময় থেকেই মনে বাসা বাঁধল। কিন্তু সাহিত্য, পদ্য, গান বা প্রেম খুব একটা কাজে লাগল না। একসময় মনে হোল আসলে ব্যাপারটা দর্শনের বা ভাবের মামলা নয়, বরং কিছু একটা সরাসরি করবার ব্যাপার। কৃষির প্রতি ঝোঁক সেই কারণে আরো বাড়ল।

এটা বোঝা বোধহয় খুবই সহজ যে 'আধুনিকতা' বা নগরায়নকে বিনাবাক্যব্যয়ে 'প্রগতি'-র পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নেওয়ায় নিজের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরই দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল আমরা আমাদের আধুনিকতা বা নগর সভ্যতার বাইরে গড়ে ওঠা জ্ঞান, প্রতিভা ও সম্পদই শুধু হারাচ্ছি না, পৃথিবীকে নতুন ভাবে গড়ে নেবার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাববার ক্ষমতাও হারাচ্ছি। নয়াক্ষি করতে গিয়ে

আমাদের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার তলায় যে-ব্যাপারগুলো হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রতি আমার আগ্রহ বাড়ি। যেমন, যে-জ্ঞানকে অস্বীকার করে আধুনিকতা নিজেকে ‘আধুনিক’ বলে দাবি করে সেই জ্ঞান। একে বলাহয় ‘লোকায়ত’ জ্ঞান। আমি মোটেও লোকায়ত কথাটা পছন্দ করি না। কারণ সকল জ্ঞানই আসলে লোকের আয়ত, লোকজাত বা মানুষের মধ্যে বিস্তৃত। মাত্রাভেদ থাকতে পারে। ফলে লোকায়ত বললে জ্ঞানের স্বভাব সম্পর্কে আমরা যা জানতে চাই বা বুঝতে চাই তার সম্পর্কে বরং ভুল ধারণাই সৃষ্টি হয়। তবুও লোকায়ত কথাটাই আমি এখন আপাতত ব্যবহার করব। সেই বিষয়েই এখন কিছু কথা বলব।

চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ Bengali New Year। নাম ভেদেই বোঝা যায় দুটোর ভাব, তাৎপর্য ও ইতিহাস আলাদা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকায়ত জ্ঞানের বৈচিত্র সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। আমাদের ধারণা “বাঙালি সংস্কৃতি” বুঝি এককাট্টা একরকমের একই ছাঁচে গড়া একটা ব্যাপার। শহর ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ে ওঠার এইরকম একাট্টা একধরনের সংস্কৃতির ধারণাও গড়ে ওঠে। বাংলা বা বাংলাদেশ বিচিত্র। এই একাট্টা ‘বাঙালি সংস্কৃতির’ ধারণা শুধু ভুল নয়—সাম্প্রদায়িকও বটে। কারণ এই পরিচয়ের মধ্যে আদিবাসীর নাই।

এই বাঙালি সংস্কৃতির কায়কারবার নিয়ে কয়েকটা কথা বলি। ঢাকা শহরে যারা থাকেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন পহেলা বৈশাখ মানে বুঝি পান্তাভাত আর ইলিশ খাওয়া। ‘রমনার বটমূল’ রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা, ইত্যাদি। নিশ্চয়ই বাংলার সংস্কৃতি এতো পানশে নয়। তাছাড়া সংস্কৃতি মানে নিছকই গান গাওয়ার ব্যাপারও নয়। বোঝা যাচ্ছে যারা এই ভাবে ‘বাঙালী সংস্কৃতির’ ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা উৎপাদনের সঙ্গে বা বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে কার্ল মার্কসের ভাষায় কোন প্রাণরসায়নিক সম্পর্কে (metabolic interaction) যুক্ত নন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখের পালনের ধরণও একরকম নয়।

সংস্কৃতি মাত্রই বিচিত্র ও নানামুখী। ওর মধ্যে শুধু এলাকার ভেদই নয়, শ্রেণীর, নারীপুরুষের, পেশার ভেদও বড়ই প্রকট। এই বৈচিত্র সম্পর্কে খানিক উদাহরণ দেবার জন্য আমি এখানে কয়েকটি নজির দিচ্ছি। পাঠক নিজের বা অন্য এলাকার তথ্য যদি জানেন তাহলে তার সঙ্গে এই তথ্যগুলোও মিলিয়ে নিলে আমাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে খানিক ধারণা করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তথ্য নিলে তথ্যের পার্থক্য বা বৈচিত্র্য থাকবে। আমি এই তথ্যগুলো আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে নিয়েছি। এই বিষয়ে নয়াক্ষি তাদের নিজের তাগিদে আরো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা পরস্পর শুধু কথা বলি তাহলেও যে সকল মজার তথ্য বেরোয় তার সমৃদ্ধি তুলে ধরছি এখানে। কিন্তু বৈচিত্র্যকে শুধু বৈচিত্র্য আকারে দেখলে সেটা জ্ঞান হয়ে ওঠে না। তার শ্রেণীকরণ বা সাধারণীকরণও চাই। অতএব নজির দেবার পর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত চেষ্টা করব। সেটা করব প্রধানত

কৃষকের বা কৃষিপ্রধান সংস্কৃতির দিক থেকে। নয়াকৃষির নজর বা নিরিখ থেকে। তবে লেখা বড়ো হয়ে যাবে বলে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দুই একটি দিক শুধু তুলে ধরব।

বাংলা বছরের শেষ দিনকে বলা হয় চৈত্র সংক্রান্তি। আসলে গ্রাম বাংলায় চৈত্র সংক্রান্তি পালনই গুরুত্বপূর্ণ, পহেলা বৈশাখ নয়। সরলরৈখিক সময়ের ধারণার মধ্যেই কেবল ‘নতুন’ আর ‘পুরাতন’ কথাগুলো খাটে। কিন্তু সময়ের ধারণা যদি ঋতুর ধারণার সঙ্গে সমার্থক হয়, সময় সেখানে সরলরৈখিক নয়, বরং চক্রাকার। সময় ফিরে আসে, নতুন হয় না। শেষটাই আরম্ভ হয়ে ওঠে। এটাই বাংলার ভাব। অতএব চৈত্র সংক্রান্তি পালনটাই বঙ্গের আসল জিনিস। ইংরেজদের দেখাদেখি নববর্ষ পালন চালু হয়েছে গোলামি সংস্কৃতির পরিণতি হিসাবে।

দিনাজপুরের কথা বলি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে ঘর ঝাড় দিতে হয় এবং মুছে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর গোসল করে তুলসি গাছে মাটির ‘ঝরা’ বেঁধে দিতে হয়। মাটির ঝরা মানে ছোট মাটির কর্লসি যার তলায় ছোট্ট একটি ছিদ্র থাকে। ওর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পানি গড়ায় এবং গাছ এই মাটির ঝরা থেকে সর্বক্ষণ পানি পায়। যেহেতু গাছের প্রতিদিন পানি চাই অতএব প্রতিদিন ভোরে এই ঝরাতে পানি দিতে হয়। ঘরের সামনে তুলসি গাছে এই মাটির ঝরা বাঁধার সঙ্গে বাংলার মেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার নিজের একটা সম্পর্কেও প্রতীক হিসাবে নিজের দৃষ্টির সামনে সবসময় জারী রাখে। গোসল করে প্রথমে যিনি ঝরা বাঁধেন তাঁকে ঘরের সবগুলো ঘরের দরজার ওপর একটি নিমের ডাল, একটি দাঁতন গাছের ডাল, একটি রসুন ও একটি পেঁয়াজ একসাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।

ঝরা বাঁধার পরে পরিবারের সদস্যরা গোসল করে সবাই যবের ছাতু, কলা, আখের গুড়, দুধ খায়। বাড়ির মাঝখানে বসায় একটা মঙ্গলঘট (ঘটে আমের শাখা, একটা কলা, একটা পান, একটা সুপারী দিতে হয় সিঁদুর ব্যবহারেরও রেওয়াজ আছে)।

চৈত্র সংক্রান্তির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে দুপুরে ১৪ রকমের শাক একত্রে রান্না করে খাওয়া। এই দিনে সবাই সবজি খায়। মাছ মাংশ খায় না। সন্ধ্যায় তুলসি তলায় চৌদ্দ পুরুষের নামে ১৪টা প্রদীপ দেওয়া হয়। প্রদীপ বাড়ির মেয়ে দিতে পারে বা ছেলেকে দিতে হয়।

পহেলা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস এবং এই মাস দিয়ে কৃষকদের যাত্রা। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো নরসিংদী বা গাজীপুরে ১লা বৈশাখকে সেই জন্য অনেক অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১লা বৈশাখে কৃষকরা জমিতে বীজ ছিটায়। এই দিনের বীজ ছিটানোকে পহেলা বৈশাখের ‘বিচ্যুত’ বলে। কৃষকরা বাসি মুখে খুব সকালে হাল নিয়ে জমিতে চাষ করতে চলে যান। আর মেয়েরা সকালে উঠে প্রথমে মাটি, গোবর দিয়ে ঘরের মাঝ খানে লেপে। অনেকে ঘর লেপার সময় ধানের কুড়াও ব্যবহার করে। এরপর আতপ চাল আর গুড় দিয়ে ‘ক্ষীর’ রান্না করে। এই ক্ষীরে দুধ দেয় না। তারপর গোসল করে এসে ভিজা কাপড়ে সেই লেপা জায়গায় দাঁড়িয়ে ও বসে ধানের

বীজ ঢালে। ভেজা জায়গায় বীজ জমা হয়। ঘরের মাঝখানের সেই লেপা ও ভেজা জায়গা থেকে ধান তুলে ডলায় করে কৃষক সেই বীজ জমিতে নিয়ে যায়। জমিতে সেই বীজ ছিটয়ে দেওয়া হয়।

ধান ছিটানো শেষ হলে কলাপাতার মাঝখানের কচি অংশটুকু কেটে নিয়ে সেই পাতায় বাড়িতে তৈরী ‘ক্ষীর’ জমির মাঝখানে রেখে আসে। জমিতে ‘ক্ষীর’ দেওয়ার আগে পহেলা বৈশাখের এই ‘ক্ষীর’ কাউকে খেতে দেওয়া হয় না। কারণ এই ‘ক্ষীর’ পশু, পাখি, পোকামাকড় জীবজন্তুকে আগে দিতে হয়। তাদের সকলকে দেবার পরে যা কিছু ক্ষীর থাকবে তা বাড়ির ছোট ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানো হবে। বাচ্চাদের খাওয়ানো মানে আনন্দ পাওয়া।

পহেলা বৈশাখে কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না। আর ঝগড়া করলে সারা বছরই ঝগড়া লেগে থাকবে। তাই সবাই বছরের প্রথম দিনে মিলে মিশে থাকে, আনন্দ করে।

সমবয়সী মেয়েরা একত্রে দল বেঁধে কুড়িয়ে পাওয়া শাক তুলতে যায়। আর বাড়ির বয়স্ক লোকেরা বলে দেয় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সাথে সাথে সামনে যে-সমস্ত গাছ পড়বে সব গাছেরই কচি কচি পাতাগুলো একটু একটু করে নিতে হবে। এই শাককে ‘তিতা শাক’ বলে। সব গাছপালার সঙ্গে এর ফলে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়। তাছাড়া পহেলা বৈশাখে এই ‘তিতা শাক’ খেলে কোন রোগ বলাই হয় না। শাক কুড়িয়ে এনে দিলে মায়েরা রান্না করে রাখবেন। বাড়ির সবাই দুপুর বেলা গোসল করে এই তিতা শাক দিয়ে ভাত খাবেন এবং এই তিতা শাক বড়রা তো খাবেনই , ছোট বাচ্চাদেরকেও খাওয়াবেন।

সাধারণ নিয়ম হোল পহেলা বৈশাখে একটু ভাল খেতে হয়। যারা গরীব তারাও সেই দিন একটু ভাল খাবার যোগাড় করার চেষ্টা করেন। মানুষ মনে করে পহেলা বৈশাখে ভাল খেলে সারা বছর ভাল খেতে পারবে। তাই সবার ঘরেই ভাল একটু মাছ কিংবা মাংশ থাকে।

নরসিংদী এলাকায় একটি গাছ আছে তার আঞ্চলিক নাম ‘কাফিলা’ (Lannea Coromandelica) গাছ। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় এর নাম হচ্ছে “ঝিকা, বাদি, জিতল, ইত্যাদি। এই সময় কাফিলা গাছের পাতা ঝরে যায় এবং জামের মতো ফল হয়। সেই গাছের ফল এনে গোসলের মাঝখানে ফলটি পানি দিয়ে খেতে হয়। আগে যখন নদী বা পুকুরে মানুষ গোসল করত তখন গোসলের মাঝখানে ডুব দিয়ে ফলটি খেতে হত। লোকায়তিক বিশ্বাস যে এতে বসন্ত রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এই দিনে সকালে কাঁচা হলুদ ও নিমের পাতা একত্রে বেটে সমস্ত শরীর ও মুখে মাখিয়ে রাখার নিয়মও আছে। গোসলের সময় এটা ধুয়ে ফেলতে হয়। এতে চামড়া ভাল থাকে এবং শরীরে কোন চুলকানি, পাঁচড়া বা ঘা হয় না।

পহেলা বৈশাখের দিন ঝড়, বৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে। পহেলা বৈশাখে দিনে যে ডাক দেয়, সে ডাকে সাপের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য বলা হয় পহেলা বৈশাখের দিনে ডাক দেওয়া ভাল। সাপের ভয় থাকে না। আর যদি দিনে ডাক না দেয় তাহলে সেই বছর সাপের ভয় থাকে এবং সাপ অনেক হয়।

পহেলা বৈশাখে অনেক এলাকায় মেলা হয়। সকাল বেলায় এই মেলায় বড় ও ছোট বাচ্চারা স্বভাবতই যেতে পছন্দ করে। মেলা থেকে বাচ্চারা বাতাসা, জিলাপি, বাশি, পুতুল, ঘুড়ি, খেলনা কিনে নিয়ে আসে এবং খুব আনন্দ পায়। বলাবাহুল্য যে এই ধরণের মেলা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

মৌলভি বাজারের দিকে পহেলা বৈশাখের সকালে লাল বোরো চালের ভাত রান্না হয়। তার সাথে কলমি শাক, ডাটা শাক, লাল শাক এইরকম বিভিন্ন রকমের শাক রান্না করা হয়। সজনার ডাল রান্না হয়। তবে চুকাই পাতার খাট্টা ছোট মাছ দিয়ে এবং কচু পাতার খাট্টা (টক তরকারি) অবশ্যই রান্না করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখে কোন প্রকার মাংস, ডিম খাওয়া হয় না। দই, চিড়া, গুড়, আখের শরবত করা হয়। প্রতি বাড়িতে কাঁচা আমের ভর্তা করা হয়। মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য অনেক বাড়িতে, বিশেষত হিন্দু পরিবারে বেশি করে মিষ্টি তৈয়ারী করা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে পুরানো তেঁতুলের শরবত প্রতি বাড়িতেই তৈরি করা হয়। কাঁচা সুপারী দিয়ে পান দেয়া হয় সবাইকে।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বালানোরও নিয়ম আছে। তবে চৈত্রসংক্রান্তিতে বিশেষ করে ‘মদন’ প্রদীপ (মঙ্গলদীপ নয়) জ্বালিয়ে সন্ধ্যাকে বরণ করা হয়। তারপর গানের আসর বসে। বাড়িতে সারা রাত পর্যন্ত গান চলে, চলে পুঁথি পাঠ সেই সঙ্গে। পালা গানও হয়। বানেছা গানও হয়। হরেক রকম গান হয়। জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিয়া মন... কিম্বা ও বুয়াই হুনজনি জামাই আমার লন্ডনী—ইত্যাদি গান এখনও হয়। বুজিকো আমার মন ভাল না... কিম্বা চৈতি যাইয়া দিন আইল...এই গানও কানে এসে বাজতে পারে।

পিরোজপুরের দিকে চৈত্র সংক্রান্তিতে গৃহস্থরা তাদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে। উঠান গোবর দিয়ে লেপে দেয়। রান্না করার সময় হিশাব করে রান্না করে যেন পহেলা বৈশাখে বাসি কিছু না থাকে।

পহেলা বৈশাখে ভোর রাতে সারা পাড়ায় বা ‘নগরে’ কীর্তন হবে। নগর কীর্তন। গৃহস্থরা ওই কীর্তনে অংশ নেয়। কীর্তনদল প্রতিটি ঘরে যাবে এবং নাম কীর্তন করবে। কীর্তনদলকে প্রতি ঘর থেকে প্রসাদ দেয়া হবে, চাল, ডাল দেয়া হবে, ইত্যাদি। চাল-ডাল আনাজ নিয়ে দুপুরে আখড়া বাড়িতে খিচুরী রান্না হবে।

এ দিনের খাদ্য হবে প্রধানত নিরামিষ এবং তিতা। সাত ধরণের তিতা গৃহস্থরা জোগাড় করবে। এর মধ্যে কচি বেতের ডগা থাকতেই হবে। আমিষ এ দিনে খায় না। খেলেও জিয়ল মাছ খাবে।

গবাদি পশুকে এদিনে সকালেই গোসল করানো হয়। গোসল শেষে কপালে সিদুর, আতপচালের গুঁড়া মেখে দেয়। বিকেলে মাঠের মধ্যে মেলা বসে।

মানিকগঞ্জে চৈত্র সংক্রান্তিতে সবাই মন দিয়ে অনেক প্রকার শাক তোলে এই দিনে শাক রান্না করে খায়। আরও খায় গমের ছাতু, পায়রার ছাতু, ছোলা বুটের ছাতু, ইত্যাদি। চাউল ও তিল বেটেও ছাতু করে। এই ছাতু দুধ গুড় দিয়ে বা কলা দিয়ে খায়। এই দিনে নানার বাড়ি, দাদার বাড়ি, মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। খুব মজা। সংক্রান্তির দিন বা পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মানিকগঞ্জের সংস্কৃতি কিন্তু খুবই সমৃদ্ধ। আমি আর কিছু লিখলাম না। দেখা যাক মানিকগঞ্জের পাঠকরা নিজেরা কিছু যোগ করতে পারেন কিনা।

আলমডাঙ্গার কথা। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে গোসল করে গরুর গোয়ালে মাটি খুঁড়ে নতুন চুলা বানায়। ঐ চুলাতে মাটির নতুন পাতিলে করে আতপচাল, গুড় ও অনেক করে দুধ দিয়ে ক্ষীর রান্না হয়। এই ক্ষীর রান্নার খড়ি অড়হড় অথবা পাট কাঠি হতে হবে। আর এই ক্ষীর রান্না করার সময় কোন কিছু দিয়ে নাড়বে না। এতে দুধ বলকিয়ে চারদিকে পড়বে। এই ভাবে রান্নার কারণ হচ্ছে ভগবতীকে তুষ্ট করা।

এই ক্ষীর প্রতিবেশীসহ সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। নানা রকমের শাক রান্না ও ৫ তরকারী রান্না এই দিনে নিয়ম। এই দিন নদীতে গোসল করে নদীর পানি এনে ৫ টি গাছে দেবার নিয়মও আছে। সেই গাছগুলো হলো, তাল গাছ, বেল গাছ, নিম গাছ, বট গাছ, ও পাকুড় গাছ। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে গাছে এই পানি দেয়া শুরু হবে। পুরো বৈশাখ মাস ধরে পানি দেওয়া হবে এবং পহেলা জ্যৈষ্ঠ পানি দিয়ে ষষ্টি পূজা করে পানি দেয়া বন্ধ করবে।

পহেলা বৈশাখে সাধুগুরুরা এসে গরুর গোয়ালে বসে গান করবে। গরুর যাতে কোন রোগ বলাই না হয় তার জন্য সরিষার তৈল ও কালি দিয়ে মিশিয়ে গরুর শিং-এ দিয়ে দিবে। এ ছাড়া তৈল ও সিদুর দিয়ে মিশিয়ে গরুর কপালে টিপ দিয়ে দিবে ও গরুর ঘরের দরজায় কাল ও লাল টিপ দিয়ে দিবে।

পহেলা বৈশাখে দুপুরে খাবারের সাথে আমের মিষ্টি খাট্টা থাকবে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনেক দিক সহজেই চোখে পড়ে।

এক, বিভিন্ন প্রকার শাক, বিশেষত কুড়িয়ে পাওয়া শাক খাওয়ার বিধান প্রাণবেচিত্র্য (biodiversity) রক্ষার একটি অসাধারণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধান। শাক খুঁজতে গিয়ে যদি বিশেষ কোন শাক পাওয়া না যায় তাহলে সেটা পরিবেশ বিপর্যয়ের একটা লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। তার মানে শাক খাওয়ার বিধান শুধু খাবার জন্যই নয়, ওর সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নও জড়িত। যদি শুধু এই লোকায়ত জ্ঞান ও চর্চার দিকটার প্রতি নিরিখ রাখি তাহলে আমরা বুঝব পহেলা বৈশাখ নিয়ে শহরে মধ্যবিস্তৃত যে তামাশাটা করে সেটা একটা থার্ড ক্লাস সার্কাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই তিতা খাওয়ার নিয়মের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রসঙ্গও জড়িত। কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে বাসনে পান্ত ভাত আর ইলিশ মাছ খাওয়ার বিধান কোথা থেকে এল সেটা এখনও একটা রহস্য এবং গবেষণার বিষয়।

তিন, যবের ছাতু, দই, কলা ও আখের গুড় মিশিয়ে কিম্বা শরবত করে পান, চৌদ্দ প্রকার শাকের মিশাল, ঘি দিয়ে গিমা ও অন্যান্য তিতা ভাজি, টেঁকিছাটা লাল চালের ভাত এবং নিরামিষ। নিরামিষে মাছ, মাংস, ডিম পরিহার ছাড়াও মসুরের ডাল খাওয়া যায় না। এই চর্চার সঙ্গে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের যোগ খুবই ক্ষীণ। এগুলো হিন্দু ধর্ম নয়। হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতি ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বিকাশের কিছু নিয়ম ও বিধান গড়ে তুলেছে। অতএব এই সংস্কৃতি প্রাণবৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। বাংলার নারীর যে 'ব্রত' তার ভিত্তি আর শেকড়ও এই সকল খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আমূল প্রোথিত। চৈত্র-সংক্রান্তি প্রাণ রক্ষার শপথের দিন। এই দিন বাংলার মেয়েরা প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষায় জন্য নানান ব্রত ও নিজের 'নিয়ত' বা 'মানত' পালন করেন।

সত্যি বলতে কি—নয়াকৃষি এই ব্রতেরই বিকাশ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। জ্ঞান ও চর্চা এখানে মার্কসীয় অর্থেই সমার্থক। দর্শন বলে এখানে আলাদা কিছু নাই। প্রকৃতি ও প্রাণের অব্যবহিত সম্পর্কের মধ্যে মানুষের খোদ জীবনযাপনটাই এখানে দর্শন হয়ে বিরাজ করে।

একেই আমি আজকাল 'ভাব' বলি। একে আশ্রয় করেই ভাবান্দোলনের প্রস্তাব করি। নয়াকৃষি বাংলার ভাবান্দোলনের একটা দৃশ্যমান চর্চা মাত্র।

টোকাটুকির হদিস

- মজহার ১৯৭৭ নোআম চমস্কি: তাঁর দর্শনের ব্যাকরণ, ফরহাদ মজহার, প্রস্তাব, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৪/ মে ১৯৭৭
- মজহার ২০০৬ 'মোকাবিলা', ফরহাদ মজহার
- মুরশিদ ২০০৬ 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', গোলাম মুরশিদ। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬
- ফিশ ১৯৮৯ Introduction : Going Down the Anti-formalist Road, DOING WHAT COMES NATURALLY by Stanley Fish, Duke University Press 1989.
- দত্ত ৯৪ 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়', অক্ষয় কুমার দত্ত। করুণা প্রকাশনী কলকাতা- ৯ ১৩৯৪
- শরীফ ৮৩ 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য', আহমদ শরীফ,। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৮৮৩।
- দাস ৮৬ 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সাহিত্য সংদস, কলকাতা, ১৯৮৬।
- হরিচরণ ৬৬ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়,। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা ১৯৬৬।
- ভট্টাচার্য ৭৮ 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ১৩৬৪।
- আলাউদ্দীন ৯৫ 'আলাউদ্দীন গীতি', আলাউদ্দীন বয়াতি,। বিউটি বুক হাউস ঢাকা।
- শক্তিনাথ ৯৫ 'ফকির লালন সাঁই', শক্তিনাথ ঝা। সংবাদ, কলকাতা ১৯৯৫।
- হেইডেগার ৮৮ 'The Basic Problems of Phenomenology', Martin Heidegger, Indiana University Press 1988
- হেইডেগার ৯০ 'Kant and the Problem of Metaphysics', Martin Heidegger, Indiana University Press 1990
- মুরশিদ ২০০৬ হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬
- উমর ১৯৬৯ 'মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাভর্তন', বদরুদ্দীন উমর, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা।

ক্রেডিট সহায়ক নাম, কোথাও দেখা যায়।

নাম-কুমার নাই।

